পৃথিবীর ইতিহাস

পৃথিবীর ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

[প্রাচীন ও মধ্যযুগ]

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

২২/১, বিধান সরণী, কলিকাতা ৬

প্রথম সংস্করণ
১লা পৌষ, ১৩৭৩

প্রকাশক
প্রকাশচন্দ্র সাহা
২২/১ বিধান সরণী, কলিকাতা ৬

একমাত্র পরিবেশক
পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড
১২/১ লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলিকাতা ১৬

শাখা

গোল মার্কেট	২৩, হামাম স্ট্রীট	১৬, চন্দ্রভানু স্ট্রীট
নিউ দিল্লী ১	বোম্বে ১	মাদ্রাজ ২

ব্লক ও মুদ্রণ
প্রসেস্ ইণ্ডিয়া
কলিকাতা ১৪

বাঁধাই
ভারতী বুক বাইণ্ডার্স
১০২ বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদপট
শচীন বিশ্বাস

রেখাঙ্কন
মৃণাল চক্রবর্তী

দাম ষোলো টাকা

এ. মিত্র কর্তৃক নিউ মিত্র প্রিণ্টার্স
১২-২ এ বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা ৪ হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

সায়ন,

সুমন্ত্র,

উদয়ন,

প্রিয়দর্শী ও সুপ্রতীক

আর কাবেরীকে

তোমাদের হাতে দিলাম আমার এই ইতিহাসের বইটি।

'দাদাই',

রাখী পূর্ণিমা
৩১শে আগষ্ট, ১৯৬৬

যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে, এই জীবনের সকল শাদা কালো
যাদের আলোক ছায়ার লীলা, সেই যে আমার আপন মানুষগুলি
নিজের প্রাণের স্রোতের 'পরে আমার প্রাণের ঝর্ণা নিল তুলি ;
তাদের সাথে একটি ধারায় মিলিয়ে চলে, সেই তো আমার আয়ু
নইলে যে কেবল দিন-গণনার পাঁজির পাতায় নয় সে নিশাস বায়ু
তাদের বাঁচায় আমার বাঁচা আপন সীমা ছাড়ায় বহু দূরে ;
নিমেষগুলির ফল পেকে যায় নানা দিনের সুধার রসে পুরে ;
অতীতকালের আনন্দরূপ বর্তমানের বৃন্তদোলায় দোলে
গর্ভ হতে মুক্তশিশু তবু যেমন মায়ের বক্ষে কোলে
বন্দী থাকে নিবিড় প্রেমের বাঁধন দিয়ে....

আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, পৃথিবী

শেষ নমস্কারে অবনত দিনাবসানের বেদিতলে।

মহাবীর্যবতী, তুমি বীরভোগ্যা,

বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে,

মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি পুরুষে-নারীতে ;

মানুষের জীবন দোলায়িত কর তুমি দুঃসহ দ্বন্দ্বে।

ডান হাতে পূর্ণ কর সুধা

বাম হাতে চূর্ণ কর পাত্র,

তোমার লীলাক্ষেত্র মুখরিত কর অট্টবিদ্রূপে

দুঃসাধ্য কর বীরের জীবনকে মহৎ জীবনে যার অধিকার।

শ্রেয়কে কর দুর্মূল্য,

কৃপা কর না কৃপাপাত্রকে।

তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছ প্রতি মুহূর্তের সংগ্রাম,

ফলে শস্যে তার জয়মাল্য হয় সার্থক !

জলে স্থলে তোমার ক্ষমাহীন রণরঙ্গ ভূমি,

সেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয় বিজয়ী প্রাণের জয়বার্তা।

তোমার নির্দয়তার ভিত্তিতে উঠেছে সভ্যতার জয়তোরণ

ত্রুটি ঘটিলে তার পূর্ণ মূল্য শোধ হয় বিনাশে।

স্নিগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি, পুরাতনী, তুমি নিত্যনবীনা,

অনাদি সৃষ্টির যজ্ঞহুতাগ্নি থেকে বেরিয়ে এসেছিলে

সংখ্যাগণনার অতীত প্রত্যুষে,

তোমার চক্রতীর্থের পথে পথে ছড়িয়ে এসেছ

শত শত ভাঙা ইতিহাসের অর্থলুপ্ত অবশেষ—

বিনা বেদনায় বিছিয়ে এসেছ তোমার বর্জিত সৃষ্টি

অগণ্য বিস্মৃতির স্তরে স্তরে।

জীব পালিনী আমাদের পুষেছ

তোমার খণ্ডকালের ছোটো ছোটো পিঞ্জরে।

তারই মধ্যে সব খেলার সীমা,

সব কীর্তির অবসান।

গ্রন্থকারের নিবেদন

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম পর্বে ইতিহাস পড়াতাম; আমাকে পড়াতে হতো প্রাচীন ইতিহাস। কিন্তু পড়াতে গিয়ে দেখি বই নেই। আমার ছাত্রদের বয়স দশ-এগারো বৎসর—তাদের জন্য ইতিহাস লিখলাম না—লিখলাম 'প্রাচীন ইতিহাসের গল্প'। বইটির ভূমিকা লিখে দেন পাটনা কলেজের অধ্যাপক যদুনাথ সরকার।

বই প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে—অনেক ছবি দিয়েছিলাম। ইচ্ছা ছিল ঐ ধারায় মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের ইতিহাস গল্পে লিখবার; প্রায় শ'খানেক ছবির ব্লক করাও হয়। অনেক বই লাইব্রেরী থেকে পড়েছিলাম, কিনেওছিলাম কয়েকখানা দামী বই। লিখেছিলাম অনেকটা—কিন্তু কী কারণে বই ছাপা হয়নি তা আজ আর মনে নেই—কারণ ঘটনাটা হচ্ছে ১৯১২ সালের—আমার বয়স তখন বিশ বৎসর পুরো হয়নি। অর্ধ-শতাব্দীর পূর্বের মনোইচ্ছা এতদিনে রূপ নিল অন্যভাবে।

বাংলার গভর্ণর এন্ডারসনকে দার্জিলিঙে গুলি করে মারার চেষ্টা হবার পর, বাঙালীদের দার্জিলিঙ যাওয়া প্রায় নিষিদ্ধ হয়েছিল। সিউড়ী থেকে পাসপোর্ট করে ছবি তুলে ফর্মে এঁটে যেতে হয়েছিল দার্জিলিঙ। গিয়ে দেখি দার্জিলিঙ স্যানিটোরিয়াম প্রায় ফাঁকা। তাই একটা ঘরে শুতাম আর একটা ঘরে বইপত্র ছড়িয়ে পড়াশুনা করতাম। ১৯৩৫ সালে সেবার গ্রীষ্মকালে পৃথিবীর ইতিহাস লিখতে সুরু করি। তারপর ত্রিশ বৎসর কেটে গেছে। বহুবার নিজের মনের আনন্দে খসড়া নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি মাঝেমাঝে। অনুলিপিও করে রাখলাম—খসড়া খাতা জীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল।

কি জানি কি ভেবে একদিন পত্র লিখলাম শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষকে বইখানি সম্বন্ধে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পেলাম পত্রিকা সিণ্ডিকেট থেকে—তাঁরা 'পৃথিবীর ইতিহাস' ছাপবেন। প্রথম্-এর উপর ভার অর্পিত হলো মুদ্রণাদি ব্যাপারে। সুকমল বাবুকে একবার মাত্র চোখে দেখেছি—রবীন্দ্রমেলার সম্বর্ধনা দিনে, তিনি উৎসাহী হয়ে 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন,

ছাপিয়ে ছিলেন ; এবারও 'পৃথিবীর ইতিহাস' প্রকাশনের দায় গ্রহণ করলেন। তাঁর উৎসাহ না পেলে এ-গ্রন্থ ছাপার হরপে বের হতো না—সেজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ এইটুকু বললাম—অনুক্ত থাকলো সবটাই। গ্রন্থম্-এর অন্যতম কর্মী শ্রীপ্রদীপ সরকারের চেষ্টায় গ্রন্থখানি অল্পসময়ের মধ্যে মুদ্রিত হয়েছে —তাঁর উৎসাহ প্রশংসনীয়। অন্তরালে আছেন শ্রীচণ্ডীচরণ বসু সবকাজ তাঁর নির্দেশে, তাঁর সহায়তার কথা না বললে অসমাপ্ত থাকবে ভূমিকা।

গ্রন্থখানির অনুলিপি করেন বধূমাতা সাহানা দেবী, পুত্রোপম অধ্যাপক জয়কুমার চট্টোপাধ্যায় ও বিশ্বভারতীর অন্যতম কর্মী ধীরেন্দ্রনাথ দাস। তাঁদের কর্মনিষ্ঠার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গ্রন্থের নির্দেশিকা প্রস্তুত করেছেন—সুধাময়ী দেবী, তাছাড়া গ্রন্থের শ্রোতাও বটে। ছবিগুলি তুলে দিয়েছেন বোলপুরের অশোক ভকত ; সেই তরুণ শিল্পীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পাঠকদের কাছে একটি অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি—গ্রন্থ-মধ্যে কারণে অকারণে বহু বর্ণাশুদ্ধি রয়ে গেছে : তার জন্য মুদ্রাকরকে সর্বতোভাবে দায়ী করতে পারিনে, আমার বার্ধক্যজনিত অনবধানতা বহুলপরিমাণে দায়ী। তবে প্রকাশক ও মুদ্রাকর উভয়েই আশ্বাস দিয়েছেন যে গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁরা আরও হুঁশিয়ার হবেন। বর্ণাশুদ্ধি থাকবে না একথা বলার সাহস আশা করি তাঁরা অর্জন করবেন।

এ-শ্রেণীর গ্রন্থ লিখতে গেলে বহু মনীষীর বই পড়তে হয়, দেখতে হয়। সে-সব গ্রন্থ সুপরিচিত বলে তাদের নাম করার প্রয়োজন নেই। 'ইসলামের সংস্কৃতি' পরিচ্ছেদের তথ্যাদি নিয়েছি সমরেন্দ্রনাথ সেনের বিজ্ঞানের ইতিহাস গ্রন্থ থেকে। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে অনুরোধ করছি বইটাকে যেন অবিলম্বে শেষ করে ফেলেন—আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক কথা বাকি।

এ-গ্রন্থে অনেক মতামত ও মন্তব্য আছে—যা পড়ে এক শ্রেণীর লোকের মন উঠবে না। কিন্তু বইটা লিখেছি ভাবীকালে যারা দেশসেবক ও রাষ্ট্রসেবক হবে—সেই সব তরুণদের কথা স্মরণ করে। জীর্ণ মতামতের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করি নি, বিজ্ঞানীর দৃষ্টি দিয়ে জগৎ-প্রবাহকে দেখতে চেষ্টা করেছি। 'প্রাচীন' হলেই তাকে মুগ্ধ নেত্রে দেখতে হবে এবং 'আধুনিক' হলেই তাকে বিনাবাক্যে মেনে নিতে হবে—কোনোটাই সুস্থ শিক্ষিত মনের লক্ষণ নয়। পরম্পরাগত তথ্য

তখনই মানতে পারি যখন সেটা যুক্তিসহ হয়। যুক্তিবাদের মূল্যায়ন নিয়ে শব্দের কচকচানি বা সকিস্তি অনেক হয়েছে।

ঐতিহাসিক কোন ঘটনাকে আমরা অলৌকিক বা দৈব বলে মনে করিনে—যেমন মানিনে কালবৈশাখী, তাইফুন, ভূমিকম্পের দৈব কারণ। বিজ্ঞানী মেজাজ অলৌকিক রহস্য-অন্ধকারের পরে নিত্য আলোকপাত করে চলেছে। আজ যা রহস্যাবৃত অলৌকিকত্বের দাবী করছে, আগামী-কাল বিজ্ঞানের স্পর্শে সেই বিশ্বাসের সৌধ ভেঙে পড়ছে। ইতিহাসে দৈব কিছু নেই—কার্যকারণের তরঙ্গে তরঙ্গে নিত্য ইতিহাস রচিত হয়ে চলেছে। ঘটনার অন্তরালে আছে ব্যক্তি-মানুষের মন—সমস্ত ঘটনার জন্মভূমি। সেই মনটাও বংশপরম্পরাগত জীবতাত্ত্বিক তথা পারিপার্শ্বিকের বিচিত্র সংঘাত ও সহায়তায় গড়ে ওঠে—সেখানে কোনো অলৌকিকের স্থান নেই। ভাবীকালের মানুষের মনের মুক্তি হবে তখনই। যখন সে জ্ঞানকে ধ্যানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে। সেই বিশুদ্ধ জ্ঞান-সাধনা হতেই অদ্বৈতবোধের জন্ম হবে—তখনই পৃথিবীতে শক্তি আসবে। ইতিহাস-অধ্যয়ন অখণ্ড মানব-সত্তার উপলব্ধির সহায় হতে পারে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বোলপুর, শান্তিনিকেতন
২৭শে জুলাই, ১৯৬৬
১১ই শ্রাবণ, ১৩৭৩

সংক্ষিপ্ত সূচী

মধ্যযুগ। ইসলামের কাহিনী

বিস্তারিত সূচী

সূচনা : ১—১৬

প্রাচীন জগত : পৃ ১৭—৩৪

পশ্চিমএশিয়া। পৃ ৩৫—৬১

পুরোহিত প্রাধান্য—দেবমন্দির বা জিগুরাত—মৃত্যু ভয়—উর নগরীর সমাধি ক্ষেত্রে সহমরণ চিহ্ন।

আক্কাদী সর্দার শারুকিন (সারগন)—বহু শিলালেখে নিষ্ঠুর বিজয় কাহিনী। বাবিলনের অভ্যুদয়—হামুরাবির আইন—শিক্ষাদান ব্যবস্থা—সাম্রাজ্য বিস্তার। হামুরাবির মৃত্যুর পর কাস্‌সু (কাসাইত) আর্য উপজাতির আবির্ভাব অশ্বপালক-সূর্য ও মরুতের পূজক। বাবিলনিয়ার ধর্ম—বহু দেবতা ও প্রেতাদিতে বিশ্বাসী—পূজার সময় নির্ধারনের জন্য জ্যোতিষ শাস্ত্রের চর্চা—সপ্তাহ-সপ্তগ্রহের নাম—কালনির্ণয়—গণনাবিধি।

—কাদাপাটা খোদিত 'গিলগমীশ' কাব্য—জলপ্লাবন কাহিনী। বাবিলনিয়ার অবস্থিতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অনুকূল।

দোয়াবের উত্তরে কাসসু, হিটাইত ও মিত্তান—আর্য উপজাতির প্রবেশ—হিটাইতরা আনাতোলিয়ার (টার্কি) বাসিন্দা হয়—হিটাইত সাম্রাজ্য—বাবিলনিয়া আক্রমণ ও লুণ্ঠন। মিশরীয়দের সহিত সংঘর্ষ—চতুর রাজাদের কৌটিল্যনীতি।

হিটাইত সভ্যতা—বোগাজকুই-এ কাদাপাটার লেখমালা আবিষ্কার। আনাতোলিয়ার লোহ আকর ও লৌহাস্ত্র নির্মাণশিল্প। বহুদেব পূজক—পূজা প্রতীক দ্বিমুখী ঈগল। মিত্তানি আর্য ভাষাভাষী উপজাতি—মিত্র, ইন্দ্র, বরুণ, ত্রাসত্য উপাসক। অশ্ব শিক্ষা সম্বন্ধে গ্রন্থি পঞ্চাবর্তন, সত্তাবর্তন কথা। মিশরীয়দের সহিত কূটনৈতিক সম্বন্ধ—মিত্তানিরাজ তুশরও (দশরথ)।

অসুর নগর পত্তন—অসুরীয়দের অভ্যুত্থান—মিশর ও মিত্তানিদের সহিত রাজাদের কূটনৈতিক সম্বন্ধ—অর্থ যাচ্‌ঞা। রাজ্যবিস্তার—বাবিলনিয়া দখল—ইলাম দেশ জয় ও ছারখার করণ। স্থাপত্য নিদর্শন দুর্গাদি রচনায়—প্রাসাদ নির্মাণ ব্যসন। রাজধানী নিনেভা—অসুরবানিপালের গ্রন্থাগারে ত্রিশহাজার কাদাপাটার লেখ। নিনেভা ও অসুররাজ্য ধ্বংস। অসুরীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য—সিংহভাস্কর্য অতুলনীয়। ভারতীয় সাহিত্যে সুর ও অসুর—ভারতে আসুর সভ্যতা, আসুর বিবাহ।

বাবিলনিয়ার নব জাগরণ—নেবুকাদনেজার—ইহুদীদের স্বাধীনতা লোপ। দোয়াবের পতন—পারসিকদের দ্বারা অধিকৃত।

আরামিন ফিনিক। পৃ ৬২—৬৬

সিরীয়া—আরামিন উপজাতি—ভাষা আরামায়িক—ব্যবসায়ী জাতি।

ফিনিশিয়া বা ফিনিক বণিকদের দেশ—পৃথক্ রাষ্ট্র নগরী টায়ার, সিডন প্রভৃতি—বাহিরে উপনিবেশ—'নূতন নগর' কার্থাজ (Carthage)—বাণিজ্যে সাফল্য গ্রীকরা প্রতিদ্বন্দ্বী—পারসিকদের গ্রীক আক্রমণে ফিনিকদের সহায়তা দান—আলেকজেন্ডারের প্রতিশোধ গ্রহণ।

ফিনিক বর্ণমালা। ফিনিকরা কি বৈদিক 'পান' ?

ইহুদীদের কথা। পৃ ৬৭—৭৩

ফিলিস্তান—ইসরেইলের ভৌগোলিক অবস্থান—হাবরু বা হীব্রুরা সেমেটিকদের উপজাতি, যাযাবর—ফিলিস্তানে বসবাস কালে হিটাইতদের সহিত মিশিয়া যায় —ইহুদীদের এক শাখা দুর্ভিক্ষের তাড়নায় মিশরে আশ্রয় গ্রহণ—হিক্‌সসদের যারা ইহুদীরা সম্মানিতভাবে থাকে। নূতন মিশরীয় ফারায়োদের উগ্র জাতীয়তার ফলে ইহুদীরা বিতাড়িত মুসার (Moses) নেতৃত্বে ইহুদীদের এককালীন মিশর ত্যাগ ও পশ্চিমএশিয়ার কানান দেশে আগমন—দেশের আদিবাসী ফিলিস্তানী। ইহুদীরা 'বারো' উপজাতিতে বিভক্ত। 'জজ'দের শাসন—সল্ প্রথম রাজা—দাউদ সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা—রাজা সলোমনের রাজ্য বিস্তার ও কূটনীতি। দশজাতি মিলিয়া ইসরাইল ও দুই জাতি মিলিয়া জুডা গঠন। অসুরীয় সম্রাটদের সহিত যুদ্ধ। নেবুকাডনেজার কর্তৃক জেরুসালেম ধ্বংস—ইহুদীদের বাবিলনে নির্বাসন—সত্তর বৎসর পরে পারসিক সম্রাট কৈরুস কর্তৃক ইহুদীদের স্বদেশ প্রেরণ—জেরুসালেম মন্দির পুনর্নির্মাণ। ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ 'বাইবেল'—ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র বা 'তোরা'।

ক্রীট (Crete) পৃ ৭৪—৭৬

ক্রীটদ্বীপের লুপ্ত সভ্যতা—মৃত্তিকা খনন করিয়া নগর উদ্ধার—প্রাসাদের প্রাচীর চিত্র। আকস্মিক ধ্বংস কাহারা করিল ?

সিন্ধু-হরপ্পা সভ্যতা পৃ ৭৭—৮১

মহেনজোদাড়ো হরপ্পার ইতিহাস—মৃত্তিকা খনন করিয়া প্রাপ্ত এই সভ্যতা ভারতে বহুদূর প্রসারিত—প্রাকৃতিক আবহাওয়ার পরিবর্তন। সিন্ধুনদ—যাতায়াতের পথ, লোকেরা ব্যবসায়ী ও বণিক। মহেনজোদাড়ো—সুরক্ষিত নগরী—নগর বর্ণনা। হরাপ্পা বৈদিক হরিযুপা কি ? ধ্বংসকারী কাহারা ? আর্যরা কি ? প্রাগৈতিহাসিক অসংখ্য উপজাতি যক্ষ, রক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব প্রভৃতি।

আর্য-পারসিক বৈদিক পৃ ৮২—৯০

আর্য মহাজাতির হিকসস্, হিটাইত, কাস্সু, মিত্তানিদের সেমেটিকদের রাজ্য-মধ্যে প্রবেশ চেষ্টা। য়ুরোপিয়ার মহাপ্রান্তরে 'আর্য' যাযাবরদের বাস—বাসভূমি ত্যাগের নানা কারণ। 'বীর' আর্যদের ধর্ম—ব্যক্তিবিশেষের ধর্মমত সম্বন্ধে স্বাধীনতা—সমাজ বা বর্ণাশ্রম নিয়ম পালনে আবার বদ্ধ—আর্যরা বাক্‌পটু জাতি—আর্যদের সাহিত্য।

আর্যভূমি হইতে পশ্চিম য়ুরোপে প্রাচীনতম উপজাতি কেল্‌টিক, লাতিন, হেলেনী—টিউটন স্লাভ। পূর্বদিকে পারস্য—ভারতে উপনিবেশ। মেসোপটেমিয়ায় বৈদিকী শাখা মিত্তানি—চীনের উত্তর পশ্চিমে ইতালো-কেলটিক শাখার উপনিবেশ—কুষ বা কুশদ্বীপে। শক শাখা।

প্রাচীন ঈজান ও ক্রীটান, সিন্ধু-হরাপ্পা, ইনকা সভ্যতা ধ্বংসকারী আর্যরা—আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতি পৃথিবীময় বিস্তারিত।

চীনদেশের কথা পৃ ৯১—৯৫

নদীমাতৃক ভূভাগ—ইয়াংসে, হোয়াঙ হো প্রবাহিত। কিংবদন্তীমূলক অবিশ্বাস্য ইতিহাস। চীনা লিখন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য—কুংফুৎসুর প্রভাব। সম্রাট হুয়াংতি কৃত কুংফুৎসুর মত ও সাহিত্য ধ্বংসের চেষ্টা—রাজ্য একীকরণ ইচ্ছা। হুয়াংতি ভারতে অশোকের সমকালীন সম্রাট।

পারস্য তথা ইরান পৃ ৯৬—১২২

আর্যদের শাখা পারসি—ইলামের সভ্যতা। আর্যনিবাস—আরিয়ান বাস (Aryana-Vaejo)—মীড়, পারসি, বক্ত্র (বাহ্লিক) সুগুধ (শক) আর্য ভাষাভাষী—মীড়দের উপজাতি 'মগ'। মীড়দের শক্তিবৃদ্ধি—রাজা দেওটি হুবক্ষত্র (শুভ ক্ষত্র)—বাবিলনিয়ার রাজা নব পলস্তরের সহিত মিতালি ও অসুরবানিপলের নিনেভা ধ্বংস। পশ্চিমে লিডিয়া রাজ্য—স্বর্ণলোভী মিডাসের গল্প—মুদ্রার প্রবর্তনকারী।

পারসিদের রাজধানী পার্ণগড়—করুষ কর্তৃক মীড়দের পরাজয়—বৃহৎ সাম্রাজ্য পত্তন—লড়িয়া জয়—বাবিলন জয়—ইহুদীদের জেরুসালেমে প্রেরণ। পালিস্তান জয়—শকদের দেশ আক্রমনে গিয়া করুষের মৃত্যু।

কারম্বসের পর অরাজকতা—দারায়ুসের আবির্ভাব—বেহিস্তান শিলালেখ

—শিলালেখ হইতে উধৃতি—আর্মিপলিস নূতন রাজধানী নির্মান। জারক্সেস—সাম্রাজ্য শাসন ব্যবস্থা—রাজপথ নির্মাণ—ঘোড়ার ডাক।

দারায়ুসের য়ুরোপ আক্রমণ। পশ্চিমএশিয়া মাইনরের গ্রীক প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহভাব—পারস্ত শাহান-শাহর স্বৈরশাসন বনাম আথেনীয়দের স্বরাজশাসন বা ডিমক্রেসিক দ্বন্দ্ব—সার্দিসে অগ্নি কবি। জারক্সেস কর্তৃক গ্রীক আক্রমণ জলে-স্থলে—আথেন্স পারসিকদের দ্বারা ভস্মীভূত—সালামিসের জলযুদ্ধে পারসিকদের পরাজয়—জারক্সেসের প্রত্যাবর্তন—দক্ষিণ-পূর্ব য়ুরোপে ক্ষত্রপ মোতয়েন। সার্দিস-ক্ষত্রপের শক্তি—দুইশত বৎসর পারসিক সাম্রাজ্য প্রতিদ্বন্দ্বীহীন।

পারসিক স্থাপত্য, ভাস্কর্যের ভগ্নাবশেষ। পারসিক ধর্ম—অহুরমজ্‌দা—মগ পুরোহিতদের প্রভাবে ধর্ম বিকৃত—'দেব' শব্দ পারসিধর্মে নিন্দাসূচক—অসুর শব্দ দেববাচক! জরদাষ্ট্র—অবেস্তা—প্রাচীন পারসিক ভাষা ও বৈদিক ভাষার জ্ঞাতিত্ব।—পহ্লবী ভাষা।

ভারতে আর্য পৃ ১১৩—১২২

আর্যদের আদি বাসভূমি—বহু উপজাতিতে বিভক্ত আর্যভাষীরা—ভারতে উপনিবেশ—আদিবাসীদের সহিত সংঘর্ষ আর্যদের বাহন অশ্ব, অস্ত্র লৌহনির্মিত। মুষ্টিমেয় আর্যদের বর্ণকৌলীন্য বা বর্ণভেদ। বাকপটু জাতি—'বেদ' সংহিতা—ব্রাহ্মণ সাহিত্য। ব্রাহ্মণ বর্ণ শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় ক্ষত্রপ—দেশরক্ষক—বিশ্‌ বৈশ্য—স্থত্র—ছুড্ড—ছোট।

চতুবর্ণের বাইরে 'পঞ্চম'—অচ্ছুত অসংখ্য উপজাতি। উত্তরভারতে আর্য উপনিবেশ—বিহারের উত্তরে মিথিলায় 'জনক' বংশ কৃষিকর্মে লিপ্ত—অনার্য-বেষ্টিত দেশ—তাড়কা নিধন—শ্রীরামচন্দ্রের দক্ষিণাপথ বিজয়।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধ—উভয়ের বিচিত্র যজ্ঞানুষ্ঠানে জনতার ক্লেশ—শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যাগযজ্ঞ বাহুল্যের নিন্দা। ধর্মগ্রন্থ—বেদান্ত—গীতা। পরিব্রাজকদের নানা মত প্রচার—গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর জিন।

পূর্বভারতে নিষ্ঠাহীন আর্যদের উপনিবেশ—জরাসন্ধ—শ্রীকৃষ্ণের ভারতে ধর্মরাজ্য (New Order) স্থাপনের স্বপ্ন—মহাভারতের যুদ্ধে ক্ষত্রিয়কুল বিনাশ। পূর্বভারতে বুদ্ধ ও মহাবীরের আবির্ভাব—বৈদিক মত—বিরোধী ধর্ম প্রচার।

হেলেনী বা গ্রীক সভ্যতা পৃ ১২৩—১৪৮

বলকান উপদ্বীপে বহু উপজাতিতে বিভক্ত। হেলেনী বা গ্রীকদের

আবির্ভাব এশিয়ামাইনরের উপকূলে হেলেনীদের উপনিবেশ। ইলিয়াম রাজ্য ট্রয় রাজধানী; ট্রয়ের অবস্থানিক বৈশিষ্ট্য। হেলেন অপহরণ—গ্রীক ও ট্রোজানদের যুদ্ধ—ইলিয়াড ও ওডেসি মহাকাব্য।

গ্রীক লিখনপদ্ধতি ফিনিকদের নিকট হইতে শিক্ষা—Alphabet।

গ্রীকদের বহু রাষ্ট্র নগরী—নাগরিক অধিকার অত্যন্ত সীমিত। রাজতন্ত্রের অবসান—গ্রীসের কুলীন রাষ্ট্র, স্পার্টার সামরিক শিক্ষা। আথেন্সের বৈশিষ্ট্য। আথেনীয় বাণিজ্য প্রসার—উপনিবেশ স্থাপন। আথেন্সে ধনীদের উপদ্রব—আর্কন সেলিনের সমাজতান্ত্রিক সংস্কার। টাইরেন্টদের আবির্ভাব ও পতন।

পারসিক আক্রমণ—আথেন্স ভস্মীভূত—সালামিকের যুদ্ধে পারসিকদের পরাজয়। মধ্যধরনী সাগরের পূর্বদিকে পারসিকদের অক্ষুন্ন প্রতাপ—সার্দিস পারসিক ক্ষত্রপদের রাজধানী—তৎকালীন আন্তর্জাতিক কৌটিল্যবাদ বা ডিপ্লোমেসির কেন্দ্র; সিসিলি দ্বীপে কার্থেজীয় ফিনিক বণিক ও গ্রীক ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে যুদ্ধ—পারসিকদের মিত্র ফিনিকদের নৌবল ধ্বংস। গ্রীক রাষ্ট্রনগরী আথেন্স, কোরিন্দ প্রভৃতির ফিনিকদের বাণিজ্য দখল।

আথেন্সের নেতা থেমিষ্টক্লিস—আথেন্সের চারিপাশে কাঠের খোটার বেড়ার বদলে পাথরের প্রাচীর নির্মাণ—স্পার্টার আপত্তি সত্ত্বেও প্রাচীর নির্মিত হইল। পেরেক্লিস—ডেমসস রাষ্ট্রসংঘ (কন্‌ফেডারেসি)—আথেন্সের ডিমোক্রেসি শাসন পদ্ধতি সকল গ্রীক রাষ্ট্রে প্রবর্তন প্রচেষ্টা—প্রতিরোধকারীদের শাস্তিদান। পেরিক্লিস কর্তৃক আথেন্সের শোভা বর্ধণ। স্পার্টার ঈর্ষা ও দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ পেলোয়নেশীয় সমর—আথেন্সের পতন—স্পার্টা ও থীবসের উত্থান-পতন।

মকিদানের আবির্ভাব। সমগ্র গ্রীসের একছত্র অধিকার লাভ।—গ্রীসের অর্থনৈতিক পরিবর্তন। সোফিষ্টদের জ্ঞানচর্চা—প্রাচীন দেব দেবী ও সংস্কারে জনতার অনাস্থা। গ্রীক সাহিত্য—নাটক ও অভিনয়—মকিদান-রাজা ফিলিপের গ্রীস্ জয়—আথেন্সে ফিলিপের বিরুদ্ধে ডিমোস্থেনীসের বক্তৃতা। ফিলিপের অপমৃত্যু—আলেকজেন্দার রাজা—দিগ্বিজয়ে যাত্রা—পারসিক সাম্রাজ্য আক্রমণ—ফিনিকদের দেশ আক্রমণ ও ধ্বংস—মিশর জয়—আলেকজেন্দ্রিয়া বন্দর পত্তন। আটেলার যুদ্ধে পারসিক সম্রাটের পরাভব। বাবিলন দখল। পার্সিপুবা অধিকার ও অগ্নিসংযোগে ধ্বংস।

আলেকজেন্দার উত্তরপশ্চিম ভারতে—ভারত জয়ে অসমর্থ—প্রত্যাবর্তন—

জলপথে সেনাপতি নিয়ার্কস—স্থলপথে আলেকজেন্দারের সুমায় আগমন—গ্রীক পারসিক মিলাইবার প্রচেষ্টা—গ্রীকভাষা ও সংস্কৃতি প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা। বাবিলনে গ্রীক সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপনার ইচ্ছা—মৃত্যু ৩২৩ খৃষ্ট পূর্ব।

গ্রীক সেনাপতিদের মধ্যে সাম্রাজ্য লইয়া বিবাদ—গ্রীক সেনাপতি কর্তৃক পটলেমি রাজবংশ মিশরে—অধিষ্ঠিত (৩০৫-৩০ খৃষ্ট পূর্ব)। আলেকজেন্দ্রিয়ার কলামন্দির—বিবিধ বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। ইউক্লিড। গ্রীক বিজ্ঞানচর্চা—দর্শন—সোক্রতিস—প্লাতোন—আরিস্তোতল—সিনিক, স্টোইক, এপিক্যুরি প্রভৃতি বিভিন্ন দর্শন পন্থী। পর্যাপ্ত ধনাগমের ফলে গ্রীক নৈতিকজীবনের অধোগতি দাস ব্যবসায়। গ্রীক সভ্যতার বিস্তার—ইতালি হইতে সিন্ধু পঞ্চনদ পর্যন্ত গ্রীক—শিল্পী সর্বত্র গ্রীক ভাষা—মিশর, পশ্চিম এশিয়ার ভদ্রদের ভাষা। কালান্তরে গ্রীস ও দ্বীপালির বাহিরে গ্রীক ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত—পশ্চিমে লাতিন ও আফ্রোশিয়ায় আরবী গ্রীকের স্থান অধিকার।

পূর্বভারত পৃ ১৪৯—১৫৫

গঙ্গারাঢ়ের কথা। মগধে নন্দবংশ। চন্দ্রগুপ্ত—চাণক্য—কৌটিল্য। সেল্যুকাসের ভারত আক্রমণ—চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত—ভারত হইতে গ্রীকদের বিতাড়ন—সন্ধি—মেগাস্থেনীস গ্রীক দূত—বৃত্তিচ্যুত পারসিক শিল্পীদের মগধে আগমণ—ভারতীয় স্থাপত্য ভাস্কর্যে পারসিক তথা অসুরী শিল্পের প্রভাব।

অশোক সম্রাট্—বুদ্ধের সদ্ ধর্ম প্রচার—পর্বত গাত্রে ও স্তম্ভে নীতিকথা উৎকীর্ণ—পারসিক সম্রাটদের শিলালেখের অনুকৃতি—সারনাথের 'ধর্মচক্র'—দক্ষিণ ভারত ও বহির্ভারতে সদ্ধর্ম প্রচার—পশ্চিম এশিয়ায় এসেনি ও মনি ধর্মের উপর বৌদ্ধদের প্রভাব। শিলালেখের লিপি—খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী। 'ব্রাহ্মী' ভারতীয় সকল ভাষার ও তিব্বতী লিপির আদিরূপ।

পারস্যদেশ পৃ ১৫৬—১৬০

গ্রীক সাম্রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ—পার্থিয় বা পারদ—সেল্যুকাসী বংশের পারস্য ত্যাগ—সিরীয়ায় নূতন রাজধানী পত্তন, আন্তিয়োক—পারদ রাজাদের নাম আরসিকি বংশ—মিত্র দেবতাপূজক (মিত্র ধর্ম)—অবেস্তা গ্রন্থ সংকলন—রোমানদের সহিত সংঘর্ষ—সেনাপতি ক্রেসাস নিহত—পারদদের গ্রীক সাংস্কৃতি প্রীতি। ভারতে পারদ রাজা গণ্ডোফোরো—সাধু টমাসের ভারত আগমন—কিম্বদন্তী।

গ্রীকদের ভারত আক্রমণের চেষ্টা। বক্ত্রিয়া বাহ্লিক—বহ্এ দেশ পারদ রাজ্যের অভ্যুত্থান—গ্রীক নৃপতি, ভাস্কর—গ্রীক ভাস্করদের দ্বারা বুদ্ধমূর্তি গঠন—বুদ্ধমূর্তির চাহিদা—গ্রীক রাজা মিনান্দর—'মিলিন্দ পঞ্‌হো' পালি গ্রন্থ চীনা রূপান্তর—বক্ত্রিয়ার বিলোপ মরুচরদের আক্রমণে।

শক—কুষাণ—কনিষ্ক পৃ ১৬১—১৬৫

মধ্যএশিয়ার বহু জাতি উপজাতির বাস হিউংনু বা হূন—ইউচি—শক বক্‌ত্রিয়ান গ্রীক, শকদের ভারত প্রবেশ ও বহু ক্ষুদ্র রাজ্যস্থাপন—'ক্ষত্রপ' উপাধি গ্রহণ—শকাব্দ কাল নির্ণয়—ইউচি উপজাতি—কনিষ্ক রাজধানী পুরুষ পুর, (পেশোয়ার)—বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি (কন্‌ফারেন্স)—হীনযান-মহাযানের সাম্প্রদায়িক বিবাদ—বৌদ্ধ বিহার ও মঠের উপর প্রভুত্ব পাইবার জন্য কলহ—উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দার্শনিক ও ধর্মীয় মতভেদ। বুদ্ধের ধর্মমতের বিকার—তিব্বতের লামাধর্ম।

রোম ও রোমান পৃ ১৬৬—১৯৮

রোম নগরের নাম হইতে রোমান সভ্যতার নাম করণ হয়—প্রাচীন ইতালির বাসিন্দা, গল্, যুট্রাসকান ও গ্রীক। রোমনগর পত্তন—রাজশক্তির অভ্যুদয়—জনতার বিপ্লব ও রাজশাসনের অবসান। রাজাহীন রাষ্ট্র—পাবলিকান বা জনতার শাসন বা রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা—পিতৃস্থান ও প্লিবিয়ান—সিনেট বা নবার বৃদ্ধদের সভা।

যুট্রাসকানদের পতন—রোম কর্তৃক তাহাদের নগর জয়—রোম নগরীর বাহিরে রোমান রিপাবলিকের রাজ্য বিস্তারের সূত্রপাত। প্লীবদের দুর্দশা—অসহযোগ নীতি প্রবর্তনের হুমকিতে প্লীবদের প্রতিনিধি 'ট্রিবিউন' পদ সৃষ্টি। লিখিত আইনের দাবী—গ্রীস্ হইতে আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়া আনয়ন—'দ্বাদশ-ফলকের' (Laws of Twelve Tables) আইন। রোমান লিপি—প্লীব প্রতিনিধি ট্রিবিউনদের ভিটো বা সরকারী সিদ্ধান্ত 'নাকোচ করবার অধিকার (ভিটো)। রোমান বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব। শ্রেণী সংঘাত বিপর্যস্ত করার জন্য, দেশ জয়ের জন্য জনতাকে উত্তেজিত করা উত্তেজিত করিয়া দক্ষিণ ইতালির গ্রীক্ কলোনীর সহিত যুদ্ধ ঘোষণা। ঔপনিবেশী গ্রীকদের অন্তদ্বন্দ্ব। গ্রীসের রাজা পিরাসের ইতালি আক্রমণ। কার্থেজীয়দের সহিত রোমানদের মিতালি। পিরাসের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন।

দক্ষিণ ইতালি রোমান রাজ্যভুক্ত। রোমান রাজপথ নির্মাণ—অধিকৃত দেশে খাস্ রোমানদের কৃষক উপনিবেশ গঠন—শাসনব্যবস্থায় প্রতিনিধি প্রথা অজ্ঞাত, রোমের অধিবাসীরাই ভোটাধিকারী—মফঃস্বল হইতে রোমে ভোটাধিকারের জন্য আগত রোমানদের মধ্যে শক্তির পরীক্ষা।

মধ্যধরনীসাগর তীরের শক্তি সমূহ—কার্থেজ রাজাহীন রাষ্ট্র, বনিক সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব। রোমের সঙ্গে প্রথম প্যুনিক যুদ্ধ। কার্থেজীয় উপনিবেশ সার্দিনিয়ার রৌপ্য খনির উপর রোমানদের লোভ—রোমের সহিত যুদ্ধ। হানিবলের অভ্যুদয় স্পেনে—কার্থেজীয়দের ইতালি আক্রমণ—হানিবল ১৬ বৎসর ইতালিতে। রোমানদের দ্বারা কার্থেজ আক্রমণ—জামার যুদ্ধে কার্থেজের পরাজয়—কার্থেজকে সর্বস্ব রোমানদের দিতে হইল—হানিবলের প্রতি কার্থেজীয়দের অনাস্থা—বীরের দেশত্যাগ।

দক্ষিণ ইতালির গ্রীক কলোনী নগর রোমানদের দ্বারা অধিকৃত—গ্রীক সাহিত্য, সংস্কৃতিতে রোমানরা মুগ্ধ। রোমে পিতৃস্থান—প্লিবিয়ান ভেদ নাই—ধনী ও নির্ধনের সংগ্রাম। কার্থেজ ধ্বংস।

রোমের 'সাম্রাজ্য' বিস্তার—হেলেনিক গ্রীকদের দেশ জয়। এশিয়াস্থ সিরীয়ার গ্রীক রাজা আন্তিয়োকসের রোমের সঙ্গে যুদ্ধে গ্রীকরাজের পরাজয়—এশিয়ার গ্রীকরাজ্য সিরীয়া রোমান রাজ্যভুক্ত। মধ্যধরনীসাগরে মিশর ব্যতীত সর্বত্র রোমানদের প্রভুত্ব কায়েম।

সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবনে বিপর্যয়—গ্রীস ও এশিয়া হইতে ধনদৌলত লুণ্ঠন—রোমে শ্রেণী-সংগ্রাম—গ্রাকিদের দুই ভাই দরিদ্রের বন্ধু—ভালো কাজের নামে আইন ভঙ্গ—গৃহবিবাদের সূচনা—সেনাপতি মারিয়াস ও জনতা—সম্ভ্রান্তদের পক্ষে সুল্লা—সুল্লাকে চিরস্থায়ী 'ডিকটেটর, পদ দান।

সৈন্যদের ক্ষমতায় নির্ভর নেতাদের আবির্ভাব—জুলিয়াস সীজার ও ত্রয়ম্বীরেট—সীজারের গালিয়া বা ফ্রান্স জয়—সিনেটের আদেশ অমান্য করিয়া সসৈন্যে রোমে প্রত্যাবর্তন—ত্রয়ম্বীরেটের অন্যতম সীজারের ধ্বংসকামী পম্পাই-এর পলায়ন—সীজার কর্তৃক পশ্চাৎধাবন—মিশরে পম্পাই-এর মৃত্যু—সীজার কর্তৃক মিশর বিজয়—পটলেমি বংশীয় শেষ রাণী ক্লিওপেট্রা—সীজারের রোমে প্রত্যাবর্তন ও শাসন ক্ষমতা গ্রহণ—রিপাবলিকান দলের দ্বারা নিহত। সীজারের দ্বারা নানাবিধ সংস্কার—পঞ্জিকা সংস্কার।

অক্টেভিয়ান—আণ্টনি ও ক্লিওপেট্রা—মিশরে তিনশত বৎসরের গ্রীক—পটলেমি শাসন অবসান—মিশরে রোমান প্রদেশ হইল।

অক্টেভিয়ান অগষ্টাস প্রথম সম্রাট্। রোমান সাম্রাজ্য দুই শত বৎসর অটুট ছিল—রোমানদের দান, রোমান আইন। রোমানদের পতনের কারণ।

খৃষ্ট ধর্ম পৃ ১৯৯—২১০

য়ুরোপে জারমেনিক জাতিসমূহের আক্রমণ; খৃষ্টানদের দ্বারা শান্তিবার্তা আনয়ন—বহুদেব পূজক রোমান—মিশরে রাজা পূজা—সেরাপিস দেবতা—মিথ্র ধর্ম।

রোমান সাম্রজ্যের ঐক্য প্রতীক সম্রাট ও তাঁহার পূজা। পটলেমিদের ভাগে পড়ে ইহুদীদের দেশ—আলেকজেন্দ্রিয়াতে গ্রীক ও ইহুদীদের ভিড়—ইহুদীরা গ্রীকভাষী হয়। সেপ্তুয়াজেই—হীব্রু বাইবেলের গ্রীক অনুবাদ। হেলেনিক জগতে ধর্মের অবস্থান।

যীশুখৃষ্টের আবির্ভাব—ইহুদী পুরোহিতদের বিরোধিতা—যীশুকে হত্যা। বাইবেল নূতন অংশ—খৃষ্টের কথা—গ্রীক ভাষায় লিখিত।

ইসরেইলে গ্রীকরাজাদের অত্যাচার—রোমানদের দ্বারা অধিকৃত হইলেও লাতিনভাষা পশ্চিমএশিয়ায় বা মিশরে চালু হয় না। ইহুদীদের স্বাধীনতা পাইবার জন্য বিদ্রোহ—রোমানদের দ্বারা জেরুশালেম লুণ্ঠিত (৭০ খৃ অ) ও ইহুদীর দেশ হইতে বিতাড়িত। উনিশ শত বৎশর পরে ইসরেইলে ইহুদীরা নূতন রাজ্য গড়ে।

ইহুদীরা রাজপূজা করিতে অনিচ্ছুক—রোমান সম্রাটদের অত্যাচার খ্রীষ্টানদের উপর। সম্রাট কনষ্টাইনের খৃষ্টধর্ম গ্রহণ (৩১৩ খৃ)—রবিবার ছুটির দিন কেন হইল? রোমে সাধু পল ও সাধু পিটার। পোপের শক্তি ও সম্মান। —রোম হইতে কনষ্টান্টিনোপলে রোমান রাজধানী স্থানান্তর (৩৩০ খৃ)। রোমের পতন (৪১০ খৃ)।

সমকালীন এশিয়া পৃ ২১১—২১৪

পারস্যে (ইরান) পহ্লব বা পারদদের আধিপত্য। চীনের হান—রোমান সম্রাটদের সমসাময়িক (খৃষ্ট পৃ ৪র্থ—খৃ অ ৩য়)—রোম-চীন-ভারতের মধ্যে আন্তর্জাতিক বানিজ্য—বকৃত্রিয়া আন্তর্জাতিক বিনিময় কেন্দ্র। সমুদ্রপথে রোমানদের ভারত ও প্রাচ্যে আগমন—অগষ্টাসের নিকট ভারত হইতে উপঢৌকন প্রেরণ। রোমানদের সহিত বাণিজ্যে ভারতের ধনাগম—মৌসুমী বায়ুর তত্ত্বজ্ঞান ও সমুদ্র বাণিজ্য প্রসার। পেরিপ্লাস গ্রন্থের কথা।

চীনের কথা পৃ ২১৫—২১৯

শি হুয়াংতি ও কুংফুৎসীয়-মতবাদ ধ্বংশের ব্যর্থ চেষ্টা—হুনদের উত্তরচীনে প্রবেশ প্রচেষ্টা—চীনের প্রাচীর নির্মাণ—চীনা দূত মধ্য এশিয়ায়—চীনের রেশম য়ুরোপে রপ্তানী—রোমানদের চেষ্টা চীনে পৌছিবার—সমুদ্রপথে রোমানদের দক্ষিণচীনে আগমন—ভারতে রোমান বাণিজ্য সুপ্রতিষ্ঠ। হান বংশের বৃত্তি (১৪০—১৮৬)—চীনের পুঁথি ছাপিবার আদিম প্রচেষ্টা—কাগজ চীনাদের আবিষ্কার।

হান বংশের অবসান—তাতার উপজাতিদের উত্তর চীন দখল—দক্ষিণ চীনে চীনা রাজবংশের আশ্রয়—ভারত, সিংহল হইতে বৌদ্ধধারা আসে।

মধ্যএশিয়া হইতে বৌদ্ধভিক্ষুদের আগমন—শ্বেত অশ্ববিহার—রাজধানী লোয়াঙে স্থাপন। ফাহিয়েন, হুয়েনসাঙ, ইৎসিঙ।

মধ্যএশিয়ার কথা পৃ ২২০—২২৯

মধ্যএশিয়ার অনির্দিষ্ট ভূভাগ—সোভিয়েত অন্তর্গত অঙ্গরাজ্য ও চীন রাজ্য অন্তর্গত সিংকিয়াং। মধ্যএশিয়ার পশ্চিমভাগে গ্রীক, পারদ, শক জাতির বাস—চীন রাজ্যাংশে তাকলামাকান মরুভূমির দক্ষিণে খোটান ও উত্তরে কুচা প্রভৃতি বিখ্যাত রাষ্ট্রনগরী। বর্তমান আফগানিস্তানে প্রাচীন গান্ধার উগ্যান প্রভৃতি দেশ—বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি—বকত্রা, ব্যাকট্রিয়া (বাহ্লিক) রাজধানী রাজগৃহপুর। সুগ্দ, সগ্দিয়ানা, শাকদ্বীপ—তুর্কী উইগুরদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম—নালন্দার প্রভাকর মিত্রের তুর্কীদেশে অবস্থান।

খসগড়, খসজাতি, খসমীর, খসপিয়ান হ্রদ তুলনীয়....ইয়ারকন্দে মহাযান বৌদ্ধমত প্রতিষ্ঠিত—খোটানে প্রাকৃত ভাষায় খরোষ্ঠী লিপিতে (উদানকা) ধম্মপদ আবিষ্কৃত। বিপ্লবান্তে বিজয় বংশীয় রাজারা অধিষ্ঠিত—জনতার ভাষা শক—লিপি ব্রাহ্মী। খোটানের বিহারে মহাযান বৌদ্ধধর্ম। কুচা বা কুশদ্বীপের রাজাদের নাম সংস্কৃত উদ্ভব—ভাষা ইতালীয় কেলটিক বর্গের। কুমারজীবের জীবনী। তুনহুয়াং—গুহার—৫০০ গুহার মধ্যে ছবি ও বুদ্ধমূর্তি। একটি গুহামধ্যে নানা-ভাষা ও লিপি—প্রধানত চীনা পুঁথি হাজার বিশ আবিষ্কৃত।....মরুভূমির উড়ন্ত বালুর দ্বারা প্রাচীন নগরগুলির ধ্বংস সাধন। —খননাদি করিয়া উদ্ধার—পুঁথির পাঠ উদ্ধার মুদ্রনাদি কার্য্যে পাশ্চাত্য দান।

ভারত কথা পৃ ২৩০—২৩২

বৌদ্ধযুগ শব্দপ্রয়োগ ভুল—অশোক কর্তৃক বুদ্ধের ধর্ম প্রচার—সুন্দরের

ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠা—গুপ্তবংশীয় রাজাদের সময়ে সংস্কৃত ভাষার স্বর্ণযুগ। ফা-হিয়েনের ভারত ভ্রমণ—বিজ্ঞান চর্চায় হিন্দুরা।

নানাজাতির চলাফেরা পৃ ২৩৩—২৪১

হূনদের ভারত প্রবেশ—তোরমন মিহিরকুল—যশোধর্মন কর্তৃক হূনদের বিতাড়ন। চীনের প্রাচীর হূনদের সে দেশে প্রবেশ ব্যর্থ করিয়াছিল। য়ুরোপ অভিমুখে হূনদের যাত্রা। গথ্দের উপর হূনদের হামলা—গথ্দের খৃষ্টানী,—সাধু উলফিল কর্তৃক গথিক ভাষায় বাইবেল অনুবাদ—হূনদের দ্বারা আক্রান্ত—গথ্দের রোমান সাম্রাজ্য মধ্যে প্রবেশ—থিওডোসিয়াস (৩৭৯) রোমান সম্রাট। গথ্ সর্দার আলারিথের ইতালি আক্রমণ—ভানডাল জাতীয় স্টিলিকো রোমান সৈন্যাধ্যক্ষ। রোম আক্রান্ত হইলে ব্রিটেন হইতে রোমান সৈন্যদের প্রত্যাবর্তন—আলারিথ কর্তৃক রোম লুঠতরাজ (৪১০)। —হূনরা পূর্বদিক হইতে মধ্যয়ুরোপের সকল জাতিকে ঠেলিতেছে—টিউটন বা জারমেনিক উপজাতি অ্যাংগেল্স স্যাক্সন প্রভৃতির ব্রিটেন দখল—ইংলণ্ড নামের উৎপত্তি।

রোমান প্রদেশ গালিয়ায় ফ্রাংকদের উপনিবেশ—ফ্রেনচ জাতি ও ফরাসী ভাষা।—আলেমান ও বার্গেনডিয়ানদের দক্ষিণ ফ্রান্সে বসবাস—প্রভেন্সাল ভাষার কবি মিস্ট্রাল নোবেল পুরস্কার প্রাপক।

আটিলা হূন সর্দারের আক্রমণ। রোম, পোপের হুমকিতে রক্ষা পায়। ভানডালদের আবির্ভাব—আফ্রিকার মারাত্মক কার্থেজ ঘাঁটি—রোম আক্রমণ ও ধ্বংস। স্লাভদের য়ুরোপের ইতিহাসে আবির্ভাব—মংগোল উপজাতীয় বুলগার—লম্বার্ড বা উত্তর ইতালিতে। পলাতক লোকেদের দ্বারা ভেনিস স্থাপন।—নর্স-ডেনদের ব্রিটেনে উপনিবেশ—আইসল্যাণ্ড, আমেরিকায় —রুশ নামে সুইডিস উপজাতির রুশিয়ায় বাস—। ম্যাজিয়ার, খাজার প্রভৃতি উপজাতির য়ুরোপে উপনিবেশ।

পারস্যের কথা পৃ ২৪২—২৪৫

পারস্যে পারদদের পর সাসনীয় বংশ—আর্দশির—জরদর্থস্ত্রের ধর্ম ও মগপুরোহিতদের ধর্মের মিশ্রণ—সাধক মণির নবধর্ম—মজ্দক প্রথম সমাজতন্ত্রবাদী। প্রাচীন রাজা পূজার স্থলে খৃষ্টানীর মধ্যে পোপকে ধর্মের গুরু বলিয়া মানার প্রথা—সাসনীয় সম্রাটদের জরথ্স্ট্রীয় ধর্ম চালু করিয়া সাম্রাজ্য

মিলন প্রচেষ্টা। রোমান সম্রাট হেরাক্লিস ও পারস্য সম্রাট খসরুর মধ্যে মেসোপটেমিয়ার দখল লইয়া সমর।

আরবে ইসলামের আবির্ভাব—৬৪১ অব্দে খলিফের নিকট শেষ সাসনীয় সম্রাটের পরাজয়।

পূর্বএশিয়া ও চীন পৃ ২৪৬-২৫৩

হজরত মহম্মদ, হেরাক্লিস, খসরু, তাইৎসুং, হর্ষবর্ধন, পুলকেশীন, বংসামগাম্‌পো—সমসাময়িক (৭ম শতকের প্রথমার্ধ)

চীনে তাংবংশীয় তাইৎসুং (৬২৭-৪৯) রাজত্বকালে নেসতোরীয়ান খ্রীষ্টানদের আবির্ভাব—ইসলামের প্রবেশ—চীনাদের বিদ্যা আরবদের দ্বারা আয়ত্তকরণ—কাগজ, বারুদ প্রভৃতি তৈরী। মধ্য এশিয়ায় ইসলামকে স্বীকৃতি দানের কারণ—বৌদ্ধ ধর্মের বিকৃতি।

তাং বংশীয়দের রাজত্বকালে (৬১৮-৯০৫) হুয়েনসাংএর ভারত ভ্রমণ—নালন্দায় বৌদ্ধ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন—শীলভদ্রের কথা—বৌদ্ধ সংস্কৃত পুঁথির চীনা অনুবাদ ব্যবস্থা অনুবাদ পদ্ধতি।—ইৎসিং-এর ভ্রমণ—সমুদ্রপথে যাওয়া আসা—সামাজিক কর্তব্য পালনে চীনাদের অবহেলা ও বৌদ্ধমঠে আশ্রয় গ্রহণ—বৌদ্ধমঠ বন্ধের আদেশ—বুৎসুঙ (৮০৫)—ধর্ম সম্বন্ধে চীনাদের ঔদাসীন্য—তাংবংশীয় শাসন পর্বের স্বর্ণযুগ—লিপো, তুফু প্রভৃতি ২৩০০ কবি—৩২০ জন চিত্রশিল্পী।

কোরিয়ায় ও জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার।—কিন্ তাতারদের উত্তর হইতে আক্রমণ—সুঙ রাজবংশের দক্ষিণ চীনে আশ্রয় গ্রহণ।

তিব্বত পৃ ২৫৪—২৫৬

তিব্বত দুর্গম দেশ—'আদিমধর্ম বোঙ'—'তিব্বত' শব্দের উৎপত্তি। বংসানগাম্‌পো প্রথম রাজা—রাজধানী লাসা (দেবভূমি)—থোনমি-র তিব্বতী ভাষার জন্য ব্রাহ্মীলিপি প্রবর্তন, ভোট ব্যাকরণ রচনা—বৌদ্ধ পুঁথি অনুবাদ—প্রতিক্রিয়াশীল বোঙধর্মী লং-দরমার বৌদ্ধপীড়ন। রলপাথেন কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা—চারিশত বৎসর বৌদ্ধ সংস্কৃতাদি গ্রন্থ তিব্বতীতে অনুদিত হয়—তেংগুর, কেংগুর। তিব্বতী হইতে মংগোলীয় ভাষায় বৌদ্ধ শাস্ত্রের অনুবাদ—বিখ্যাত বৌদ্ধবিহারে জারমান পণ্ডিত ও বন্দিলারের অধ্যয়ন।

কোরিয়া ও জাপানের কথা পৃ ২৫৭—২৬১

কোরিয়ার বর্তমান সমস্যা। কোরিয়ার প্রবাদগত ইতিহাস—চীনাদের উপনিবেশ স্থাপন—কোরিয়ান লিপিমালার উদ্ভব—ভারতীয় বলিয়া অনুমান—কুবলাই খানের কোরিয়া অধিকার—কোরিয়ানদের সাহায্যে কুবলাই দুই দফায় জাপান আক্রমণ করেন—১৩৮২ অব্দে কোরিয়া স্বাধীন হয়। ১৯১০ সালে জাপান দ্বারা অধিকৃত—১৯৪৫ সালে জাপানীরা বিতাড়িত হয়।

জাপান—কোরিয়া হইতে বৌদ্ধধর্মের বাণী প্রচারক। আদিম বাসিন্দা আইনু শিনতো ধর্ম। শোতোকু তাই শির (৫৯৩—৬২১) বৌদ্ধধর্ম প্রচার—রাজা বা মিকাদো—শোগানরা সর্বেসর্বা। কামাকুরার দাইবুদসু। চীনা ত্রিপিটক—জাপানী অনুবাদ।

জাপানী ভাষা ও লিপির বৈশিষ্ট্য—লিপি দক্ষিণ ভারতীয়। জাপান বাহির হইতে বিচ্ছিন্ন—কুবলাই খান দুইবার জাপান আক্রমণে ব্যর্থ হন।

বৃহত্তর ভারত ও পূর্ব দ্বীপালি পৃ ২৬২—২৭৭

সমুদ্রের আহ্বানে জোয়ানদের সাড়া—ভারতীয়রা যায় বর্মা, আরাকান, মালয়—বৃহত্তর ভারতের অর্থ—আদিমবাসিন্দা—মন্‌খেমর, অস্ট্রিক বা দক্ষিনী মানুষ এবং চীন-তিব্বতী পার্বতিয়া—ভারত হইতে পল্লবরা প্রথম উপনিবেশী—ব্যবসায়ী শ্রেষ্ঠী (চেট্টিয়ার); ভারতীয় লিপি, বৌদ্ধ, হিন্দুধর্ম প্রসার—গ্রীক পেরিপ্লাস, প্‌টলেমিক গ্রন্থে তৎকালীন ভৌগোলিক অবস্থা—। সুবর্ণভূমি, সোনার দেশ, সোনার বাংলা, সোনার লোম, এলডোরাডো তুলনীয়—বাংলা মঙ্গলকাব্যে সমুদ্রপাড়ির কথা। মালয়, সিয়াম, কম্বোজে উপনিবেশ। বোর্ণিও দ্বীপে মূলবর্মনরাজা 'বহুসুবর্ণ' যজ্ঞ—বক্রকেশ্বর তীর্থ—সংস্কৃত শিলালেখ।

মালয় উপদ্বীপে কেদার হিন্দুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। সুমাত্রা যবদ্বীপে শৈলেন্দ্র রাজবংশ—রাজধানী শ্রীবিজয় (পালেমবঙ)—যবদ্বীপে শৈলেন্দ্র রাজশাসন—দক্ষিণ ভারতের রাজেন্দ্রচোলের শৈলেন্দ্র রাজ্য আক্রমণ—সিংহল অধিকারের জন্য প্রেরিত নৌবাহিনী ধ্বংস—শৈলেন্দ্র রাজাদের পতনের সূত্রপাত।

শৈলেন্দ্ররাজারা মহাযান বৌদ্ধ—যবদ্বীপ—ফা-হিয়েনের কথা—শৈলেন্দ্র রাজাদের কর্তৃত্ব দ্বীপের উপর—বরবুদুর মন্দির সেই রাজাদের শাসনকালে নির্মিত—কালে যবদ্বীপ শৈলেন্দ্ররাজাদের (সুমাত্রা) প্রতিদ্বন্দ্বী হয়—।

পূর্বযবদ্বীপে সিংগোসিরি কৃত নাগর রাজা—মধ্যপহিত রাজ্যস্থাপন রাজনরাজা—কুবলাই খান কর্তৃক যবদ্বীপ আক্রমণ—। চীনাদের নিকট হইতে কামান ও বারুদ শিক্ষালাভ—মধ্যপহিতের একক কর্তৃত্ব—শ্রীবিজয় ধ্বংস। ইসলামের অভ্যুদয়।

বরবুদুরে ললিতাবস্তুর দিব্যাবদানের বুদ্ধকাহিনী খোদিত—বঙ্গদেশের পাহাড়পুরের স্থাপত্য তুলনীয়—যবদ্বীপের ভাষা কবি—প্রাচীন সাহিত্য—'তন্ত্র পংগেলয়ং', 'অর্জুন বিবাহ', 'ভারতযুদ্ধ' 'বৃত্তসঞ্চয়'।

বালিদ্বীপের হিন্দুরা। দ্বীপময় ভারতে বৌদ্ধধর্ম—বৃহত্তর ভারতে হিন্দুবৌদ্ধ সংস্কৃতি। কাম্বোডিয়ায় হিন্দুরা—মেকং নদীমুখে উপনিবেশ—মহেন্দ্রবর্মন—৭—১৩ শতকে কম্বোজে হিন্দুরাজত্ব—অংকোর নগরী নির্মান। —বন্যার উৎপাতে রাজধানী পরিত্যাগ—পনমপেন-এ নূতন রাজধানী পত্তন।

আনাম (ভিয়েৎনাম)—চম্পা রাজ্য—রাজধানী অমরাবতী পাণ্ডুরঙ্গ। চাম বা অধিকাংশ বর্তমানে মুসলমান—দ্বীপময় ভারতে ইসলামের আবির্ভাব।

ইসলাম কাহিনী

মধ্যযুগ পৃ ২৭৮—২৮৭

পশ্চিমএশিয়ায় ইহুদী ধর্ম, খ্রীষ্টানী, ইসলাম। হজরত মহম্মদের আবির্ভাব। আরাবিয়ার অধিবাসীদের কথা—একেশ্বরবাদ ধর্ম—কোরানশরীফ—কাবা—রমজান—ইসলামের মূলতত্ত্ব—। হজরতের বিরুদ্ধে শত্রুতা—মদিনায় হিজরা—মুসলমানী অব্দ। খলিফাদের আসন—সিরীয়া দখল—জেরুসালেম অধিকার—মিশর জয় হওয়ায় নৌবাহিনীর মালিকানাপ্রাপ্তি।

মেসোপটেমিয়ায় ওঠবান সামনীয়রা অধিকার চ্যুত—ইসলামের জয়যাত্রা—প্রাচীন জরথুষ্ট্রীয় পন্থীদের ভারতে আশ্রয় গ্রহণ—বোম্বাইএ 'পার্সি'।

ইসলামের জয়যাত্রা পৃ ২৮৮—৩০৬

সেকালে পশ্চিমা গথদের রাজ্যে গৃহবিচ্ছেদ—মুক্তদাস তারিক-এর-

আফ্রিকা হইতে স্পেনে গমন—জিবারউলতারিক (জিবরলটার)—স্পেন হইতে আরবদের ফ্রান্সে প্রবেশ—চার্লস মার্ত্তেলের দ্বারা তুর-এর যুদ্ধে আরবদের পরাভব। সিন্ধু জয়—দাহীর ব্রাহ্মণ রাজা নিহত—পরাভবের কারণ—আরব ধর্মরাজ্যের বিস্তৃতি।

খলিফাদের পদ লইয়া বিবাদ—খলিফা ওমর, ওসমান, আলী নিহত—হাসানকে বিষপ্রয়োগ—মোয়াবিয়ার একচ্ছত্র আধিপত্য—মদিনা হইতে দামাস্কাসে রাজধানী স্থানান্তরণ—কারবালার যুদ্ধে হোসেন নিহত। —য়েজিদ-এর মক্কা আক্রমণ—খলিফা বংশপরম্পরায় প্রতিষ্ঠিত। দামাস্কাসের উম্মীয় বংশের বিরোধী শিয়া সম্প্রদায়—খারিজা।

আব্বাসী খলিফাদের উদ্ভব—স্পেনে উম্মীয় বংশের আব্দুর রহমান—আব্বাসী খলিফা অল মনসুর—বোগদাদে রাজধানী স্থাপন—ইরাক অঞ্চল প্রগতিশীল—খলিফাদের সময়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা।

স্পেনে স্বাধীন খিলাফত—খোরাসান, বোখারা প্রভৃতির স্বাধীনতা।

শিয়া ইমামদের মধ্যেও গৃহবিচ্ছেদ। ইসমাইলি সম্প্রদায়—কার্মেথীয়দের বিদ্রোহ, মক্কা ধ্বংস। সুফীদের প্রেমধর্ম।

স্পেনের ইসলামিক রাজ্য—কর্দোভায় গ্রানাডার ঐশ্বর্য—আলহামব্রা—স্পেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র।

তুর্কদের আবির্ভাব—মধ্যএশিয়ায় পারসিক সামানিদ রাজাদের সাহিত্য, বিজ্ঞানে চর্চার উৎসাহ—ইবন্ সিনা।

সামানিদদের তুর্কদাস আলপতগীন কর্তৃক গজনীতে রাজ্য পত্তন—সবুক্তগীন কর্তৃক কাবুলের হিন্দু সাহীরাজাদের ধ্বংস—সুলতান মামুদ——ভারত আক্রমণ সতেরো বার—সোমনাথ মন্দির ধ্বংস। অলবিরুণী—ফিরদৌসী। সেলজুক তুর্কদের আরব সাম্রাজ্য মধ্যে বিস্তার—তুগরলবেগ—আলপ আরসলন—গ্রীক সম্রাট যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী—বহু অর্থ দিয়া মুক্তিলাভ (১২১৩)—মালিক শাহ—নিজাম-উল-মুলক—সিয়াসত নামা বা শাসনপ্রকরণ ও গ্রন্থরচনা—ইসমাইলি সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়—গুরু হাসান সব্বাহ্ কর্তৃক নিজাম-উল-মুলকের গুপ্তঘাতন।

গজনীর পতন—ঘোরীদের অভ্যুদয়—গিয়াসউদ্দীন। মহম্মদ ঘোরী ভারতে—পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও নিহত—জয়চন্দ্র—উত্তর ভারত তুর্কীদের দ্বারা অধিকৃত।

ইসলামিক সংস্কৃতি পৃ ৩০৭—৩১৬

আরবী ভাষা ও লিপির প্রসার—নেসত্তোরীয় খ্রীষ্টানদের সহায়তায় জ্ঞান চর্চা—জুনদেশাহপুরের বিদ্যায়তন—আব্বাসী খলিফাদের জ্ঞান উৎসাহ—গ্রীক গ্রন্থের সন্ধান আরবী ভাষায় তর্জমার জন্য—হিন্দু গণিত, জ্যোতিষ, বীজগণিত চর্চা। কর্দোভার বিদ্যায়তনে বহুদেশের ছাত্রের আগমন।

জ্ঞানচর্চার সহিত বিচিত্র শিল্পের জন্ম—লেখনকলা—কাগজ—পুস্তক, পুস্ত —দিকনির্ণয় যন্ত্র—মৈসুমী বায়ুতত্ত্ব—সমুদ্র বাণিজ্যের প্রসার।

ইসলামিক সংস্কৃতি (২) পৃ ৩১৭

আরবদের বিজ্ঞানচর্চা—হুনায়েন ইবন ইশাক—অল মামুনের 'দারঅল হিকমা' বা ভারতীভবন—থাবিত ইবন করা অনুবাদক। কর্দোভার 'কিতাব মহল' বা লাইব্রেরী। যশস্বী লেখকদের নাম—অলবিরুণী, ওমরখায়েম। কর্দোভা, মারাঘার—সমরকন্দের মানমন্দির।

কিমিয়া বা রসায়ন বিদ্যার চর্চা—পারদ হইতে ঔষধ—আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থের ভাষান্তরণ। ইবন্‌সিনা—ইবনরসীদ—ইসলামে প্রতিক্রিয়াপন্থীদের প্রভাব—বিজ্ঞানচর্চা বাধাগ্রস্ত—অল গজ্জালের মতের প্রাধান্য—মুক্তমনে জ্ঞান চর্চার অবসান—মধ্যযুগে ইসলামের অধোগতির সূত্রপাত।

আরবদের মাধ্যমে য়ুরোপে পবনচক্র প্রবর্তন—তুলা (আরবী কতুর্ন, ইংরেজি কটন), শর্করা, কাগজ, বারুদ।

স্থাপত্য শিল্পে ইসলামের দানের বৈশিষ্ট্য। বিজ্ঞানের অবহেলা—প্রাচীন জগতের সভ্যতা ধ্বংসিত হয়—মধ্য যুগে ইসলামিক রাষ্ট্রসমূহের পতনের কারণ বিজ্ঞান অবহেলা।

পৃথিবীর ইতিহাস

সূচনা

আমরা যে পৃথিবীর ইতিহাস বলতে যাচ্ছি তা হ'ল পৃথিবীতে মানুষের ইতিহাস। আসলে পৃথিবীর ইতিহাস হচ্ছে ভূতত্ত্ব ও জ্যোতির্বিদ্যা নামে বিজ্ঞানের বিষয়; অর্থাৎ পৃথিবীর জন্ম হলো কেমন করে এবং কিভাবে সেটা জীবের বা মানুষের বাসের যোগ্য হলো ধীরে ধীরে—তার ইতিহাস। কিন্তু সেটা হচ্ছে বিজ্ঞানীদের আলোচনার বিষয়।

রাতের বেলায় আকাশে অগণিত নক্ষত্র দেখা যায়, তার অনেকগুলি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে। এইসব জ্যোতিকণার একটা হচ্ছে আমাদের সূর্য। পণ্ডিতেরা বলেন একসময়ে এই সূর্য ছিল সৌর-জগতের সীমান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে। তারপর কিভাবে গ্রহ উপগ্রহগুলির সৃষ্টি হলো তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। সে সবের আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নেই। মোটকথা আমাদের এই পৃথিবী সূর্যের দেহবস্তু দিয়ে গড়া, আর তার তেজ থেকে সৃষ্টি হয়েছে জীবের প্রাণশক্তি। আসলে জড় ও জীব এক ধাতুতে গড়া। আমাদের এই পৃথিবী এককালে অতি গরম বায়বীয় তরল অবস্থায় ছিল,—ধোঁয়াটে গরম গাঢ় বাষ্প ও জলকণা মিলে একটা পদার্থ। কোটি কোটি বৎসর তাপ ছাড়তে ছাড়তে পৃথিবী শীতল ও কঠিন হয়ে আজকের রূপ পেয়েছে। পণ্ডিতেরা বলেন যে পৃথিবী এইভাবে ঠাণ্ডা হতে থাকলে তার বাইরের দিকটা কুচ্‌কোতে সুরু করে; তারই ফলে পৃথিবীর গায়ের উপরটা এমন উঁচু-নিচু, এবড়ো-খেবড়ো। নানা রকম গ্যাস ছিল পৃথিবীর দেহবস্তুতে তার খানিকটা এখনো চাপা আছে মাটির ভিতর। বাইরের আকাশও ছিল লবণাদি ও ভারী নানা উপাদানে গড়া, নানা গ্যাসে ভরা। কালে সেই গ্যাস থেকে অনেকাংশ 'জল' হয়ে পড়লো পৃথিবীর উপর—জমলো গিয়ে, নিচু জমিতে—সৃষ্টি হলো সমুদ্র; তাই সে-জল লবণ-ক্ষারে ভরা। আকাশের ময়লা ঘোলাটে রং কেটে আকাশ হলো নির্মল, স্বচ্ছ—সেখানে থাকলো কেবল বায়ু—তার সব দেহবস্তুটা জল হল না। পৃথিবীর উপরিভাগে ঢাকোনের মত ঘিরে থাকলো স্বচ্ছ বায়ু। এই বায়ু জীবের প্রাণধারণের সব থেকে বড় উপাদান—

এক মুহূর্ত তাকে ছাড়া জীবের চলে না। এই বায়ুস্তর ভেদ করে আসে সূর্যের আলো ও তাপ।

জল, বায়ু ও তাপ (গরম ও ঠাণ্ডা) এই কয়টিতে মিলে যুগযুগান্তর হতে পৃথিবীর উপরকার যতকিছু ভাঙ্গাগড়ার খেলা খেলে আসছে। পৃথিবীর উপর কঠিন স্তরটি পঞ্চাশ মাইলের বেশি গভীর নয়—আর পৃথিবীর ব্যাস হচ্ছে আট হাজার মাইলের কিছু উপর। এই স্তরের কয়েক হাজার ফুট মাত্র মানুষ নামতে পেরেছে, কারণ ভিতরে ভিতরে যে প্রচণ্ড তাপ ও বায়ুর চাপ সেখানে মানুষের কঠিনতম হাতিয়ার পাঠালেও গলে যায়। পৃথিবীর উপরে আঁচড় কেটে খুব অল্প গভীর স্থানের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটেছে।

পৃথিবীর উপর যে স্বচ্ছ বায়ুমণ্ডলের মধ্যে মানুষ ঘুরে বেড়ায়; সেটা প্রায় শ' দুই মাইল হতে পারে বলে পণ্ডিতদের অনুমান; কারণ আট দশ মাইলের উপরে সে এরোপ্লেনে ক'রে এখনো উঠতে পারেনি। তাই উঠতেই তার দম বন্ধ হয়ে আসে, রক্ত হিম হয়ে যায়। অনেক কল-কব্জা যন্ত্রপাতি সঙ্গে করে তবে এইটুকু উঁচুতে উঠতে পারে। এই তো হোলো আমাদের পৃথিবী—যার ওপর মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সেও তো খুব বেশি বছর নয়। কারণ অতি-তপ্ত পৃথিবী মানুষের বাসের উপযোগী হতেও সময় লেগেছিল। অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবার পর মানুষ এলো ধরার বুকে।

পণ্ডিতদের মতে পৃথিবীতে প্রধানতঃ তিনটি যুগ চলে গেছে; সবথেকে পুরোণো যুগে প্রাণের কোন চিহ্ন ছিল না। সে-যুগকে তাঁরা আদিযুগ বা প্রাইমারি পর্ব বলেন। তারপর প্রাণ দেখা দিল শেওলা বা সমুদ্রপানার মধ্যে, কোথা থেকে কিভাবে—সে-সমস্যার উত্তর দেবেনা ইতিহাস। এই কালের পরে এলো অতিকায় গাছ—ছেয়ে দিল পৃথিবীর বুক। যুগযুগান্ত কেটে গেল কিন্তু টেঁকলো না তারা। পৃথিবীর ভিতর বাইরে প্রলয় এলো। মাটির তলায় তলিয়ে গেল সে-অতিকায় গাছের জঙ্গল, চাপা পড়ল মাটি-পাথরের তলায়। কালে তারাই হয়েছে পাথুরে কয়লা—যা মানুষের নিত্য লাগছে নানা কাজে।

এই যুগে ক্ষুদে ক্ষুদে জলজ প্রাণী, শামুক, মাছকে দেখা গেল। কেমন করে তারা জন্মেছিল তার রহস্য এখনো মানুষ ভেদ করতে পারেনি। তারাও ভূগর্ভে চলে যায়—তাদের চাপা পচা দেহ থেকে হয়তো হয়েছে পেট্রোলিয়ম, খোলা থেকে হলো চুনা পাথর।

জীব আবির্ভাবের দ্বিতীয় যুগে পৃথিবীতে এলো অতিকায় প্রাণীর দল—সরীসৃপ ও পাখী। প্রকৃতি তাদের অদ্ভুত ও কিম্ভুতাকারে গড়েছিলেন—লম্বা গলা, মোটা দেহ, মাথা ছোট। ঠিকভাবে তৈরী হয়নি বলে পৃথিবী থেকে তাদের সরে যেতে হলো। তাদের বিরাট দেহের কঙ্কাল এখানে-সেখানে পাওয়া গেছে। অতিকায় পাখীরা ধীরে ধীরে কেজো ধরণের পাখা ডানা পেয়ে আজকালকার পাখী হলো—অসংখ্য রকমের তারা।

এবার এলো স্তন্যপায়ী প্রাণী। এদের আবির্ভাব পৃথিবীর ইতিহাসে একটা বড় ঘটনা। পৃথিবীর জলবায়ু অর্থাৎ শীতগ্রীষ্মের আসা-যাওয়ার অনেক অদলবদল হওয়াতে এ শ্রেণীর জীবের আবির্ভাব সম্ভব হলো। জীব আবির্ভাবের সেই আদি যুগে পৃথিবীর আবহাওয়া ছিল অন্য রূপ, উত্তর মেরু ছিল আধা-গরম। লাট্টুর মত ঘুরতে ঘুরতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করবার সময় কখন কি কারণে পৃথিবী একটু টাল খেলো—মেরুকেন্দ্র গেল সরে; সঙ্গে সঙ্গে উত্তর গোলার্ধেরো ভূপ্রকৃতির মধ্যে ভাঙ্গ-চুর সুরু হলো,—যার ফলে আধা-গরম মেরুমণ্ডল চাপা পড়লো তুষার তলে। সমস্ত উত্তর মেরু গভীর তুষারে শুধু ঢাকা পড়লো তা নয়, চলন্ত তুষার স্রোত গোলার্ধের অনেকটা ঢেকে দিল। য়ুরেশিয়া ও উত্তর-আমেরিকার উত্তরাংশের মেরুমণ্ডলের চেহারা গেল পাল্‌টে; গ্রীনলাণ্ড্ দ্বীপের তুষার পাহাড় সেই প্রাচীন যুগের চিহ্ন।

কিন্তু পৃথিবীতে এই হিমের কাঁপন চিরকালের মত কায়েম হলো না। পণ্ডিতেরা বলেন বার চারেক এই তুষার বন্যা পৃথিবীর উপর দিয়ে যাওয়া-আসা করেছে—দাগ রেখে গেছে অনেক জায়গায়—কোথায় হ্রদে আটক পড়েছে তুষার-গলা জল। তুষার যুগে পৃথিবীর মহাদেশ, মহাসাগর, দ্বীপ, উপ-দ্বীপ এমনকি পর্বতমালা আজকের মতো ছিল না। গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লণ্ড ছিল য়ুরোপ মহাদেশের সঙ্গে জোড়া—তখন তাদের দ্বীপত্ব ছিল না—মধ্য য়ুরোপের ভাণ্ডার-চরা জন্তুর দল ইংলিশ চ্যানেলের বিরাট নিরেট জমির উপর দিয়ে চলে যেতো ব্রিটেনে। সমুদ্র বসে গেলে ফিরতে আর পারেনি—

তাদের হাড়গোড় মাটির নিচে পাওয়া গেছে। উত্তরসাগর বা নর্থ সী-র অস্তিত্ব ছিলনা। ভূমধ্যসাগর ছিল দুটো হ্রদ—জিব্রাল্টার সিসিলি ও দার্দিনালিস্ দিয়ে য়ুরোপ আফ্রিকা ও এশিয়ার সঙ্গে ছিল যুক্ত। লোহিত সাগরও ছিল কয়েকটা হ্রদ,—আদেন ও আফ্রিকা ছিল স্থল দিয়ে আঁটা। কৃষ্ণসাগর থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত ভূভাগ ছিল সমুদ্রের তলায়, দক্ষিণভারত হয়তো আরব সাগরের উপর দিয়ে আফ্রিকার সঙ্গে লাগা ছিল। ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলির খানিকটা জোড়া ছিল অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। বেরিং প্রণালী না-থাকায় এশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে যাওয়া আসার বাধা হয়তো তখন ছিল না। এই তুষার যুগে লোমশ ম্যামথ বা ঐরাবত হাতী, লোমশ গণ্ডার, অতিকায় বৃষ, বল্গা হরিণ য়ুরেশিয়ায় বিচরণ করতো নির্বিবাদে, ছোরা-দেঁতো বাঘ ছিল ভীষণ হিংস্র প্রাণী—হাতী গণ্ডার কেউ রক্ষা পেতোনা তাদের কাছ থেকে। তুষার গলে গেলে বসন্তকালে এসব জন্তুরা যেতো উত্তরে খাবার সন্ধানে। তারপর আবার যেমন তুষার পড়তে সুরু করতো, তারাও সরে আসতো দক্ষিণ দিকে। কিন্তু হঠাৎ তুষার এসে পড়ায় চাপাও পড়তো বরফের তলায়। এইভাবে কত কাল যে কেটে গেল তা কেউ বলতে পারে না।

মানুষ এলো সব শেষে। কোথা থেকে সে আবির্ভূত হলো, কেমন ভাবে জন্মালো সে-সব প্রশ্নের জবাব এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে পণ্ডিতদের অনুমান পঞ্চাশ ষাট হাজার এমন কি লক্ষাধিক বছর আগে মানুষের মতো দ্বিপদ জন্তু পৃথিবীর নানাস্থানে গুহা-গহ্বরে পাথরের আড়ালে আবডালে বাস করতো। তাদের মাথার খুলি ও দেহের হাড়গোড় এখানে-সেখানে পাওয়া গিয়েছে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে। বেঁটে খাটো জীব, শক্ত চোয়াল, ছোট কপাল—হয়তো গায়ে খানিকটা লোমও থাকতো তাদের। মানুষের মতো ঠিক খাড়া হয়ে চলতে পারতো কিনা সন্দেহ। মুখের গড়ন-অনুমানে মনে হয় যে তারা বাকপটু ছিল না—বানর বনমানুষের মতো শব্দ করে, ইঙ্গিত করে হয়তো ভাব প্রকাশ করতো। হাজার হাজার বছর এরাই ছিল জীবজগতের সেরা সৃষ্টি! প্রকৃতি কত যুগ ধরে এই জীবটিকে নিয়ে পরীক্ষার পর পরীক্ষা করে আসলেন মানুষের মতো আকৃতি দিতে।

পৃথিবীর গঠন ও আবহাওয়ার বদলের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দেহের আকৃতি, তার মনের প্রকৃতি গেল বদলে। এখন যারা এলো তারা হাত পা সহজভাবে চালাতে পারে, পাঁচটা আঙুল তাদের বশে এসেছে—এখন আঙুলকে কাজে লাগাতে পারছে। এই নয়া মানুষ ঘাড়ে-গর্দানে সমান নয়—ঘাড় বাঁকাতে পারে, উপরে নিচে আশে-পাশে ফেরাতে পারে। এই ঘাড় নাড়ানাড়ি ও কণ্ঠের মাংসপেশীর মধ্যে টানাটানি হতে-হতে তার গলায় এলো শব্দ, সুর,—কথা ফুটলো মুখে—এতদিন যা ছিল অস্ফুট অস্পষ্ট স্বর মাত্র এখন তা হলো ভাষা। এই ঘটনা যুগান্তর আনলো এই জীবের মধ্যে। শব্দ করে কথা বলে ভাব প্রকাশ করে দল বাঁধতে লাগলো। পূর্বকালের অর্ধনরদের এরা তাড়ালো গুহা থেকে, দখল করলো তাদের বাস্তগুলো। এই আদি-মানবের অনেক চিহ্ন পাওয়া গেছে পৃথিবীর নানা স্থানে।

আদিকালের মানুষের অবস্থা কি রকম ছিল, তা এ-যুগের লোকের কল্পনায় আনাও কঠিন। ঘর নেই, বস্ত্র নেই, অস্ত্র নেই—ভবঘুরে জীবন তার, খাবার শোবার আশ্রয়ের সন্ধানেই তার দিন যায়। বন্য জন্তুর ভয়ে গুহায় থাকে, সকলে মিলে পাথর চাপিয়ে দেয় দোরের মুখে, অথবা গাছে উঠে বাসা বেঁধে রাত কাটায়। বন্য জন্তুর সঙ্গে লড়াই করবার হাতিয়ার সে পায়নি। হাতিয়ার ছাড়া মানুষ জীবজগতে যেমন অসহায় এমন বোধহয় পথের ধারের পিঁপড়েটিও নয়; তারও বিষদাঁড়া আছে। তবে প্রকৃতির পরীক্ষাশালা থেকে মানুষ এমন-একটা জিনিস বেশি পেয়েছিল যার বলে সে কালে সকল জীবজন্তুকে বশে আনলো; সেটা হচ্ছে মানুষের মাথার মধ্যে মগজ, ঘিলু বা মস্তিষ্ক—সব জন্তুর থেকে এরই মগজের ওজনও বেশি, খাঁজ-খোঁজও বেশি। সেই বাড়্তি পদার্থের গুণে তার বুদ্ধি, তার দেখবার শোনবার ক্ষমতা, তার মনে রাখবার শক্তি সকলের থেকেই বেশি। হাতের দশ আঙুল তার বশে, যা আর কোনো প্রাণীর নেই। সেই আঙুলের সহায়তায় সে গাছে চড়ে, ডাল ভাঙে, লাঠি বানায়, মুগুর গদা তৈরী করে। আঙুল দিয়ে পাথর চেপে ধরে ঠুকে ঠুকে বাদাম ভাঙে, বন্য জন্তুর হাড় ভেঙে খায়। খাবারের খোঁজে চলে বন্য জন্তুর পিছু-পিছু; কখনো মরা জন্তু খায়, কখনো মেরে ফেলে খায়—কাঁচা মাংস সঞ্চয় করে রাখে; সেই মাংস পচলেও খায়,—সে-গন্ধটা খারাপ লাগে না ক্ষিদের তাড়ায়। এখনো মানুষ

হরিণের মাংস বাসি না-হলে খায় না, শুয়োরের মাংস ধোঁয়াটে করে রেখে দেয়—জন্ম জন্মান্তরের স্বাদ রয়ে গেছে তার জিবে। ক্ষিদের তাড়ায় মানুষ মানুষও খেতো, বুড়ো বাপ-মা মরলেও তার সদগতি করতো তাদের খেয়ে ফেলে। কিন্তু মগজ ছাড়া আরেকটা জিনিস পেয়েছিল মানুষ, তাকে বলি আমরা মন। সেই মন তাকে সুস্থির হয়ে থাকতে দেয় না—কেবলি সে তাগিদ করে সামনে চলবার জন্য, যা পেয়েছে তার থেকে আরো বেশি পাবার জন্য, যা হয়ে আছে তার থেকে আরও বড়ো হবার জন্য মন দিনরাত মানুষকে ঠেলতে থাকে। মানুষ তার চোখ, কান, জিভ, নাক ও আঙুল দিয়ে দুনিয়ার টুক্‌রো টুক্‌রো অসংখ্য জিনিস থেকে বিস্তর তথ্য বা খবর সংগ্রহ করে দেখে-শুনে, চেকে-শুঁকে, ছুঁয়ে-ধরে, ভেঙে-চুরে। মন সেগুলোকে নিয়ে তালগোল পাকিয়ে মানুষটাকে খেপিয়ে তোলে, কেবলই তাগিদ করে। আত্মরক্ষার জন্য সে কত কি ভাবছে কত কি করছে। অস্ত্র বানাবার বুদ্ধি পেয়ে শক্ত চকমকি পাথর জোগাড় করে, দিনের পর দিন ঘসে ঘসে বানায় দা, ছুরি, বর্শার ফলা। নয়া হাতিয়ার নিয়ে দল বেঁধে চলে বন্য জন্তুর পিছু-পিছু—দলের দুপাঁচটা লোক মরে বা জখম হয়। শেষ পর্যন্ত জন্তুটাকে মেরে পাথরের নতুন অস্ত্র দিয়ে কেটেকুটে খায়। এইভাবে চোখ-কান খুলে চলতে চলতে মন দিয়ে সব দেখতে দেখতে একদিন আগুনের সন্ধান পেলো। চকমকি ঠুকতে ঠুকতে হোক অথবা জঙ্গলে গাছে-গাছে ঘসা-ঘসিতে আগুণ জ্বলতে দেখেই হোক—সে ঐ ভীষণ পদার্থটার অস্তিত্ব জানতে পারলো। ভাবলো আগুন দেবতা। কাজে লাগালো তাকে। আগুন মানুষের জীবনে যুগান্তর এনে দিলো।

মাটির মধ্যে মিশিয়ে আছে নানা ধাতুর চুর। হয়তো মাংস ঝলসানোর পরে দেখে থাকবে মাটিটা পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে! সে ভাবে কেন এটা হলো। একদিন আবিষ্কার করলো পোড়া মাটি থেকে তামার চুর; আর একবার পেলো রাঙ। অস্ত্র বানালো পৃথক পৃথক ধাতু নিয়ে! দুটোতে মিশিয়েও দেখলো; বেশ শক্ত ব্রোন্‌জ মজবুত ধাতু হয়েছে। বাস্‌, আর তাকে পায় কে! সেই থেকে শুরু হো'লা অস্ত্র বানানোর কাজ—আজ পর্যন্ত সেই অস্ত্র নির্মাণ কাজ শেষ হয়নি।

মানুষ দেখে আগুন জ্বালাতে তার ভারি কষ্ট,—নিবে গেলেই মুস্কিল। তাই আগুন রাখার ব্যবস্থা হলো স্থায়ী ভাবে। ভারতে বৈদিক যুগে অগ্নিচয়ন ছিল মস্ত একটা কাজ। রোমেও এক মন্দিরে একদল কুমারীর কাজ ছিল আগুন জিইয়ে রাখা। আজকাল আমরা চাপা আগুন সঙ্গে নিয়ে ফিরি দেশলাইএর মধ্যে, চাপা তাপহীন আলো থাকে টর্চের ব্যাটারীতে। য়ুরোপের একজায়গার একটা গুহার কাছে অনেকগুলি বুনো ঘোড়ার হাড় পাওয়া গেছে; পণ্ডিতেরা বলেন লোকে ঘোড়াগুলো মেরে পুড়িয়ে পুড়িয়ে খেয়েছিলো বহুকাল ধরে। ভারতে বৈদিক যুগে যে অশ্বমেধ যজ্ঞ হোতো—তা হয়তো ঐ প্রথাটারই ধর্মীয় রূপ। আসলে ক্ষুধার তাড়ায় মানুষ সব খায়—এমন কোনো জীবজন্তু গাছপালা নেই যা মানুষ না খেয়েছে। পাতা, ফুল ফল, কন্দ, মূল, আঁটি, শাঁস, খোসা, শামুক, গুগ্‌লি, ডিম, পাখী, পাখীর বাসা, পোকা মাকড়, ফড়িং, সাপ, ব্যাং—মানুষ কি না খেয়েছে। বুদ্ধিবলে জল থেকে মাছ ধরেছে—গর্তের মধ্যে ফাঁদ পেতে ম্যামথ হাতী ফেলে দিয়ে তাকে মেরেছে। মানুষ খায়নি কী তাই বলা শক্ত। এইসব শাক ও আমিষ খাদ্য ও অখাদ্য খেতে খেতে কোনটার কি গুণ, কোনটা বিষ, কোনটা ওষুধ তা জানা গেল। বুদ্ধিমান লোকে সেইসব ওষুধ সংগ্রহ করে রাখে—লোকের ব্যামো হলে টোটকা ওষুধ দেয়, তার নাম ডাক হয় বৈদ্য বলে। লোকে ভাবে এদের বুঝি দেবতাদের সঙ্গে জানাশুনা আছে, কারণ ওষুধ দেবার আগে অনেক সব মন্ত্র বিড় বিড় করে বলতো এরা; তাতেই লোকের বিশ্বাস হতো ওদের বুঝি দৈবশক্তি আছে।

পশু মারবার জন্য লোকেদের ঘুরতে হয় দল বেঁধে; কিন্তু ঘুরলেই তো আর পশুর সন্ধান মেলেনা। পশুরা যত বেগে ছুটে পালাতে পারে—মানুষের দুটো পা তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারে না। তবু ছুটতে হয়। মানুষ দেখে সঙ্গে তাদের জুটেছে বুনো কুকুর; এঁটো হাড় মাংস খেয়ে কখন তারা মানুষের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেছে; সঙ্গে সঙ্গে চলেছে সুখে দুঃখে, আর তার সঙ্গ ছাড়ে না। কুকুরই মানুষের সবপ্রথম ঘরপোষা প্রাণী। আজও মানুষের দরজায় পড়ে থাকে—মারধোর খেয়েও নড়ে না। মানুষ ভাবে কুকুর যদি পোষ মেনে গুহার দোরে, গাছের তলায় পড়ে থাকে তবে অন্য প্রাণীই বা বশ মানবে না কেন? লতা তন্তু দিয়ে দড়ি বানিয়ে দল বেঁধে ফাঁস দিয়ে ধরে বুনো গরু, ছাগল, ভেড়া। সংস্কৃতে পশ্‌ মানে বাঁধা, পশু

শব্দটা পশ্‌ বা ফাঁস থেকে এসেছে। যাই হোক্‌, বুনো পশু বশ মানলো অনেক ঠেঙ্গা খেয়ে। পাহারায় থাকে তাদের ভক্ত কুকুর—বাঘ হেঁড়েল তাড়ায়। এইসব পশুর মাংস তারা খায়। পশুর চামড়া দিয়ে শীতবস্ত্র বানায়, বৃষ্টি পড়লে কাঠ, বাঁশ পুঁতে ঠোঙ্গার মত তাঁবু বানিয়ে তার মধ্যে গিয়ে বসে, ঘর বানানোর সব প্রথম প্রয়াস এই ঠোঙ্গা ছাঁদের তাঁবু। তাঁবুর মানুষরা পশুর হাড়, দাঁত, মাংস, শিরা, নাড়ি-ভুঁড়ি, চর্বি সমস্তই কাজে লাগায়। চর্বি দিয়ে প্রথম বাতি হয়তো জ্বেলে থাকবে তারা।

কিন্তু পশুকে পোষ মানালেই তো হলো না, তার খাদ্য চাই; ঘাস, জল নিয়ম মতো পেলে তবেই তো পশুর গায়ে মাংস চর্বি জমবে! অল্প জায়গায় পশুপাল রাখা যায় না। এই পশুপাল নিয়ে তারা ঘুরে বেড়ায় ঘাসের জমির সন্ধানে—জলের ধার থেকেও খুব বেশি দূর যেতে পারে না। স্ত্রী-পুত্র পরিবার সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। খুবই হাঙ্গামার ব্যাপার। খাদ্যের কথা ভাবতে হয়! কত রকম বুনো ঘাসের বীজ যে খেয়ে আসছে। একবার কোনো এক মহাপুরুষের মনে হলো এই সব ঘাসের বীজ পুঁতে কি ফল পাওয়া যায় দেখা যাক্‌ না। খোন্‌তা দিয়ে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে বীজ পুঁতলো। যথা সময়ে ফসলও পেলো। আশা বেড়ে গেলো। সাহসও বড়লো—চললো তাদের পরীক্ষা পুরুষানুক্রমে। 'জুম্‌' চাষ শুরু হলো জঙ্গলের ধারে ধারে। গুহার মুখে দেখে যেখানে পশু মারার রক্ত জমেছিল, সেখানে বীজ পড়ে গাছের কী ঝাড় জমেছে—শস্যের ফলনও হয়েছে তেমনি! তবে কি মাটির দেবতা রক্ত পেয়ে খুসী হয়েছেন? বলি দেওয়ার প্রথা হয়তো এর থেকেই সুরু হোলো! তারপর যখনই-কিছু দেবতার কাছ থেকে চাইবার দরকার হয়—তখন একটা নিরীহ পশু এনে বলি দেয়। পশু বলতে বুঝায় যা বেঁধে রাখা হয়েছে—এমনকি বেঁধে-রাখা মানুষ-পশুকেও বলি দেওয়া হতো,—সবই দেবতাকে তুষ্ট করবার জন্য!

এর মধ্যে মানুষের হাতিয়ার হয়েছে ব্রোন্‌জের—পাথুরে-কুড়ুল থেকে এই কুড়ুলের ধার বেশি। মানুষ কুড়ুল বা পরশু নিয়ে গাছ কাটে, বাঁশ কাটে, একা-একা। আগে যে গাছ ভাঙ্গতে অনেক লোকের অনেক সময় লাগতো, এখন তা একজনই কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে নামাতে পারে। গাছ, বাঁশ, বেত, শর কেটে সে ঘর বানায়—এই হোলো গ্রাম পত্তনের প্রথম ধাপ। মানুষ মাটি চষে পায় খাদ্য, আর বন থেকে গাছ কেটে সংগ্রহ করছে কুঁড়ে

তৈয়ারীর কাঠ খড়; আর পায় গাছের ছাল পরবার প্রথম কাপড়—যাকে বলা হয় বল্কল। মানুষের মনের বদলের সঙ্গে সঙ্গে তার মনে এসেছে লজ্জা সরমের বোধ। মেয়েরা পরতো পাতা—এখন পাচ্ছে বল্কল। প্রাচীন ভারতের আশ্রমে শকুন্তলা এই ঠোঁটি বল্কল পরতেন—বোধ হয় তা হাঁটুর নিচে নামত না, আর গাও সাপটে ঢাকা পড়তো না।

দুনিয়ার সব জাতির সব মানুষেরই যে একই রকমের সমস্যা তা তো হতে পারে না। নানা জায়গায় নানা রকমের সমস্যা হওয়াই সম্ভব ও স্বাভাবিক। মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে উঠ্ছে তাদের বংশবৃদ্ধি নিয়ে,—অর্থাৎ লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সমস্যা। শিশু-মৃত্যুর অনুপাত অত্যন্ত বেশি হওয়া সত্ত্বেও জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির অর্থই হচ্ছে খাদ্য সমস্যা। একদল ভাবে পুরোণো জায়গায় বসে বসে জায়গা নিয়ে কেবলই ঝগড়া বিবাদ না করে বেরিয়ে পড়া যাক্। একদল যায়, তারপর আর এক দল। এমনি করে নানা দিকে ভেঙে পড়ে মূল দল। চলতে চলতে একদল পৌঁছালো নদী-তীরে। বাঁশ কাঠ দিয়ে বানায় ভেলা—ভেসে চলে দূর দেশের সন্ধানে। কোথাও বা গাছের গুঁড়ি কেটে, মাঝখানটা চেঁচে পুড়িয়ে বানায় ডোঙা (Canoe)—এই হলো মানুষের প্রথম নৌকা, বা জলযান। মিশরের নীল নদ, পশ্চিম এশিয়ার য়ুফ্রাতিস-তাইগ্রিস, ভারতের সিন্ধু গঙ্গা যমুনা চীনের হো হাং-হো, ইয়াংৎসে প্রভৃতি নদীর তীরে তীরে গ্রামের পত্তন ও চাষ-বাসের সূত্রপাত হলো। এখন থেকে শুরু হচ্ছে মানুষের মাটির প্রতি টান—যা কালের ইতিহাসে পরিচিত হলো মাতৃভূমির প্রতি ভক্তি নামে। যেটা ছিল বস্তুর প্রতি টান, সেটা থেকে হলো ভাবের উদয়। ন্যাশনালিজম শব্দের সংজ্ঞা নির্ণয় করা কঠিন।

মানুষ চলাফেরা করে পায়ে হাঁটে, সামান্য সম্পত্তি মাথায় নিয়ে বা ভার-সাম্য রাখবার প্রথম কল 'বাঁকে' ঝুলিয়ে। বাঁকের একদিকে থাকে শিশু, অন্যদিকে হাঁড়ি-কুঁড়ি। কালে পশু বশ মেনেছে—ঠ্যাঙায় চোটে ঠাণ্ডা হয়ে

মানুষের মাথার বোঝা পিঠের ওপর তুলে নিয়ে চলে সঙ্গে সঙ্গে। গরু, গাধা, উট—যে আবহাওয়ার যে জন্তুটা পাওয়া গেছে—তারা হয়েছে মানুষের বোঝা বইবার বাহন—আজকালকার মোটর ট্রাক। পরযুগে মানুষ বশ মানালো দুর্দান্ত ঘোড়াকে! সে কি সহজ কাজ! কিন্তু ঘোড়ার পিঠে যেদিন সে উঠে চলতে শুরু করলো সে কী অনুভূতি। এত বেগে যে চলা যায় মানুষ তা ভাবতে পারেনি। কত দূরের জায়গা কি অল্প সময়ে পৌঁছানো যাচ্ছে!

ইতিমধ্যে কোনো এক মহাবিজ্ঞানী বুদ্ধিমান গাছের গুঁড়ি চাকা চাকা করে কেটে 'চাকা' বানালো—গাড়ি তৈরী করলো। সে সব চাকার অর, পুঁটে থাকতো না—নিরেট কাঠ দিয়ে তৈরী হতো। এরকম চাকা এখনো বিহার রাজ্যের দেহাদে-পাড়াগাঁয়ের পথে দেখা যায়। চাকার উপর মাচা বানিয়ে গাড়ি হলো। তারপর পশুদের জোতার পালা। যে দেশে যে জন্তু বশ মেনেছে তাদের জুতলো; অনেক দেশে গাধায় গাড়ি টানতো। উটের গাড়ি ভারতের কোনো কোনো জায়গায় কয়েক বছর আগে পর্যন্ত ছিল। তবে ভারতে মোষ ও গরুর গাড়ির চল্‌টাই বেশি। কিন্তু এ জন্তুরাও কি আর সহজে বশ মেনেছিল! মাঠের মধ্যে এখনো দেখা যায় আবোড় দামড়া গরুকে বশ মানাবার জন্য কি মেহন্নতটাই করতে হচ্ছে। আবোড় গরু জোয়ালে কাঁধ দেবে না কিছুতেই। পাঁচনের বাড়ি খেতে খেতে সিধে হলো; একদিন গাড়ি নিয়ে চললো পথে পথে। তখন পায়ে হাঁটা 'পথ'ই ছিল।

গাধায় গরুতে টানা গাড়ি চালু হওয়ার পর দেশান্তরে যাবার সময় স্ত্রীলোকদের পিছনে ফেলে রেখে আসার প্রয়োজন হলো না। এর ফলে সামাজিক জীবনে নতুনত্ব এলো—পুরুষের দায় দায়িত্ব দুই-ই বাড়লো। এছাড়া বাড়তি শস্য এখন গাড়িতে করে অন্য জায়গায় নেওয়া সহজ হয়েছে। আগে একটা লোক মাথায় করে বা বাঁকে ঝুলিয়ে যা পারতো—এখন তার দশ-বারোগুণ বেশি মাল এক খেপেই একটা লোক দুটো বলদে-টানা গাড়িতে নিয়ে চলছে। যাদের হাল-বলদ ছিল না, সেই ভূমিহীনের দল সেদিন হয়তো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল ভিন্ গাঁয়ে যখন চলে গেল বাড়্‌তি শস্যের বোঝা। আজও ভালো সড়ক দিয়ে মোটর ট্রাক শহর থেকে এসে জোতদারদের ফালতু শস্য নিয়ে যায় কলে—আজও ভূমিহীন লোক চেয়ে থাকে তেমনি করেই শস্য বোঝাই মোটর ট্রাককে শহরের দিকে চলতে দেখে। কালে গাঁয়ে গাঁয়ে চলাচলের পথ হলো রথ্যা অর্থাৎ রথ

চলবার মতো চওড়া ; শকট চলতো সড়াকের উপর ; এই পথের নাম রোড, রাস্তা—চাকার দাগকে বলে rut।

আগুন যেমন যুগান্তর এনেছিলো আদি মানবের জীবনে, চাকাও কিছু কম করলো না। ভারি জিনিস তোলবার জন্য আবিষ্কার করলে কোপিকল, দশজনের হিম্‌সিম্‌-খাওয়া কাজ একজন করে অনায়াসে।

এরপর কে একজন ঐ চাকা দেখে বানালো কুমোরের চাক। এতকাল ঘট, কলসী, জালা, দোনা, নাদা হাতে-পিটিয়ে লোকে বানিয়ে এসেছে ; সে সব কাজও কী চিত্র-বিচিত্র করা। মানুষের মনের মধ্যে সুন্দরের প্রতি একটা স্বাভাবিক টান আছে ; তাই সে এসব জিনিসকে সযত্নে মনোহর করতো। আজ চাকের কলে হু হু করে হাঁড়ি-পাতিল কলসী ঘট তৈরী হয়ে চলেছে। সকলেই চায় এসব পাত্র—সকলেই তো আর বানাতে পারে না। নৌকায় করে দূর দূর দেশে চালান হয়।

কোপিকল ও কুমোরের চাক্‌-এর চল হলে সেদিন কি অনেক লোকের জীবিকায় টান পড়ে নি ? কেজানে ! তবে গৃহস্থের খুব সুবিধা হলো : বৃষ্টির জল ধরে রাখে, বনের থেকে ভেঙ্গে-আনা চাকের মধু সঞ্চয় করে, নানা রকমের বাড়তি শস্য জমিয়ে রাখে এই সব ভাণ্ডে। ভাণ্ডে বা ভাঁড়ে জিনিস রাখা হোতো বলে 'ভাণ্ডার'-ভাঁড়ারঘর শব্দ এলো। এইসব ভাণ্ডের গায়ে কারু চিত্র থেকে শোভন শিল্প (decoration) কলার জন্ম। রঙীন পাথর ও মাটি থেকে লাল নীল রং সংগ্রহ করে, কাঠকয়লা থেকে গাঢ় কালো মসী বানায়—সে-সব রং দেয় ভাণ্ডের গায়ে। কত ছবিই আঁকে অনিপুণ হাতে। আর্টের জন্ম হয় এই ভাবে।

এখন মানুষ আর ঋতু বদলের সঙ্গে সঙ্গে ডেরা-ডাণ্ডা ভেঙ্গে চলাফেরা করে না—এখন সে চাষ করছে, ঘর বানিয়ে গ্রাম পত্তন করেছে দশজনে মিলে। যাযাবর জীবনে শীত বর্ষা এড়িয়ে তারা ঘুরতো বলে বেশি কাপড়-চোপড়ের দরকার ছিল কম,—পশুর চামড়ায় কাজ চলে যেতো। এখন সে ছয় ঋতুতেই এক জায়গায় থাকে সুতরাং শীত গ্রীষ্মের জন্য বস্ত্রের ভাবনা ভাবতে হয়। বল্কলের যুগ প্রায় পেরিয়ে এসেছে। বুনো 'শন' ও মাস্তাগাছের ছালে পেলো আঁশাল সুতো ; তাই দিয়ে জাল বোনে মাছ ধরার জন্য। তারপর ছোট তাঁত কে কোথায়, কবে আবিষ্কার করলো তা কেউ জানে না। আমেরিকার লাল মানুষদের ও ভারতে মণিপুরীদের তাঁত সেই আদিযুগের যন্ত্র—এখনো

তার চল আছে। তাঁতের একটা দিক খুঁটিতে অপর দিক কোমরে বাঁধা—হাত দিয়ে ধীরে ধীরে টানা-পোড়েন দুই-ই সামলাতে হয়। কিন্তু কী অদ্ভুত ভাবে সূক্ষ্ম ও সুন্দর কাজ হয় এভাবে তা দেখলে অবাক হতে হয়! প্রাচীন কালে বোধহয় এই ভাবেই লোকে তাঁত বুনে কাপড় তৈরী করেছিল। তকলি থেকে চরকা নামে যন্ত্র যেদিন আবিষ্কৃত হলো—সেদিন তো আর একটা যুগান্তর হয়েছিল—যেমন—আধুনিক যুগে স্পিনিং জেনি করেছিল ইংলণ্ডে আটটা টাকু একসঙ্গে চালিয়ে।

মানুষের খাওয়া থাকা ও পরার সমস্যা একটু একটু মিটছে ;—কিন্তু সব জায়গাতে একই সময়ে একই রকমের উন্নতি যে দেখা গিয়েছিল তা তো নয়। সব মানুষ যেমন একসঙ্গে জোয়ান হয়ে ওঠে না, সব জাতের মানুষের কাজের শক্তি, সৃষ্টির শক্তি একই সঙ্গে গজিয়ে ওঠে না। পৃথিবীর কোথাও সূর্যোদয়, কোথাও অন্ধকার রাত্রি। যাই হোক, যখন পৃথিবীর একজায়গায় একদল মানুষ বেঁচে-বর্তে খেয়ে-পরে সুখে-দুঃখে বেড়ে উঠ্‌ছে তার অদূরে হয়ত আরো অনেকদল রয়েছে যাদের হাতে বিজ্ঞানের চাবিকাঠি পৌঁছয়নি—যাদের বুদ্ধি গৃহস্থালীর দিকে আগায়নি ; তারা হাম্‌লা করে গ্রামের উপর—লুটপাট করে নিয়ে যায় গরু, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া নিরীহ গ্রামিকদের ঘর থেকে। এখনো নিশ্চিহ্ন হয়নি তারা—নানা নামে তারা বেঁচে আছে, উপদ্রব করছে প্রতিবেশীর উপর। এই অবস্থায় দরকার হলো আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ও উৎপাতকারীদের দূর থেকে মারবার জন্য শস্ত্র। নানারূপ মারণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হতে থাকলো। আদি মানুষের খুব পুরাতন শস্ত্র হচ্ছে ধনুক-বাণ। লাঠি-শড়কি গদার ব্যবহার চলতে পারে শত্রু কাছে এলে, কিন্তু দূর থেকে বাণ মেরে শত্রু তাড়ানোর বিদ্যা যুগান্তর আনলো আদিম যুগের রণনীতিতে। আমাদের দেশে বন্দুক-বারুদ আসার আগে পর্যন্ত এটাই ছিল প্রধান মারণ অস্ত্র ; এখনো আদিম উপজাতিদের মধ্যে তীর-ধনুকের চল্ দেখা যায়। ধাতু আবিষ্কৃত হবার পর থেকে অস্ত্রশস্ত্র বানানোর পদ্ধতি ও ব্যবহারের কায়দা গেল নানা পথে।

মানুষের ইতিহাসে পাথুরে যুগের প্রায় শেষ দিকে কোন বিজ্ঞানীর দল কোথায় যে মাটি ও পাথরের মধ্য থেকে ধাতু নিষ্কাষণ করলো তার সঠিক

বিবরণ কেউ দিতে পারে না। মানুষ কবে মাংস ঝলসাতে ঝলসাতে দেখেছিল তলার মাটি পাথর গলে গিয়ে তাল পাকিয়ে শক্ত পিণ্ড হয়ে গেছে। সেই ইঙ্গিতই মানুষের পক্ষে যথেষ্ট। মাটি খুঁড়ে সে সেই ধরণের পাথর বের করে অন্য শক্ত পাথর দিয়ে সেগুলো ভাঙে, তারপর কাঠ এনে 'পোয়ান' করে পোড়ায়, পায় গলন্ত তপ্ত ধাতু। তার থেকে বানায় তৈজসপত্র অস্ত্রশস্ত্র। পাথরের তীরের ফলার জায়গায় তৈরী হয় তামা-রাঙের মেশানো ব্রোন্‌জ ধাতুর তীক্ষ্ণ শক্ত ফলা। এই ঘটনা আজকের আণবিক অস্ত্র নির্মাণের মতই সেদিন লোককে ত্রস্ত করে তুলেছিল।

অস্ত্রশস্ত্রর চাহিদা থেকে লোকে চললো ব্রোন্‌জের উপাদান তামা ও রাং খুঁজতে দেশ বিদেশে—যেমন আজ পেট্রোলিয়ম, ইউরেনিয়ম ও অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য মাটির খোঁজে সমস্ত দেশ খুঁড়ে বেড়াচ্ছে লোকে। সেই বিস্মৃতযুগেও ব্যবসায়ীরা ডিঙি-নৌকা করে দেশে দেশে দ্বীপে দ্বীপে ফিরেছিলো এইসব ধাতুর খোঁজে। য়ুরোপের কাইপ্রাস দ্বীপ, ইতালি, স্পেন বৃটেন প্রভৃতি দেশে ফিনিক বণিকরা যেতো এইসব মহামূল্যবান দুষ্প্রাপ্য ধাতুচুর আনতে। বাংলা দেশের তাম্রলিপ্ত (তমলুক) বন্দরের হয়তো এই তামা রপ্তানীর খ্যাতি ছিল। য়ুরোপে কাইপ্রাস দ্বীপের নাম হলো সেখানে প্রচুর তাম্রচুর পাওয়া যেতো বলে; লাতিনে কুপরুম শব্দ থেকে কপার ও দ্বীপের নাম কাইপ্রাস হয়েছে।

মানুষ যখন শিকারী ও যাযাবর অবস্থায় ভবঘুরে ছিল, তখন সমাজ-বন্ধন ছিল না। বিবাহ সম্বন্ধে নিয়ম কানুন ছিল অত্যন্ত ঢিলা। বিয়ে করতেও যতক্ষণ, ছাড়তেও ততক্ষণ। মহাভারতে কতরকম বিবাহের কাহিনী আছে,—সম্বন্ধ করে বিবাহ, লুকিয়ে বিবাহ, চুরি করে বা ডাকাতি করে বিবাহ, টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে বিবাহ প্রভৃতি বারো রকমের বিবাহ হিন্দুসমাজে এককালে প্রচলিত ছিল। এছাড়া এক পত্নীর বহু স্বামী, এক স্বামীর বহু পত্নী হতো। সহমরণ, বিধবা বিবাহ সবই চলিত্ ছিল। পৃথিবীর একটা আদিম যুগে নারী ছিল সংসারের কেন্দ্র; মায়ের নামে ছেলেদের পরিচয় হতো। পিতা ঘুরে বেড়ান, যুদ্ধ করেন—সময় সময় স্ত্রীর ঘরে আসেন। মাতৃকেন্দ্রিক সমাজ কেরল দেশে এখনো রয়েছে—যদিও তা ভেঙে যাচ্ছে।

সেখানে সম্পত্তি পায় ভাগ্নেতে, পুত্র পায় তার মাতুলের দান; রাজার ছেলেও সে-দেশে রাজা হয়না, রাজার ভাগ্নেরা রাজা হয়ে আসছে।

মানুষের যথার্থ সমাজ-জীবন শুরু হয় গ্রাম পত্তন ও চাষবাস থেকে। এখন থেকে বাড়ির মেয়েদের ওপর অনেক কাজ—গরু-দেখা, গোয়াল সাফ্ করা, দুধ দোহা, মাখম তোলা, শস্যের বীজ রাখা, খেতি-খামারী করা। এর উপর আছে সুতাকাটা তক্লিতে বা চরকায়। রান্নাবাড়ির কাজ তো ছিলই। সুতরাং মেয়েদের অবস্থা পূর্বের থেকে এখন অনেক ভালো। কিন্তু চাষবাস ছিল না, খেত খামার করতো না এমন লোকও তো সমাজে ছিল তাদের দশা চিরকালই, সব দেশে সমান। তারা 'প্রজা' উৎপাদন বা ছেলেপুলে সংসারে আনছে দলে দলে—এদের বলা হয় প্রজা বা Proletariat। এরাই ইতিহাসে ক্রীতদাসের সংখ্যা বাড়ায়, ভাড়াটিয়া সৈন্য হয়ে টাকার জন্য দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়, জান দেবার জন্য রোজগার করে। বিদেশে বিভুঁয়ে তারা মারা পড়ে অথবা আধ-মরা হলে পথের ধারে ফেলে রেখে সঙ্গীরা চলে যায়, তখন তাদের সে-রোজগারের টাকা কে ভাগ করে! আজও দুনিয়ায় টাকার বিনিময়ে প্রাণ-কেনার দুর্নীতিমূলক ব্যবসায়ের শেষ হয়নি। এই কাল্তু লোকের দল জান দেবার ও জান নেবার জন্য সৈন্যদলে ভর্তি হয়।

সমতলভূমে নদীতীরে লোকে গ্রাম পত্তন করে, চাষবাস করে; ভিন্ দেশ থেকে আসে লুটেরার দল নদী পার হয়ে। গ্রামের লোকে চাষবাস নিয়ে থাকে—লড়াই করতে পারে না দলবদ্ধ লোকের সঙ্গে; তারা মরিয়া হয়ে এসেছে লুট করবার জন্যেই। তাই দেখা গেল নদী-ঘাটের পারাপারের জায়গায়, যারা বাস করছে, তারাই লুটেরাদের রুখবার জন্য জোট বাঁধে। তাদের মধ্যে যে মাতব্বর সেই হয় লড়াইএর সর্দার। কালে অনুগত দলের সহায়তায় তিনি হন 'রাজা'। প্রজার মনোরঞ্জন করে তিনি রাজা হয়েছেন। রাজা কিন্তু তাঁর রাজধানী করলেন দূরের পাহাড় বা টিলার উপর। সেখান থেকে বহু দূর দেখা যায়—কারা আসছে কোন দিক থেকে জানা যায়। তাছাড়া 'নগ' বা পাহাড়ের

উপর পাথর দিয়ে ঘরবাড়ি ও দুর্গ প্রাচীর নির্মাণ করা সহজ। 'নগ' এর উপর শহর পত্তন হলো বলে তার নাম হয় 'নগর'; দুর্গম-স্থানে নির্মিত হয় 'দুর্গ' অনেক দুঃখ না করলে সেখানে ওঠা যায় না। প্রাচীনকালের রোম, রাজগৃহ, এথেন্সের আক্রোপোলিস প্রভৃতি পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। নগরের পত্তনের সঙ্গে-সঙ্গেই অনেকরকম শিল্পেরও আরম্ভ হয়। নানা শ্রেণীর লোকও আসে নানা উদ্দেশ্য নিয়ে—সাধু, ভদ্র, ঠগ্, জুয়াচোর খুনে মাতাল সবই এসে জোটে নগরে। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য দরকার হয় নিয়ম কানুন। জনতার মধ্যে যারা বুদ্ধিমান, শক্তিমান তারা নগর শাসন ব্যবস্থায় মন দেয়; তারা 'ক্ষত্র' বা রক্ষাকর্তা। কিন্তু নগরের বা পুরের লোকদের রক্ষা করলেই তো চলবে না, তারা তো চাষ করে না, খাদ্যশস্য উৎপন্ন করে না, সে সব আসে নিকটের গ্রাম থেকে; সেই গ্রামবাসী কৃষক শিল্পীদের রক্ষা না করতে পারলে তাদের মুখের অন্ন জোগাবে কে? তাই নগরের ক্ষত্র বা ক্ষত্রিয়রা গ্রাম রক্ষা করে, গ্রামের লোকে খুশী হয়ে উৎপন্নের ষষ্ঠাংশ দেয়; তারপর লুটেরার হাঙ্গামা সাম্‌লাবার সমস্ত দায় রাজা ও রাজন্য বা রাজার সাকৃবেদদের উপর গিয়ে বর্তায়। লোকে বলে সেটাই হলো রাজধর্ম।

এইভাবে আদিম মানুষের কত হাজার বৎসর কেটে যাবার পর সে আবিষ্কার করলে লিপি বা লেখার পদ্ধতি। এতদিন মানুষের যা কিছু বলার মতো কথা, তা সামনের মানুষকে বলতো, অথবা চেঁচিয়ে আরও কয়জন বেশি লোককে শোনাতে পারতো। কিন্তু সে ঠিক কি কথাটা বলতে চেয়েছিল, তা বিশ জন লোকের মনে বিশ রকম ক্রিয়া করতো। যাই হোক মানুষ যেদিন লিপিমালা আবিষ্কার করলো সেদিন থেকে ইতিহাসের নতুন পাতা খোলা হলো। এ লেখার ইতিহাস পাঁচ হাজার বছরের বেশি পুরাণো নয়, অথচ মানুষ 'মানুষ' ভাবে পৃথিবীর উপর চলাফেরা করছে প্রায় পঞ্চাশ যাট কি লাখ-দুলাখ বছর। সুতরাং মানুষের ইতিহাসের কতটুকু আমরা জানি, তারপর এই লেখার বিদ্যাও তো সব দেশের লোক আয়ত্ত করতে পারে নি; ফলে মানব জাতির খুব একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের কথা আমরা ইতিহাসরূপে জানতে পারি।

আদি মানুষদের অনেক কথাই বলা গেল; কিন্তু তাদের ধর্মবিশ্বাস কি ছিল সে বিষয়ে কিছু জানা দরকার। মানুষের অসংখ্য প্রশ্ন, অগনিত সমস্যা। আকাশে বিদ্যুৎ কেন চমকায়, বজ্র কেন ডাকে, বৃষ্টি কেন পড়ে, ভূমিকম্প কেন হয়, মানুষ মরে যায় কোথায়, জন্মাবার আগে সে কোথায় ছিল—এমনি অসংখ্য প্রশ্ন। মানুষ ছাড়া আর কোনো প্রাণীর এ সব কথা নিয়ে মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। মানুষই ভেবে ভেবে মরে। বিজ্ঞানের কম কথাই সে জানে, তাই ভয়ে ভয়ে প্রকৃতির সকল উপদ্রবকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে, বলি দেয়। সব থেকে তার বেশি ভয় ভূতের; তাদের ধারণা মানুষ মরে আর একটা জগতে যায়—সেখান থেকে জ্যান্ত মানুষের খোঁজ খবর নেয়—উপদ্রব করে। তাই তাদের উদ্দেশ্যে ঘি, দুধ, চাল, ছাতু ফল, মূল নিবেদন না করলে তারা অনাহারে ঘুরে বেড়াবে আনাচে কানাচে। মনে মনে বলে কোন দেবতাকে ঘি দুধ দিয়ে তুষ্ট করবো। ভয়ে বিস্ময়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেবতাকে ডাকে, বুকের কাছে হাত রেখে ভাবে দেবতা বুঝি সেখানে আছে—বুক ধুক্ ধুক্ করে ভয়ে ভাবনায়। মাটিতে মাথা ঠোকে, প্রণাম করে সাষ্টাঙ্গ হয়ে—ভাবে তার এই হীনতা দেখে আকাশের দেবতারা তুষ্ট হবেন।

এদেরই মধ্যে একদল বুদ্ধিমান ভাবুক লোক ঈশ্বর সম্বন্ধে ভাল কথা বললেন। তাদের মধ্যে আবার যারা ধূর্ত তারা সাধারণ লোকের কাছে নানারকম বুজরুকি দেখিয়ে তাক লাগায়—কেউ গায়ে ছাই মাখে, মাথায় জটা পরে, মুখে রঙ মাখে—মন্ত্র উচ্চারণ করে তীব্রস্বরে—তার মধ্যে এমন শব্দ ব্যবহার করে—যা সাধারণ লোকে বোঝে না বলেই ভয়ে ভক্তিতে আড়ষ্ট হয়ে গদগদ হয়ে শোনে। এইসব ধারণা বহুযুগের ঘসা খেয়েও এখনো টিকে আছে।

প্রাচীন জগত

"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি!
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু,
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তায় এক কোন।

এটি বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, এবং সমগ্রের মধ্যে সন্ধান করেছেন ঐকতান!

মানুষ যেদিন একসঙ্গে চলাফেরা করতে করতে সমাজবদ্ধ হলো, যেদিন অনেকে মিলে সভা ও সমিতি করে কাজকর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতে শুরু করলে—সেদিন থেকে সভ্য মানুষের ইতিহাসের আরম্ভ। প্রায় সব জাতিই দাবী করে যে সভ্যতা সর্বপ্রথম তাদের দেশেই দেখা দিয়েছিল। 'প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে' গেয়েছেন সব দেশের কবিই। সূর্যোদয় পৃথিবীর কোনখানে প্রথম হয়, তা যেমন বলা যায় না, তেমনই পৃথিবীর কোন দেশেতে প্রথম সভ্যতার আলোক জ্বলে উঠেছিল সে-সম্বন্ধে শেষ কথা বলা কঠিন। তা ছাড়া সভ্যতা কা'কে বলে সেটা নিয়েও কথা উঠছে।

আজ পৃথিবীতে লোকসংখ্যা এত বেড়ে চলেছে যে তাই নিয়ে দেশে দেশে পণ্ডিতদের খুবই ভাবনা,—কোথায় এতো স্থান, কোথায় এত খাদ্য। প্রাচীনকালে পৃথিবীর নানাস্থানে নানা জাতের মানুষের বাস থাকা সত্ত্বেও এখনকার তুলনায় জনসংখ্যা ছিল অনেক কম। তবুও সেই স্বল্পসংখ্যক লোকেরও খাদ্য সমস্যা মেটানো শক্ত ছিল, কারণ সকলে অনুকূল স্থানে আশ্রয় পায়নি, আর প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন করবার বিজ্ঞানী-চাবিকাঠির সন্ধানও মেলেনি। মানুষকে বহু ঠেকে, বহু ঠকে প্রকৃতিকে একটু একটু করে বশে আনতে হয়েছে; সে-আনার কাজ এখনো শেষ হয়নি।

আদি যুগের মানুষ খাদ্য 'সংগ্রহ' ক'রে বেড়ায়, তারপর ঘুরতে ঘুরতে একদিন নদীতীরে অনুকূল পরিবেশ পায়; সেদিন থেকে সে খাদ্য উৎপাদনে মন দিল। কর্ষণজীবী বা চাষী লোকে পত্তন করলো গ্রাম। আর একদল লোক যারা কর্ষণ-যোগ্য অনুকূল পরিবেশ পেলো না, তারা ঘুরতে ঘুরতে সমুদ্রের তীরে বা দ্বীপের মধ্যে গিয়ে উঠ্‌লো,—তাদের দৃষ্টি গেল বনটনে, বিনিময়ে, ব্যবসায়ে ও বাণিজ্যে। তারা গড়লো শহর, বন্দর।

নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে নদীতীরে ও সমুদ্র-উপকূলে সভ্যতার প্রথম আলোক জ্বলেছিল। অতি-গ্রীষ্ম, অতি-শীত, অতি-বৃষ্টির দেশে, জলশূন্য বা জলেডোবা দেশে মানুষ আদিযুগে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে সভ্যসমাজ পত্তন করতে পারেনি। আবার অতি-উর্বর ভূমি, প্রচুর জল ও বৃষ্টি পাওয়া সত্ত্বেও মিসিসিপি-মিসোরি বা আমাজোন বা কংগো নদীর তীরে সভ্যতা সৃষ্টি হয়নি। তার প্রধান কারণ বুদ্ধিমান মানুষের অভাব ছিল সেই সব অঞ্চলে। জমি হলেই ভাল চাষ হয় না—ভাল বীজেরও দরকার—পরিবেশ বা আবহাওয়া অনুকূল হওয়া চাই।

কিন্তু বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী, অনুসন্ধিৎসু মানুষ বৃষ্টিহীন নীলনদ তীরে এসে আশ্চর্য এক সভ্যতার পত্তন করলো। খাদ্য সংগ্রহের পর্ব শেষ করে তারা খাদ্য উৎপাদন করলো এইখানে এসে। মিশর থেকে অনুকূল ইউফ্রাতিস-তাই গ্রীস নদীর দোয়াবে, ভারতের পঞ্চনদ ও গঙ্গা-যমুনার অববাহিকার দেশে, চীনের হোয়াং হো—ইয়াংৎসিকিয়াঙ ধৌত ভূখণ্ডে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ পত্তন হয়েছিল—আজ থেকে পাঁচ-ছয় হাজার বৎসর পূর্বে। তার আগে অনেক হাজার বছর ধরে মানুষ পৃথিবীতে ঘুরে বেড়িয়েছিল, অনুকূল স্থানের সন্ধানে। বুদ্ধিমান লোকে পেলো সেই অনুকূল দেশ, মনিকাঞ্চনের যোগে সভ্যতার ইতিহাস লেখা সুরু হলো সেদিন থেকে।

মিশর

আফ্রিকার উত্তরে নীলনদ তীরের মিশর সভ্যতা পৃথিবীর ইতিহাসে একটা অভিনব ঘটনা। আজ মিশরের নানা আশা, নানা সমস্যা। উত্তর-আফ্রিকা ও পশ্চিম-এশিয়ায়, আরবী ভাষাভাষী জাতিদের সর্বময় কর্তা এখন মিশর। ধর্মে তারা মুসলমান, রাজনীতিক মতবাদে তারা সাম্রাজ্য-বিরোধী। কিন্তু আমরা যে-মিশরের কথা বলছি, তা আজ থেকে পাঁচ ছয় হাজার বৎসর আগের কথা। মানচিত্রে মিশর (Egypt) বলতে যে রং-করা দেশটুকু দেখা যায়, প্রাচীন যুগের মিশর তা থেকে অনেক সংকীর্ণ, অনেক ছোট। মিশরের মাঝ দিয়ে বইছে নীল নদ, দক্ষিণ থেকে উত্তরে গিয়ে পড়ছে ভূমধ্য সাগরে। এই নদীর দু'পাশে দশ-পনেরো ক্রোশ বিস্তৃত জায়গাটুকু আসল মিশর—তার বাইরে দুই দিকেই মরুভূমি ও বালিয়াড়ি বা বালির পাহাড়। বাহির থেকে হঠাৎ দেখলে মনে হয় দেশটা বুঝি দুনিয়া থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন; বিদেশীর পক্ষে হঠাৎ ঢুকে-পড়ার পথ পাওয়া সহজ নয়। মধ্য-আফ্রিকা থেকে নীলনদ দিয়ে যে জলধারা আসছে, তার মাঝে-মাঝে ছোট ছোট জলপ্রপাত থাকাতে নৌকা করে উপর-নীচে আসা-যাওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া দক্ষিণ দিকটায় গভীর জঙ্গল। কিন্তু মিশরের সমতলের ভিতর দিয়ে নদীর যে অংশ বয়ে আসছে তা ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বাধাহীন; সাগরের কাছে সমতল দেশে নদীর গতি মন্থর, তাই সেখানে হয়েছে বিশাল ব-দ্বীপ। এই ব-দ্বীপের পূর্বদিকে সিনাই উপত্যকা। এই সিনাই দিয়ে মিশরে প্রবেশ করে এশিয়ার নানা জাতি উপজাতি। এই পথ দিয়ে মিশরের রাজারা সৈন্য নিয়ে যায় এশিয়ায়; এই পথ দিয়েই আসে অসুরীয়রা, পারসিকরা, গ্রীকরা, আরবরা, তুর্কীরা। এখনো এই সিনাই-এর মাঝ দিয়ে এসে সুয়েজখালে হানা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল ইসরেইলি-ইংরেজ ও ফরাসীরা।

নীলনদের কল্যাণে দেশে প্রচুর ফসল ফলে ব'লে বিদেশের লোকে এককালে মিশরকে বলতো 'প্রাচ্য-জগতের শস্যের গোলা'। প্রতি বৎসর

নীলনদের বানের জল প্রচুর পলিমাটি রেখে যায় ক্ষেতের উপর। তারপর সারা বৎসর চলে চাষের মেহন্নত—এক-গেড়ে দুগেড়ে দোন দিয়ে নদী থেকে জল তুলে সেঁচ ক'রে, প্রচুর ফসল ফলায়। মিশর গ্রীষ্মপ্রধান দেশ; তার উপর বৃষ্টিহীন। লোকের ঘরবাড়ি তৈরী করবার বা পরনের কাপড় চোপড় সংগ্রহ করবার প্রয়োজন অন্য দেশের তুলনায় কম। এইসব সুযোগ সুবিধার মধ্যে মিশরের সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল।

ঐতিহাসিকেরা আগেকার দিনে মিশরের ইতিহাস যেখান থেকে আরম্ভ করতেন এখন সেই আদিপর্ব অনেক পিছিয়ে গিয়েছে। তাকে প্রাগৈতিহাসিক বলা হয় বটে, কিন্তু আসল ইতিহাসের সূত্রপাত সেখানেই। ইতিহাসের সেই পাতা খোলা হলে আমরা দেখতে পাই সংকীর্ণ উপত্যকার মধ্যে ছোট ছোট বহু উপজাতির বাস—যেমন আর সব দেশেই দেখা যায়—তেমনিই ছিল মিশরে। এইসব লোক কোথা থেকে আসে, তার স্পষ্ট ধারণা করা শক্ত। আদিম বাসিন্দা নিগ্রো বা তাদের কাছাকাছি কোন জাতের লোক যে নয়, তা প্রাচীন মিশরীয়দের অসংখ্য প্রাচীর-চিত্রের আলেখ্য থেকে বুঝা যায়। আবার এশিয়ার সেমিটিকদের সঙ্গেও এদের চেহারার মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। পণ্ডিতদের অনুমান যে আদিকালে আদেন (Aden) উপসাগরের পথে এরা এসে নীলনদের তীরে ধীরেধীরে উপনিবেশ পত্তন করে থাকবে। এইসব উপজাতির একটা বৈশিষ্ট ছিল যে প্রত্যেকেরই দেবতার প্রতীক একটি প্রাণী—গুবরে-পোকা থেকে আরম্ভ করে ষাঁড় পর্যন্ত নানা জন্তু কোনো না কোনো দেবতার পবিত্র প্রাণী বলে পূজো পেতো। সেসব জন্তুকে তারা মারে না, খায় না—ভক্তির সঙ্গে সেবা করে। এ বিষয়ে আমাদের দেশের সঙ্গে আশ্চর্য মিল; হিন্দুদের গাভী দেবী, ভগবতী বৃষ মহাদেব শিবের বাহন, ময়ূর কার্তিকের, ইঁদুর গণেশের, ছাগ অগ্নির, মহিষ যমের, পেঁচা লক্ষ্মীর, হাঙর গঙ্গার, ঐরাবত-হাতী ইন্দ্রের, সাপ তো দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড়দের বিশেষভাবে পূজ্য; মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, তো অবতার। আরো খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে।

মিশরীয়দের বিশ্বাস মৃত্যুর পর তারা আবার বাঁচবে; তাই কবরের ব্যবস্থা হতো খুব পরিপাটি করে; কবরঘরে শবের চার পাশে পেটা-মাটীর জালার মধ্যে নানা প্রকার জিনিষ ভরা। ইহলোকে বেঁচে থেকে মানুষ যা সব ভোগ করেছে, মরবার পরে পরলোকে গিয়েও যেন সে সবের অভাব না হয় তার, এমনভাবে গুছানো কবর ঘর। খাদ্য পানীয়, বস্ত্র, অস্ত্র

-শস্ত্র সবই কবর ঘরে সাজানো। অস্ত্র সব পাথরের, কিন্তু সুনিপুণভাবে কেটে ঘসে তীক্ষ্ম করা। পাথরের কুড়ুল বটে, কিন্তু তার হাতোল হাতির দাঁতের বা কাঠের। মেয়েদের কবরঘরে মুখের রং, চোখের কাজল, কাজললতা, সব দেওয়া হয়েছে—পরলোকে দরকার হবে তো!

এই আদিম মিশরীয়রা কুমোরের চাকে মাটির পাত্র বানাতে শেখেনি; হাতে পিটিয়ে সুন্দর জালা বা কুম্ভ, হাঁড়ি পাতিল বানায়, তার উপর লাল রঙও দেয়।

এরা কৃষিজীবী, জলসেচ দিয়ে চাষের কাজ করতে জানে। গম, যব, শণ তারা রোপে। শণের আঁশে সুতা কাটে, বস্ত্র বোনে। তুলা তখনো অজ্ঞাত। বর্তমান মিশরের প্রধানতম রপ্তানী মাল তুলা। ইজিপশিয়ান কটন্ বা তুলা পেলে ভারতের কাপড় কলওয়ালারা আর কিছু চায় না। যে-চিত্রলেখা বিদ্যার জন্য পরবর্ত্তী যুগে মিশরীয়দের খ্যাতি, তার সূত্রপাত দেখা যায় এই আদিযুগের মানুষদের মধ্যে। কালে এইসব ছোট ছোট উপজাতিগুলি দুইটি ভাগে দলবদ্ধ হয়—উত্তর ও দক্ষিণ। ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ হলো এই দুই রাজ্যের মিলনে; রাজা বা ফারায়ো উত্তর ও দক্ষিণ দেশের প্রতীক ধারণ করলেন তাঁদের মুকুটে—শকুনি ও সাপ (গরুড় ও নাগ) উভয়েই মহাশক্তির প্রতীক। ভারতের পুরাণে দুই বিরুদ্ধ শক্তির মূর্তি খেচর গরুড় ও ভূচর নাগ।

মিশরীয় পুরান্ কথা মতে প্রথম রাজার নাম মেনিস—আমাদের দেশের মনু শব্দের সঙ্গে আশ্চর্য মিল; মনু থেকে মানব হয়েছে। মিশরে তিন হাজার বৎসরে প্রায় ত্রিশটি রাজ বংশ রাজত্ব করেছিল।

মিশরের আদিযুগের ইতিহাসকে পণ্ডিতরা বলেন পিরামিড পর্ব। কারণ এ যুগের রাজারা তাঁদের কবরগৃহ করেন পিরামিডের ভিতর। রাজকবরের জন্য পাথরের স্তূপ বড় হতে হতে এতোই বড় হল যে তার কয়েকটি অনেক হাজার বৎসরের পর এখনো টিকে আছে। কায়রোর অদূরে এই পিরামিডগুলি দেখতে আসে হাজার হাজার লোক দেশ বিদেশ থেকে। পিরামিডের কথা আমরা পরে আবার বলবো।

আদিযুগের ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্র সংকীর্ণ ছিল। তৎসত্ত্বেও মিশরীয়দের ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকা ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগরের তীরে তীরে ঘুরতো; উদ্বৃত্ত গম তারা বিদেশে পাঠিয়ে বিনিময়ে আনতো লবণ, মদ, জলপাই-এর তেল, আর আনতো ঘরদুয়ার বানাবার মতো কাঠ।

মিশরের ভিতরের ইতিহাস অন্য সব দেশের মতোই বিচিত্র ও জটিল। নানা কারণে শক্তিমান ও বুদ্ধিমান পুরুষরা রাজা হতেন। কিন্তু রাজ্য বড়ো হয়ে গেলে তাঁদের পক্ষে রাজধানী থেকে বসে শাসনকাজ চালানো সম্ভব হয় না। সেজন্য রাজাদের নির্ভর করতেই হয় রাজন্য বা রাজার সমতুল সম্ভ্রান্ত দের উপর। তাঁদের উপর ভর দিয়েই তিনি তো রাজা। কালে রাজধানী থেকে প্রাদেশিক শাসন কেন্দ্রের দূরত্বের জন্য এই সকল রাজতুল্য শাসকেরা স্বাধীন হতে চান—ফারায়োর মুকুট পাবার জন্য সকলেরই লোভ; কিন্তু বাহির থেকে শত্রু এলেও একত্র হয়ে তাদের রুখতে পারে না। হিকসস (Hyksos) নামে এক দুর্ধর্ষ জাতির লোক যখন পশ্চিম এশিয়া থেকে মিশরে প্রবেশ করে (খৃষ্ট পূর্ব ১৮০০) তখন তারা বাধা পেলো না। হিকসসর আসে ঘোড়ায় চড়ে। এমন অদ্ভুত জন্তু মিশরীয়রা পূর্বে দেখেনি, গর্দভ তাদের ভারবাহী জন্তু, গাড়িও টানে তারা। এই নতুন লোকদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে দেখে তাদের পুরানো যুগের ব্রোনজের বা তামার অস্ত্র-শস্ত্র কোনো কাজে লাগছে না, কারণ বিদেশীদের হাতিয়ার লোহার তৈয়ারী। তামা ব্রোনজের তরোয়ার শড়কির হার হলো লোহা-ইস্পাতের কাছে—বিজ্ঞানের কাছে অবিজ্ঞানের পরাভব।

হিকসসদের আদি নিবাস কোথায় জানা যায় না। পশ্চিম এশিয়ায় এ-সময় নানা অজ্ঞাত কারণে মানুষের চলাফেরা চলছে, নিশ্চয়ই খাদ্যের অভাবে নতুন নতুন দেশ জয়ের প্রয়োজন হয়েছিল। এক দলের ঠেলা পেয়ে দেশ ছাড়া হয় এক দল; তাদের চাপে নাড়া পায় পাশের লোকে। মানুষের ঢেউ চলে একের পরে এক। খত্তি, মিতানি, কাস্‌সু প্রভৃতি কত জাতির মধ্যে এই চলা-ফেরা চলেছে তাদেরই অন্যতম; হিকসস্‌রা মিশরে প্রবেশ করেছিল। পণ্ডিতদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন হিকসস্‌রা (ইক্ষ্বাকু?) আর্যদের একটা শাখা—যেমন খত্তি, মিত্তানি, কাস্‌সুরা! এদের কথার পরে আসবো।

শতাব্দীকাল মিশরে হিকসসরা রাজত্ব করে। এরা জলের উপর তেলের মতো ভেসে থাকলো, মিশ খেলো না। মিশরীয়রা এদের আপনার

করতে পারলো না, তারাও মিশরীয়দের আত্মীয় হলো না। খাস মিশরীয়দের চেয়ে বিদেশী ইহুদি উদবাস্তরা হিকস্‌স রাজাদের কাছে বেশি সোহাগ পেয়েছিল।

বিজয়ী ও বিজিত পাশাপাশি বাস করতে থাকলে, কিছুকালের মধ্যে পরস্পরের দোষ গুণ কোনো পক্ষের কাছে আর চাপা থাকে না। মিশরীয়রা হিকসস্‌দের কাছথেকে অশ্বারোহণ বিদ্যা শিখে নিলো। অশ্বের আবাদ বিদ্যা জেনে ফেললো, লৌহের ব্যবহার বিদ্যা আয়ত্তে এলো। অন্য দিকে হিকসসরা নদীমাতৃক দেশে বাস ক'রে, মিশরীয়দের সংস্পর্শে এসে ধীরেধীরে নির্বীর্য হয়ে পড়েছে। এছাড়া মিশরীয়দের মধ্যেও আত্মচেতনা জাগছে।

বিপ্লব এলো; হিকসস্‌রা দেশছাড়া হলো। এই বিপ্লবের নেতৃত্ব করে দক্ষিনীরা, থীবস নামে নগরে তাদের বাস। কালে তারাই হলো সমগ্র মিশরের একছত্র অধিপতি। উত্তরের রাজধানী মেমফিস থেকে রাজ্যের ভারকেন্দ্র সরে গেল দক্ষিণে। হিকসস্‌রা বিতাড়িত হয়ে কোথায় যে গেল তার সন্ধান ঐতিহাসিকরা আর পান না। পণ্ডিতরা মনে করেন এই হিকস্‌দের নানা শাখা ক্রীট, ফিলিস্তান ও ব্যাবিলনে (ববিলুবডে) রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

মিশরীরা নূতন যুগের লোহার মারণাস্ত্র পেয়ে, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে আপনাদের শক্তি পরীক্ষা করবার জন্য দিগ্বিজয়ে বের হলো। মানুষের জীবনে অশ্ব যুগান্তর আনলো। চার হাজার বৎসর অশ্ব মানুষকে পিঠে নিয়ে ঘুরছে, নানা রকমের গাড়ি টেনে চলেছে। ঘোড়াকে বশে আনার পর থেকে মানুষের দূর এলো নিকটে, দূর পথ খুবই কম সময়ের মধ্যে পারানো ও দুর্গম পথ সহজে লঙ্ঘন করা সম্ভব হলো। বিংশ শতকে মাত্র তার স্থান নিয়েছে মোটর যান।

ফারায়োদের সৈন্যবাহিনী সিনাই উপত্যকা পার হয়ে ফিলিস্তান, ফিনিকস্তান (ফিনেশিয়া), সিরীয়ার নগরগুলি একের পর এক দখল করলো। এতকাল মিশর ছিল রাজ্য, এখন হলো সাম্রাজ্য। এই দিগ্বিজয়ের

সময়ে মিশরীয় ফারায়োদের সঙ্গে হিটাইট নামে এক পরাক্রমশালী জাতির বহুকাল ধরে যুদ্ধ চলে। সে সময় উভয় রাজ্যের মধ্যে যেসব পত্র বিনিময় হয় তা থেকে প্রাচীন জগতের অনেক তথ্য জানা যায়। অবশ্য সেসব পত্র কাগজের উপর লেখা হয় নি। সেগুলি কাদার পাটার উপর খোদাই লেখা, যার কথায় পরে আবার আসবো। হিটাইট ছাড়া ফারায়োদের সহিত বাবিলনীয়, অসুরীয়, মিত্তানি প্রভৃতি জাতির ও অলস (কাইপ্রাস) প্রভৃতি দেশের রাজাদের অনেক পত্র বিনিময় হয়। পত্রগুলি বন্ধুভাবে লিখিত হলেও সেগুলির মধ্যে কূট-নীতিজ্ঞদের মুন্সিয়ানা সুস্পষ্ট। এসব পত্র পড়লে মনে হয় সে যুগের রাজমুন্সীরা যেন বর্তমান যুগের নানারাজ্যে কূটনীতি দপ্তরের কাজ করছেন!

বাবিলনের রাজা বন্ধুত্বের মূল্য স্বরূপ প্রায়ই মিশরের ফারোয়ার নিকট থেকে স্বর্ণ দাবী করেন, কখনো মিশরীয় রাজকন্যা বিবাহ করবার জন্য অনুরোধ জানান। মিত্তানিদের রাজারা বন্ধুত্ব বজায় রাখবার জন্য নানাভাবে দীর্ঘপত্র পাঠান। প্রাচীন জগতের আন্তর্জাতিক ইতিহাসের মহা মূল্যবান এই কাদার পাটাগুলি এক কৃষক মাঠের মধ্যে মাটির তলায় পায়, কয়েক টাকায় সেগুলি সে বিক্রি করে। এগুলি তেল-অল-আমার্ণার পত্রাবলী নামে পরিচিত। সেসব পত্রাবলী মুদ্রিত অনূদিত হয়েছে বহুকাল।

প্রাচীন যুগে রাজ্যজয়ের অর্থ ছিল সরাসরি লুটতরাজ, আর পরাজিত লোকদের বেঁধে এনে দাস করা। দিগ্বিজয়ের ফলে যুদ্ধে বন্দী অগণিত দাসদাসীতে মিশর ছেয়ে গেল। এই ঘটনা মিশরের আর্থিক জীবনে যেমন আনলো ওলট-পালোট, তেমনিই বিপ্লব ঘটালো সমাজ-জীবনে। প্রথমত দাসশ্রমের সাহায্য ফারায়োদের রাজধানী থীব্স ও অন্যান্য নগরী শিল্প শোভায় অতুলনীয় হলো। কিন্তু দরকারের বাড়্তি অপরিমিত টাকা বা ধন বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠির হাতে জমা হলেই সমাজ-জীবনে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যায়; তখন সে-পাপের ফল সমস্ত দেশকে একদিন ভুগতে হয়। বিলাসে

ব্যসনে মিশরীয় সমাজের নৈতিক জীবন গেল মুষড়ে। ফারায়োরা বিশাল হারেমের অধীশ্বর, কয়েক শত রানী,—তাদের শত শত পুত্র কন্যা নিয়ে সে-যে কী সমস্যা তা আধুনিক কালে কল্পনা করা কঠিন। হিংসায় চক্রান্তে, রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরগুলি বিষিয়ে থাকতো, সুখও ছিল না, শান্তিও ছিল না—রাজ মুকুটে টান পড়তো এইসব হুজ্জুতের ফলে।

ফারায়ো ও অভিজাত ভদ্রলোকদের দিন 'সুখেই' কাটতো—যদি সুখের মানে হয় ভোগ মাত্র। কিন্তু সাধারণ লোকের দশা? ঠিক এর বিপরীত—শাল-জামিয়ারের নক্সা কল্কার উল্টোপিঠের মতো। দারিদ্র্য দুঃখের নানা কারণ। সাম্রাজ্যের অধিকাংশ জমিজমা মহাদেব আমন্-এর নামে 'দেবত্র', পুরোহিতরা সেসবের মালিক; পুরুষানুক্রমে তারই দেবত্রের ভোগ দখলিদার।

যতদিন কৃষকরা চাষবাস করেছিলো, ততদিন তাদের অবস্থা একরকম ছিল, কিন্তু বিদেশ থেকে দাসশ্রম আমদানী হওয়ায় মিশরীয় খাস কৃষক শ্রমিকদের পক্ষে চাষবাস করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। দাসশ্রমে উৎপন্ন ফসল ও সামগ্রীর সঙ্গে বিনিময়ের বাজারে কৃষকদের পাল্লা দেওয়া অসম্ভব। তাই তারা ধীরে ধীরে ভূমিহীন মজুর বা দাসের দলে ভীড় বাড়াতে থাকে। এইভাবে দেশে শ্রেণীগত ভেদ সমাজ-জীবনে দেখা দিল। এই শ্রেণীগত ভেদবুদ্ধি থেকে একরাট্ সাম্রাজ্যে ভাঙ্গনের সূত্রপাত।

মানুষের সাম্রাজ্য বিস্তার থেকেই সাংস্কৃতিক জীবনেও অনেক অদল বদল হয়ে যায়। নানা দুর্বোধ্য ভাষাভাষী ও বিচিত্র ধর্মবিশ্বাসী লোকসমাজের সংস্পর্শে আসছে মিশরীয়রা। ফলে তাদের মনের ও মতের পরিবর্তন হয়ে চলেছে, যেমন ঘটে আসছে সকল দেশে সকল কালেই।

প্রাচীন মিশরের কথা উঠলেই প্রথমেই কাইরোর কাছে যে চার পাঁচটা বিশাল পিরামিড আছে, তার কথা লোকের মনে হয়। আর কলিকাতার যাদুঘরে যে 'মমি' আছে তার বিকট ছবিটা চোখে ভেসে ওঠে। মরা মানুষকে তাজা দেখাবার বিদ্যায় প্রাচীন যুগে মিশরীয়রা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মমিগুলোকে সযত্নে রাখবার জন্য পিরামিডের ন্যায় স্তূপ

নির্মাণেও তাদের জুড়ি মেলে না। আসলে সকল প্রকার বাস্তুবিদ্যায় পূর্ব গোলার্ধে মিশরীয়দের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারে এমন কোন জাতি প্রাচীন জগতে ছিল না। অট্টালিকা নির্মাণ, স্তম্ভের উপর ছাদ দিয়ে বিরাট ঘর তৈয়ারীর দৃষ্টান্ত এদেশেই সব প্রথম দেখা যায়; তবে খিলানের কাজ জানতো না। মিশরীয়দের স্থাপত্যরীতি ক্রীট, গ্রীস ও রোমের মাধ্যমে আধুনিক যুগে এসে পৌঁছিয়েছে। থীব্‌সের কর্নাক মন্দির শুধু মিশরের কেন, সমস্ত প্রাচীন জগতের স্থাপত্য শিল্পের এক অতুলনীয় নমুনা; দুই আড়াই হাজার মণ ওজনের পাথরের কড়ি প্রায় সত্তর ফুট উঁচু থামের ওপর কিভাবে চাপানো হয়েছিল তা এখন কেউ অনুমান করতে পারে না। অপর দিকে প্রাচীরের গায়ে কী সূক্ষ্ম কারুকার্য! এই সব কারু-কার্যের মধ্যে মিশরীয়দের সর্বাঙ্গীন জীবনযাত্রা, পরলোক সম্বন্ধে তাদের ধারণা ও বিশ্বাস নিয়ে অসংখ্য ছবি খোদাই। প্রাচীন কালের ইতিহাস রচনার এত অফুরন্ত উপাদান কোথাও পাওয়া যায় না। মিশরের ছবিতে সাধারণ মানুষকে দেখা যায় তাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজের মধ্যে—কামার, কুমোর, ছুতার, স্বর্ণকার, তন্তুবায়, রাজমিস্ত্রী, ইট-পাড়ুনি প্রভৃতি সকলকেই দেখতে পাই। আর কোনো দেশের চিত্র বা ভাস্কর্যে সাধারণ মানুষকে এমন সুন্দরভাবে দেখতে আমরা পাইনে।

আজও যেমন নগরের মধ্যে দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও বিখ্যাত নরপালদের মূর্তি স্থাপিত দেখা যায়, প্রাচীন মিশরে থীব্‌সেও সেরূপ মূর্তি ছিল, এখনো সত্তর ফুট খাড়াই দুই বিরাট মূর্তির ধ্বংসশেষ দেখা যায়।

থীব্‌স নগরের কাছেই পর্বতগুহায় রাজা ও রাজন্যদের সমাধিগৃহ। আমরা পূর্বে বলেছি যে পরোলোকে গিয়ে লোকে যাতে ইহলোকের সকল সামগ্রী পায় তার জন্য ব্যবস্থা করা হতো। তুতেনখামেন নামে এক ফারায়োর কবরগৃহ খুঁড়ে (১৯২২ সালে) যেসব জিনিষপত্র পাওয়া গিয়েছিলো সেসব সম্ভ্রান্ত ঘরের আসবাব ও তৈজসপত্রের নমুনা। সে-সব সামগ্রীর কারুতা সূক্ষ্ম ও মনোরম।

মিশরের রাজারা মিশরীয় ভাষায় 'ফারায়ো' নামে পরিচিত; ফারায়ো

শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে 'বড় বাড়ি'। আমাদের ভাষায় লোকে বলে 'বড়লোক', 'বড়মানুষ, 'বড়ঘর', বোধহয় সেই রকম অর্থে বড়বাড়িতে থাকতেন বলে ফারায়ো শব্দের ব্যবহার।

মিশরের পৌরাণিক ইতিহাস অনুসারে ৩০টি রাজবংশ সেখানে রাজত্ব করেন। চতুর্থ রাজবংশের সময় (খৃষ্ট পূর্ব ২৭০০—২২০০) পিরামিড নির্মিত হয়। সাম্রাজ্য বাড়ার সঙ্গেসঙ্গে দাসশ্রম সুলভ হলে লোকে হয় বিলাসী, যুদ্ধবিমুখ। তারই ফলে খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে অসুরীয় সম্রাটরা মিশর লুটতরাজ করে। বৈভবের যুগে অনেক বৎসর ধরে মিশরের জবরদস্তিতে লোকে ভীত ছিল—তাঁদের প্রসাদকণা পাবার জন্য পশ্চিম এশিয়ার রাজারা কি তোষামোদ করেই পত্র দিতেন। তার কথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু পট পরিবর্তন হয়ে গেল।

অসুরীয়দের পরে পারসিক শাহনশাহরা মিশর আক্রমণ ও অধিকার করলো (খৃষ্ট পূর্ব ৫২৫—৪০৫)। সেদিন থেকে মিশরীয়দের পরাধীনতার সূত্রপাত। পারসিকদের অধপতনের পর এদেশ গ্রীক মকিদানপতি-আলেকসেন্দারের তাঁবে আনে। মিশরীয়রা গ্রীকদের অধীন থাকলো প্রায় চার শত বৎসর (খৃষ্ট পূর্ব ৩২৩—খৃ. অ. ৩০) এর মধ্যে তাদের জাতীয়ত্ব, মনুষ্যত্ব অনেক কিছুই প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়। তারপর এলো রোমানরা,—তারাও প্রায় ছয় শত বৎসর রাজত্ব করলো, তখন আর প্রাচীন মিশরকে চেনা দায়। তারপর খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে আরব মুসলমানরা আসবার পর প্রাচীন মিশর একেবারেই লোপ পেলো। অর্থাৎ আরব ইসলাম বিজয়ের সময় থেকে মিশরীয়দের প্রাচীন ভাষা, ধর্ম—এককথায় তাদের সংস্কৃতির মূল গেল ছিন্ন হয়ে। লোকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো; আরবী ভাষা সাহিত্য আয়ত্ব করে পুরোদস্তুর আরবী মুসলমান বনে গেল; আজ মিশরীয়রা আরব লীগএর নেতা।

প্রাচীন মিশরের রাজা বা ফারায়ো রাজ্যের অধীশ্বর শুধু নন, সমাজেরও মাথা। দেবতার ন্যায় পূজা তিনি পান। তাঁর উদ্দেশ্যে পরযুগে মন্দিরও নির্মিত হয়। ফারায়োদের অনেক কাজ, যুদ্ধের সময়

তিনি সৈন্যদের চালক, শান্তির সময়ে রাজদরবারের শোভা। সকলের অভিযোগ শোনেন। মন্দিরে গিয়ে তিনি পূজা দেন। ক্রমে কালবদলের হাওয়ায় সমস্তই উলটে-পালটে যায়। রাজায়-প্রজায় মিল থাকলেই রাজ্য অটুট থাকে, সে-কথা ভুলে গেলেন তাঁরা। দুর্বল ও দরিদ্র প্রজা রাজা ও রাজ্যকে রসাতলে টেনে নিয়ে যায়। যারা হতে পারতো রাজ্যের বল, তারা হয়ে ওঠে রাজ্যের ভার।

রাজার নিচেই প্রদেশপাল। চল্লিশটি প্রদেশে সাম্রাজ্য বিভক্ত। প্রদেশপালদের প্রধান কাজ কর আদায়—কৃষকরা শস্য দিয়ে রাজকর দেয়, যেমন প্রাচীন ভারতে উৎপন্ন ফসলের ছয় ভাগের একভাগ ছিল রাজপ্রাপ্য। শাসন ও শৃঙ্খলার ভার এই রাজ্যপালদের উপর ন্যস্ত। স্থানীয় দেবদেবীর নিয়মিত পূজা পার্বনের ব্যবস্থা করা, প্রজাদের বিবাদ নিষ্পত্তি করার ভারও তাঁরই উপরে। বলা বাহুল্য তখনো আইন-কানুন জটিল হয়নি, মিথ্যার আশ্রয় ও প্রশ্রয় সর্বব্যাপী হয়নি, লোকে ধর্মভয়ে ধর্মপথে চলতো। বিচার অনেক সময়েই সরাসরি চলে। মানুষ-খুন ও দেবতার সম্পত্তি অপহরণ—এই দুটি মহাপাপ ; শাস্তি—অপরাধীর প্রাণদণ্ড। বিচার হয় ধর্মের দিকে তাকিয়ে, লোকাচার মেনে। আইন পুস্তক ছিল কিনা জানা যায় না।

মিশরে নারীর অবস্থা ভালই ছিল বলতে হবে। সম্পত্তির অধিকারিণী হতো তারা, নিজের নামে ব্যবসা বাণিজ্য চালাতে বাধা ছিল না।

মিশরীয় সমাজে আমাদের দেশের মতই কর্মভেদে শ্রেণীবিভাগ ছিল, কিন্তু জাতিভেদ ছিল না। সমাজের মাথার উপর ছিলেন পুরোহিতরা—অনেকটা ব্রাহ্মণদের মতো তাঁদের স্থান ও মান। তারপরেই যোদ্ধসমাজ ক্ষত্রিয়দের মতো। তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত কৃষক—যারা সমাজের সত্যকার মেরুদণ্ড। শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের স্থান ছিল কৃষিজীবীর নিচে; তার নিচে ধীবর, গোপালক দাস প্রভৃতি।

পুরোহিতদের অসীম ক্ষমতা; দেব সেবা, পবিত্র প্রাণীদের তত্বাবধান প্রভৃতি ধর্ম কর্ম ছাড়া সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, চিকিৎসাদির চর্চা তাদের একচেটিয়া। তারা সমাজে ভূদেব,—রাজকর থেকে মুক্ত, দেবত্র নিষ্কর সম্পত্তির উপসত্ব ভোগী। রাজা ও প্রজার স্বেচ্ছাচার ও অনাচার পরলোকের ভয় দেখিয়ে তাঁরা ইশাসন করেন—ভারতে ব্রাহ্মণেরা যা করতেন।

ব্যবসায় বাণিজ্যে মিশরীয়রা অতি প্রাচীন কাল থেকেই খ্যাত; তাদের জাহাজ ক্রীট, কাইপ্রাস দ্বীপে যাওয়া-আসা করতো। লোহিত সাগর ও আফ্রিকার পূর্ব উপকূলেও বাণিজ্য পোতগুলির যাতায়াত ছিল। এই পথ দিয়ে ভারতের সামগ্রী মিশরে পৌছাতো; ভারতের সেগুন কাঠ, সেখানকার সূতীর কাপড় প্রভৃতির চিহ্ন পাওয়া গেছে কবরের মধ্যে।

ডাঙ্গাপথে বাণিজ্য চলতো নিউবিয়া, সুদানের সঙ্গে; সে অঞ্চল থেকে আসতো হাতীর দাঁত, ও নানা বনজ পদার্থ।

বিচ্ছিন্ন জ্ঞান সুসংবদ্ধ হলে হয় বিজ্ঞান। সমাজে এক শ্রেণীর লোক যাদের খাওয়া পরার ভাবনা ভাবতে হয় না, শারীরিক শ্রম করতে করতে যাদের সমস্ত শক্তি ও সময় নিশোষিত হয়ে যায় না; সমাজের ব্রাহ্মণের মতো তত্ত্বকথা ভাববার অবসর তাদের আছে—জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা তারাই করতে পারে। সেই অবকাশের অধিকারী ব'লে মিশরের পুরোহিত সম্প্রদায় বহু তত্ত্বের আবিষ্কারক হ'তে পেরেছিল। গণিতের একখানি পুঁথিতে ভগ্নাংশ প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। জ্যোতিষ সম্বন্ধে কিছু কিছু তত্ত্ব তারা জেনেছিল; বৎসরকে চন্দ্রমাসে ভাগ করার রীতি ত্যাগ করে ক্রমে তারা সৌর গণনা প্রবর্তন করে। বারো মাসে ত্রিশ দিন করে, বর্ষ-শেষে পাঁচটা দিন যোগ করে ৩৬৫ দিনে বর্ষ গণনা করতো।

মিশরীয়দের সর্বাপেক্ষা বড় দান চিকিৎসা শাস্ত্রে। শবদেহকে 'মমি' করতে হয়; পচনক্রিয়া থেকে রক্ষা করবার জন্য তাদের এ বিষয়েঅনেক গবেষণা করতে হয়েছিল। নানা ঔষধ পথ্যের অনেক পরীক্ষা তারা করে। এখনো এলোপেথিক ডাক্তাররা তাঁদের প্রেসকিপশনে গ্রেন, ড্রাম প্রভৃতি লিখিতে যে সব চিহ্ন ব্যবহার করেন,, তা মিশরীয়দের প্রতীক।

মিশরীয়দের ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত তাদের কবরগৃহ পিরামিড ও মমি। প্রাচীন মিশরীয়দের কাছে প্রাণ বিশ্বাত্মায় ব্যাপ্ত, সর্বজীব প্রাণময়, এবং সেই প্রাণ জন্ম মৃত্যু অতিক্রম করে অনন্তকালে

তিনি সৈন্যদের চালক, শান্তির সময়ে রাজদরবারের শোভা। সকলের অভিযোগ শোনেন। মন্দিরে গিয়ে তিনি পূজা দেন। ক্রমে কালবদলের হাওয়ায় সমস্তই উলটে-পালটে যায়। রাজায়-প্রজায় মিল থাকলেই রাজ্য অটুট থাকে, সে-কথা ভুলে গেলেন তাঁরা। দুর্বল ও দরিদ্র প্রজা রাজা ও রাজ্যকে রসাতলে টেনে নিয়ে যায়। যারা হতে পারতো রাজ্যের বল, তারা হয়ে ওঠে রাজ্যের ভার।

রাজার নিচেই প্রদেশপাল। চল্লিশটি প্রদেশে সাম্রাজ্য বিভক্ত। প্রদেশপালদের প্রধান কাজ কর আদায়—কৃষকরা শস্য দিয়ে রাজকর দেয়, যেমন প্রাচীন ভারতে উৎপন্ন ফসলের ছয় ভাগের একভাগ ছিল রাজপ্রাপ্য। শাসন ও শৃঙ্খলার ভার এই রাজ্যপালদের উপর ন্যস্ত। স্থানীয় দেবদেবীর নিয়মিত পূজা পার্বনের ব্যবস্থা করা, প্রজাদের বিবাদ নিস্পত্তি করার ভারও তাঁরই উপরে। বলা বাহুল্য তখনো আইন-কানুন জটিল হয়নি, মিথ্যার আশ্রয় ও প্রশ্রয় সর্বব্যাপী হয়নি, লোকে ধর্মভয়ে ধর্মপথে চলতো। বিচার অনেক সময়েই সরাসরি চলে। মানুষ-খুন ও দেবতার সম্পত্তি অপহরণ—এই দুটি মহাপাপ ; শাস্তি—অপরাধীর প্রাণদণ্ড। বিচার হয় ধর্মের দিকে তাকিয়ে, লোকাচার মেনে। আইন পুস্তক ছিল কিনা জানা যায় না।

মিশরে নারীর অবস্থা ভালই ছিল বলতে হবে। সম্পত্তির অধিকারিণী হতো তারা, নিজের নামে ব্যবসা বাণিজ্য চালাতে বাধা ছিল না।

মিশরীয় সমাজে আমাদের দেশের মতই কর্মভেদে শ্রেণীবিভাগ ছিল, কিন্তু জাতিভেদ ছিল না। সমাজের মাথার উপর ছিলেন পুরোহিতরা—অনেকটা ব্রাহ্মণদের মতো তাঁদের স্থান ও মান। তারপরেই যোদ্ধসমাজ ক্ষত্রিয়দের মতো। তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত কৃষক—যারা সমাজের সত্যকার মেরুদণ্ড। শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের স্থান ছিল কৃষিজীবীর নিচে ; তার নিচে ধীবর, গোপালক দাস প্রভৃতি।

পুরোহিতদের অসীম ক্ষমতা ; দেব সেবা, পবিত্র প্রাণীদের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি ধর্ম কর্ম ছাড়া সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, চিকিৎসাদির চর্চা তাদের একচেটিয়া। তারা সমাজে ভূদেব,—রাজকর থেকে মুক্ত, দেবত্র নিষ্কর সম্পত্তির উপসত্ব ভোগী। রাজা ও প্রজার স্বেচ্ছাচার ও অনাচার পরলোকের ভয় দেখিয়ে তাঁরা ইশাসন করেন—ভারতে ব্রাহ্মণেরা যা করতেন।

ব্যবসায় বাণিজ্যে মিশরীয়রা অতি প্রাচীন কাল থেকেই খ্যাত; তাদের জাহাজ ক্রীট, কাইপ্রাস দ্বীপে যাওয়া-আসা করতো। লোহিত সাগর ও আফ্রিকার পূর্ব উপকূলেও বাণিজ্য পোতগুলির যাতায়াত ছিল। এই পথ দিয়ে ভারতের সামগ্রী মিশরে পৌছাতো; ভারতের সেগুন কাঠ, সেখানকার সূতীর কাপড় প্রভৃতির চিহ্ন পাওয়া গেছে কবরের মধ্যে।

ডাঙাপথে বাণিজ্য চলতো নিউবিয়া, সুদানের সঙ্গে; সে অঞ্চল থেকে আসতো হাতীর দাঁত, ও নানা বনজ পদার্থ।

বিচ্ছিন্ন জ্ঞান সুসংবদ্ধ হলে হয় বিজ্ঞান। সমাজে এক শ্রেণীর লোক যাদের খাওয়া পরার ভাবনা ভাবতে হয় না, শারীরিক শ্রম করতে করতে যাদের সমস্ত শক্তি ও সময় নিশোষিত হয়ে যায় না; সমাজের ব্রাহ্মণের মতো তত্ত্বকথা ভাববার অবসর তাদের আছে—জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা তারাই করতে পারে। সেই অবকাশের অধিকারী ব'লে মিশরের পুরোহিত সম্প্রদায় বহু তত্ত্বের আবিষ্কারক হ'তে পেরেছিল। গণিতের একখানি পুঁথিতে ভগ্নাংশ প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। জ্যোতিষ সম্বন্ধে কিছু কিছু তত্ত্ব তারা জেনেছিল; বৎসরকে চন্দ্রমাসে ভাগ করার রীতি ত্যাগ করে ক্রমে তারা সৌর গণনা প্রবর্তন করে। বারো মাসে ত্রিশ দিন করে, বর্ষ.শষে পাঁচটা দিন যোগ করে ৩৬৫ দিনে বর্ষ গণনা করতো।

মিশরীয়দের সর্বাপেক্ষা বড় দান চিকিৎসা শাস্ত্রে। শবদেহকে 'মমি' করতে হয়; পচনক্রিয়া থেকে রক্ষা করবার জন্য তাদের এ বিষয়েঅনেক গবেষণা করতে হয়েছিল। নানা ঔষধ পথ্যের অনেক পরীক্ষা তারা করে। এখনো এলোপেথিক ডাক্তাররা তাঁদের প্রেসকিপশনে গ্রেন, ড্রাম প্রভৃতি লিখিতে যে সব চিহ্ন ব্যবহার করেন,, তা মিশরীয়দের প্রতীক।

মিশরীয়দের ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত তাদের কবরগৃহ পিরামিড ও মমি। প্রাচীন মিশরীয়দের কাছে প্রাণ বিশ্বাত্মায় ব্যাপ্ত, সর্বজীব প্রাণময়, এবং সেই প্রাণ জন্ম মৃত্যু অতিক্রম করে অনন্তকালে

অবস্থিত ও অনন্তজীবনে প্রবাহিত। সেইজন্য জন্মমৃত্যু সবই তাদের কাছে পবিত্র। মিশরীয়দের আজন্ম মৃত্যুচিন্তা। মৃত্যুর পর কিভাবে তার কফিন হবে কোথায় তার কবর হবে, এই সব বিষয় নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভেবে রাখতো জীবনকালেই। মৃত্যুর পর আত্মাকে কিয়ামৎ দিনে বা শেষ বিচারের দিন দেবতাদের এজলাসে হাজির হতে হবে। সেখানে আত্মাকে বলতে হয় কিভাবে সে মর্ত্যজীবন কাটিয়েছে। এজলাসে তাকে বলতে হয় "আমি কখনো চুরি করিনি, আমি খুন করিনি, আমি মিথ্যা কথা বলিনি, আমি কোন পবিত্র প্রাণী হত্যা করিনি, আমি কোনো শস্য নষ্ট করিনি, আমি পিতাকে অপমান করিনি, আমি দাসদাসীর প্রতি দুর্ব্যবহার করিনি, আমি কাউকে দুঃখ দিয়ে কাঁদাইনি"......ইত্যাদি বেয়াল্লিশ দফা অপরাধ না করার কথা জানাতে হয়। আর বলতে হয় সে কি কি করেছে, যেমন "আমি ক্ষুধার্তকে অন্ন দিয়েছি, তৃষ্ণার্তকে জল দিয়েছি, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিয়েছি"। এসব বলার পর দেবতারা আত্মার পাপ পুণ্যের ওজন করতেন।

এইসব কথাগুলি চিত্রাক্ষর বা হাইরোগ্লিফিকে লিখিত আছে 'মৃতের পুস্তকে'; পিরামিডের মধ্যে মামির কফিনে এই পুঁথি রেখে দিতো।

মিশরের ধর্ম বহু দেববাদ হলেও আসলে লোকে পূজা দিত জল ও আলোক—নীলনদ ও সূর্যকে। নদীর জল ও আকাশের আলো তাদের জীবনের সকল সম্পদের উৎস—কৃষিজীবনের মূল কথা।

কাল্পনিক দেবদেবী ছাড়া বহু জীবজন্তুকে তারা দেবজ্ঞানে পূজা করতো। সেসব প্রাণী বধ করা পাপ। এই সকল প্রাণীর মধ্যে বৃষ ছিল প্রাধান, সিন্ধু সভ্যতার যেসব শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে, তাতেও দেখা যায় বৃষের ছাপ সবগুলিতেই আছে। মিশরে বৃষ ছাড়া বিড়াল বাজপাখী প্রভৃতি অনেক প্রাণীই দেবতা বোধে পূজা পেতো।

মানুষ মাত্রেরই বিশ্বাস যে সে মরেও বেঁচে থাকবে। পরলোকে অথবা পৃথিবীর প্রলয় দিনে সমস্ত আত্মার তলব হবে ঈশ্বরের দরবারে। যে পুণ্যাত্মা সে চিরস্বর্গ ভোগ করবে, আর যে পাপাত্মা সে চিরনরকের দুর্ভোগ ভুগবে। পরলোকের ভয় দেখিয়ে দুর্বৃত্ত মানুষকে সায়েস্তা রাখার পদ্ধতি সব ধর্মেই আছে। মিশরীয়দের বিশ্বাস কিয়ামৎ দিনে যখন ডাক আসবে, তখন তো সশরীরে হাজির হতে হবে। তাই

তারা অতি যত্নে মৃতদেহকে ঔষধপত্র দিয়ে তাজা রাখতে চেষ্টা করতো। শবের পেটের নাড়িভুঁড়ি বের করে, মাথার ঘিলু যন্ত্র সাহায্যে ফেলে দিয়ে দেহকে নানা ঔষধপত্রে জর্জরিত করে অবশেষে দীর্ঘ বস্ত্র দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে কফিনে ভরা হোতো। পাহাড়ের গায়ে গর্ত করে কফিন গুলি রাখে। এক যুগের রাজারা রেখেছিলেন পিরামিডের মধ্যে গর্ভ-গৃহে। কবরের সঙ্গে যে-সব জিনিষপত্র দেওয়া হোতো, কালে চোরে সেসবের সন্ধান পেয়ে ভাঙাভাঙি করে ; বাজারে বিক্রী করে সেইসব কফিনের সামগ্রী। য়ুরোপীয় পণ্ডিতরা জানতে পারলেন এসব কথা তখন থেকে চললো সন্ধান 'মমির'। এখন অনেক যাদুঘরে 'মমি' দেখা যায়, আমাদের কলকাতার যাদুঘরেও একটা আছে।

রাজা ও রাজমহিষী, ধনী বা ধনীর পত্নীদের কবরের উপর সবদেশেই বিরাট স্থাপত্য গড়ে উঠেছে, ভারতের সবথেকে বিখ্যাত স্মৃতিসৌধ হচ্ছে তাজমহল ও ইতমদ্দৌলা একটি রাজমহিষীর আর একটি রাজশ্বশুরের। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে পর্যটক আসে এই সব দেখতে। মিশরীয় পিরামিডগুলির নিচে ছিল কবর ও কফিন। কাইরোর কাছে নীলনদের অদূরে প্রায় ৮০টি পিরামিড এখনো দেখা যায় তার মধ্যে তিনটাই চোখে পড়বার মতো—তাদের বিশাল আকারের জন্য। সর্বোচ্চ পিরামিডটি ফারায়ো খুখু মরবার আগে তৈরী করিয়েছিলেন খৃষ্ট পূর্ব আড়াই হাজার বছর পূর্বে। এই পিরামিডে প্রায় কুড়ি লক্ষ পাথর লেগেছিল—প্রত্যেক পাথরের ওজন গড়ে ৫০ মণ। এই বিশাল কবর গৃহের তলদেশের আয়তন ৭৭৫ বর্গফুট ; খাড়াই ৪৫০ ফুট—কুতুব মিনারের দ্বিগুণ। এই স্তূপের নিচে গর্ভগৃহে প্রবেশের সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ আছে—তার শেষ প্রান্তে রাজার মমি। সেখানে নানা প্রকার তৈজসপত্র দেওয়া থাকতো।

পিরামিড নির্মাণের রীতি চিরকাল চলে নি এবং সব ফারোয়ার পক্ষে তৈরী করাও সম্ভব হয়নি, কারণ এত ধন নষ্ট করা এবং হাজার হাজার লোককে খাওয়া-পরা দেওয়ার মত ঐশ্বর্য সকলের ভাণ্ডারে ছিল না। চতুর্থ রাজবংশের রাজাদের পিরামিডগুলিই খুব জাঁকজমকে নির্মিত হয় তার পর সে উৎসাহ কমে আসে, অথবা ঐ পদ্ধতি সমাজে বাতিল হয়ে যায়।

প্রাচীন মিশরের মহাদেবের নাম আমোন-রা আদিযুগে আমোন ছিলেন ছিলেন থীব্‌সের গ্রাম্য-দেবতা যেমন যাহোরা (Jehovah) ছিলেন ইহুদীদের, ব্রহ্মা ছিলেন ব্রাহ্মণদের আগুন-দেবতা। থীবসের অভ্যুদয় ও মিশরীয় সাম্রাজ্যের রাজধানীর পদগৌরব লাভের পর হতে আমোনের খাতির যায় বেড়ে। পুরোহিতরা আদিদেব 'রা' এর গুণাবলী আমোনের উপর আরোপ করে নূতন দেবতার নাম দিলেন আমোন 'রা'। রাষ্ট্র ব্যাপারে মিশরের যে আধিপত্য সমস্ত লোকের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, দৈবরাজ্যে আমোন-রা সেই স্থান দখল করলেন, —হলেন দেবাদিদেব। এই দেবতার কী আড়ম্বরপূর্ণ পূজাই হতো।

এই পূজার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন ফারোয়া আমোনহোতেপ; কার্ণাকের মন্দিরে আমোনের পূজা হয়, নতুন ফারায়ো বন্ধ করে দিলেন পূজা অর্চনা। মুছো দিলেন প্রাচীর গাত্র থেকে আমোনের ছবি ও নাম। নতুন দেবতা 'আতোন' বা সূর্য হলেন উপাস্য, রাজা নিজের নাম বদলে করলেন ইখনাতোন বা 'রবিতোষ'—যেমন অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে নাম নিয়েছিলেন 'প্রিয়দর্শী'। ইখনাতোনের সূর্য প্রার্থনা পড়লে মনে হয় যেন উপনিষদের কোনো জায়গা পড়ছি বাইবেলের সাম—(paslm) গাথার (১০৪ নং) সঙ্গে আশ্চর্য মিল পাই। ইখনাতোনের ঈশ্বর সর্ব-জীবের ঈশ্বর, সর্বমানবের কল্যাণকর দেবতা। সে যুগে প্রত্যেক জাতি মনে করতো যে তাঁদের দেবতা কেবলমাত্র তাঁদেরই দয়া করেন; তাই শত্রু বিনাশের জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করা হতো। সে ধরণের প্রার্থনা আজও ওঠে মন্দিরে, মসজিদে বিহারে চার্চে, সাইনাগগে মানব-হত্যায় দেবতাকে নিজের সহায় ভাবে মানুষ! ইখনাতোনের মতে ঈশ্বর পিতার ন্যায়, তিনি করুণাময়। ঈশ্বর করুণাময় একথা ইতিপূর্বে কোথাও শোনা যায়নি।

কিন্তু ইখনাতোনের বিশুদ্ধ ধর্মমত প্রসার লাভ করলো না; কারণ আমোন-রার পুরোহিতরা ছিল ধর্ম বিষয়ে সর্বময় কর্তা; তাদের আধিপত্য, জমিদারী তারা ত্যাগ করতে পারে না। বোধহয় তাদের প্ররোচনায় রাজ্যে বিপ্লব দেখা দিল; সে বিপ্লবের ঝড়ে ইখনাতোনের ধর্মান্দোলন নিশ্চিহ্ন হলো, তাঁর আধিপত্যও দূর হলো। ইখনাতোনের ব্যর্থতার সঙ্গে তুলনা হয় প্রিয়দর্শী অশোকের সদ্‌ধর্মএর দশা অশোকের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণরা নিশ্চিহ্ন করে দেয় বুদ্ধের ধর্মপাটলিপুত্র থেকে—অশোকের প্রাসাদেই অশ্বমেধ যজ্ঞ হলো।

ইখনাতোনের জামাতা তুতেনখামোন ফারোয়া হয়ে থীবসে ফিরে এলেন ও প্রাচীন সবকিছু পুনপ্রবিষ্ট করলেন; শ্বশুর নাম দিয়েছিলে তুতেনখাতোন সে নাম বদলে হলেন তুতেনখামোন অর্থাৎ আমোন দেবতা:কে স্বীকার করে নিলেন।

মিশরের কথা পৃথিবীর ইতিহাসে অমর স্থান অধিকার করেছে সেখানকার চিত্রলিপির জন্য কারণ সেই চিত্রলিপি হচ্ছে পাশ্চাত্য জগতের লিপির আদি জনক! সভ্যতার আদিযুগে মানুষ শিশুদের মতো ছবি এঁকে বস্তুকে প্রকাশ করতো, কিন্তু বিচ্ছিন্ন বস্তু দিয়ে তো সব কথা বলা যায় না। তাই বস্তুর প্রতিকৃতির সঙ্গে নানা প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহার করে সে ভাবনাকে রূপ দেয়! কত শতাব্দী লেগেছিল এই ভাবকে রেখায় লিপিতে রূপ দিতে! মিশরীয় লিপিকে হায়রেগ্লিফিক বলে, এর অর্থ পবিত্র লেপি—মিশরীয় ভাষায় এর অর্থ দেবভাষা।

মিশরীয়রা যে কেবল লেখার উদ্ভাবক, তা নয়, আমরা যে কাগজ বা 'পেপার' ব্যবহার করি, তা তাদের দেশের শব্দ। পাপাইরাস নামে শর জাতীয় গাছের ছাল থেকে লেখবার উপযুক্ত কাগজ তৈরী হলো বলে' 'পেপার' শব্দ এখনো সকল প্রকার কাগজকে বোঝায়। আমাদের দেশেও পত্র বা পাতায় লেখা হতো বলে এখনও আমরা কাগজ'পত্র' বলি, বই এর 'পাতা' বলি।

পাথরের উপর ছবি খোদাই করে 'লেখা' খুব কঠিন নয়; কিন্তু কাগজ বা পাপাইরাসের উপর ছবি এঁকে দ্রুত লিখতে গেলেই মূল চিত্রের একটু অদল-বদল হবেই আমাদের ছাপার হরপ ও হাতের লেখায় মধ্যে কত তফাৎ! সেইজন্য মিশরের কাজকর্ম চালাবার জন্য দুই ধরণের দ্রুত লিখন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছিল—হায়রোগ্লিফিক থেকে হায়রেটিক এবং তার থেকে ডেমোটিক। হায়রেটিক লিপিতে লেখা পুঁথি মিশরে পাওয়া গেছে ডেমোটিক লিপি থেকে আধুনিক কপটিক লিপি এসেছে,—মিশরের খৃষ্টান কপটরা এখনো সেই লিপিই ব্যবহার করে।

খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী থেকে প্রাচীন চিত্রলিপি একেবারে লোপ পেয়ে গেল ভারতেও যেমন প্রাচীন খরোষ্টি ও ব্রাহ্মী লিপি লোপ পায়।

গত দেড়শত বৎসরে য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের চেষ্টায় প্রাচীন লিপির

পাঠোদ্ধার হয়েছে, অসংখ্য পাপইরাস জড়ানো পুঁথি পাওয়া গিয়েছে; সেসব য়ুরোপীয় ভাষায় তর্জমা হওয়ায় সকলেই ইচ্ছা করলেই পড়তে পারেন। এইসব পুঁথি ও প্রাচীর গাত্রের লেখমালা ও চিত্র থেকে প্রাচীন মিশরীয়দের কথা ও কাহিনী, মন্ত্র ও তন্ত্র—এক কথায় তাদের জীবন যাত্রার নিখুঁত ছবিটুকু পাই।

পশ্চিম এশিয়া

বাংলায় প্রবাদ আছে একা নদী ।বিশ ক্রোশ। সুয়েজ খাল কাটাইবার পূর্বে এশিয়া ও আফ্রিকার মধ্যে যে সহজ যোগ ছিল তার অনেকখানি কমে যায় খাল কাটা হলে। এখন ভূগোলের বই পড়ে শিশুকাল থেকে সকলেই শিখেছে যে এশিয়া ও আফ্রিকা হচ্ছে দুটি পৃথক মহাদেশ। কিন্তু প্রাচীনকালে দুই মহাদেশের মধ্যে ব্যবধান ছিল না; সিনাই উপদ্বীপ দিয়ে যাওয়া-আসা চলতো সহজ ভাবেই। সেই পুরানো সুবাদে সুয়েজ খালের পূর্বদিকের মিশরের রাজ্য বিস্তৃত-ইসরেইল-এর গাজা (Gaza) পর্যন্ত।

মধ্যধরণী সাগরের আশে-পাশে তিনটা মহাদেশ। পূর্বসাগরে ছোটো বড় অসংখ্য দ্বীপ। ইতিহাসের পাতায় মানুষের কথা স্থান পাবার বহু শত বৎসর পূর্ব থেকে দ্বীপে-দ্বীপে লোকেদের যাওয়া-আসা চলে। সমুদ্রচর লোকেরা ডিঙ্গি নৌকো নিয়ে বন্দর থেকে বন্দরে যায় সে-সব খবর ইতিহাসে রাখেনা। যাইহোক অতি প্রচীনকালেই এই ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে বা ঈজান ও লেভাণ্ট সাগরাংশে একটা সাংস্কৃতিক ও আর্থিক পরিবেশ গড়ে ওঠে তার নাম দেওয়া হয়েছে 'ঈজান' সভ্যতা। এই পরিবৃত্তির মধ্যে পড়েছে এশিয়া মাইনরের উপকূলাংশে ফিনিশিয়া ও ফিলিস্তান, কাইপ্রাস ও রোডস দ্বীপ, ক্রীট ও মিশর, গ্রীস ও তার চারিদিকের অসংখ্য দ্বীপ। এই পরিবৃত্তির বাইরে য়ুফ্রাতিস। তাইগ্রিস নদীদ্বয়ের অববাহিকায় বিচিত্র ও জটিল সভ্যতা গড়ে উঠেছে বহুযুগ ধরে একের পরে একে। পশ্চিম দিকে ঈজান পরিমণ্ডলের দেশগুলি ও মিশরের সঙ্গে কখনো এদের প্রত্যক্ষ কখনো পরোক্ষ, কখনো দৃঢ়, কখনো শিথিল সম্বন্ধ দেখা গিয়েছে। বণিকের দল গাধার পিঠে, উটের পিঠে ঘোড়ার পিঠে মাল চাপিয়ে দল বেঁধে বহুকাল যাওয়া-আসা করে আসছে।

য়ুফ্রাতিস-তাইগ্রিস নদীদ্বয় ধৌত দোয়াব বা মেসোপটেমিয়া বর্তমানে ইরাক নামে পরিচিত আরবীভাষীদের ইসলামীরাজ্য, এখন নয়া রিপাবলিক।

নদী দুইটির একটি উঠেছে আনাতোলিয়া ও অপরটি আর্মেনিয়ার পাহাড়ী মালভূমি। এইনদীসেবিত দেশের পশ্চিমে মরুভূমি, পূর্বে ইরানের মালভূমি এই ইরাণ বা পারস্যের অবস্থিতির বৈশিষ্ট্য এখানে লক্ষ্যণীয় তার পশ্চিমে য়ুফ্রতিস, তাইগ্রিসের অববাহিকা আর তার পূর্ব দিকে সিন্ধু-সরস্বতী ধৌত ভারত বর্তমানে পাকিস্তান। এশিয়ার প্রাচীনতম লুপ্ত ইতিহাস ইরানের দুই প্রান্তে নদীর পলিমাটির নিচে লুপ্ত ছিল পূর্ব দিকে হরপ্পা বা সিন্ধু সভ্যতা এবং পশ্চিমের বা ইরাক-দোয়াবে-বাবিলন অসুরীয়ার সভ্যতা। কালে ছড়িয়ে পড়ে ইরানের আর্য সভ্যতার আলো পূর্বে পশ্চিমে, উত্তরে দক্ষিণে। আমরা মিশরের কথা বলবার পর ইরাক-দোয়াবের ইতিহাস আলোচনা করছি বলে এ কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই যে এ অঞ্চলের ইতিহাস মিশর থেকে কম পুরাতন।

য়ুফ্রতিস ও তাইগ্রিস নদীদ্বয় বহুদূর নাব্য। এখন মানচিত্রে দুইটি নদীকে একত্রে মিলে পারস্য উপসাগরে পড়ছে দেখা যায়। কিন্তু কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে দুইটি নদী পৃথক ধারায় সাগরে পড়তো। পলিমাটি জমতে জমতে বহুদূর ভরাট হয়ে গেছে। তারপর দুইধারা মিলে হলো শাৎ-অল-আরব।

এই অঞ্চলের ইতিহাসের সূত্রপাত হয় এই নদীর মূল সমুদ্রতীরের বসত থেকে। নদীমাতৃক শস্যশ্যামল দেশের উপর চিরকালই মরুচরদের শ্যেন-দৃষ্টি থাকে। যাযাবরের দল আসে মরু প্রান্তর থেকে। পাহাড়িয়ারা নেমে আসে সমতলের 'পরে ; সকলেই চায় আহারের ও বাসের যোগ্য স্থান। কিন্তু এখানে এবার যারা এলো তারা পাহাড়িয়াও নয়, মরুচরও নয়-তারা সাগর পারের কোন অজ্ঞাত বিদেশ-থেকে-আসা মানুষ।

মেসোপটোমিয়া বা দোয়াবের সবথেকে পুরাতন নাম দেওয়া হয়েছে সুমেরুয়। পণ্ডিতদের অনুমান প্রথম বাসিন্দাররা সমুদ্রপথে এসে নদীর মুখে উপনিবেশ পড়ে। ইবিদু, উর,* লরসা, লগশ, উম্‌মা, আদব, উরুক* সুরুপ্পক* প্রভৃতি রাষ্ট্র নগরীর চিহ্ন পাওয়া গেছে মাটির তলায়। আসলে এগুলি সাগরপারের কোনো বণিক জাতের লোকদের উপনিবেশ—পৃথক পৃথক দলে এসে পৃথক জায়গায় ব্যবসা বাণিজ্য ও চাষবাস সুরু করে বলে

*'উর' শব্দ তামিলে নগর

মনে হয়, যেমন বাংলাদেশে নদীর ধারে পর্তুগীজ, দিনেমার, ফরাসী ইংরেজরা এসে কুঠি গড়ে।

সুমেরুয়দের আদি সভ্যতার যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে তা বর্বরদের উপকরণ নয়; বেশ বুঝা যায় যে উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়েই এখানে তারা বাস করতে আসে। তাদের অসংখ্য কাদার পাটার উপর লেখা 'লেখ' আবিষ্কৃত হয়েছে; পণ্ডিতরা তার লিপি উদ্ধার ক'রে পাটাগুলি পড়েছেন, নানা য়ুরোপীয় ভাষায় তার মূল ও তর্জমা ছাপিয়ে বই বের হয়েছে। ইতিহাসের এত উপাদান প্রাচীন জগতে আর কোথাও পাওয়া যায় নি।

মিশরীয়রা যেমন চিত্রলেখার উদ্‌ভাবক সুমেরুয়রা তেমনই আরেকপ্রকার লিপির আবিষ্কারক। ইরাকের দোয়াব পলিমাটির দেশ, এখানে মিশরের প্যাপাইরাস শর পাওয়া যায় না, আর শিলাও কাছাকাছি কোথাও নেই তবুও প্রথম দিকে এরা দূর থেকে পাথর এনে তারই উপর খোদাই করেছিল রাজার হুকুমনামা প্রভৃতি। কিন্তু শিলা সংগ্রহ করা সহজ কাজ নয় ব'লে কোনো বিজ্ঞানীর পরামর্শক্রমে তারা কাদা-পাটার উপর খোদাই করে লিখতে সুরু করে। পাতলা টালির মত চৌকণা পাটায় নরুনের মতো লেখনী দিয়ে লিপি উৎকীর্ণ করলো। এ রকম করার কারণ কাদার উপর আঁচড় কাটা যায় না, নরুন টিপে টিপে 'লিখতে' হয় এই লিপিকে বলা হয়েছে কীলকাক্ষর বা কোণাক্ষর—লাতিনে বলে কিউনিফর্ম (Cuniform)। প্রথমে তারা লিখতো ডাইন দিক থেকে বাম দিকে; পরে ধীরে ধীরে বাম দিক থেকে আমরা যেমন লিখি সেইরকম পদ্ধতি প্রবর্তন করে। পুরাকালে গ্রীকরাও লেখা বিষয়ে দক্ষিণপন্থী ছিল।

সুমেরুয়দের এই কোণাক্ষর-লেখ কত হাজার যে পাওয়া গিয়েছে তা বলা কঠিন; এক লগাস (বা তেল্‌লো) নগরেই ত্রিশ হাজারের উপর (৩০,০০০) কাদাপাটা পেয়েছেন পণ্ডিতরা। এই লিপি-লেখ পদ্ধতি আক্কাদীরা সুমেরুয়দের কাছ থেকে শিক্ষা করে; অসুরীয়রা নিজ ভাষা এই লিপিতেই লিখতে শেখে বাবিলনীয়দের কাছ থেকে; আরও পরে পারসিকরা এই লিপির আদর্শে আপনাদের লিপিমালা তৈরী করে। এই সব কাদার পাটা পোড়ানো হতো ব'লে আজ পাঁচ-ছয় হাজার বৎসর পরেও সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অটুট অবস্থায় পাওয়া গেছে।

ঐতিহাসিকদের মহাসমস্যা এই সুমেরুয়রা এলো কোথা থেকে? ইতিহাসে আর্য ও সেমেটিক বলে যে মহাজাতিদ্বয়ের কল্পনা করা হয়, সুমেরুয়রা তার কোনো গোষ্ঠির মধ্যেই পড়ে না। এদের মধ্যে প্রবাদ যে 'ওএনেস' বা ইয়া নামে মৎস্য-নর সমুদ্রপথ দিয়ে এসে এই দোয়াবের মুখে জলাভূমিতে বাস করে। এই প্রবাদ ধরে অনুমান করতে পারা যায় যে, যে আদিম সুসভ্য জাতি ভারতে এককালে প্রাক্-আর্য যুগে বাস করতো, যাদের একটা শাখার বিপুল কীর্তিকলাপ সিন্ধু-সরস্বতী অববাহিকায় পাওয়া গেছে—সুমেরুয়গণ তাদেরই কোনো দূর আত্মীয় শাখা হতে পারে। মহেঞ্জোদাড়ো, হারাপ্পা এবং সুমেরুয়দের নাগর বা শহুরে সভ্যতা, সুদূর দক্ষিণের লঙ্কাও তাই। সাগরে-চলা ডিঙ্গী করে তারা এসেছিলো ব'লে, তাদের মৎস্য-নর বলে হয়তো অভিহিত করা হয়েছিল।

সুমেরুয় নগরগুলি নদী বা খালের ধারে অবস্থিত। নগরীর নিকট জলাভূমির জঙ্গল; সেখানে অযত্নে বা সামান্য যত্নে খেজুর ডুমুর আঙুর দালিমের গাছ জন্মে; চাষ হয় যব ও গমের। অসংখ্য খাল থাকায় চাষের সুবিধা যথেষ্ট। খাল কাটায় সুমেরুয়দের যে বুদ্ধি ও কৃতিত্ব দেখা যায় তা প্রাচীন জগতে সে যুগের আর কোথাও চোখে পড়ে না। রাজশাসনে ও জনতার সহযোগিতায় যতদিন জলসরবরাহের নহরগুলি চালু ছিল, ততদিন দেশে খাদ্যাভাব হয়নি। জলসরবরাহ সম্বন্ধে রাজাদের কঠোর নিয়ম নিষেধ ছিল। রাজপুরুষরা জলপথ সম্বন্ধে উদাসীন হলে রীতিমতো সাজা পেতেন। আবার বাদাড়-জমি চষে ফসল তুলতে পারলে চাষীর খাজনা মকুব হতো। নদীর জল খাল দিয়ে কে কতটা নেবে তা নিয়ে রাজায় রাজায় কলহ হতো। এখনো চাষের সময় ক্ষেতে ক্ষেতে জলকাটা ও জলনিকাশ নিয়ে গ্রামের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়। শুধু গ্রামে কেন? রাজ্যে রাজ্যে বিবাদ ঘটছে খালের জল নিয়ে এমনকি একই রাষ্ট্রের অন্তর্গত এক প্রদেশের লোকের সঙ্গে প্রতিবেশীর কলহ চলছে।

আদিযুগে দেবতারা হতেন নগরের মালিক। কিন্তু দেবতাকে তো দেখা যায় না, তাই যে পুরোহিত পাণ্ডারা দেবতার নামে মন্দিরে পূজাপার্বণ করতেন, তাঁরাই হতেন সর্বময় কর্তা। পুরোহিতরা দেবতার প্রতিনিধি, দেবত্র সম্পত্তির

মালিক ও অছি। লোকেদের দেবতার প্রতি ভক্তি থাক্ আর না থাক ভয় ছিল খুবই। তাই দেবতার সম্পত্তির হিসাবপত্র নিখুতভাবে রাখতে গিয়ে 'লিখন' পদ্ধতির উৎপত্তি হয়েছিল এ কথা কেউ কেউ মনে করেন।

নগর শাসন করতেন রাজা। তবে তাঁর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন মহাপুরোহিত বা 'পতেশি'। অনেক সময় দেব সম্পত্তি আত্মসাৎ করবার মতলবে রাজারা নিজ পুত্রকে 'পতেশি' মনোনীত করতেন, কখনো বা কোনো ছুতোয় নিজেই মহাপুরোহিতের পদ দখল করতেন; দেবতার নামে ফাঁকি দিয়ে খাওয়ার অভ্যাস মানুষের চিরকালের। বাংলা দেশে জমিদারী উচ্ছেদ আরম্ভ হ'ল আইন করে সরকার তো জমি নিলেন, কিন্তু দেখা গেল চারআনি অংশ কোন না কোন দেবতার নামে উৎসর্গকরাতাতে হাত দিতে গেলেই কথা উঠবে।

সুমেরুয়গণের লিপিমালা এক কালে ছিল প্রায় ২০০০; কিন্তু লিপির সংস্কার হয়। খৃষ্ট পূর্ব তিনহাজার বৎসর পূর্বে কোণাক্ষরের প্রতীক সংখ্যা কমে ৮০০ এবং আরওপাঁচশত বৎসর পরে ৬00-র কাছাকাছি দাঁড়ায়। শুধু যে সংখ্যা হ্রাস পায় তা নয়, হরফের জটিলতাও অনেক সরল হয়েছিল।

লেখবার মতো অস্ত্র হাতে এলে লোকে কি আর হিসাবের খাতা লিখে চুপ করে থাকতে পারে? কত কি লিখতে সুরু করে দিল তারা? পুরোহিতরা মন্ত্রধারণী লিখলেন, কবিরা পুরাণ কাহিনী রচলেন, রাজা-সম্রাটরা প্রজাদের জন্য হুকুম ও উপদেশ প্রচার করলেন। জনতার জীবন যাত্রা ধর্মকর্মের জটিল-জালে জড়ানো; সে সব তো মনে রাখা সম্ভব নয়; তাই সেগুলিও লেখা হলো।

ধর্মের ভয়, পরলোকের ভয় দেখিয়ে দুর্দান্ত মানুষকে ঠাণ্ডা রাখার ব্যবস্থা দেন পুরোহিতরা। সুমেরুয়দের দেবতার মূল স্বরূপ মৃত্তিকা ও জল। এন্‌লিন মাটির দেবতা, এনকি জলের দেবতা। কিন্তু আসলে প্রত্যেক রাষ্ট্র-নগরীর নিজ নিজ দেবতা আছে আমাদের দেশের গ্রাম-দেবতার মতো। তারপর শহরের লোকের ঐশ্বর্য যেমন যেমন বাড়তে থাকে, দেবস্থানগুলিও বিশাল হতে বিশালতর হতে থাকে,—দেবমন্দির বা জিগুরাত-এর শিখর দূর থেকে দেখা যায়। যুগে যুগে মন্দির, গির্জা ও মসজিদের চুড়া আকাশকে স্পর্শ করবার জন্য উঁচু থেকে আরও উঁচু হয়ে আসছে। সুমেরুয়দের মন্দির ছিল যেন এক একটা দুর্গ, শস্যের গোলা থেকে অস্ত্রাগার পর্যন্ত সমস্ত থাকতো। দেবতাদের জন্য মহামূল্য কতো অলঙ্কার জমানো হতো। দক্ষিণ ভারতের

মন্দিরগুলির সঙ্গে এদের তুলনা হতে পারে—সেগুলিও এক একটা দুর্গ নগরের মতো।

মিশরীয়দের ন্যায় সুমেরুয়দের মৃত্যু ভাবনা থেকে মৃত্যু ভয় ছিল বেশি; বিশেষ করে প্রেতাত্মার ভয়ে তারা সদাই আতঙ্কিত। সদ্‌গতি বা যথাযথভাবে মৃতের অঙ্গ-প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি না হলে আমাদের দেশে হিন্দুদের বিশ্বাস প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়ায় এবং সুবিধা পেলেই গৃহস্থের ক্ষতি করে—পারে তো ঘাড় মটকায়। সেইজন্য গয়ায় পিণ্ডি দানের ব্যবস্থা দিয়েছেন ব্রাহ্মণের দল। সুমেরুয়রা প্রেতের ভয়ে স্বজনদের ঘরের কানাচেই কবর দিত, প্রেতাত্মা যেন মনে না করতে পারে আত্মীয়স্বজনরা তাদের তাচ্ছিল্য করেছে। মৃতদেহের সঙ্গে নানা প্রকার সামগ্রী দেওয়ার রীতি প্রায় সকল ধর্মেই দেখা যায়; অনেকেরই বিশ্বাস স্বর্গে গিয়ে মৃতাত্মারা পৃথিবীর জিনিসপত্র কোথায় পাবে? তাই সঙ্গে দেওয়া যাক্।

উর (Ur) নামে নগরীতে এক বিশাল সমাধিক্ষেত্র মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে। কবরগৃহে একসঙ্গে বহু মৃতদেহ দেখা গেল! পণ্ডিতরা বলেন যে সুমেরুয় রাজা সম্ভ্রান্তদের মৃত্যুর পর তাঁদের সঙ্গে বাড়ির দাসদাসীদেরও বিবিধ সামগ্রীর সঙ্গে পরলোকে যেতে হতো, এবং সে উদ্দেশ্যে তাদের হত্যা করা হতো। উরের কবর ঘরে রাজা ও রানী পৃথক কামরায় শায়িত, তাঁদের চারিপার্শ্বে সোনা, রূপার তৈজসপত্র, সংগীতের বাদ্যযন্ত্র পর্যন্ত সাজানো। এমন নিষ্ঠুর রীতি পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না একমাত্র তুলনা হতে পারে ভারতে হিন্দুদের সতীদাহপ্রথা। মানসিংহ রণজিৎ সিংহের সঙ্গে কত নারীকে পুড়িয়ে মারা হয়! এতো ইতিহাসের ঘটনা।

ইরাকের দোয়াবে ইতিহাসের পাতা উলটে উলটে চলেছে। কালের ধর্মে সুমেরুয়রা দুর্বল হয়ে পড়ছে—বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রনগরীগুলি সংঘ শক্তি লাভ করতে বা পরস্পরের সঙ্গে শান্তিতে বাস করতে পারে নি। সমুদ্রের পরপারে তাদের অজ্ঞাত জন্মভূমি থেকে আর নতুন নতুন দল আসছে না। এখন দুর্ধর্ষ লোকরা আসছে উত্তর থেকে। নদীমাতৃক দোয়ারের শস্যশ্যামল সমতটের উপর পাহাড়ী ও মরুচর উপজাতিদের দৃষ্টি গিয়েছে। এই নতুন মানুষের দল আক্কাদ নামে এক জায়গায় উপনিবেশ ও পরে রাজ্য পত্তন করলো। এই আক্কাদীদের এক সর্দার সারগন বা শারুক্কিন (খৃঃ পূঃ ২৮০০)

প্রাচীন ইতিহাসের একটি কোণে বিশিষ্ট স্থান দখল করেছিলেন। বহু দেশ জয় করে শিলালেখে তাঁর বিজয় কাহিনী খোদাই করা হয়। সে নিষ্ঠুর কাহিনী খুব সুখপাঠ্য নয়। যাই হোক, নগরগুলি সবই তাঁর সাম্রাজ্য ভুক্ত হয় বলে তিনি শিলালেখে লেখেন যে তিনি সুমেরুয় ও আক্কাদীদের রাজা। এর ফলে বিজিত সুমেরুয়রা খুসিই হয়েছিল বলে মনে হয়।

এই আক্কাদীরা সেমেটিক জাতির একটা উপশাখা ; কিন্তু সুসভ্য সুমেরুয়দের মধ্যে এসে তারা বিজিতদের অনেক কিছুই আপন করে নিল ; তাদের ভাষা সাহিত্য, দেবদেবী, আচার-ব্যবহার এমনকি কুসংস্কারগুলিও। এই দুই সভ্যতার ও সংস্কৃতির মিলনে সৃষ্ট হলো নতুন সভ্যতা—যেমন হয়েছিল হিন্দু মুসলমানদের সংমিশ্রনে ভারতীয় মধ্যযুগীয় সভ্যতা। সুমেরুয়দের ভাস্কর্যের মধ্যে গতানুগতিকের যে দুর্বলতা এসে গিয়েছিল, নবীন জাতির ছোঁয়াচে সেখানে শিল্পে নতুন প্রাণ এলো।

সুমেরুয় ও আক্কাদের গৌরবময় ইতিহাসের উপর আরেকবার পরদা পড়লো। ছয় শ' বৎসর কেটে গেল অস্পষ্ট আলো-আঁধারে। তারপর য়ুফ্রাতিস নদী বেয়ে নামলো নতুন সেমাইট দল—সিরীয়ার প্রান্তরবাসী তারা। হয়তো এরা প্রথমে এসেছিলো মজুর খাটতে পেটের দায়ে। কালে য়ুফ্রাতিস তীরের বাবিলু নামে এক গ্রামে বাস করতে এসে দলে ভারি হয়ে ওঠে। চাষ-বাস করতে করতে কবে তারা শক্তি সঞ্চয় করে সেই অঞ্চলের মধ্যে মাতব্বর হয়ে পড়লো, তা স্পষ্ট নয়। খাদ্য উৎপন্ন করতে পারে যে, তারই হাতে তো উদ্বৃত্ত শক্তির চাবিকাঠি। কালে এই কর্ষণজীবীরা দোয়াবে হয়ে দাঁড়ালো মহারাজ্যের অধীশ্বর।

ব্যবিলনের শাসনকাজে হামুরাবি যখন পরিচালক হলেন তখন সেটা নগণ্য স্থান—গ্রাম্য গরীবী আবহাওয়া চারিদিকে। কিন্তু হামুরাবির শাসনকালে যুগান্তর হয়ে গেল বাবিলনের স্থাপত্যে, শিল্পে, শিক্ষা—ব্যবস্থায়। পরযুগে এই অঞ্চলের ইতিহাসকে বলা হয় বাবিলনের ইতিহাস,। যেমন বলা হয়ে থাকে রোমের ইতিহাস নগর থেকে সাম্রাজ্যের নাম, সভতার নাম।

সকল মানুষের সমাজ কল্যাণ ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যবোধ যখন জাগেনি, তখন জনতার মাঝ থেকে দুই একটি মানুষ ইতিহাসের পাতায় অমর স্থান করেনে ! বাবিলনের রাজা হামুরাবি তাদেরই একজন।

রাজ্য বিস্তার তো সব রাজাই করেন,—রাজধর্মের একটা বড় অঙ্গ পরস্বাপহরণ। কিন্তু সমাজ কল্যাণকর কাজের সঙ্গে হামুরাবির নাম আছে জড়িয়ে। তাঁর অমর খ্যাতি পৃথিবীর প্রথম লিখিত আইন প্রণেতা রূপে। সাধারণ লোকের পক্ষে লিখিত আইন কানুনের খুবই দরকার ; বিচারকদের যথেচ্ছাচার খানিকটা সংযত করা যায় কিতাব থাকলে। সেইজন্য দেখা যায় সকল সভ্যদেশে জনমত প্রবল হয়ে উঠলে শাসক-গোষ্ঠির চেতনা হয় আইনকে লিপিবদ্ধ করবার জন্য] আমাদের দেশে বোধ হয় 'মনুস্মৃতি'ও সেই কারণেই কোনো কমিটি বা পরিষদ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল এবং বোধ হয় মনু ছিলেন পরিষদের সভাপতি। অথবা সমস্ত লোকাচারগুলিকে তিনি সংহত করেন বলে তাকে বলা হয় মনু-সংহিতা। হামুরাবিও বাবিলনের প্রচলিত কানুন সংগ্রহ করে সেগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে শ্রেণীত করেন। প্রাচীন আকাদ সুমেরুয়দের বহু শতাব্দী সঞ্চিত কাদাপাটায় উৎকীর্ণ দলীল পত্র ও মামলা মোকদ্দমার নথিপত্র দেখে শুনে বিচার বিবেচনা করে, নিয়মগুলি তৈরী হয় ; আদর্শবাদের দোহাই দিয়ে কল্পনা প্রসূত কানুন বা তিল তিল ভালো কানুনের তাল পাকিয়ে তিলোত্তমা করা হয়নি। আইনগুলি ২৮৫টি সুত্রাকারে একটি অষ্টকোণ পাথরের উপর কীলাক্ষরে খোদিত। ১৯০২ সালে সুসা নগর খুঁড়বার সময় প্রত্নতত্ব বিভাগের হাতে এটা আসে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ তার পাঠোদ্ধার ও তর্জমা করেছেন। এই শিলালেখে বাবিলনীয়দের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রায় সকল সমস্যা সম্বন্ধেই আইন লিপিবদ্ধ দেখা দেখা যায় ব্যবসায়, শিল্প, মজুরী ও বেতন, বিবাহ, সম্পত্তিদান ও বিক্রয় ঋণদান, চৌর্য ইত্যাদি বিষয়ে।

এই অসাধারণ মানুষটির নজর ছিল সকল দিকেই, লোক শিক্ষার ব্যবস্থাও তিনি করেন বলে মনে হয়, কারণ মাটি খুড়তে খুড়তে একটা পাঠশালার ধ্বংসশেষ পাওয়া গিয়েছে। বাবিলনে লোকশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কারণ জ্ঞান বিজ্ঞান সম্বন্ধে পুঁথি পত্র অর্থাৎ কাদাপাটা সুমেরুয় প্রাচীন ভাষায় লেখা ; সে সব কথা জানতে হলে লেখাপড়া চর্চার খুবই দরকার।

সূর্য অস্ত গেলেই অন্ধকার। হামুরাবির মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরগণ ইতিহাসে অখ্যাত জোনাকির মতো পিট্ পিট্ করতে করতে নিবে গেল, যেমন প্রিয়দর্শী অশোকের পর মগধের দশা হয়েছিল। হামুরাবির তিরোধানের

অল্পকালের মধ্যে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র নগরগুলি স্ব স্ব প্রধান ও স্বাধীন হয়ে ওঠে। দেখতে দেখতে নূতন বর্বরের দল এসে কেউ বা দোয়াব দখল করে, কেউ বা বাবিলন লুঠতরাজ করে, যেমন ভারতে মুঘলদের পতনের সময় দিল্লী লুঠ করে সরে পড়লো, নাদির শাহ, আর রোহিলারা এসে ডেরা দাণ্ডা গাড়লো দিল্লীর উত্তরে।

বাবিলন যারা লুঠ করলো তারা এসেছিল আনতোলিয়া (এশিয়া মাইনর) বা বর্তমান তুর্কী থেকে। তারা ইতিহাসে হিটাইট নামে খ্যাত; এদের কথা পরে আস্‌বে। আর যারা দোয়াব দখল করে বসলো—তাদের নাম কাশসু (Kassite)। পণ্ডিতদের মতে এই কাশ্‌সুরা আর্য ভাষা ভাষী মহাজাতির একটি শাখা; কোথা থেকে ঘুরতে ঘুরতে ইরান মালভূমি অতিক্রম করে ইলাম দেশে এসে প্রথম উপনিবেশ করে তার সঠিক ইতিহাস কেউ জানে না। ইলাম দেশ হচ্ছে পারস্যের দক্ষিণ পশ্চিমে দোয়াবের কাছাকাছি। অশ্ব কাশ্‌সুদের বাহন, অশ্বআবাদ তাদের জীবিকা। অশ্ব বিক্রয় করতে আসে বাবিলানে। এতদিনে এ অঞ্চলে অশ্বের প্রচলন হয়নি, গদর্ভে গাড়ি টানে। ঠিক এই ধরণের ঘটনা ঘটে মিশরে হিক্সদের আগমনের পর মিশরে, ভারতে ঘটে আর্যদের আক্রমনের সময়ে।

কাশসুদের মধ্যে বোধহয় নানা শ্রেণীর বা স্তরের লোক ছিল। একদল উচ্চস্তরের অভিজাত—বাবিলনের সমভূমির ভূস্বামী হয়ে বসেন। ঐতিহাসিক-দের বড়ই দুঃখ সে কাশসুদের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে তারা যে দোয়াবে প্রায় ছয়শ' বৎসর প্রভুত্ব করে তার প্রমাণ টুক্‌রো টুক্‌রো ভাবে পাওয়া যায়। শিল্পকলায় এদের বিশেষ কৃতিত্ব ছিল বলে মনে তো হয় না, কারণ নিদর্শন কিছু পাওয়া যায়নি।

এরা সূর্য ও মরুতের পূজক। ঈশ্বরকে বলতো 'ভগ্‌', আমাদের ভগবান শব্দের সঙ্গে তুলনীয়; আবার 'বগ' শব্দ রুশ ভাষায় ঈশ্বর অর্থেই চলিত্‌। বাবিলনিয়ার উন্নততর সভ্যতা ও সংস্কৃতি এরা আয়ত্ত করে নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে মিশে যায় স্থানীয় লোকের সঙ্গে। কাশসুর রেখে গেল অশ্ব-বিদ্যা এই অঞ্চলে।

বাবিলনিয়ার, সমাজ জীবনে পুরোহিতদের প্রাধান্যর কথা আমরা পূর্বে বলেছি। তাদের ধর্ম ছিল বহুদেববাদ। লোকের বিশ্বাস ছিল যে এই

পৃথিবীটা একটা উপুড় করা পাত্রের মত, তার উপর মানুষ ও পশু পক্ষীদের বাস। আর পৃথিবীর ভিতর প্রকাণ্ড গর্ত, সেখানে ভূতের বাস। পৃথিবীর উপরে সাতটা গ্রহ ঘোরে, তারা মানুষের হিতাকাঙ্খী। আর তাদের পাশেই সাতটা দুষ্ট ভূত মানুষের অনিষ্ট করবার জন্য সুযোগ খুঁজে বেড়ায়। হিন্দুদের মতে বরুণ দেবতা সাগরের রাজা তেমনি বাবিলনীয়দের বিশ্বাস 'ইয়া' দেবতা সাগরের মাঝে মাছের দেশে বাস করেন; তিনি সমস্ত প্রাণীর রক্ষাকর্তা, জীবনদাতা। পৃথিবীর মধ্যে সাতটি দুষ্ট ভূতের বাস—স্বর্গে, মর্তে কোথাও তাদের সুনাম নেই। ঝড়, ভূমিকম্প, ঘূর্ণী হাওয়ার কারণ তারই—খুবই ঘৃণিত এরা। এদের সম্বন্ধে অসংখ্য মন্ত্র পাওয়া গেছে—তার থেকে একটার অনুবাদ উঠিয়ে দিলাম:

সংখ্যায় সাতটি তারা, পাতালেতে বাস
স্বর্গ মর্তবাসীদের সকলের ত্রাসে।
ভেদি উঠি পাতালের গুপ্ত স্থান তারা
জল সম ছড়াইয়া পড়ে আত্মহারা।
পুরুষ অথবা নারী কিছু তারা নয়,
তাহাদের বংশে কোন সন্তান না হয়।
সংসারের সমাজের নিয়ম না মানে,
পর উপকার বলে কিছুই না জানে।
দেবতা 'ইয়া'র শত্রু বসে পথ মাঝ,
ভয়শূন্য ঘরে আনে বিপদের বাজ।
অতি ভয়ঙ্কর তারা, অতি ভয়ঙ্কর।
অত্যাচারে ত্রস্ত সব পশুপক্ষী নর॥

অন্ধকার গর্তে পাতালের মধ্যে বাস করে—রোগ, শোক, মহামারী পাগলামির ভূতের দল। গাছে পালায়, লতায় পাতায়, বাতাসেঝড়ে, ধুলায়, বৃষ্টিতে ভূত! এতো যাদের ভূতের ভয়, ভূত ঝাড়ানোর বিশ্বাসও তাদের তেমনই। যাদুবিদ্যা, ইন্দ্রজাল, মাদুলি-তাগা-তাবিজ ধারণ প্রভৃতি নানা উপসর্গে তাদের দেহ ও মন ভারাক্রান্ত। কারো জ্বর হলে তারা ভাবে রোগীকে

ভূতে পেয়েছে। ভূত তাড়াবার জন্য পেঁয়াজ পোড়ায়, আর পুরোহিত ঠাকুর বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে—

ভূত যেন পোড়ে এই পেঁয়াজের মতো,
আগুন যেন খায় তাদের আজকারের মতো।

আমাদের দেশে অথর্ব বেদে এই ধরণের বহু শত মন্ত্র ও তুক্‌তাক্‌ আছে, এই দুই এর মধ্যে কোনো সম্বন্ধ আছে তা আমরা বলছিনে—তবে মিল দেখলে আশ্চর্য হতে হয়।

পূজা পার্বন মানার সঙ্গে জ্যোতিষের সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ট। কখন কোন অনুষ্ঠান করতে হবে তা স্থির করতে গিয়ে গ্রহ নক্ষত্র দেখতে হয়; এর থেকে জন্ম হলো পঞ্জিকার। লোকের ভয় পূজা অনুষ্ঠান ঠিক সময়ে বা লগ্নে অথবা শাস্ত্রে-যেমন-বলেছে-ঠিক তেমনিভাবে সব কিছু না করতে পারলে দেবতারা কী যে অনিষ্ট করে বসবেন তা তো কেউ জানে না! সুতরাং নক্ষত্রাদি দেখে সময় নিরুপণ করার বিদ্যা বাবিলনীয়রা খুব প্রাচীনকালেই আয়ত্ত করে নেয়। মানুষের অজানা ভবিষ্যতের উপর গ্রহ উপগ্রহ, ধূমকেতু, চন্দ্র সূর্য গ্রহণের প্রভাব কি, তা নিয়ে পুরোহিতরা গবেষণা করেন, আর লোকদের মনে ভয় জাগিয়ে রেখে রেখে পয়সা আদায় করেন। প্রাচীনকালের এই ভূতের ভয় এখনো। অনেক দেশেই দেখা যায়।*

এই সব আলোচনা থেকে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে বহু তথ্য জানতে পারে বাবিলনীয়রা। সাতদিনে 'সপ্তাহ' গুণবার রীতি, দিনকে বারো ঘণ্টায় বা দ্বাদশ যামে বিভক্ত করার পদ্ধতি এদের দানা মাসকে সপ্তাহে ভাগ করা হয়েছিল সাত গ্রহের নামে; নিনিব (শনি), মার্দুক (বৃহস্পতি), নের্গাল (মঙ্গল), শামাশ (রবি), ইশতার, (শুক্র), নাবু (বুধ) ও সিন (চন্দ্র)। প্রত্যেক গ্রহের গুণাগুণ সম্বন্ধে তাদের যে ধারণা ছিল, সেগুলিও আমরা পেয়েছি। শনি বা নিনিব আনে মড়ক মহামারি; বৃহস্পতি বা মার্দুক হচ্ছেন রাজা; বৃহস্পতির দশায় লোকের ভাল হয় বলে বিশ্বাস। মঙ্গল বা নের্গাল যুদ্ধের গ্রহ—রোমানদের মধ্যে মার্স (Mars) যুদ্ধের দেবতা ছিলেন ইত্যাদি।

---

* ভরতে ফলিত জ্যোতিষ, গ্রহবিপ্র, সূর্যপূজাদি কীভাবে বিদেশ হতে প্রাচীন হিন্দুরা গ্রহণ করেছিলেন, সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন ক্ষিতিমোহন সেন 'ভারতের সংস্কৃতি' গ্রন্থে পৃ ২৯-৩১। বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ।

বাবিলনীয়রা দিনকে ২৪ ঘণ্টায় ভাগ করে। তাদের বিশ্বাস গ্রহের দেবতারা ঘুরে ঘুরে প্রতি ঘণ্টার উপর নজর রাখেন। বৎসরকে ৩৬০ দিনে ভাগ করে দেখা গেল যে জ্যোতিষের গণনায় সেটা ভুল, ২৭ দিনে চাঁদের মাস ভরতি হয়, কিন্তু বৎসর পুরে না; তাই পণ্ডিতেরা ঠিক করলেন কয়েক বৎসর অন্তর মলমাস বা ত্রয়োদশ মাস হবে। কোন বৎসর মলমাস জোড়া দিতে হবে তার হুকুমনামা দিতেন রাজারা।

আমরা গুন্‌বার সময় বলি এতো 'কুড়ি'—বাবিলনীয়রা বলতো এতো 'ষাট'; ষাট ছিল তাদের একক। সেই হিসাব দিয়ে তারা বৃত্তকে ৬০ ভাগে ভাগ করে, প্রত্যেক অংশ আবার ৬০ মিনিট এবং প্রত্যেক মিনিটকে ৬০ সেকেণ্ডে ভাগ করার পদ্ধতি তাদেরই আবিষ্কার। সূর্যঘড়ি জলঘড়ির উদ্‌ভাবকও তারা। বাবিলনীয়দের অনেক বিজ্ঞানী বুদ্ধি ভারতীয় আমরা পেয়েছি, তার সঙ্গে গ্রহ উপগ্রহের ফের প্রভৃতি বহু বিশ্বাস ও কুসংস্কারও পেয়েছি; অবশ্য এসব পেয়েছিলাম গ্রীকদের মারফতে, আর গ্রীকরা পায় পশ্চিম এশিয়া থেকে।

পৃথিবীর উৎপত্তি কেমন ভাবে হলো, মানুষ কিভাবে সভ্য হয়েছে এ সম্বন্ধে সব দেশেই লোকে কত কি কল্পনা করে আসছে। হিন্দুদের পুরাণগুলি এই সব কাহিনীতে পূর্ণ; গ্রীকদের মধ্যেও এসব ছিল। প্রাচীন বাবিলনীয়দের মাথায় কত কল্পনা আসতো—তার সন্ধান পাওয়া গেছে পোড়ামাটির পাটা থেকে।

মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে কাদাপাটায় লেখা এক মহাকাব্য পাওয়া গিয়েছে; গিলগমীশ তার নায়ক বলে পণ্ডিতরা কাব্যটির নাম দিয়েছেন 'গিলগমীশ কাব্য। এই পোড়ামাটির পুঁথির মধ্যে জলপ্লবনের একটি কাহিনী পাওয়া গেছে; উপাখ্যানটি প্রচীন সুমেরুয় ভাষাতেও ছিল, ইহুদিদের বাইবেল গ্রন্থেও এই কাহনী আছে। প্লাবনে সমস্ত জীব ধ্বংস হয়—রক্ষা পায় শামাশ-নাপিস্তিম, তারই বংশধর গিলগমিশ। আশ্চর্যের বিষয় প্লাবনের কথা ভারতীয় সাহিত্যে একমাত্র 'শতপথ ব্রাহ্মণে' পাওয়া যায়।

গিলগমীশ কাব্যের ঘটনা সংক্ষেপে এইরূপ; দুইভাগ দেবতা ও এক ভাগ মানবরূপী বীর গিলগমীশ। তাঁর ভক্তেরা তাঁর নির্দেশে সর্বপ্রকার কঠিন কাজ করতে প্রস্তুত। তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা 'ঈষতার' দেবীর

সাহায্য প্রার্থনা করায় এঙ্গিডু নামে এক বীরের সৃষ্টি হ'ল। কিন্তু গিলগমীশ প্রথমে তাকে যুদ্ধে পরাজিত করে, পরে প্রেমের দ্বারা ইঙ্গিডুকে জয় করেন। ঈশতার দেবী তখন গিলগমীশকে ছলনা করতে চেষ্টা করেন কিন্তু গিলিগমীশ তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। দেবী রুষ্ট হয়ে আর কিছু করতে না পেরে বন্ধু ইঙ্গিডুর মৃত্যু ঘটালেন। এর পরে গিলগমীশ যমপুরীতে গিয়ে হাজির হলেন, মৃত্যুর রহস্য ভেদ করবার জন্য কত দেবদেবীর সাহায্য নিয়ে এঙ্গিডুকে মৃত্যুর রাজ্য থেকে ক্ষণেকের জন্য ফিরে পেলেন।

বাবিলনিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অনুকূল; য়ুফ্রাতিস ও তাইগ্রিস নদীদ্বয় বহুদূর পর্যন্ত নাব্য। জলপথ দিয়ে ভারত থেকে পারস্য সাগর পৌঁছানো কঠিন হলেও অজ্ঞাত ছিল না। অপর দিকে স্থলপথে ভারত থেকে কাবুল, হিরাট ইরানের মধ্যে দিয়ে নিনেভা হয়ে বাবিলনে যাওয়া-আসা চলতো। ভারতীয় সাহিত্য থেকে জানা যায় যে সার্থবহদল ববেরু বা বাবিলনে যেতো মালপত্র নিয়ে। পরবর্তী যুগে চীন থেকে মধ্য এশিয়ার ভিতর দিয়ে বাবিলনে যাবার পথ আবিষ্কৃত হয়; এই পথে চীনাংশুক বা রেশম রপ্তানী হতো পশ্চিম এশিয়ায়। বাবিলন, নিনেভা হয়ে বাণিজ্যধারা সিরীয়া, ফিলিস্থান, ফিনিশিয়া দিয়ে মিশরের দিকে রওনা দিত।

ইরাক দোয়াবের সভ্যতার ভারকেন্দ্র সমুদ্রতীর থেকে এসে ক্রমে উত্তরে সরে সরে যাচ্ছে; আর উত্তরের পাহাড় থেকে নতুন নতুন উপজাতির দল নেমে আসছে দক্ষিণের দিকে। য়ুফ্রাতিস ও তাইগ্রিসের উত্তরাঞ্চলের পার্বত্য ও আধা-পার্বত্য মালভূম নানা উপজাতির বাসভূমি। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কাশসু, হিটাইট, ও মিত্তানি। পণ্ডিতরা মনে করেন এরা সকলেই আর্য ভাষাভাষী।

আর্য ভাষা ও উপভাষা ভাষী বহু উপজাতির বাসস্থান ছিল দক্ষিণ রুশ বা ইউকরায়েন; সেখান থেকে মধ্য এশিয়ার আরল হ্রদ পর্যন্ত অনির্দিষ্ট ভূখণ্ড বিস্তৃত। যুগে যুগে লোকে পূর্বপশ্চিম, উত্তর দক্ষিণে বের হয়ে গেছে নতুন দেশে বসবাস করবার জন্য। পশ্চিম দিকে যারা যাত্রা করেছিল তাদের কথা এখন বাদ দিলাম। পূর্বদিকে যারা উপনিবেশ স্থাপন ক'রে তাদের কথাই বলা যাক

আগে! ইরানের উত্তরস্থিত গিরি সঙ্কট পার হয়ে যে সবউপজাতি ইরান মালভূমে প্রবেশ করে তাদের একটা শাখা চলে যায় সিন্ধু-সরস্বতীর অববাহিকায়—তারা ভারতে বৈদিক সভ্যতার পত্তনদার। য়ুফ্রাতিস তাইগ্রিসের দোয়াবে পারসিক প্রভৃতি আর্য উপজাতিদের পক্ষে দখল করে বসা অসম্ভব, কারণ সেখানে সেমেটিক বাবিলনীয়রা রাজ্য গেড়ে বসে আছে বহুকাল। তাই তাদের থাম্‌তে হয়েছিল ইরানের মালভূমিতে এসে, কিন্তু সর্বদাই দৃষ্টি পড়ে আছে ইরাকের শস্যশ্যামল দোয়াবের উপর। কাশস্থ নামে উপজাতি দোয়াবের কাছাকাছি ইলমে গিয়ে ঘর বাঁধে—তারপর হানা দেয় বাবিলনিয়ার উপর। তাদের কথা বলেছি। এইসব জনতার চলাফেরার ফলে ধাক্কা খেতে খেতে হিক্সসরা মিশরে প্রবেশ করেছিল সে ইতিহাসও আগেই বলা হয়েছে।

ইরাক-দোয়াবের উত্তর-পশ্চিমে বর্তমান তুর্কী রাজ্য—গ্রীক যুগের আনাতোলিয়া প্রাচীন কালের হিটাইটদের বাসভূমি। পশ্চিম এশিয়ার উর্বর সমতল ভূমি থেকে আনাতোলিয়ার মালভূমি যেন হঠাৎ খাড়া হয়ে উঠে গেছে। এই পার্বত্য মালভূমে বহু নদীধারা পুষ্ট উপত্যকায় বাস করে হিটাইট ও তাদের শাখা-উপশাখার নানা মানুষরা। বাবিলনীয়রা এদের বলতো মুস্‌কি, হিটাইটি ভাষায় নেসীয়া। এতকাল পার্বত্য আনাতোলিয়ার দুর্গমতা ভেদ করে কি মিশরীয়রা। কি বাবিলনীয়রা কেউই সে-দেশে পৌঁছতে পারেনি। কারণ সমতল বা মরুবাসীদের পক্ষে তুষারঢাকা পর্বত পার হয়ে পাহাড়ী দেশের উপত্যকার পর উপত্যকা জয় করা খুবই কঠিন। অথচ পর্বতবাসীদের পক্ষে সমতলে নেমেএসে লুঠ পাট ক'রে চম্পট দেওয়া সহজ, জয় করাও শক্ত নয় ঠিক এই কারণে ঐ অঞ্চলে মুসলীম আরবরাও প্রবেশ করতে পারেনি, কিন্তু তুর্কীরা উত্তর থেকে এসে সমস্ত আরাবিয়া জয় করেছিল।

আনাতোলিয়ায় হিটাইটরা বিজয়ী রূপেই প্রবেশ করে। এরাও ঠিক একটা অখণ্ড জাতি নয়, ছোট ছোট বহু উপজাতিতে বিভক্ত। তাদের রাজধানী ছিল আধুনিক বোগাজ-কুই।*

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে একটা পুরাতন ধ্বংসস্তূপ খুঁড়তে খুঁড়তে প্রায় দশ হাজার পোড়া মাটির পাটা পুঁথি পাওয়া যায়। সেইসব লেখগুলির

Bogaz koy or boghde keni or hattee shashgrt. Pteria ...About 90m. East of ankara, Turkey.

অধিকাংশই বাবিলনীয় কোণাক্ষরে খোদাই, কতকগুলি চিত্রাক্ষরে উৎকীর্ণ; অর্থাৎ আনাতোলিয়ার মালভূমি থেকে একটি ধারা নেমে আসে ইরাক দোয়াবে, আরেকটি ধারা সিরীয়া ফিলিস্তান হয়ে মিশরের সঙ্গে যুক্ত হয়। তাই হিটাইতদের মধ্যে বাবিলনীয় কোণাক্ষর ও মিশরীয় চিত্রাক্ষরের মতো লিপি দুই-ই পাওয়া যাচ্ছে,—যেমন প্রাচীন ভারতেও পাওয়া যায় দুটো লিপি —খরোষ্ঠি ও ব্রাহ্মী, কোনো মিল নেই পরস্পরের মধ্যে।

বাবিলনের গৌরবের দিন কিভাবে অস্তমিত হয় তার কথা বলেছি। বাবিলনিয়ার উপর হানা দিয়ে হিটাইতরা অসংখ্য দেবমূর্তি, রাজমূর্তি ও শিল্প নিদর্শন লুঠ করে নিয়ে যায়,—যা চিরদিনই সকল দেশে, সকল যুগে হয়ে এসেছে —সেই রকমেই পরস্বাপহরণের মামুলি ঘটনা। বাবিলনের উপর স্বল্পকাল আধিপত্যের মধ্যে সেখানকার লিখন পদ্ধতি আয়ত্ত করা সহজ সাধ্য হয়নি; হয়তো বাবিলনীয় বন্দী পুরোহিত পণ্ডিতদের কাছ থেকে হিটাইতরা কোণাক্ষর লেখন পদ্ধতি শিখে নেয়। বহু শতাব্দী পরে গ্রীস জয় করে রোমানরা গ্রীক পণ্ডিতদের দাসরূপে নিয়ে যায় ইতালিতে, এবং তারাই হয় শিক্ষাগুরু রোমানদের। রোমনরা গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বাদ পেয়েছিল এইভাবে। হিটাইতদেরও তাই হলো। আবার হিটাইতদের সংস্পর্শে এসে বাবিলনীয়জাত-বেনিয়াদেরও অনেক সুবিধা হলো,—পশ্চিমের এই পথ দিয়ে অজানা নূতন দেশের সন্ধান পেয়ে বাণিজ্য বিস্তারের সুযোগ মিললো।

এদিকে হিটাইতদের সঙ্গে মিশরীয় ফারায়োদের সংঘর্ষ বাধলো। পাঠকের মনে আছে মিশরীয়রা লৌহাস্ত্র বানাতে শিখে ও অশ্বারোহণে পটু হয়ে দিগ্বিজয়ে বের হয়েছিল। উত্তর থেকে হিটাইতরাও পার্বত্য আনাতোলীয় থেকে নেমে এসে সিরীয়া দখল করেছে। আসলে মিশর থেকে আসতে বা সেখানে যেতে হলে সিরীয়া, ফিলিস্তান প্রভৃতি দেশ মাড়িয়ে-মাড়িয়ে যেতেই হয়। হিটাইতদের এক চতুর রাজা সুবিলুলিয়ামা দেখলেন ফারায়োদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে পেরে ওঠা দায়; তখন মিশরের অধীনস্থ রাজাদের বিদ্রোহ করবার জন্য উস্‌কোতে লাগলেন। বিদ্রোহীদের নিশ্চয়ই অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তিনি সাহায্য করেছিলেন কারণ হিটাইতদের দেশে সুপর্য্যাপ্ত লৌহ আকর ছিল। তবে নিছক উস্‌কানিতে তারা যে বিদ্রোহী হয়েছিল তা তো মনে হয় না।

কিন্তু প্রাচীন ইতিহাসের সব কথা তো স্পষ্ট করে জানার মতো উপকরণ পাওয়া যায় না, তাই কল্পনা করে অনেকটা ফাঁক ভরতি করতে হয়।

হিটাইত ও বাবিলনীয়দের মাঝখানের দেশে বাস করে মিত্তানি (Mittani) নামে এক জাতি, এদের কথা পরে আসবে। এই মিত্তানিরা ছিল মিশরের মিত্র। মিত্তানিদের রাজা হিটাইতদের উৎপাতে উত্যক্ত হয়ে ফারায়োদের কাছে বহু পত্র দেন; কাদার পাটায় লেখা সেই সব পত্র পাওয়া গেছে।

কিন্তু মিশরের মধ্যে ইতিমধ্যে বিপ্লব দেখা দিয়েছে। পাঠকদের মনে আছে ফারায়ো আমোনহোতেপ নতুন ভাবে ধর্ম প্রবর্তিত করে ইখনাতোন নাম নিয়েছিলেন। ধর্মপ্রাণ রাজার রাজকার্যে মন ছিল কম। তাঁর মৃত্যুর পর আমোনরার পুরোহিতরা আবার পুরাতন ধর্ম ফিরিয়ে আনে, রাজারাও রাজকার্যে মনোযোগী হন। ফারায়ো রামসেস্ হিটাইতদের রাজা খত্তিশীলকে বারেবারে যুদ্ধে হারিয়ে দিতে থাকলে সে বেচারা ফারায়োর সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। সেই সন্ধিপত্র পাঠ করলে মনে হয় যেন আধুনিক যুগের কোনো সন্ধিসর্ত্ত পড়ছি। পড়তে পড়তে ভাবি, মানুষের মনের কি কোনো পরিবর্তন হয়নি এত হাজার বৎসরেও!

প্রাচীন যুগের হিটাইতরা সভ্যতার অনেক কিছু সম্পদের স্রষ্টা। যেমন, রাজধানী সুরক্ষিত করবার জন্য চারদিকে সুদৃঢ় প্রাচীর গাঁথার রীতির প্রবর্তক এরাই। অবশ্য তাদের নগর সুদৃঢ় করবার কারণ ছিল। হিটাইতরা যেখানে রাজ্য পত্তন করে সেখানে পূর্ব থেকেই বহু উপজাতির বাস ছিল; উপজাতির বোধহয় এইসব অ-মিত্র উপদ্রব এড়বার জন্য নগর সুদৃঢ় করার দরকার হয়।

বোগাজকুই খুঁড়ে যেসব কাদাপাটার লেখ পাওয়া গেছে তার মধ্যে অনেক কয়টি উপজাতিদের নাম লেখা—যেমন হত্তি বা খত্তি, লুইত, নেসিয়, হুবীর, মিতান্নু। পণ্ডিতদের মতে 'খত্তি'রা হচ্ছে আনাতোলিয়ার আদিবাসী, যারা ইতিহাসে হিটাইত নামে খ্যাত, আসলে তাদের নাম হচ্ছে নেসিয় (Nesians),—এরা আর্য ভাষাভাষীদের দূর জ্ঞাতি বলেই

মনে হয়। পণ্ডিতদের অনুমান এই নেসিয় বা হিটাইতরা বাইরে থেকে এসে এই পার্বত্য মালভূমি দখল করে ছিল মোট কথা অনেক তত্ত্বই অনুমানের উপর গড়া কারণ তথ্য অল্প ও অস্পষ্ট।

হিটাইতদের শক্তির মূলে ছিল তাদের দুর্জয় সাহস; আর সহায় ছিল অশ্ব ও লৌহাস্ত্র—আজকালকার জেট্ প্লেন ও আনবিক বোমা! আনাতোলিয়ায় প্রচুর লৌহ-আকরের এরা পূর্ণ ব্যবহার করেছিল মজবুত লোহা-ইস্পাতের হাতিয়ার বানিয়ে। পশ্চিম এশিয়ায় ব্রোন্‌জের অস্ত্রশস্ত্র, তৈজসপত্রর চল্ ছিল এতকাল। লৌহ ধীরে ধীরে তার স্থান নিতে সুরু করলে। লোহার তৈরী অস্ত্রশস্ত্রে আঁটশাট হয়ে হিটাইতরা শুধু যুদ্ধে অজেয় হলো তা নয়, লৌহ রপ্তানী করে বিনিময়ে তারা ধনবান হয়ে উঠ্‌লো। পরযুগে পশ্চিম আনাতোলিয়ার গ্রীকরা যে পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছিল তার একটা কারণ পর্যাপ্ত লৌহাস্ত্রের সরবরাহ তাদের অব্যাহত ছিল। ইতিহাসেয় সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষের বিজ্ঞানীবুদ্ধি, রাসায়নিক বিদ্যা।

হিটাইতরা বহু দেবতার পূজক। হিন্দুদের সম্বন্ধে যেমন বলা হয় যে তাদের তেত্রিশ কোটি দেবতা—হিটাইতদের সম্বন্ধে শোনা যায় যে তাদের ছিল হাজার দেবতা। অবশ্য অত নাম পাওয়া যায় না কারও। তবে ভারতে তপশীলী ও উপজাতিদের গ্রাম্য দেবতাগুলি একত্র যোগ করলে কয়েক হাজার নিশ্চয় হবে। হিটাইতদের আদিদেবতার নাম তাদেরই ভাষায় 'মা' (Ma) ; 'অত্তিস' নামে আর একজন দেবতার নাম খুবই পাওয়া যায়—যিনি না-স্ত্রী, না পুরুষ—আমাদের শাস্ত্রের 'ব্রহ্মন্' ক্লীবলিঙ্গ।

হিটাইতদের শস্ত্রের প্রভাব যেমন আশেপাশের জাতিউপজাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তাদের ধর্মের প্রভাবও তেমনি পশ্চিম এশিয়ার সীমানা ছাড়িয়ে ক্রীট দ্বীপ পর্যন্ত পৌঁছেছিল বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। ক্রীট প্রভৃতি স্থানের মাতৃদেবতার পূজাপদ্ধতি হিটাইতদের সংস্পর্শে এসে পাওয়া বলে অনুমান হয়। পরযুগে হিটাইতদের মধ্যে মিথ্র (মিত্র=সূর্য) ও 'মেন'-এর সূর্য-চন্দ্রের [moon Anglo Saxon-mona] যুগ্মপূজা প্রবর্তিত হয়।

পুরোহিতদের পূজা-প্রতীক ছিল দ্বিমুখী ঈগল অনেকটা গরুড়ের মতো।

তিন হাজার বৎসর পরে তুর্কীর সেলজুক শাখার শাসকরা এই ঈগলের প্রতীককে রাজমহিমার কেতনরূপে গ্রহণ করেছিল। তুর্কীদের নিকট থেকে বৈজয়ন্তীয়মের গ্রীকগণ এবং তাদের কাছ থেকে অষ্ট্রিয়া, রুশিয়া, মার্কিনযুক্ত রাষ্ট্রপ্রভৃতি দেশে রাষ্ট্রকেতন রূপে গৃহীত হয়। কোন্ অজ্ঞাত যুগের চিহ্ন কোথায় এলো চলে!

আমরা পূর্বেই বলেছি হিটাইতদের বহু শত লেখা পাওয়া গিয়েছে। বাবিলনীয়দের সংস্পর্শে এসে তারা যে কোণাক্ষর শিখেছিল, সেই লেখা থেকে এই জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনেক তথ্য জানা গেছে। য়ুফ্রাতিস—চিত্রা লিপির পাঠ উদ্ধারের চেষ্টা চলছে, আংশিকভাবে সফল হ'য়েছে। এইসব লেখগুলি ভাল করে পড়তে পারা গেলে এই হিটাইত জাতি আটশত বৎসর পশ্চিম এশিয়ায় প্রবল ছিল তাদের ইতিহাসও ভালভাবে জানা যাবে।

হিটাইত ও বাবিলনীয়দের মধ্যভাগে য়ুফ্রাতিস নদীর উপর দিকে মিত্তানিদের বাস। মিত্তানিরা আর্যভাষাভাষী; আর্যদের দেবতা মিত্র, ইন্দ্র বরুণ, নাসত্য ছিল তাদের উপাস্য। এই জাতির লোকে মিত্র দেবতা পূজা করতো বলে হয়তো 'মিত্রানি' নামে পরিচিত হয়, কারণ মিত্র শব্দের বহুবচনে মিত্রানি হয়। এদের ভাষায় উৎকীর্ণ লেখসমূহ মিশরের তেল-অল-আমর্ণা ও তুর্কীর বোগাজকুই-এ মাটির নিচে চাপা ছিল। এই সব পাটার মধ্যে কিক্কুলি নামে এক ব্যক্তির লেখা অশ্বশিক্ষা সম্বন্ধে গ্রন্থের ভাঙা পাতা (মাটির) পাওয়া গিয়েছে। তাতে অশ্বশিক্ষার 'পঞ্চাবর্তন,' 'সত্তাবর্তন' (অর্থাৎ পঞ্চ সপ্ত আবর্তন) প্রভৃতি যে শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলি ভারতীয় অশ্ববৈদ্যক গ্রন্থের শব্দ। অশ্বের শিক্ষা সম্বন্ধে গ্রন্থ কিভাবে ভারত থেকে সেখানে পৌঁছলো তা জানা যায় না।

মিত্তানি রাজারা খুবই চতুর। আন্তর্জাতিক জটিলতার সুযোগ গ্রহণ করে তারা বাবিলনীয়দের একচেটিয়া প্রাধান্য ধীরে ধীরে হরণ এবং চারদিকে আপনাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। কিভাবে যে অর্থনৈতিক ভারকেন্দ্র সরে সরে গেল তার সব কথা এতকাল পরে জানা সম্ভব নয়। তবে দেখা যায় চঞ্চলা লক্ষ্মী কোনো গৃহে বা দেশে চিরস্থায়ী হন না, ঠাঁই নাড়া হয়ে হয়ে সকলকেই একবার ক'রে সোনার পরশ ছুঁইয়ে দেন।

মিশরীয় ফারায়োরা পশ্চিম এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার করতে এসে দেখেন হিটাইত ও মিত্তানিরা তাঁদের প্রধান কণ্টক। ফারায়ো থুতমিস তো মিত্তানিদের যুদ্ধে হারিয়ে (খৃ. পূ. ১৪৭৯), তাদের দেশের মধ্যে প্রবেশ করলেন। এমন অবস্থায় মিত্তানি রাজার পক্ষে ফারোয়ার সঙ্গে মিত্রতা করে সিংহাসন ও মুকুট নিজ বংশে কায়েম করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক! কিন্তু রাজার ইচ্ছা ও প্রজার ইচ্ছায় সব সময় মিল হয় না। মিত্তানির লোকেরা হিটাইতদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করবার ব্যবস্থা করলো; আর মিত্তানিদের রাজা তুশরত্ত (দশরথ) বন্ধুতা করলেন মিশরের ফারোয়ার সঙ্গে। ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বেশ ঘোরালো হয়ে উঠ্‌লো। আজও এরকম ঘটনা ঘটছে দেশে দেশে-রাজইচ্ছা ও প্রজাইচ্ছা খাপে খাপে মেলে না—বিদ্রোহ হয়, বিপ্লব হয়, কখনো রাজার মাথা যায়, কখনো হাজারে হাজারে প্রজার প্রাণ যায়। মিশর বিরোধী হিটাইত কূটনীতিরই জয় হলো, সুবিলুইলুব মনোনীত ব্যক্তি মিত্তানিদের রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত হলো। এই ব্যক্তির সঙ্গে হিটাইতরাজ নিজ কন্যার বিবাহ দিলেন।

মিশরের মিত্রতাকামী মিত্তানিরাজ দশরথ ফারায়োকে যেসব পত্র লিখেছিলেন, তা পাঠ করলে সে যুগের কূটনীতির বিস্তারিত ছবিটি পাওয়া যায়। একখানি পত্রে মিত্তানিরাজ মিশরাধিপতি আমোনহোতোপ কে লিখছেন, 'আমার পিতার সময়ে ইশতার দেবীকে আপনাদের দেশে পাঠানো হয়েছিল এবং সেখানে বাসকালে দেবী প্রভূত সম্মান পেয়েছিলেন। আশাকরি ভ্রাতা আমাদের দেবীর প্রতি দশগুণ শ্রদ্ধা দেখাবেন এবং যথাসময়ে তাঁহাকে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন।" আমোনহোতেপ ব্যাধিগ্রস্থ হলে তাঁর কল্যাণের জন্য ইশতার দেবীকে দ্বিতীয়বার পাঠানো হয়েছিল।

মিত্তানিরাই যে মিশরের মিত্রতা লাভের জন্য লালায়িত তা নয়, প্রতিবেশী বাবিলনীয় রাজারাও মিশরের অনুগ্রহ পাবার জন্য ব্যাকুল। বাবিলনিয়ার রাজা মিশরের ফারায়োকে নিজেদের কন্যা দিয়ে মিশর থেকে রাজকন্যা দাবী করছেন। ফারোয়া জবাবে জানাচ্ছেন যে অতীতকাল থেকে এপর্যন্ত মিশরীয় রাজকুমারীদের সঙ্গে কখনো বিদেশীর বিবাহ দেওয়া হয়নি। তদুত্তরে বাবিলনের কাশগুরাজ আমোনহোতেপকে

লিখছেন, "কেন? আপনি তো রাজা আপনার অন্তরের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে পারেন না? আপনি কন্যা দিলে কে কি বলতে পারে? আপনি যদি কাউকে না পাঠাতে পারেন তা হলে কি এই বুঝবো যে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের প্রতি আপনার আকর্ষণ নেই?...আপনি যদি কন্যা না পাঠান, আমিও পাঠাব না।" আর একটি চিঠিতে বাবিলনরাজ মন্দির নির্মাণের জন্য স্বর্ণ চাচ্ছেন. ঠিক আজও যেমন ধনশালী দেশ থেকে অর্থভিক্ষা ও আদায়ের চেষ্টা দেখা যায় দুর্বল রাষ্ট্রের। তখন ছিল মন্দিরের জন্য ভিক্ষা, এখন ইস্পাত-কারখানা, বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতির জন্য অর্থ 'ঋণ' বা দান যাচ্ঞা!

হিটাইত ও বাবিলনীয়ার কাশ্‌সুদের ইতিহাসের উপর পর্দা পড়ে আসছে; য়ুফ্রাতিস তীর থেকে শক্তির ভারকেন্দ্র সরে গিয়ে তাইগ্রীস তীরে গড়ে উঠ্‌ছে।

বহু প্রাচীনকালে সেমেটিকদের একটি উপজাতি তাইগ্রীস নদীর তীরে 'অসুর' নামে নগর পত্তন করে। এই অঞ্চলের জলবায়ু বাবিলন থেকে ঠাণ্ডা, বৃষ্টি প্রচুর। নিকটে বন ও পাহাড় থেকে কাঠ, পাথর আনা সহজ, জঙ্গল থেকে দামী কাঠ পাওয়াও কঠিন নয়। অপর দিকে দোয়াবের মধ্যে আসা-যাওয়ার প্রাকৃতিক বাধাও কম। আবার হিটাইত ও মিত্তানিদের দেশও দূরে নয়। আশেপাশের সুসভ্য জাতিদের সঙ্গে মেলামেশা, বাণিজ্য-কারবার করতে করতে অসুরের লোকেরাও বেশ চতুর ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তারপর অল্পকালের মধ্যে তাদের চাতুরীর ও শক্তির পরীক্ষা সুরু করলো প্রতিবেশীদের উপর। অসুরীয়দের দীর্ঘকালের ইতিহাস নিরন্তর যুদ্ধের কাহিনী—দোয়াবের উপর প্রভুত্ব বিস্তার তার প্রধান উদ্দেশ্য; কারণ বাবিলনীয়ার দোয়াবেই আছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-খাদ্যশস্য। নদীতে আছে মাছ। সে দেশটা দখল করতেই হবে।

এককালে মিত্তানিদের রাজা দশরথ অসুরদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন এবং মিশরের ফারোয়াকে তোয়াজ করবার জন্য অসুরীয়দের জাগ্রত দেবী ইশতারকে বহু আড়ম্বরে মিশরে পাঠিয়েছিলেন এবং তার বিনিময়ে ধনদৌলত লাভ করেন বিস্তর। কিছুকাল পরে অসুরদের রাজা ফারোয়ার কাছে কাঁদুনি গাইলেন যে মিত্তানির রাজা যদি তাঁর কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে তবে অসুরীয়রাই বা পাবে না কেন?

অসুরের রাজদূত মিশরে ফারোয়ার দরবারে অর্থ সাহায্যর জন্য গিয়েছে জানতে পেরে মিত্তানিরাজ খুবই আপত্তি জানালেন। বাবিলনের কাশ্সু রাজারা মিশরের নিকট থেকে স্বর্ণদাবী করেছিলেন সে কথা বলেছি। মোট কথা মিশর কাউকে টাকা দিয়ে, কারো কন্যা বিবাহ করে আপনার প্রতিপত্তি পশ্চিম এশিয়ায় বজায় রাখছে। আধুনিক যুগেও সেরকমেই চেষ্টা চলে আসছে। উনবিংশ শতকে ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দৌহিত্র পৌত্রেরা—য়ুরোপের অধিকাংশ রাজ্যের সিংহাসনে বসেছিলেন।

এদিকে সীরিয়া থেকে হিটাইতদের তাড়াবার জন্য ফারোয়ারা লড়াই-এ যখন খুব মত্ত, অসুরীয়রা সেই সুযোগে উত্তর দোয়াবে ভালভাবেই কায়েম হয়ে বসলো। আর দেখতে-দেখতে সমতলভূমি থেকে হিটাইতদের দিল বিদায় ক'রে।

এইভাবে আশে-পাশের রাজ্যগুলি দুর্বল বা লুপ্ত হয়ে গেল। অসুরীয়দের দিগ্বিজয়ে বাধা দিতে পারে এমন প্রবল শক্তি আর একটিও থাকলো না; সারা পশ্চিম এশিয়ায় অসুরীয়রা কণ্টকশূন্য!

সীরিয়া দখল করে অসুরীয়রা ঢুকে পড়লো দক্ষিণ আনাতোলিয়ার সিলিশিয়া (Cilisia) দেশে; সেখানকার রূপার খনি দখলে এলো। আর্মেনিয়া দেশ জয় হলো, আয়ত্বে এলো সেখানকার তামা ও লোহার খনি। রূপো ও তামার খনির অধিকারী হওয়াতে হাতে এলো ধাতুজ সম্পদ বা অর্থ, যা দিয়ে সবই কেনা যায়; এমনকি সে যুগে অসংখ্য ভাড়াটিয়া সৈন্য প্রাণ বিকোবার জন্য পাওয়া যায়।

অর্থ ও অস্ত্রের মালিক হয়ে অসুরীয়রা ক্রমে যুদ্ধে অজেয় হয়ে উঠে। বাবিলনীয়া, ইলাম অধিকৃত হলো; এমনকি সাময়িকভাবে মিশরের উপরও প্রভুত্ব করে নেয়। বাবিলন দখল করার পর অসুরীয় সম্রাট যে শিলা-লেখ উৎকীর্ণ করেন তা'তে তিনি লিখিয়েছেন যে মহানগরীতে যে সব লোকদের মেরে ফেলা হয়, তাদের মৃতদেহ এমনই স্তূপীকৃত হয়েছিল যে পথ চলাচল দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। মন্দির ও প্রাসাদাদি এমনভাবে লুণ্ঠিত হয় যে কোথাও কপর্দকমাত্র পড়ে থাকেনি। ইলাম রাজ্য অধিকার করে নিষ্ঠুর সম্রাটের হুকুমে দাসের দল চাষের জমির উপর লবণক্ষার ও কাঁটার বীজ এমনভাবে ছড়িয়ে দিল যাতে ভবিষ্যতে সে দেশ বাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়। সম্রাটদের শিলালেখে কে কত লোক খুন করেছেন

তার দীর্ঘ তালিকায় পূর্ণ। ঐতিহাসিকেরা বলেন প্রাচীন পৃথিবীতে এমন নিষ্ঠুর জাত আর ছিল না। কিন্তু আজও তো যুদ্ধে-হতাহতের তালিকা প্রকাশিত হয়। পুরাতনের সঙ্গে গুণগত ভেদ কোথায়?

অসুরীয়রা যোদ্ধ জাতি, প্রথম সাম্রাজ্য স্রষ্টা (অসুরীয় সাম্রাজ্য) —বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রনগরীর জনতার শিথিল বন্ধন নয়। বিজিত নগরী উৎসন্ন করে হাজারে হাজারে বন্দীদের দাসদাসী করে অসুর দেশে আনা হতো।

যোদ্ধাজাতির লোকে জমির মালিক কিন্তু, চাষবাস কাজকর্ম সমস্তই করে বন্দীদাসের দল। ব্যবসায় বাণিজ্য কারুশিল্পের চর্চা বরাবরই ছিল বাবিলনীয়দের হাতে। অসুরীয়রা থাকলো রাজকার্যে ও যুদ্ধকর্মে লিপ্ত, অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়বার দিকে মন গেল না ভালো করে। সুলভ দাসশ্রম বীরের জাতকে একালে নিবীর্য করে ফেলবেই। অসুরীয় বীরের দল সুসভ্য বাবিলনীয়দের সংস্কৃতি, তাদের শিল্পকলা সবই গ্রহণ করলো। তবে একটা বিষয় অসুরীয়দের মনের ও হাতের ছাপ রয়ে গেছে চিরকালে জন্য; সেটি হচ্ছে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য।

স্থাপত্যকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হচ্ছে দুর্গাদি-বেষ্টিত নগর; এই দুর্গ-নগর নির্মাণের কৌশলটি অসুরীয়দের শেখা হিটাইতদের কাছ থেকে। এইসব প্রাসাদে ভাস্কর্যের নমুনা—যা পাওয়া গেছে তা তাদের নিজস্ব যা প্রাচীন জগতে তুলনাহীন। অসুরীয় রাজাদের ব্যসন ছিল প্রাসাদ-নির্মাণ—যেমন ছিল ভারতের পাঠান, মুঘল বাদশাহদের।

যে-কালে মানুষের শ্রমকে শুধু একমুঠো বেঁচে থাকার মতো খাদ্য দিলেই পাওয়া যেতো; সেখানে এ ধরণের বাদশাহী মেজাজ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বর্তমান যুগে দুর্ভিক্ষের সময় বেঁচে থাকবার মতো পয়সা দিয়ে বড় বড় জনহিতকর পূর্তকার্য করা হয়। হাজার হাজার বন্দীদাসদের শ্রম যেখানে অতিসুলভ, সেখানে বাদশাহদের খেয়াল চরিতার্থ করা আদৌ কঠিন নয়। হিন্দু ও বৌদ্ধযুগে যে সব মন্দির বিহার স্তুপাদি নির্মিত হয়েছিল, তার পিছনে মূক জনতার নিছক প্রেম ছিল কিনা সন্দেহ। মুসলমান যুগের দুর্গ, প্রাসাদ মসজিদ ও কবর গৃহ নির্মাণের পিছনে কতখানি দাসশ্রম ছিল তার স্পষ্ট ইতিহাস পাওয়া যায় না। বর্তমান যুগেও যেসব অতিকায় ইমারত, কারখানা, নগর বন্দর প্রভৃতি নির্মিত হচ্ছে তার সঙ্গেও মিশে আছে

মানুষের রক্ত; সেই মূক মানুষের ভালো ভালো নাম দেওয়া হয়েছে, তাদের শ্রমিক জীবনকে আনন্দময় করবারও চেষ্টা চলছে নিরন্তর।

অসুরীয়দের রাজ্যের রাজধানী নিনেভা। সম্রাট অসুরবানিপালের সময়ে এই রাজধানীর নতুন রূপ হয়। এই রাজার নাম ইতিহাস থেকে ঐতিহাসিকদের কাছে বেশি সুপরিচিত, উল্লেখযোগ্য শেষ রাজা ইনি (খৃঃ পূঃ ৬৬৯—৬২৯)। কারণ তাঁর তিরোভাবের চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে অসুরীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। কিন্তু ঐতিহাসিকদের কাছে তিনি চিরস্মরণীয় কেন, সেই কথাটা বলছি।

অসুরবানিপাল বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী রাজা ছিলেন, যার তুলনা পৃথিবীতে খুবই কম মেলে। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি যে ইনি নিনেভা নগরকে নতুন করে গড়ে তোলেন। তাঁর প্রাসাদের কাছে বিরাট এক অট্টালিকা নির্মাণ করে সেখানে এক গ্রন্থ-ভাণ্ডার স্থাপন করেন। আড়াই হাজার বৎসর পরে নিনেভা নগরের ধ্বংসস্তূপ খুঁড়তে খুঁড়তে সেই গ্রন্থ-ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়। সেখানে পাওয়া গেছে প্রায় ৩০,০০০ ইটের পাটা। সেগুলি য়ুরোপের নানা ম্যুজিয়ামে সযত্নে সংগৃহীত আছে; পণ্ডিতেরা যক্ষের ধনের মতো সেগুলি শুধুই আগলে বসে নেই প্রত্যেকটি ইটের পাঠোদ্ধার হয়েছে, তর্জমা হয়েছে, গ্রন্থ ছাপা হয়েছে নানা য়ুরোপীয় ভাষায়।

প্রাচীন বাবিলনীয় বা সুমেরুয় ভাষা ও অসুরীয় ভাষা পৃথক গোষ্ঠিভুক্ত প্রাচীনতর যুগের সুমেরুয় ভাষা দুর্বোধ্য হয়ে আসছে—অথচ তার মধ্যে অনেক রত্ন। সেজন্য সেগুলির রক্ষণ, অনুলিখন এবং অনুবাদ প্রয়োজন বুঝে অসুরবানিপাল বহু পণ্ডিত ও অনুলেখক নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি সেসব রক্ষা না করলে বাবিলনীয়দের জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, অভিধান, পুরাণ, তন্ত্রমন্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান—এক কথায় বাবিলনীয়দের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপাদান—কিছুই এসে এযুগে পৌঁছাতো না। পুরানো ভাষার ব্যাকরণ, শব্দকোষ প্রভৃতি পাওয়া গেছে বলেই সুমেরুয় ভাষা আজ বোঝা যাচ্ছে।

অসুরবানিপালের মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যে অসুরীয়দের রাজ্য ধ্বংস হলো। বাবিলনীয়রা মীড় ও শকদের দলে টেনে এনে অসুরদেশ ছারখার করে দিল। রাজধানী নিনেভা এমনভাবে লুণ্ঠতরাজ হলো যে মাত্র দুইশত

বৎসর পরে গ্রীক সেনাপতি জেনোফোন ঐ ধ্বংসস্তূপের পাশ দিয়ে যাবার সময় সেখানকার পুরাণো কাহিনী কিছুই জানতে পারেননি। আড়াই হাজার বৎসর পরে মাটি খুঁড়ে ইতিহাস উদ্ধার করা হয়ে ছিল।

এশিয়াবাসী অসুরীয়রা পৃথিবীর প্রথম সাম্রাজ্য পত্তন করে। এদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল পশ্চিমে ঈজান সাগর থেকে পূর্বে ইরাণ মাল-ভূমি পর্যন্ত। ইতিপূর্বে এতোবড়ো ভূখণ্ড কোন একরাটের শাসনাধীনে আসে নি। মিশরের কবল থেকে এশিয়াকে তারা কেবলমাত্র বাঁচিয়ে রাখেনি, বীরের মতো তাদের বিজয়সেনানী ফারোয়াদের রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করে, তাঁদের যুদ্ধে হারিয়ে আসে। যাই হোক, অসুরীয়দের সম্বন্ধে বিচার করতে গেলে সব থেকে যা চোখে পড়ে, তা হচ্ছে এদের দুর্বলের প্রতি পীড়ন। সংস্কৃতি ও সভ্যতার দিক থেকে স্মরণ করবার মতো বিশেষ কিছু রেখে যায়নি। তাদের শক্তি প্রকাশ পেয়েছিল স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, শাসনে ও শোষণে! প্রতিবেশী পারসিকরা এদের কাছ থেকে এই তিনটি বিদ্যাই শেখে ভালো করে। সে কথায় যথাস্থানে আসা যাবে।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যকলায় অসুরীয়দের স্থান প্রাচীনজগতে তুলনাহীন; নূতন নূতন প্রাসাদ তৈরী করা ছিল সম্রাটদের ব্যসন বা বিলাস। এই বাস্তু বিদ্যায় বা নির্মাণ শিল্পে অসুরীয় শিল্পীরা যে নিপুণতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার ধারা আধুনিক যুগ পর্যন্ত চলে এসেছে। অসুরীয় স্থপতিদের হাতে বাবিলনীয় যুগের কারুকরদের খিলান নির্মাণের কৌশল আরও উন্নত হলো, অর্থাৎ সুদৃঢ় ও সুঠাম হলো। পরযুগে রোমানদের মধ্যে বিজয়তোরণ তৈয়ারীর যে-রীতি দেখা দেয় তা এই অসুরীয় পদ্ধতিরই ক্রমিক পরিণতি।

অসুরীয় রাজপ্রাসাদের পাথরের গায়ে অনেক শত ফুট স্থান জুড়ে আছে অসংখ্য খোদাই মূর্তি,—রাজাদের যুদ্ধের দৃশ্যই বেশি। আর এ ছাড়া সিংহ-শিকারের দৃশ্যও একটা বড় রকমের বিষয়বস্তু। অত মানুষ আঁকা হতো, কিন্তু সকলের মুখের একই ভাব; যোদ্ধৃজাতের লোকের মুখেভাবের পার্থক্য হলে কাজ চলেনা—এইভাব থেকে শিল্পীরা সবগুলিকে-একইরকম করে খোদাই করতেন। একাকারত্ব করাই তো হচ্ছে আদর্শ ষ্টেটের চরম লক্ষ্য!

অসুরীয় শিল্পীদের আসল কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে বন্যজন্তু ও বিশেষ-ভাবে সিংহ খোদাই কার্যে,—সমগ্র জাতির মধ্যে সুপ্ত বন্য হিংস্রতাকে

ভাস্করের নিপুণ বাটালির মধ্যে দিয়ে সিংহের মুখে ফুটে উঠেছে। জানে শিল্পীর মনের কথা।

মিশর থেকে অসুরীয়রা অনেক কিছুই শিক্ষা করে; প্রাসাদ গাত্রে পোড়া রঙীন মাটির টালি দিয়ে সাজানোর রীতি মিশরীয়দের কাছ থেকে শেখা। কাঠের কারুকার্য করা আসবাব তৈয়ারীর কলা তারা জানে ফিনিকদের কাছ থেকে। সম্রাট সেনাচেরীব (খৃ. পৃ. ৭০৫—৬৮১) তাঁর এক শিলালেখে বলেছেন যে হিটাইতদের প্রাসাদ নির্মাণ পদ্ধতির অনুকরণে তিনি 'সিংহদ্বার' প্রভৃতি তৈয়ারী করেন। আজও তো একজাতের দুর্গ বা প্রাসাদাদির নির্মাণকলা দেখে অন্য জাতের লোকে সে-সব বানায়। দিল্লী কলিকাতার ঘরবাড়ির মধ্যে ভারতীয় বাস্তুবিদ্যা কি দেখা যায়?

অসুরীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অনেক নিদর্শন। লনডনের ব্রিটিশ ম্যুজিয়ামে ও প্যারিসের ল্যুভের সংগ্রহালয়ে আছে। অসুরীয়দের স্থাপত্যাদি রচনার কলা প্রতিবেশী পারসিকরা কালে গ্রহণ করে, কারণ য়ুফ্রাতিস—তাইগ্রিসের দোয়াব এই দুই জাতির মিলনভূমি ও দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র। অখামনীয়রা যখন হঠাৎ পারস্যের শাহনশাহ হয়ে পড়লেন তখন সকল বিষয়ে সাহায্য নেবার জন্য সুসভ্য অসুরীয় ও বাবিলনীয়দের তলব করতে হয়েছিল। তারপর পারসিকদের সাম্রাজ্য ধ্বংস হলে শিল্পীরা ভারতে মৌর্য রাজদরবারে আশ্রয় নেয়; তাই চন্দ্রগুপ্ত, অশোক ও পরবর্তীযুগে ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে পারসিক তথা অসুরীয় প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। 'সিংহাসন' বা সিংহের মূর্তির উপর আসনটা বোধ হয় পশ্চিম এশিয়া থেকে আমদানী।

অসুর নামে যে ক্ষুদ্র গ্রামকে কেন্দ্র করে অসুরীয়দের উদ্ভব। তাদের দেবতার নাম ছিল 'অসুর'। 'অসুর' দেবতা ভারতীয় সাহিত্যে একেবারে অজানা নয়; বৈদিক যুগের দেবতাদের মধ্যে সুর ও অসুর উভয়েই এককালে সমাদর পেতেন; বোধহয় ভারতে প্রবেশের পূর্বে আর্যরা এই দুই দেবতাকেই মান দেখাতেন সমভাবে। কিন্তু কালে একটা শাখা বৈদিক ক্রিয়াকলাপ যাগ যজ্ঞের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে, পৃথক হয়ে গিয়ে একমাত্র অসুর দেবতারই উপাসক হয়; তখন 'সুর'-এর পূজকরা অসুরের পূজকদের দৈত্যদানব দুশ্‌মনের সঙ্গে সমান আসনে বসালেন। অসুর দেবতার পূজা

আর্যদের থেকে পশ্চিম এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে পড়তে অবশেষে এশিয়া মাইনরের কাপাদেশিয়া অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল।

ভারতের মধ্যে অসুর নামে এক মহাপরাক্রমশালী জাতির উল্লেখ সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায়; ভারতের স্থাপত্য কলার সঙ্গে অসুরদের নাম জড়িয়ে আছে। প্রাচীন সামাজিক জীবনেও তারা অজ্ঞাত নয়, তার কারণ হিন্দুদের বারো রকম বিবাহ প্রথার একটা হচ্ছে আসুর বিবাহ।

ইরাণীয় বা পারসিকদের সঙ্গেও অসুরের সম্বন্ধ প্রাচীন; পারসিকদের আদি ধর্মগুরু জরদউষ্ট্রের পূর্বে সেদশের মহাদেবের নাম ছিল 'অসুর' বা অহুরমজ্দ। পণ্ডিতদের অনুমান বাবিলনীয়দের মহাদেবের নাম মরদুক তারই অপভ্রংশ হচ্ছে মজ্দ শব্দ। ঐতিহাসিক যুগে ইরাণের শাহনশাহ বা রাজাধিরাজগণ অসুর বা অহুরকে কিভাবে বাবিলনীয় দেবতার সঙ্গে এককরে অহুর-মজ্দ নামে পূজা কায়েম করেন, তার কথা আমরা পরে আলোচনা করব। মোটকথা এই অসুর জাতি এককালে ভারত থেকে পশ্চিম এশিয়ার শেষ সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং তাদেরই লুপ্ত ইতিহাস এখন নানা নামে মানুষের দৃষ্টি গোচর হচ্ছে।

ইতিহাসে ওঠা-পড়ার চাকা সর্বদাই ঘুরছে; এই যাকে দেখা গেল নাগর-দোলার উপরে নিমেষের মধ্যে সে নেমে এল ধূলোয়। অসুরীয়দের রাজ্য ধ্বংস হলো বাবিলনীয়দের হাতে; কল্দি নামে এক নগণ্য উপজাতি পুরাতন বাবিলন নগরে আড্ডা গাড়ে। সর্দার তাদের বুদ্ধিমান লোক। তিনি দেখলেন বাবিলনের পুরোহিত পাণ্ডা দেশের সর্বেসর্বা। চতুর লোকটি জনতাকে ও পুরোহিতদের খুশি করবার এবং দলে পাবার জন্য তাদের দেবতা মরদুক-এর মন্দির নির্মাণ করে দিলো। নিজের দুই ছেলেকে মজুরদের সঙ্গে কাজ করতে পাঠালো,—বাবিলনীয়রা তো মুগ্ধ।

এই-সর্দার পুত্রদের একজনের নাম নেবুকাদনেজার (খৃ পূ ৬০৫—৫৬১)। ইনি রাজা হয়ে বাবিলনকে তার পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। নেবুকাদনেজারের অধিকাংশ সময় দেশ জয়ে ও পররাজ্য লুটপাটে কেটে যায়; তা সত্ত্বেও বাবিলন নগরকে অলকাপুরী করে গড়বার সময় পেয়েছিলেন। সুলতান মামুদ যেমন ভারতের নগর লুঠ করে গজ্নী শহরকে বোগদাদের সমতুল্য করে তুলেছিলেন, নেবুকাদনেজার তেমনি করে চারদিকের

লুঠকরা ধনদৌলত এনে আর যুদ্ধে-বন্দী অগণিত দাসের বেগার শ্রম দিয়ে বাবিলনকে সুন্দর নগরী করে তোলেন। বাবিলন সমতল দেশে অবস্থিত, পার্বত্য মীড় দেশের রাজকন্যা রাজমহিষী হয়ে এসেছেন ; শস্যশ্যামল সমতল দেশ তাঁর পছন্দ হয় না। তাই তাঁর মন রাখবার জন্য কৃত্রিম পাহাড় করা হল মাটি দিয়ে। তার ওপর প্রাসাদ ও সেখানে বাগান হলো। সমতলের মানুষদের চোখে ধাঁধা লাগে, দূর থেকে দেখে মনে করে বাগানটা ঝুলছে আকাশের গায়ে। সে যুগের লোকে পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম মনে করতো এই উদ্যানটিকে (the hanging garden of Babylon)।

নেবুকাদনেজার আশে-পাশের অনেক দেশ জয় করেন। ইরাণের উত্তরে পার্বত্য অঞ্চলে আর্যভাষাভাষী মীড়দের বাস, তাদের রাজকুমারীকে রাজরানী করে আনলেন বলে তাদের সঙ্গে হলো গভীর সখ্যতা। ফিনিকদের বহু নগরী তাঁর অধিকারে আছে। ইহুদীদেরও স্বাধীনতা হরণ করেন তিনি। তারপর জেরুজালেম দখল করে কয়েক হাজার লোককে বাবিলনে এসে বাস করতে বাধ্য করলেন। এটা কেন করেন এবং তার ফলাফল কি হয়েছিল, সে-কথা আমরা পরে বলব। তিনি মারদুক-এর এক বিরাট মূর্তি গড়ে ইহুদীদের বললেন যে সকলকে এই দেবতাদের কাছে পূজা দিতে হবে। ইহুদীরা মূর্তি পূজা করে না, তারা বললে যে তারা ঐ দেবতাদের কাছে মাথা নোয়াতে পারে না, তাদের ধর্মে বাধে। রাজা খুব রেগে গিয়ে তাদের নেতাদের ধরে মন্দিরের অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিলেন ; তারা আগুনে পুড়ে মরলো কিন্তু মিথ্যা দেবতাকে প্রণাম করলো না।

নেবুকাদনেজারের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্যও ভেঙে-চুরে শেষ হয়ে গেল। ধূমকেতুর মত তাঁর আবির্ভাব ধূমকেতুর মতই তাঁর তিরোভাব।

পারস্যের নবীন রাজা কৈয়রুশ (খৃ পূ. ৫৫০—৫৩০) বাবিলনের সিংহদ্বারে উপস্থিত হলে মন্দিরের পুরোহিতরা স্বেচ্ছায় দ্বার খুলে দিল, আগন্তুককে সম্রাট বলে মেনে নিল সহজেই। বাবিলনিয়ার স্বাধীনতা চিরকালের মত অস্তমিত হলো বটে, কিন্তু বাবিলন মহানগরীর শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকলো। কারণ ব্যবসায় বাণিজ্যে, ধর্মে কর্মে দোয়াবের মধ্যে সেরা ছিল বলে সে টিঁকে থাকলো। খৃ পূঃ ৪ শতকে মকিদান রাজ আলেকজেন্দার বাবিলনে তাঁর হেলেনিক সাম্রাজ্যের রাজধানী করেছিলেন। সেই তার শেষ গৌরব।

আরামিন-ফিনিক—ইহুদী

মিশরের নীলনদ-সেবিত উপত্যকা, এবং ইরাকের য়ুফ্রেতিস-তাইগ্রিসের দোয়াব' ছিল প্রাচীন যুগের সভ্যতার কেন্দ্র। মিশর থেকে ফারোয়ার সৈন্যদল, আর বাবিলনের সার্থবাহী উটের সারি আরব মরুভূমির উত্তরের (Fertile crescent) অর্ধ-চন্দ্রাকার শ্যামল পথ দিয়ে চলাফেরা করে আসছে। আজকাল মানচিত্রে সিরীয়া নামে যে রাজ্য দেখা যায় সেইখান দিয়ে ছিল সকলের যাওয়া আসার পথ। যে দেশের বুকের উপর দিয়ে বিদেশীর সৈন্যদল যায় দূর দেশ আক্রমণ করতে, আবার পরাজিত হয়ে পালিয়ে আসবার সময় যাদের সেই পথই ধরতে হয়, সে-দেশের রাজ্য শাসন কখনো শক্ত হয়ে গড়ে ওঠে না। রাজনৈতিক দিক থেকে সিরীয়া প্রতিষ্ঠিত হতে না পারলেও অর্থ-নৈতিক দিক থেকে অধিবাসীরা ষোলো আনি সুযোগ আদায় করে নিতো যারা আসাযাওয়া করতো দেশের মধ্য দিয়ে তাদের কাছ থেকে। সৈন্যদের খাদ্য, পানীয়, অস্ত্র-শস্ত্র পোষাক পরিচ্ছদ, ঔষধপথ্য চাই—উট-খচ্চর চাই। মোটকথা সেসব যুদ্ধ যাত্রীদের অসংখ্য চাহিদা। মেটাতে হয় সিরিয়ার নগরগুলিকে। পাকা বেনীয়া হয়ে উঠলো এখানকার লোকেরা। আজকালও মহাযুদ্ধে যারা কোন পক্ষে যোগ-না দিয়ে ধার্মিক সেজে বসে থাকে তারা টাকা লোটে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করে—দুপক্ষের প্রতি তাদের সমান দরদ।

ইতিহাসে সিরীয়া* দেশের লোকেদের নাম দেওয়া হয়েছে আরামিন (Aramean); এদের আদিবাস হয়তো ছিল আরাবিয়ার অনির্দিষ্ট কোনো মরুস্থানে। তারপর এখানে এসে তারা হয়েছে বণিক শিল্পী ও ব্যবসায়ী। পথের যাত্রীদের চাহিদা মেটাতে মেটাতে নগরগুলি বেশ জমকালো হয়ে ওঠে। বাণিজ্যের জন্য নানা দেশে তারা ঘুরেও বেড়ায়। ফলে তাদের ভাষা পশ্চিম এশিয়ার কথ্যভাষা হয়ে ওঠে। যীশুখৃষ্ট যেভাষায় কথা বলতেন, তা হীব্রু নয়, তা এই আরামাইক ভাষা, এই ভাষায়

* বাবিলনীয় ভাষায় 'সুরি' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'পশ্চিম'; তার থেকে গ্রীকরা এদেশকে বলে সিরীয়া।

ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থর কিছুটা লেখাও হয়েছিল। আরামাইকদের ভাষা ও লিপির প্রভাব পারসিকদের মধ্যে খুবই স্পষ্ট করে পাওয়া গেছে। মধ্যএশিয়ার খরোষ্ট্রি লিপি এদের লিপির অনুকরণে রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে এই লিপিতে মহারাজ অশোকের শিলালেখা উৎকীর্ণ। এ-লিপি পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য লিপির মত ডান দিক থেকে বাঁ দিকে লেখা।

আরামিনদের ব্যবসায় বাণিজ্য চলতো দেশের ভিতর-ভিতর। তাদের নগরগুলি কোনটাই সমুদ্রতীরে অবস্থিত নয়, যেমন কারচেমিশ, আলেপ্পো (হালের) অন্তিয়োক, পালমিরা, দামাস্কাস—সব নগরগুলি ইতিহাস বিখ্যাত।

আরামিনদের দেশের দক্ষিণে লেবানন পর্বতের পশ্চিমে সংকীর্ণ সমুদ্র-তীরে যারা বাস করতো তারা ইতিহাসে ফিনিক বা ফিনিশীয়ান নামে খ্যাত। একসময়ে মধ্য-ধরণী সাগরের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ছিল তাদের হাতে। মিশর, উত্তর আফ্রিকা, সিসিলি, দক্ষিণ ইতালী, গ্রীস, সাইপ্রাস, ক্রীট নিয়ে একটা আন্তর্জাতিক তথা অর্থনৈতিক বৃত্তের কল্পনা করা যেতে পারা যায়, ফিনিকরা ছিল এই পরিমণ্ডলের বণিক।

ফিনিকদের দেশ মধ্যধরণী সাগরের তীরে লম্বমান, উত্তর-দক্ষিণে একশ' মাইলের মধ্যে ও প্রস্থে দশ-বারো মাইলের বেশি নয়। সে-দেশের পশ্চিমে লেবানন পাহাড় দামী মজবুত আরণ্য বৃক্ষপূর্ণ। এই কাঠে জাহাজ হতো ভাল। তাই এই কাঠের চাহিদা ছিল এককালের 'বর্মা' টীক্ বা সেগুনের মতো।

সমুদ্রের তীরে সংকীর্ণ ভূভাগে যে সভ্যতা গড়ে ওঠে তা কখনো কৃষি প্রধান হতে পারে না। সমুদ্র তাদের নাবিক ও বণিক করে তোলে। বাবিলনীয় বণিকরা সুদূর ভারতও পারস্য থেকে যে সব দামী জিনিষপত্রে আনতো, তা তারা আরামিনদের হাতে সমর্পণ করে চলে যেতো। আরামিনরা দেশের ভিতর ভিতর মালপত্র বিকিকিনি করে, উদ্‌বৃত্ত জিনিষ চালান দিত ফিনিকদের কাছে। ফিনিকরা জাহাজে করে সেইসব মাল মধ্যধরণী সাগরের ঘাটে ঘাটে ফিরী করতো, বিনিময়ে সেসব দেশের কাঁচামাল আনতো— মুদ্রা বা টাকা পয়সার লেনদেন তখনো চালু হয়নি।

ইতিহাসের আদিযুগে ফিনিকদের যখন সমুদ্রের তীরে দেখা গেল, তখন

তারা মাছ ধরা জেলে মাত্র। সুবিধা পেলে জেলে ডিঙ্গী করে মিশর ও ক্রীটের সদাগরী জাহাজের উপর হানা দেয়, লুটপাট করে। ক্রমে এরা বড় বড় ডিঙ্গী নৌকা বানায় ও ব্যবসা বাণিজ্য করতে সুরু করে।

কিন্তু এদের সৌভাগ্য সূর্য উদয় হলো ক্রীটদ্বীপের সুদিনের সূর্য অস্ত গেলে। ক্রীট ছিল সাগরের রাণী—তাদের উত্থান—পতনের ইতিহাস আমরা অন্যত্র আলোচনা করবো। ক্রীটের রাষ্ট্রনগরীগুলি অজানা কারণে ধ্বংস হয়ে গেলে মধ্যধরণী সাগরে পরিবহন ও বাণিজ্যের স্থানটি দখল করে ফিনিকরা। সাগরের বাণিজ্য তাদের হাতে এসে গেলো। ফিনিকরা যে কেবল পরের মালপত্র বন্দরে বন্দরে ফেরি করে বেড়ায় তা নয়, তাদের নিজেদের তৈরী বিশেষ একরম রঙিন কাপড় তারা বিক্রয় বা বিনিময়ের জন্য নিয়ে যায় দেশে দেশে। এই রঙের রহস্য বহুকাল কেউ জানতে না পারায় এই কাপড়ের ব্যবসা ছিল তাদের একচেটিয়া।

ব্যবসায়ী জাত বলে এরা রাজ্য গড়েনি—গড়েছিল রাষ্ট্রনগরী টায়ার, সিডন, বিবলোস প্রভৃতি বন্দর-নগর, সবাই স্বস্ব প্রধান। নগরে-নগরে রেশারেশি খুব—যেমন গ্রীসের আথেন্স কোরিন্থের মধ্যে ছিল, যেমন মধ্য যুগের ইতালির জেনোয়া ভেনিসের মধ্যে, যেমন আমাদের দেশের কাশী কোশলের মধ্যে। যাইহোক, তৎসত্ত্বেও একটা সামান্য সংস্কৃতি ও ধর্মের শিথিল বন্ধন ফিনিকদের এক করে রেখেছিল।

কিন্তু তাদের সমস্যা দেখা দিল অচিরেই। সমুদ্রের তীরের একফালি দেশের মধ্যে লোকেদের সংকুলান হয় না। তাই তারা মধ্যধরণী সাগরতীরে উপনিবেশ গড়তে সুরু করলো। উত্তর আফ্রিকার তাদের 'নয়া নগর' বা 'কার্থাডা' ইতিহাসে কার্থেজ নামে খ্যাত। এছাড়া সিসিলি, সার্দিনিয়া, স্পেন, বালেরিক দ্বীপপুঞ্জেও নানা স্থানে বাণিজ্যের কুঠী ও কালে সেই সব কেন্দ্রে গড়ে ওঠে উপনিবেশ। মিশরের পতনের পর আফ্রিকার কার্থেজ মধ্যধরণী সাগরের রাণী হ'য়ে দুই তিনশত বৎসর প্রভুত্ব করে। এদের কথা আসবে রোমের ইতিহাসের সময়।

ফিনিকদের বাণিজ্য তরণী মধ্যধরণী সাগর পেরিয়ে অতলান্তিক মহাসাগরের তীরে তীরে চামড়া, টিন, দস্তা, সোনার সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়; যুগটা ব্রোন্জের—অর্থাৎ দস্তাতামার মিশ্রধাতু দিয়ে সামগ্রী বানানোর যুগ। ও দুটো ধাতুর খোঁজে তারা ঘুরতো দেশে দেশে। ব্রিটনদের দ্বীপেও তারা যায় টিনের সন্ধানে।

'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী'—তাই ফিনিক নগরগুলি বিপুল ধনের অধিকারী হয়ে উঠলো। একদিন তাদের উপর দৃষ্টি পড়লো পারসিক শাহনশাহদের। পারসিক সম্রাট দিগ্বিজয়ে বের হয়েছেন—গ্রীস আক্রমণ করবেন। কিন্তু পারসিক সৈন্যরা সমুদ্র চোখে দেখেনি, অথচ সাগর পাড়ি দিয়ে গ্রীস আক্রমণ করতে হবে। তাই ফিনিকদের নগরগুলি দখল করে, তাদের জাহাজগুলিকে গ্রীকদের বিরুদ্ধে লড়াইএর জন্য লাগানো হলো। ফিনিকদের এ-লড়াই-এ আপত্তি ছিল না। ভূমধ্যসাগরে বাণিজ্য বিষয়ে গ্রীকরা এখন তাদের দুরন্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। সুতরাং পারসিকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে গ্রীক বণিকদের ধ্বংস করার সুযোগটা তারা ছাড়বে কেন। পারসিকদের সাহায্য করার ফলে, গ্রীকদের খুব ক্ষতি হয়, গ্রীকরা সে-কথা কখনো ভোলেনি। অনেক বৎসর পরে মসিদানের রাজা আলেকজান্দার গ্রীকদের মুরুব্বি সেজে ফিনিকদের উপর শোধ তুলেছিলেন; এমন নিষ্ঠুর প্রতিশোধ তোলেন যে চিরকালের মতো ফিনিকদের টায়ার, সিডন প্রভৃতি বন্দর-নগরগুলির নাম ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যায়। গ্রীকরা মিশর জয় করে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর স্থাপন করায়—ব্যবসায়ের ভারকেন্দ্র লেভান্ট ও এশিয়ার উপকূল থেকে সরে গিয়ে আফ্রিকায় নীলনদের ব-দ্বীপের মুখে জমলো। মধ্য-প্রাচ্য বা এশিয়াফ্রিকার ও দক্ষিণপূর্ব য়ুরোপের অর্থ-নৈতিক পরিস্থিতির উলট পালট হয়ে গেল বাণিজ্যের ভারকেন্দ্র সরে যাওয়াতে।

প্রাচীন জগতের ফিনিকরা ইতিহাস থেকে লুপ্ত হয়েছে সত্য, কিন্তু তাদের একটা দানের জন্য তারা অমর হয়ে আছে সেটা হচ্ছে তাদের 'বর্ণমালা'। গ্রীকরা যে বর্ণমালা ব্যবহার করে, তা তারা শিখেছিল ফিনিক বণিকদের কাছ থেকে। গ্রীকদের কাছ থেকে লিপিবিদ্যা পায় রোমানরা, আজ দুনিয়ার বড় একটা অংশে 'রোমান' লিপি চালু। আর গ্রীক ও রুশীয়লিপি মালাও এই প্রাচীন লিপির বিকল্প মাত্র।

তবে এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে ফিনিকরা লিপি-মালার প্রচারক, উদ্ভাবক নয়। অতি প্রাচীনকালে উত্তর সেমেটিকদের মধ্যে বর্ণমালার (Alphabet) সাহায্যে লেখবার প্রথম প্রয়াস হয়েছিল; তাদের সেই পদ্ধতি ফিনিকরা শিখে নিয়ে কিছু উন্নতি করে নিজেদের কাজকর্ম চালাতো। গ্রীকরা প্রথমে সেমেটিকদের মতো ডান দিক থেকে.

বাঁ দিকে লিখতো। পরে বাঁ দিক থেকে লেখবার রেওয়াজ হলে হরপগুলিরও আকার যায় বদলে। আশ্চর্যের বিষয়ে ক্রীটে অতি প্রাচীনকাল থেকে যে এক প্রকার লিখন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল গ্রীকরা সেটা গ্রহণ করেনি। অনুরূপ ঘটনা ঘটে ভারতেও; আর্য ভারত যে লিপি উদ্‌ভাবন করে, তা প্রাচীন হারাপ্পা সভ্যতার সীলমোহরের পাওয়া লিপি নয়; ভারতের লিপি বাইরে থেকে পাওয়া বলেই অনুমান। তবে মতভেদ আছে যথেষ্ট।

কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে বৈদিক সাহিত্যের 'পণি'রা ফিনিক। বেদে আছে পণিরা ধনী অথচ যাগযজ্ঞ করে না, দক্ষিণা দেয় না; সেইজন্য দেব-পূজকদের সঙ্গে তাদের শক্রতা; তারা সুদখোর, তাদের ভাষা দুর্বোধ্য (মৃদ্‌বাক্)। আমাদের মনে হয় পণিরা যা লেনদেন করে তাই হচ্ছে 'পণ্য'। বণিক শব্দর সঙ্গে ফিনিক বা ফনিক শব্দের মিলও কল্পনা করা হয়। তবে এই শ্রেণীর শব্দের ঐক্যের মধ্যে কতখানি ধ্বন্যাত্মক কল্পনা আছে তা বলা কঠিন; সেজন্য কোনো সিদ্ধান্তে আসা সম্বন্ধে হুশিয়ার হওয়াই ভালো।

ইহুদীদের কথা

এশিয়া-আফ্রিকার যাওয়া আসার পথের বাইরে ছিল ফিনিকরা। মিশর থেকে ইরাকে বা আনাতোলিয়া থেকে মিশরে যাবার পথের উপর পড়ে সীরিয়া আর পড়ে ইহুদীদের রাজ্যগুলি। ঘোড়সওয়ারের দল ও উটের সারি সীরিয়া ও ফিলিস্তান (ইসরাইল) দেশ মাড়িয়ে মাড়িয়ে যায় আসে, তছ্‌নছ্‌ করে দেয় সব। তাহলেও বিদেশী সৈন্যদের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করে অধিবাসীরা পয়সা রোজগার করে ভাল রকমে। ফিলিস্তান দেশটা পার্বত্য, গাছপালা কম, শুকনো পাহাড়ের মাঝে উপত্যকার পর উপত্যকা। কঠিন শ্রম করলে তবেই সেখানে গম, যব, ডুমুর, আঙ্গুর উৎপন্ন হয়। এইসব উপত্যকায় ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতির বাস। মিলেমিশে কোনো রাষ্ট্র গড়া ও চালান তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি এই প্রাকৃতিক কারণেই। প্রতিকূল পরিবেশে শহরগুলোও সীরিয়ার শহরের মতো ঐশ্বর্যশালী হতে পারেনি। এইভাবে বিচ্ছিন্ন উপত্যকার মধ্যে যারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠিতে বিভক্ত হয়ে বাস করতো—ইতিহাসে তারা ইহুদী নামে পরিচিত।

অতি প্রাচীনকালে হাবরু বা হীব্রুরা (ইহুদীরা) অন্যান্য সেমেটিকদের ন্যায়ই মরুচর, অর্ধযাযাবর ছিল। বালু-সাগরের মধ্যে ছোট ছোট মরুদ্যানে খাদ্য ও পানীয় পায়; ধরিত্রীর এই রহস্য তাদের মুগ্ধ করে। তারা মনে করে দেবতারা তাদের সন্তানদের রক্ষক। ধর্মভয় ও ধর্মভাব এ জাতের লোকের মধ্যে আদিযুগ থেকেই বেশি স্পষ্ট। এই হাবরু বা হীবরু জাতির নানা শাখা উপশাখা ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে হাজির হলো ফিলিস্তানে। স্থানীয় লোকদের মধ্যে হিটাইতরাই ছিল বেশি; তাদের সঙ্গে এরা মিশে গেল। ইহুদীদের খাঁড়ার মত নাক হিটাইতদের সঙ্গে মিশেযাবার চিহ্ন মনে করেন পণ্ডিতরা। আদি ইহুদীদের বোধ হয় এতটা খাড়া নাক ছিল না।

এই ইহুদীদের এক শাখা (রাখেল) মিশরে যায় দুর্ভিক্ষের তাড়নে,

খেতে না পেয়ে। যুসুফ নামে এদেরই একজন যুবক বুদ্ধি বলে মিশরের ফারায়োর অনুগ্রহভাজন হয়ে প্রদেশপাল পর্যন্ত হয়েছিলেন। এই ফারায়োরা ছিলেন বিদেশী হিকসস্‌ জাতীয়; তাই বিদেশী ইহুদীদের আশ্রয় দিতে বা তাদের বড় চাকরী দিতে কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু হিকসদের পরে খাঁটি মিশরীয়রা যখন ফারায়ো হলেন, তখন তাঁরা ইহুদী-খেদা হুজুগ আরম্ভ করে দেন। ইহুদীরা যায় কোথায়? দুনিয়ার উদ্‌বাস্তুদের যে দশা, এদেরও সেই দশাই হয়। মুসা (Moses) নামে এক জবরদস্ত নেতা মিশর থেকে তাদের বের করে লোহিত সাগর পার হয়ে চললেন নূতন দেশের সন্ধানে কিন্তু পুনর্বাসনের জায়গা কোথায়! পুরাতন বাসিন্দারা নূতনদের স্থান দেয় না। দীর্ঘকাল যাযাবরের মতো ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে তারা কানান দেশে এসে পৌঁছিল। সে-দেশ দখল করে নিতে দীর্ঘকাল কেটে যায়। কানান দেশটা হলো বর্তমান ইসরাইলের সমুদ্র-উপকূলস্থিত অংশ।

কানানীদের সঙ্গে নূতন লোকদের মিলমিশ কোন রকমে হলো বটে কিন্তু ফিলিস্তানী বলে যারা সেদেশের আসল মালিক, তাদের সঙ্গে বনিবনা কিছুতেই আর হয় না। ফিলিস্তানীরা আদিবাসী কানানী ও নবাগত ইহুদী দুই জাতকেই ঘৃণার চোখে দেখে। তারা নাকি এসেছিল সমুদ্রপারের কোন এক দ্বীপ থেকে; পণ্ডিতরা বলেন ক্রীট ধ্বংস হলে সেখানকার একদল লোক পালিয়ে এখানে এসে ওঠে। অতীত যুগে তারা বড় জাত ছিল বলে নূতন দেশে এসে অন্যের উপর ঘৃণায় নাক সিটকে থাকতো। ইংরেজিতে সেইজন্য ফিলিষ্টাইন (Philistine) কথাটা ব্যবহার করা হয়—যার অর্থ অসংস্কৃতিমনা বা অসভ্য।

কিম্বদন্তী যে, ইহুদীদের 'বারো'জাত কখনো এক হয়ে রাজ্য গড়তে পারেনি যেমন পারেনি সীরিয়ায় আরামিনরা, যেমন পারেনি ফিনিকরা। ইহুদীদের 'জজ' শাসকরা অনেকটা গ্রাম্য মোড়লদের মত বিচার বিবেচনা করতেন আদিযুগে। কিন্তু এভাবের শাসন ব্যবস্থায় তো দেশরক্ষা করা যায় না, শত্রুজয় তো দূরের কথা। এককর্তৃত্বের জন্য একদল লোক উৎসুক হয়ে সল্‌ নামে দক্ষিণী এক ইহুদী-সর্দারকে 'রাজা' করে দিল। কিন্তু তাদের মধ্যে সামুএল নামে যে প্রোফেট বা ঋষিতুল্য লোকটি ছিলেন, তিনি সল্‌কে আদৌ পছন্দ করতেন না। তিনি ধর্মরাজ্য গড়তে চান, রাজতন্ত্র

নয়। সল্ ফিলিস্তানীদের সঙ্গে যুদ্ধে মারা পড়লে, তাঁর সুযোগ্য জামাতা দাউদ রাজা হয়ে ইহুদীদের মধ্যে একতা, নিষ্ঠা প্রভৃতি আনলেন, ও ফিলিস্তানীদের যুদ্ধে হারিয়ে জেরুসালেম শৈলদুর্গ দখল করলেন। জেরুসালেম হাতে আসায়, ইহুদীদের মধ্যে সাময়িকভাবে আত্মবিশ্বাস দেখা দিল। দাউদ প্রাচীন ইতিহাসের এক অদ্ভুত চরিত্র—পাপে পুণ্যে, দোষে গুণে জড়ানো মানুষ।

জেরুসালেমে ইহুদীদের মন্দির নির্মিত হলো; তাদের দেবতার নাম ছিল যাহবা (Jahweh Jehova): এই দেবতা ছিলেন আদিযুগে তাইগ্রীস দোয়াবের উর (Ur) অঞ্চলের গ্রাম্যদেবতা; যাযাবর যুগে ইহুদীদের সঙ্গে সঙ্গে দোলায় চড়ে ভক্তদের কাঁধে কাঁধে চলতেন; যেমন আমাদের দেশে মনসা শীতলা নিয়ে লোকে ঘুরে বেড়ায় এখনও। সেই গ্রাম্যদেবতা যাহবা হয়েছেন ইহুদীদের মহাদেব। ইহুদীরা কালে অমূর্ত্ত একেশ্বরের পূজক হয়েছিল; কিন্তু সে বিশ্বাস ও ভক্তি পেতে দীর্ঘকাল লাগে।

যাহোক্, জেরুসালেমের নূতন মন্দিরে যাহবার আর্ক বা দোলা প্রতিষ্ঠিত হলো। মরুভূমির খোলা মাঠের দেবতা এবার মন্দিরের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী হলেন। সব ধর্মেই দেখা যায় ভক্তদের ধন দৌলত যেমন যেমন বেড়ে চলে, মন্দিরের আয়তনও বেড়ে চলে তার সঙ্গে—আর পূজার উপচার সমারোহও বৃদ্ধিপায় যুগপত। জেরুসালেমের মন্দিরেরও হলো তাই।

দাউদের পর সলোমন রাজা হলেন, কিন্তু অনেক রক্তপাতের পর; তার কারণ রাজারা অনেকগুলি বিবাহ করেন এবং পত্নীদের অনেকগুলি সন্তান জন্মে, সকলেই পিতার গদী পাবার জন্য উৎসুক। শেষ পর্যন্ত মীমাংসা হয় খুনোখুনী ও রক্তপাতের পর। যে চতুর অথচ বীর সেই পায় রাজতক্ত। সলোমন (খৃঃ পূঃ ৯৭৩—৯৩৩) এই বিবাদে উৎরে গিয়ে রাজা হন। সিংহাসনে বসে তিনি অবশ্য অনেক হিতকর কাজে মন দেন; ফিনিশিয়ার টায়ার নগরীর রাজা হিরিয়ামের (খৃঃ পূঃ ৯৬৯—৯৩৬) সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করে, জেরুসালেমের মন্দিরটি ভাল করে নির্মাণ করলেন; অবশ্য এই সহায়তার মূল্য তাঁকে দিতে হয়েছিল। টায়ার মধ্যধরণী সাগর তীরে অবস্থিত, ফিনিকদের পক্ষে ভারত মহাসাগর তীরে আসবার উপায় ছিল না। হিরিয়াম ইসরাইলের ভিতর দিয়ে সেই পথ পেয়ে আকাবা উপসাগরে

বাণিজ্য করবার সুবিধাটা আদায় করে নিলেন। আকাবা উপসাগরে আসতে পারায় ফিনিকদের পক্ষে এশিয়া, আফ্রিকার কূলে কূলে বাণিজ্য তরণী নিয়ে চলাফেরা সুবিধা হলো। বর্তমানে এই আকাবা উপসাগরের একটা কোণে ইসরাইল রাজ্যের বন্দর (Eitat) অবস্থিত। প্রসঙ্গত বলি, অনুকূল বন্দর পাবার জন্য বর্তমান যুগেও প্রবল রাষ্ট্রগুলি দুর্বল বা অনুন্নত জাতির উপর নানা রকমের বুদ্ধির চাল চেলে থাকেন, তেমন-তেমন হলে যুদ্ধও করেন।

বিদেশের সহিত মিত্রতা করবার জন্য আকবর শাহের মতো চতুর সলোমনকে নানা জাতির পত্নী ও তাদের কুটুম্বদের জন্য নানা ধর্মের পূজাদি ব্যবস্থা করতে হয়। ইহুদীদের প্রোফেটরা এইসব পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী। সলোমন যাহবার পূজক হলেও অন্য দেবতাদেরও সহ্য করতেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। তাঁর সময়ে জেরুসালেম মন্দিরে জাঁকিয়ে জীববলি হতো পূজার সময়ে। ইহুদীদের মধ্যে বল (Baal) দেবের পূজা হতো—জোড়া-বাছুর ছিল প্রতীক (Calves)। নিষ্ঠুর জীববলি এমনকি নরবলিও হতো। এই ধর্ম রদ করবার জন্য চেষ্টা হতো মাঝে মাঝে।

সলোমনের মৃত্যুর পর হীবরুদের বারো জাতির দশটি একত্র হয়ে ইসরাইল রাজ্য গড়ে—তাদের রাজধানী সামারিয়া। অবশিষ্ট দুটিতে মিলে হলো জুডা রাজ্য—তাদের রাজধানী জেরুসালেম। বর্তমান জেরুসালেমের এই অংশ পড়েছে জর্দনের ভাগে; ইহুদীরা নতুন নগর নির্মাণ করেছে নিজেদের এলাকার মধ্যে।

আত্মকলহে দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন ইহুদীরা অল্পকালের মধ্যে স্বাধীনতা হারালো। এখন পশ্চিম এশিয়ায় ইরাকের দোয়াবে অসুরীয়রা প্রবল, মিশরের শক্তি বহুদিন অস্তমিত। একদিন অসুরীয় সৈন্যদল এসে সামারিয়া দখল করে বহু সহস্র নরনারীকে বেঁধে নিয়ে চলে গেল নিনেভায়। ইসরাইলের এই পরাজয়ে জুডায় ইহুদীরা অবাক। তাদের বিশ্বাস যে ইহুদীদের মহাদেব যাহবা সর্বশক্তিমান। তবে কেন তিনি ভক্তদের রক্ষা করতে পারলেন না! তবে কি অসুরীয়দের দেবতা অসুর-মরদুক যাহবা থেকে অধিক শক্তিমান! কিন্তু অচিরেই তারা দেখলে যে—তাদের দেবতারই জোর বেশি।

ইসরাইল ধ্বংসের পর অসুরীয় সম্রাট সেনাকরীব (খৃঃ পূঃ ৭০৫—৬৮১) জুডা আক্রমণ করলেন। ঋষি ইসায়া লোকদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'ভয় নেই, ভগবনে সহায়।' ইতিমধ্যে সেনাকরীবের সৈন্যদের মধ্যে মড়ক দেখা দিলে, বেগতিক বুঝে রাজা জেরুসালেম অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে সরে পড়লেন। এই ঘটনায় ইহুদীদের বিশ্বাস হলো যে যাহবা তাদের রক্ষা করলেন, সুতরাং যাহবাই প্রধান দেবতা ; অসুরদের দেবতা তাদের রক্ষা করলো কই ?

কিন্তু অচিরকালের মধ্যেই দেখা গেল কারও দেবতা কাউকে রক্ষা করে না বা করতে পারে না। বাবিলনের সম্রাট নেবুকাদনেজার এলেন জুডা জয় করতে। জেরুসালেম দখল করে অধিবাসীদের দুর্বল করে দেবার জন্য দশ হাজার ইহুদীদের বন্দী করে বাবিলন নগরে চালান করে দিলেন। এতেও বাবিলনের আশ মিটলো না, কয়েক বৎসর পরে বাবিলনীয় সৈন্য এসে জেরুসালেমের মন্দির ভেঙে, নগর লুঠ করে চলে গেল। দেবতা যাহবা রক্ষা করতে পারলেন না তো! হিন্দুদের কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির আর ইহুদীদের মিলনের কেন্দ্র এই জেরুসালেমের যাহবা মন্দিরের একই দশা হয়। বিজয়ীরা জানে যে মন্দির বা ধর্মস্থান ধ্বংস করতে না পারলে পরাজিতের উপর আঘাতটা পুরোপুরি হয় না ; তাদের জাতীয়তা বোধটা বিলোপ করার উদ্দেশ্যেই এই দুর্বৃত্তপনা করা হয়।

এখনো ধর্মসম্বন্ধে মূঢ় ধারণা সমূলে উৎপাটন করবার জন্য বিজয়ী প্রবল পক্ষীয় বিজিত দুর্বলদের শিক্ষার মাধ্যমে মস্তিষ্ক-ধোলাই (brain wash) করার ব্যবস্থা করেন।

বাবিলনে ইহুদীরা ছিল সত্তর বৎসর অর্থাৎ যারা গিয়েছিল তাদের পৌত্র দৌহিত্রদের সময় পর্যন্ত। এই নির্বাসন থেকে ইহুদীদের ইতিহাসের নূতন পরিচ্ছেদের সূত্রপাত। বাবিলনে এসে ইহুদীরা সব প্রথম সভ্য সমাজ ও রাজ্যের সঙ্গে পরিচিত হলো। বাবিলনীয়দের কাছ থেকে ইহুদীরা প্রাচ্যের জ্ঞান বিজ্ঞান, ধর্ম পুরাণ, ব্যবসায়-বাণিজ্য নীতি, শিল্পকলা, অনেক কিছুই আয়ত্ত করে। যে-একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে ইহুদীদের প্রবাদগত নিষ্ঠা ও খ্যাতি সে সম্বন্ধে প্রথম স্পষ্ট ধারণা তারা পায় বাবিলনবাসী পারসিকদের কাছ থেকে। যাহবা ইহুদী জাতিরই বিশেষ দেবতা নন, তিনি বিশ্বদেব, বিশ্বাত্মা—এই তত্ত্ব তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয় নির্বাসনকালে পারসিক পণ্ডিতদের তত্ত্বকথা শুনে।

সত্তর বৎসর নির্বাসন বাসের পর বাবিলনিয়া রাজ্য ও মহানগরী পারসিক সম্রাট কৈরুসের অধিকারে আসে। তিনি ইহুদীদের মুক্তি দিয়ে জেরুসালেমে ফিরিয়ে পাঠান। প্রায় পঞ্চাশ হাজার ইহুদী জুডায় ফিরে এলো। কিন্তু কোথায় তাদের জমি জমা ঘরবাড়ি, অন্যেরা দখল করে বসে আছে। তীব্র সমস্যা দেখা দিল পুনর্বাসন সম্পর্কে, যেমন দেখা দিয়েছে আজকাল আরব-ইহুদীদের মধ্যে। তবে সে যুগে বাইরের উসকানি ছিল না বলে সমস্যাটা খুব বেশি দূর গড়ায়নি।

বিজয়ী পারসিক শাহনশাহ কৈরুস উদারভাবে বহু অর্থ দিলেন জেরুসালেমের মন্দির মেরামতির জন্য; নেবুকাদনেজারের লুণ্ঠিত তৈজসপত্র মন্দিরে ফিরিয়ে পাঠালেন। বলা বাহুল্য এসব কৈরুস করলেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। অতবড় একটা প্রাণবন্ত জাতিকে দয়া দাক্ষিণ্য ভালবাসা দেখিয়ে যদি আপনার দলে টানা যায়! বাবিলন বাসী পারসিকদের আর্থিক ও শিল্পীর সুবিধা সুযোগ বাধাহীন করবার জন্যও হয়তো ইহুদীদের স্বদেশে ফিরিয়া পাঠাবার প্রয়োজনটা বুঝে থাকবেন শাহনশাহ।

জেরুসালেমের মন্দির মেরামতীর পর সে-মন্দিরে আর মূর্তি বা প্রতীক রাখা হলো না; যাহবা সম্বন্ধে এখন ইহুদীদের ধারণা অনেক পরিশুদ্ধ হয়েছে। প্রাচীন জগতের ইতিহাসে ইহুদীদের ইতিহাস খুবই শিক্ষাপ্রদ; একটি আদিম জাতি কীভাবে ধীরে ধীরে ঈশ্বর সম্বন্ধে বিরিশুদ্ধ ধারণার অধিকারী হলো তার আনুপূর্বিক ইতিহাস জানা যায় এদের কাহিনী থেকে। বাবিলন থেকে ফিরে আসাবার পর এই ইহুদীরা 'জু' (jew) নামে পরিচিত। এই সময় থেকেই তাদের ইতিহাস, পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতি লিখিত ও সংগৃহীত হতে আরম্ভ হয়।

পারসিকদের পতনের পর ইহুদীদের রাজ্য মকিদানের রাজা আলেকজান্দারের দখলে আসে। সে ইতিহাসে আবার আমরা পরে ফিরে আসবো।

ইহুদীদের প্রাচীন কাহিনী, বিধিবিধান, ঋষিবাক্য প্রভৃতি হীব্রু ভাষায় লিখিত ও সংগৃহীত হয়েছে; তাদের ধর্মগ্রন্থকে গ্রীক ভাষায় বলে বাইবেল,—এবং সেই শব্দটাই সর্বদেশে চলে আসছে। বাইবেল শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে গ্রন্থ। মধ্যধরণী সাগরের পূর্ব দিকে বিবলোস

নামে এক বন্দরে মিশর থেকে পাপাইরাস (paper) আসতো এবং সেখানে অনুলেখকগণ গ্রন্থের অনুলেখন কপি করতো পাপাইরাসের উপর। বিবলোস (বর্তমান জুবাইল) বন্দর থেকে লেখবার প্রধান উপকরণ কাগজ দেশ বিদেশে ছড়িয়ে যেতো ব'লে লোকে কাগজের উপর লেখা বইগুলিকেই 'বাইবেল'* বলতে সুরু করলো, কালে ইহুদী ও খৃষ্টানদের গ্রীকভাষায় লেখা ধর্মগ্রন্থের নামও হয় বাইবেল।

পৃথিবীতে ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমান ছাড়া ধর্মগ্রন্থের প্রতি এমন অচলা ভক্তি ও নিষ্ঠা আর কোন ধর্মে দেখা যায় না; আধুনিক যুগে ভারতে শিখদের 'গ্রন্থসাহেব' অনুরূপ সম্মান পেয়ে থাকে।

ইহুদীদের ইতিহাসে রাজা মহারাজাদের কাহিনী থেকে ঋষি বা প্রফেটদের কথাই বেশী পাওয়া যায়। আদিম যুগের মূঢ় জড়বাদী ধর্ম-বিশ্বাস থেকে সুরু করে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ পর্যন্ত সব স্তরের ইতিহাস আছে হীব্রু ভাষায় লেখা পুরাতন বাইবেলের মধ্যে।

ইহুদীদের মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্যের সূত্রপাত হয় রাজশাসনের আবির্ভাবের সঙ্গে; এই শ্রেণী সংগ্রামে নায়কত্ব করেন প্রফেটরা,— একেশ্বরবাদের তত্ত্বের তাঁরাই প্রচারক। সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণীভেদের বিরুদ্ধে সব প্রথম তীব্র প্রতিবাদ করেন আমোস নামে এক দীন দুঃখী মেষপালক। তাঁর পরে হোসিয়া, ইসায়া, জেরেমিয়া, ইজেকেল প্রভৃতি প্রফেটগণের উপদেশে ইহুদীদের ধর্মবিশ্বাসের অনেক বদল হয়। এই প্রফেটদের ধারায় আসেন জন্ ও যীশুখৃষ্ট। সকলেই এঁরা প্রেমের ধর্ম প্রচার করে বলেন ঈশ্বরের চোখে সব মানুষই সমান, সকলেই তাঁর সন্তান। এ কথাটা সেদিন খুব নূতন ঠেকেছিল কারণ অতিবুদ্ধিমানেরা মনে করতেন যে সকল মানুষ সমান নয়, সমান হতেও পারে না। দীন দুঃখীরা তো সাম্যভাবের দাবী করবেই—দাবী করলেই কি দাবী মানতে হবে এই ছিল সেকালের মনোভাব। ইহুদীদের ও হিন্দুদের ধর্ম, আচার ব্যবহারে কিছুটা মিল পাওয়া যায়; ইহুদীদের স্মৃতিশাস্ত্র বা তোরা-য় (Torah) কত নিয়ম নিষেধ, ভাষ্যকারদের কত রকম ব্যাখ্যা। যে সব জটিল তথ্য ও তত্ত্ব মধ্যে প্রবেশ করলে দিশাহারা হতে হবে।

* Bibliography, Bibliotheque প্রভৃতি শব্দের মূলে আছে biblo শব্দ

ক্রীট (Crete)

এইবার আমরা এশিয়া আফ্রিকার পশ্চিমাংশের দেশ ছেড়ে মধ্যধরণী সাগরের দ্বীপ ও তটভূমে প্রবেশ করবো এবং তারপর ভারতের (পাকিস্তান) সিন্ধু সরস্বতী তীরে অতি প্রাচীন কালে মানুষ যে সভ্যতার পত্তন করেছিল সে কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো।

সিন্ধু ও সুমেরীয় সভ্যতার প্রায় একই সময়ে পশ্চিমে ক্রীট দ্বীপে ও পূর্ব সিন্ধুনদের অববাহিকায় দুইটি শহরে সভ্যতার অভ্যুদয় হয়। এই দুই জায়গার ইতিহাসের মালমশলা হচ্ছে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের খুঁড়ে-পাওয়া ঘর-বাড়ি, তৈজস পত্র, সীলমোহর, কাদা-পাটায় অজানা হরপে লেখা কি সব কথা! লেখাগুলি কেউ পড়তে পারেনি। দুই সভ্যতারই প্রচুর উপকরণ বোবার কথা বলার মতো অবোধ্য হরপগুলি তাকিয়ে আছে, কিন্তু কি বলছে কেউ জানে না। নানা পণ্ডিতে নানা কল্পনা করছেন এই বোবার ইঙ্গিত নিয়ে।

ক্রীটের ইতিহাস কত প্রাচীন প্রশ্ন উঠেছে। পণ্ডিতরা বলেন মিশরে যখন ফারায়োরা পিরামিড তৈরী করাচ্ছেন তখন সমুদ্রে বাণিজ্যে ও বোম্বেটেগিরি করে ক্রীটানরা স্বর্ণলঙ্কার ন্যায় নগরীগুলির পত্তন করছে। সে যুগটায় লোহা ছিল অজ্ঞাত বা দুষ্প্রাপ্য, তামা দিয়েই অস্ত্রশস্ত্র, তৈজসপত্র তৈরী হতো; তাই কাইপ্রাস দ্বীপের তামার খনি থেকে তামা সংগ্রহ করা ছিল বণিকদের একটা বড় কাজ।

ক্রীটের অনেকগুলি নগরী খুঁড়ে প্রাচীন কালের রাজবাড়ি, ধনীদের কবরখানা প্রভৃতি পাওয়া গিয়েছে। রাজবাড়ি দেখে অবাক লাগে; মনে হয় রাজা বুঝি দ্বীপের সম্রাট। প্রাসাদের কাছেই ছিল রাজ-কর্মচারীদের ঘরবাড়ি। খুব সম্ভব রাজারা ছিলেন ব্যবসায়ী; তাই প্রাসাদের মধ্যে শিল্পঘর, শিল্পজাত সামগ্রী রাখবার ভাণ্ডার ছিল—সবগুলি একই আকারের। বড় বড় মাটির জালা সারি দিয়ে সাজানো; বোধহয় মধু, মদ, জলপাইএর তেল, শস্য ভরা থাকতো সেগুলিতে। শহরে জীবনের বিলাস ও বাবুয়ানির আসবাবপত্র যথেষ্ট পাওয়া গেছে। প্রাসাদের বা ভদ্রলোকের বসতবাটিতে স্নানের ঘর, ময়লা জল-

নিকাশের পৃথক নালা ছিল আধুনিক কালের মতো। রাজবাড়িতে প্রবেশের পথ ছিল অত্যন্ত জটিল, যেন গোলকধাঁধা! বোধহয় শত্রুর ভয়ে এমনটা করা হতো। কিন্তু দুর্গ ধরণের ইমারত ছিল বলে তো মনে হয় না।

ক্রীটানদের সভ্যতার নির্ভর ছিল সমুদ্রগ্রামী জলযানর উপর। চারপাশের দ্বীপের লোকের চোখে এরা তো 'সমুদ্রের রাজা'। সমস্ত লোকেরই মন শিল্পে, ব্যবসায়ে। ব্যবসা-বাণিজ্য করে বিনিময়ে খাদ্যশস্য আমদানী করতে হতো।

লোকে ভাবে বাড়তি টাকা হলেই কিছুরই অভাব হয় না, ধন হলেই সৌখীনতা বাড়ে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় রাজধানী প্রাসাদের প্রাচীর-চিত্র বা 'দেয়াল চিত্তির' থেকে। এই ফ্রেস্‌কোতে ফুটে উঠেছে ক্রীটান শহরে লোকদের জীবনের নিখুঁত ছবি। মেয়েদের পোষাক পরিচ্ছদ প্রায় আজকালকার মেয়েদেরই মতো; রাজবাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে তারা নগরের উৎসব ও খেলাধূলা দেখছে। মাথানেড়া এক পুরোহিত একটা বাজনায় শব্দ করতে করতে চলেছেন উৎসবের লোকদের সঙ্গে। মেয়ে পুরুষে সকলেই নানারকমের গহনা পরেছে শোভাযাত্রায়। পুরুষদের সাজ পোষাক কম, কিন্তু মেয়েদের সাজগোজ বেশ পরিপাটি। ক্রীটান মেয়েরা পর্দানসীন নয়, তারা ষাঁড়ের লড়াইয়ে যোগ দেয়। সে-ছবি দেখলে আশ্চর্য হতে হয়—কেমন ষাঁড়ের শিঙ্‌ বাগিয়ে ধরেছে একজন, পুরুষটি নামলেই আরেকজন মেয়ে ডিগবাজী খেয়ে উঠ্‌বে ষাঁড়ের পিঠে! এরা হয়ত ক্রীতদাস ও দাসী। এইসব খেলা ও কস্‌রত শেখানো হতো উৎসবে আনন্দ জোগাবার জন্য কে জানে সেসব তথ্য? কোনো লেখাজোখা দলীলপত্র পাওয়া যায়নি এসব খবর দেবার জন্য।

মনে হয় এ অঞ্চলে মাতৃকেন্দ্রিক সমাজে মেয়েদের ক্ষমতা ছিল বেশী; পুরুষরা ব্যবসায় বাণিজ্যে ও যুদ্ধে ব্যাপৃত, তাই সংসারের সর্বকর্ম চালায় মেয়েরা।

ক্রীটানদের ধর্ম কি ছিল জানা যায় না, তবে তারা যে দেবতাকে মন্দিরের মধ্যে বন্দী করে পূজা করতো না তা জানা যায়। কারণ মন্দিরের বা দেবস্থানের কোন চিহ্নই মাটি খুঁড়ে পাওয়া যায় নি।

ক্রীটের এই সভ্যতা হঠাৎ যেন লোপ পেয়ে গেল। কোথা থেকে বোম্বেটের দল এসে রাজধানী পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে গেল। বোধহয়

কোন জলদস্যুর দল ক্রীটান নৌবাহিনীকে এড়িয়ে ক্রীটের উপকূলে নেমে পড়ে। কোন কোন পণ্ডিতে বলেন যে, সে সময়ে ভূমিকম্পও হয় বলে মনে হয়। প্রকৃতির খাম-খেয়াল ও মানুষের উপদ্রব একই সঙ্গে হয়তো আসে দ্বীপের উপর।

ক্রীটানরা ব্যবসায় করে ধনী হয়েছিল; দাসশ্রমের উপর ছিল তাদের সমস্ত নির্ভর। এই দাসের দলও হয়ত নগর ধ্বংসে সহায় হয়। বিলাসী হয়ে পড়লে লোকের আত্মরক্ষার শক্তিও যায় নষ্ট হয়ে। বাইরের শত্রুর এই হঠাৎ উৎপাতে তারা ভেঙে পড়লো। ক্রীটান সভ্যতা ও সংস্কৃতি যেন এক ফুঁয়ে নিবে গেল। আক্রমণের আগের দিন রাজমিস্ত্রীরা দল বল নিয়ে মেরামতীর কাজ করছিল কিন্তু তা শেষ করবার আগেই নগর ধ্বংস হয়—তাদের হাতিয়ার পড়ে থাকে কাজের জায়গায়। এই উপদ্রবকারী বোম্বেটেরা কে তা বলা কঠিন। তবে মনে হয় এরা গ্রীস থেকে এসেছিল। হতে পারে এরা 'আর্য' মহাজাতির একটা শাখার শাখা, ঘুরতে ঘুরতে সমুদ্রতীরে এসে সাগর পাড়ি দেবার বিদ্যা আয়ত্ত করে নিয়ে ক্রীটের উপর হামলা করেছিল। এরাই হয়ত ঈজান সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র দক্ষিণ গ্রীসের মিকিনিও ধ্বংস করে থাকবে। এদের দূরতম শাখা ভারতে এসে হয়তো সিন্ধু-হরাপ্পা সভ্যতা তছনছ করে দেয়।

ক্রীটের রাজ্য হঠাৎ যেন লুপ্ত হয়ে গেল তারপর দেখা গেল সেখানকার লোকেদের একদল পালিয়ে গিয়ে উঠলো এশিয়ার উপকূলে; সে দেশের নাম 'কানান', লোকদের বলতো ফিলিস্তানী (Philistine)—হয়ত এইটাই তাদের জাতের পুরাতন নাম। পণ্ডিতরা মনে করেন আনাতোলিয়ার ফ্রিজিয়ানরাও ক্রীটের আদিবাসী ইতালীর ইউট্রাস্কানদের পলাতক ক্রীটান বলে সন্দেহ করা হয়। কানানের দখল নিয়ে বহুকাল ফিলিস্থানীদের সঙ্গে ইহুদীদের লড়াই চলে—সে কথা পূর্বে আমরা বলেছি।

ক্রীটের পতনে সুবিধা হলো ফিনিশিয়ার টায়ার, সিডন প্রভৃতি বন্দর নগরের। মিশরের অধঃপতন সুরু হয়েছে ওদিকে। ফলে মধ্যধরণী সাগরে ফিনিকরা হলো অপ্রতিদ্বন্দ্বী বণিক ও নাবিক। ইতিহাসে এক কূল ভাঙে আরেক কূল গড়ে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভারকেন্দ্র সর্বদাই সরছে। প্রথম দিকে তা বোঝা যায় না। তারপর কয়েক বৎসর পরে দেখা যায় এ কূলে আর তরী ভিড়ছে না, চর পড়ছে,—দূরে ওপারের গঞ্জে ভিড় জমছে।

সিন্ধু-হরপ্পা সভ্যতা

নীলনদের তীরে মিশরীয় ও ইউফ্রাতিস-তাইগ্রিস অববাহিকায় সুমেরীয় আকাদী সভ্যতার সমকালীন হচ্ছে হরাপ্পা সভ্যতা—যা ছড়িয়ে ছিল সিন্ধু ও পঞ্চনদের অববাহিকার এলাকায়। কিন্তু ক্রমেই জানা যাচ্ছে একটি শহুরে সভ্যতা ভারতের নানাস্থানে বিস্তারিত ছিল। মহেঞ্জোদড়ো হরাপ্পার কথা আজকাল ভারত ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকেও থাকে, অথচ এই শতাব্দীর গোড়ায় এই সিন্ধু সভ্যতার কথা কেউ জানতো না, কারণ 'ইতিহাস, চাপা পড়ে ছিল মাটির তলায়! প্রত্নতত্ত্ববিভাগের পণ্ডিতগণের চেষ্টায় সে-সব উদ্ধার পেয়েছে। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে বেশি কিছুই জানা যাচ্ছে না কারণ যে সব সীলমোহর পাওয়া গেছে তার পাঠোদ্ধার হয়নি। এই সভ্যতার উত্থান পতনের ইতিহাস সম্পূর্ণ অজ্ঞাত; তাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত; কেউ বলেন তারা আর্য, কেউ বলেন তারা প্রাক্ আর্য বা অন-আর্য। অবশ্য এই আখ্যার দ্বারা তাদের জাতি তত্ত্বের কোন কূল-কিনারা হয় না।

উত্তরপশ্চিম ভারতের অনেক জায়গায় প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন দেখা যায়। তার মধ্যে পশ্চিম পঞ্জাবের হরাপ্পা ও সিন্ধু দেশের মহেনজোদোড়ো খুঁড়ে অনেক কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে। ঘুরে ঘুরে পণ্ডিতরা অন্যান্য প্রাচীন নগরের চিহ্নও দেখতে পেয়েছেন তার পরিধি উত্তর ও পশ্চিম ভারতে ছড়িয়ে আছে বহু দূরে। মোটকথা একটা শহুরে সভ্যতা ভারতের নানা জায়গায় ছিল, তার মধ্যে ভাল করে খোঁড়াখুঁড়ি হয়েছে মহেঞ্জোদোড়োতে। হরাপ্পার প্রাচীন নগরের ইটপাথর বহু পূর্বেই রেলপথ তৈয়ারীর জন্য ব্যবহার হয়ে গেছে।

হরাপ্পা পশ্চিম পঞ্জাবের রাবি নদীতীরে, মহেঞ্জোদোড়ো সিন্ধুনদতীরে সিন্ধুদেশে, এই জায়গার ব্যবধান প্রায় চারশ' মাইল। মিশর ও মেসোপট্যেটে-মিয়ার ন্যায় ভারতের (বর্তমান পাকিস্তানের) এই অংশ শুক্‌নো, নদীর বান আসে বৎসরে বৎসরে। তবে প্রাচীন কালে বেলুচিস্থান থেকে রাজস্থানের

থর (Thar) মরু অঞ্চল পর্যন্ত ভূভাগে এত জলাভাব ছিল না। এখনকার চেয়ে বৃষ্টিও হতো বেশি। তা ছাড়া কতক মরা নদীর সোঁতা থেকে মনে হয় জলের অভাব আজকের মতো এতটা ছিল না।

নদীই ছিল যাতায়াতের রাজপথ, দূর দূর দেশ থেকে নানা রকমের জিনিষ আমদানী হতো নদীপথে। নদীর বাড়তি জল খাল কেটে বিস্তার করে দেওয়া হতো বলে এইসব অল্প বৃষ্টির দেশে চাষ চলতো কোনো রকমে।

নগরের মধ্যে যারা বাস করে তারা শিল্পী, ব্যবসায়ী ও বণিক, নগরের বাইরে চাষীদের বাস। সিন্ধুনদের বন্যার জল চাষের উপকারে লাগে কিন্তু সেই জল অনিয়ন্ত্রিত হলে নগরে ঢুকে অনাসৃষ্টি করে। মাটি খুঁড়ে তাই দেখা গেল বন্যার জলে ঘরবাড়ি ডুবে যাওয়াতে লোকে ধ্বসে-পড়া ভাঙা ঘরবাড়ির উপর উঁচু করে নতুন ঘরদোর বানিয়েছে। বারে বারে নতুন করে নগর পত্তন করেছে একের উপর আরেকটা। এইসব নগর বিন্যাস ও পূর্তকার্য্য আধুনিক যুগের মতো। নগরের স্বাস্থ্য ও সুবিধার দিকে চোখ রেখে কর্তারা নগর পত্তন করেছিলেন। কাশী ও কলকাতার মতো এলোমেলোভাবে নগর গড়ে ওঠেনি, জয়পুর মান্দালয়ের মতো বাস্তুবিন্যাসসম্মত প্ল্যান করা নগর। মহেঞ্জোদোড়োর মধ্যে বড় বড় রাস্তার ধারে বড়লোকদের বড় বড় ইমারত, মধ্যবিত্তদের ছোট ছোট বাড়ি সারি সারি। বড়লোকের বাড়ি হতো অনেক তলার; নিচের তলায় দোকান। বাড়ির ভিতরটা চক্‌মিলানো। প্রত্যেক বাড়িতেই বাঁধানো ইঁদারা। ধনীদের বাড়িতে স্নানের ঘর, পায়খানা। মহেনজোদেড়োর শহর সুমেরুয়দের বিখ্যাত নগর উর-এর ন্যায় যেমন-তেমন ভাবে গড়ে ওঠেনি। এ নগর সুপরিকল্পিত। রাস্তাগুলি সমান্তরালে গিয়েছে, পথ সোজা, আঁকা-বাঁকা কম। রাস্তা গুলি ৯ ফুট থেকে ৩৪ ফুট পর্যন্ত চওড়া। পথগুলি প্রায় সমকোণে কেটেছে পথের উপর কেউ জোর দখল করে কিছু বানাতে পারতোনা; যদিও সুমেরুয় নগরগুলিতে ধনীরা রাস্তার উপর বেশ চওড়া করে ঘরবাড়ি বানাতেন। মহেঞ্জোদোড়োর অধঃপতন সুরু হলে পূর্বকালের কঠোর নিয়মে ঢিলা পড়ে যায়, আধুনিক শহরের নোঙরামি দেখা গিয়েছিল স্থানে স্থানে।

পথের দুধারে বাঁধানো নালা দিয়ে ময়লা জল নিকাশ হয়। আবর্জনা কুণ্ড আছে মাঝে মাঝে পথের ধারে। নালাগুলি পাথর দিয়ে ঢাকা,

নালা সাফ্ করবার জন্য নামবার সিঁড়ি আছে। সমস্ত ময়লা জল গিয়ে পড়ে সিন্ধু নদের মধ্যে, স্রোতের বেগে সব চলে যায়।

পণ্ডিতরা বলেন যে এমন স্বাস্থ্যসম্মত পৌরকার্যের ব্যবস্থা প্রাচীন জগতে কোথাও দেখা যায় না, আশ্চর্য জাত ছিল এরা।

সিন্ধু-হরাপ্পার কারিগরদের তৈয়ারী মাটির কলসী, জালা ও অন্যান্য তৈজসপত্র, ব্রোন্জ ধাতুর অস্ত্রশস্ত্র ও টুকিটাকি জিনিষপত্র অজস্র পাওয়া গেছে মাটি খুঁড়ে। কার্পাস ও পশমের বস্ত্র তারা বুনতো বলে মনে হয়। পোড়ামটির উপর চক্‌চকে 'এনামেল' দেবার রহস্য তাদের জানা ছিল। ঐতিহাসিক যুগে সিন্ধুর রঙ্গীন টালি বিখ্যাত ছিল। সে-যুগের গরুর গাড়ির চাকায় অর থাকতো না—আস্ত কাটের নিরেট চাকা বানাতো—ভারতের নানা জায়গায় গ্রামাঞ্চলে এখনো এরকম গো-যান দেখা যায়।

বহুদূর থেকে কাঁচা মাল আস্‌তো শিল্পীদের জন্য, যেমন রাজস্থান থেকে—এবং হয়তো বেলুচিস্থান থেকে আস্‌তো তামা ; এমনকি ভারত সীমানার বাহির থেকে সোনা রূপা রঙ্গ বা রাঙ ও অন্যান্য দামী ধাতু পৌঁছতো এসব মালপত্র নিশ্চয় আসতো জাহাজে করে, ভারত ঘুরে। বোধহয় লঙ্কাদ্বীপ ছিল এই সমুদ্র বাণিজ্যের মহাকেন্দ্র, স্বর্ণলঙ্কা কথাটা হয়েছে হয়তো ঐ জন্যই। হিমালয় থেকে দেবদারু কাঠ বোধ হয় নদীতে ভাসিয়ে আনা হতো। এই ভাবে নানা জায়গা থেকে মালপত্র সংগ্রহ করে শিল্পীরা নানা প্রকারের জিনিষ বানাতো। সেইসব জিনিষ রপ্তানী হতো দূর দূরান্তে। পশ্চিম এশিয়ার সুমেরুয়দের নগরে এদের জিনিষ পৌঁছাতে, আর তাদের জিনিষের নমুনা সত্যই পাওয়া গেছে মহেঞ্জোদোড়োতে। যাওয়া আসা চলতো জলেস্থলে যখন যেটা সুবিধা হতো।

মহেঞ্জোদোড়োতে কয়েকটা খুব বড় ঘর দেখা যায়—বোধ হয় সেগুলো কারখানা অথবা মাল বোঝাই রাখার গুদামঘর। এছাড়া একটা বিরাট স্নানাগার আছে ১০০ ফুট লম্বায় ১০৮ ফুট চওড়া, উঠানের মাঝখানে ৩ ফুট দীর্ঘ ও ২৩ ফুট প্রস্থ এবং ৮ ফুট গভীর চৌবাচ্চা। চারিদিকে কুঠরি। বোধ হয় সেগুলি ধনীদের জন্য নির্দিষ্ট স্নানের ঘর। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন এই ইমারতটা ছিল ধর্মস্থান, ; চৌবাচ্চা ধর্মকুণ্ড আর পাশের কুঠরিগুলি পুরোহিত যজমানদের ধর্মকর্মের জন্য। বলা বাহুল্য এ রহস্য ভেদ হবে তখনই যখন সীলমোহর গুলির পাঠোদ্ধার হবে সুনিশ্চিতভাবে।

নগরের মধ্যে মালপত্র তৈরীর কারখানা ও আড়ত ধরণের ঘরই বেশি করে চোখে পড়ে। ব্যবসার খাতিরে বিদেশী লোক আসতো; তাদের কঙ্কাল ও খর্পর পাওয়া গেছে। ব্যবসায়ীদের অসংখ্য সীলমোহর মাটির তলা থেকে উদ্ধার পেয়েছে। নগরীর প্রতীক হচ্ছে বড় ককুদ বিশিষ্ট ষাঁড়; প্রত্যেকটি সীলে সেটি আছে এবং তার পাশে ব্যবসায়ীর নাম ধাম বোধ হয় লেখা।

সিন্ধু হরাপ্পা উপত্যকার এই লোকেদের আগাপিছু কিছু জানা যায় না—কোন মহাজাতির অন্তর্গত এরা এবং নগর ধ্বংস হলে তারা গেল কোথায় এ সমস্যার শেষ কথা এখনো শোনা যায়নি, পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আস্‌মান জমিন ফরাক। তবে এই নাম না-জানা জাতির লোকেদের নগর যে ভারতের নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিল, তার প্রমাণের অভাব নেই। বেদে পাওয়া যায় সুদাস প্রভৃতি রাজার প্রাসাদের কথা; হরিয়ূপায় যুদ্ধ হয়েছিল দুই দলে তার কথাও পাই; পণ্ডিতরা বলেন হরিয়ূপা হচ্ছে হরাপ্পা। স্বর্ণলঙ্কার সঙ্গে এদের কোনো যোগ ছিল কিনা তাও নিশ্চিত বলা যায় না। সমুদ্রপথে ঘুরে বেড়িয়ে ধন সংগ্রহ করাই ছিল হয়তো তাদের কাজ।

কিন্তু এই বিরাট সভ্যতা অকস্মাৎ লোপ পেল কেন? পৃথিবীর অনেক সভ্যতাই যেমন লুপ্ত হয়েছে হরাপ্পা সভ্যতাও মহাকালের সেই সব অমোঘ কারণেই নিশ্চিহ্ন হয়েছে। কালের সঙ্গে তাল রেখে চলতে না পারলে, বিজ্ঞান বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করলে এই পরিণাম অনিবার্য। তবে পণ্ডিতরা অনুমান করেন সিন্ধুনদের বানের জল প্রতি বৎসর বাড়তে বাড়তে এমন বিপদজনক হয়ে উঠেছিল যে লোকে সমস্ত জিনিষপত্র নিয়ে অন্যত্র সরে পড়ে; একদিনে সেটা ঘটেনি। তারপর ধীরে ধীরে নদীর জলের পলিমাটিতে চাপা পড়ে নগর গেল মাটির তলায় তলিয়ে। অন্য পণ্ডিতরা মনে করেন বাহির থেকে কোন 'বীর' জাতি এসে এদের ঘর ছাড়া করে। সিন্ধু-হরাপ্পা সভ্যতায় তামা, ব্রোন্‌জ ছিল অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারীর উপাদান। অশ্ব দুই একটা আসতো বাহিরের বণিকদের সঙ্গে, দেশের মধ্যে তাদের ব্যবহার ছিলনা। অশ্ব যে মানুষের বাহন হয়ে দূরকে নিকট করতে পারে, রথ টানতে পারে এসব খবর তাদের জানা ছিল না। ফলে তাদের হার মানতে হলো, এমন এক জাতির কাছে, যাদের হাতে ছিল লোহার অস্ত্র আর

যাদের বাহন ছিল মধ্য এশিয়ার পক্ষীরাজ তাজিকী ঘোড়া। সুবিধার জন্য এই 'বীর'দের নাম দেওয়া হয়েছে আর্য (Vero=heros, hero=বীর)।

এই আর্যদের অসংখ্য শাখা কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল তার কথা আমরা পরে আলোচনা করব। ইতিমধ্যে এদের নানা শাখা—হিক্সোসস, হিটাইত, কাশসু ও মিত্তানিদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে পশ্চিম এশিয়ায়। ক্রীট ও ঈজানী সভ্যতার ধ্বংসকারী বলে আর্যদেরই এক শাখাকে দায়ী করা হয়।

প্রাগৈতিহাসিক ভারতে বহু জাতি উপজাতির বাস ছিল। রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণগুলিতে তাদের নাম, তাদের সম্বন্ধে কিম্বদন্তীমূলক কাহিনী, তাদের আচার-ব্যবহার প্রভৃতি অনেক কিছু জানা যায়। কিম্বদন্তী অনুসারে বানর, কিন্নর—অর্থাৎ যারা আর্যদের মতো সুপুরুষ নয় এমন সব জাতিছাড়া যক্ষ, রক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব প্রভৃতি বহু উপজাতির নাম পাই। যক্ষরা ব্যবসায়ী, ধন জমায়। তাদের ধনপতিদের বলতো কুবের। রক্ষরা লুঠতরাজ করে। যুদ্ধ করে স্বর্ণলঙ্কা নির্মাণ করেছিল। নাগরা সাপ পূজা করতো, এখনো দক্ষিণ ভারতে বাস্তু সাপ পূজাবিধি আছে। নাগরা খুব সুসভ্য জাতি ছিল। অসুর ও দানবরা ছিল স্থপতি-শিল্পী ; হস্তিনাপুর নির্মাণ করবার সময় ময়দানবের ডাক পড়ে। তিনি কুবেরের প্রাচীন অট্টালিকা থেকে ইট পাথর ভেঙে এনে হস্তিনাপুর তৈয়ারী করে দিলেন।

কিম্বদন্তীর পিছনে অনেক ইতিহাস ঢাকা পড়ে আছে, পণ্ডিতদের নিরন্তর চেষ্টায় অনেক তথ্য একটু একটু করে জানা যাচ্ছে এবং হয়তো একদিন প্রাক্-আর্য ভারতের বড় রকম ইতিহাসও লেখা হবে।

আর্য-পারসি-বৈদিক

পশ্চিম এশিয়ার মরু প্রান্তর থেকে যে সব জাতি যুগে যুগে আহার পানীয় খুঁজতে খুঁজতে নীলনদের অববাহিকা ও য়ুফ্রাতিস-তাইগ্রীসের দোয়াবে বা মধ্যধরণী সাগরের তীরে এসে আপনাদের অমর ইতিহাসের কীর্তিকাহিনী রচে গেছে, ইহুদী ধর্ম, খৃষ্টান ধর্ম ও ইসলাম যাদের মধ্যে উদ্‌ভূত হয়েছিল—ইতিহাসে সেইসব জাতিদের সাধারণ নাম দেওয়া হয়েছে সেমেটিক। পুরাতন বাইবেল মতে সেম (Shem)-এর বংশধর এবং আমাদের দেশে সূর্যবংশ, চন্দ্রবংশ, যদুবংশের ন্যায় মনগড়া বংশ। সেমেটিকদের নানা শাখা উপশাখা।

পশ্চিম এশিয়ায় ও উত্তর আফ্রিকায় রাজ্য, সাম্রাজ্য গড়েছে ভেঙেছে—তখন তথাকথিত 'আর্য'রা ইতিহাসের আঙিনায় আসেনি, এখানে সেখানে দু'একটা দলকে দেখা গেছে মাঝে মাঝে যেমন হিক্‌সস্ হিটাইত, কাশ্‌স্ত মিত্তানি-যাদের কথা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি।

খৃষ্ট জন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্বে অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় হাজার চার বৎসরের আগে মধ্য য়ুরেশিয়ার জলবায়ু এখনকার থেকে গরম ও স্যাঁতসেঁতে ছিল বলে পণ্ডিতদের অনুমান। এই সীমাশূন্য ভূ-ভাগে নীলচোখ, কটা চুল, ফরসা রঙ, বলিষ্ঠ যে লোকের বাস ছিল—বহু উপজাতি, উপশাখায় বিভক্ত ছিল তারা। যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়ায় পশুপাল সঙ্গে নিয়ে, গরু তাদের সেরা সম্পদ—বলতো গোধন। অশ্ব তাদের দূরপাল্লা যাত্রার সহায়। কাছাকাছি যে-সব উপজাতি বাস করে, তারা পরস্পরের ভাষা বোঝে, আপনাদের মধ্যে জ্ঞাতিত্ব অনুভব করে। কিন্তু স্থান ও কালের ব্যবধানে পরস্পরের ভাষা হয় দুর্বোধ্য, আত্মীয়তার বোধ হয়ে যায় ক্ষীণ। উনবিংশ শতকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করতে করতে অর্থাৎ নানা ভাষার মধ্যে কতকগুলো শব্দের উচ্চারণ ও অর্থের মিল দেখে জানা গেল 'আর্য' ভাষা য়ুরোপের পশ্চিম থেকে ভারতের পূর্ব পর্যন্ত নানা নামে চালু হয়েছিল। পণ্ডিতরা কল্পনা করলেন যে আদিযুগে একটা ভাষা চলিত ছিল, তার থেকে ভারতের বৈদিক

পরে যা সংস্কৃত নামে চলিত হয়, ইরানের পারসিক ভাষা, য়ুরোপের গ্রীক, লাতিন, জারমেনিক, স্লাভীয় প্রভৃতি ভাষা ও উপভাষা ভেঙে ভেঙে নানা সময়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পণ্ডিতরা এই আদিভাষার নাম দিয়েছেন ইন্দো-জারমেনিক, ইন্দো-য়ুরোপীয় বা আর্য; এমনকি এইসব জাতিদের একটা সাধারণ নাম দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এক ভাষা বললেই যে এক জাত হবে তার মানে নেই। আমেরিকার নিগ্রোরা ইংরেজি বলে কিন্তু আসলে তারা আফ্রিকান নিগ্রোর বংশধর; চারশো বৎসর আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গ ইংরেজি-ভাষী মুনিবদের সঙ্গে থাকতে থাকতে ইংরেজি শিখেছে ও মাতৃভাষা ভুলেছে। সুতরাং 'জাতি'র সঙ্গে 'ভাষা'র সম্বন্ধ না-ও থাকতে পারে।

যুগে যুগে মানুষ বাসভূমি ছেড়ে বিদেশে গিয়েছে, এখনও মানুষের সে চলা শেষ হয়নি। মাথা গুনতিতে মানুষের সংখ্যা বাড়লে খাদ্যের টান পড়ে, তখন লোকে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। ধর্মমতের বিরোধ বা রাজনীতি নিয়ে মতভেদ প্রভৃতি দেখা দিলেও মানুষ দেশত্যাগী হয়। আর্যদের নানা শাখা অর্ধ-যাযাবর বা আজকালকার 'বেদে'দের অবস্থায় য়ুরেশিয়ার বিশাল সমতল ভূমের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। দানিয়ুব নদীর অববাহিকা থেকে মধ্য এশিয়ার আরল হ্রদ পর্যন্ত ভূভাগে এই 'বীর' আর্যরা কিভাবে কখন ছড়িয়ে বাস করলো সে ইতিহাস আর জানা যায় না। আমরা এদের 'আর্য' বলবো কারণ এই নামটিই চলিত হয়েছে।

এই বীর আর্যরা প্রকৃতির পূজক। প্রকৃতির নানা রূপকে নানা দেবতার নামে তারা ডাকে। আগুন জ্বেলে ঘি ঢেলে যাগযজ্ঞকরা ধর্মকর্মের আসল অঙ্গ। মন্দিরের মধ্যে দেবতাকে বন্দী করে তারা পূজা করে না, গাছতলায় নদীর ধারে যজ্ঞ করে। মন্দির নির্মাণ করতে তারা শেখে পরযুগে সুসভ্য দ্রাবিড়দের কাছ থেকে।

মহাপুরুষ সকল যুগেই সকল দেশেই জন্মেছেন; তাদের কেউ করেছেন আগুন আবিষ্কার, কেউ দিয়েছেন পীড়িতকে ঔষধ; কেউ বা লোকদের রক্ষা করেছেন বাহিরের দস্যু আক্রমণ থেকে। এঁরা কালে জনতার কাছে হয়ে উঠেছেন দেবতা। এঁদের মৃত্যু হলে চিতাভস্ম পাত্র মধ্যে রেখে চারিদিকে গোলাকার স্তূপ তৈয়ারী করে দিত। দক্ষিণ য়ুরোপে এ ধরণের বহু স্তূপ দেখা যায়।

য়ুরোপের আর্য ভাষাভাষী লোকে খৃষ্টান হবার পর তাদের বিশ্বাস জন্মায় যে মানুষ মরবার পর 'কিয়ামৎ' দিনে আবার উঠ্‌বে। এটা সেমেটিক জাতের মূল-ঘেঁসা ধর্মবিশ্বাস। সেই হতেই কবর দেবার রেওয়াজ। পুরাতন আর্যদের ওসব ভাবনাই ছিল না। আত্মার সদগতির জন্য নানাভাবে মন্ত্র পড়ে, যজ্ঞ করে, বলি দেয়—কিন্তু মৃতদেহের জন্য দরদ দেখায় না। পারসিকরা তো মৃতদেহ ফেলে দেয় চিল শকুনে খাবার জন্য। হিন্দুরা মৃতদেহ পুড়িয়ে দেয়, পুঁতে তার উপরে ইমারত বানিয়ে জায়গা জোড়ে না। এসব বিষয়ে আর্যদের ঢিলেমি থাকলেও আচার-বিচার নিয়ে তাদের খুৎ-খুঁতানির অশেষ। আর্য কৌলীন্যর গোঁড়ামি সম্বন্ধেও তাদের বুদ্ধি সজাগ। এইখানেই সেমেটিকদের সঙ্গে আর্যদের একটা মস্ত পার্থক্য। ধর্ম বিষয়ে সেমেটিকরা অত্যন্ত কঠোর ও গোঁড়া। ধর্মমত বিশুদ্ধ রাখবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টাই হলো তাদের বৈশিষ্ট্য, সেখানে যুক্তিহীন অন্ধ আনুগত্যই তারা বোঝে। সমাজ বিষয়ে ঠিক বিপরীত; সেখানে তারা উদার। সকলকে দলের মধ্যে টেনে নেবার জন্যই তারা সদাই উৎসুক। সেমেটিকরা মনে করে সকল মানুষের জন্য একই পথ, একই মত, একই ধর্ম এবং সেই পথে, সেই মতে ও সেই ধর্মে টানতে পারাই হচ্ছে প্রত্যেক বিশ্বাসীর কর্তব্য। এদিকে আর্যরা মনে করে সব পথই পথ, সব নদীই সমুদ্রে গিয়ে পৌছবে; সেইজন্য ধর্মমত ও বিশ্বাস নিয়ে বাড়াবাড়ি করায় লাভ কী। কিন্তু আচার নিয়েই তাদের যত বিচার। তাদের ভয় পাছে সবার সঙ্গে বেশি মেশামেশি করলে আর্য কৌলীন্য ফিকে হয়ে যায়। সেইজন্য পরাজিত জাতির লোকের সঙ্গে রক্তের মিশ্রণ যাতে না হয়, তার জন্য কড়া নিয়ম করতে করতে সমাজের হাল এমন হলো যে ছোঁয়াছুঁয়ি মেশামেশি পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়ে উঠলো। একে বলে বর্ণভেদ অর্থাৎ কে ধলা আর কে কালা তাই নিয়ে সূক্ষ্ম বিচার। কিন্তু এত কড়াকড়ি করেও জীবধর্মেরই জয় হল। মানুষ গণ্ডীভেদ করল; ফলে অসংখ্য সঙ্কর বর্ণের উদ্‌ভব হয়েছে। আজ ভারতে হাজার আড়াই-এর উপর জাতি, উপজাতি, সম্প্রদায়, উপ-সম্প্রদায় সকলেই হিন্দু সমাজভুক্ত, সিঁড়ির ধাপে ধাপে বসে আছে পরস্পরের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে কিন্তু সব মিলে একটা 'জাতি' হয়ে উঠতে পারেনি।

আর্যরা বাক্যবাগীশ জাত! আর্যভাষায় যেমন ধর্মগ্রন্থ, কাব্য, দর্শন

কলা বিষয়ক গ্রন্থ লেখা হয়েছে তা তুলনাহীন। আদি কালে তাদের যাযাবর জীবনের অসংখ্য উদ্বেগ আশঙ্কার মধ্যেও গোষ্ঠীভুক্ত লোকেদের চিত্তবিনোদনের জন্য তারা 'গাথা' গান করে, নাট্য অভিনয় করে জীবনের একঘেয়েমি ঘোচায়। মানুষের স্বাভাবিক ধর্মই এসব। গ্রাম মুখর হয়ে ওঠে তাদের হৈ হুল্লোড়ে। স্ফূর্তির একটা কারণ সোমরস বা সুরা পান, বারুণীর কৃপায় তাদের কণ্ঠ ও মন দুই-ই যায় খুলে। প্রত্যেক ছাউনীতে কবিরা পুরাতন কাহিনী ত্রিতন্ত্রী বাজিয়ে সুর দিয়ে গান করে। লোকে শুনে শুনে শেখে। পুরুষানুক্রমে কাহিনীগুলি চলে; উপাখ্যানে মিশিয়ে দেয় নিজেদের কল্পনা; জমে ওঠে কাব্য মহাকাব্য, ইতিহাস, পুরাণ, জাতকাদির গল্প। এইভাবে ভারতের বেদাদি ধর্মগ্রন্থ, রামায়ণ মহাভারতাদি ইতিহাস, গ্রীকদের এপিক ইলিয়ড ওডেসী, আইসলন্ডের সাগা সাহিত্য, জারমানদের নেবুলেনগেন লীড প্রভৃতি রচিত হয়ে চলে এই আর্যভাষীদের মধ্যে। তারপর গত দুই হাজার বছরের মধ্যে আর্যদের নানা ভাষায় কত লক্ষ বই লেখা হয়েছে এবং এখনো প্রতি বৎসর কত হাজার বই ছাপা হচ্ছে তার ঠিকানা দেওয়া কঠিন। তাদের সাহিত্যাদি বেড়েই চলেছে; সাহিত্যে, সঙ্গীতে এখনো আর্যরা আছে। সবার অগ্রনী।

আর্যদের ছোট ছোট এক একটা দলের(Clan)-দলপতিকে বলে পাতিয়ার্কি বা প্রজাপতি। প্রজাপতিদের পরে এলেন রাজা বা Rex। Patriarch-এর পর গ্রীসে আসেন 'আর্কন' (archon) নামে শাসকরা *।

গ্রীকদের ব্যাসিলিউস, জারমানদের ক্যোএনিগ, ইংরেজি কিং প্রভৃতি রাজাবাচক শব্দগুলি বিশেষ স্থানেই উদ্‌ভূত হয় বলে মনে হয়।

যাইহোক দলপতি বা প্রজাপতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে গোষ্ঠির সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন। গ্রামের মধ্যে কাঠের চালা, বোধ হয় গাছের খোঁটা দিয়ে তৈরী (শালা, Sala, hall) ঘর। সেটা জোয়ানদের আড্ডার জায়গা, সভা সমিতি আসরও বসে সেখানে। গ্রামের প্রজাদের * পশুপাল রাখা হয় একটা খোঁয়াড়ে; যাদের গরু এক জায়গায় থাকে তারা বোধ হয় এক গোত্র বা সগোত্র নিকট আত্মীয় কুটুম্ব। গোচারণ মাঠ ছিল সর্বসাধারণের সম্পত্তি।

আর্যদের মধ্যে জনসংখ্যা বাড়ছে—শিশুমৃত্যু যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও। খাদ্যাভাবও কম নয়। লোকে পুরাণো ঘর বাড়ি ছেড়ে নতুন দেশের সন্ধানে বের হয়। পথেই মরে, পথেই জন্মায় কত শত! ঘুরতে ঘুরতে দুই একটা শাখা য়ুফ্রাতিস দোয়াবে ঢুকে পড়ে। কিন্তু সেখানে সুবিধা করতে পারেনা, সেমেটিকরা বহুকাল থেকে সেখানে জাঁকিয়ে বসে আছে। এসবকথা আগে আমরা বলেছি।

য়ুরেশিয়ার সমতলভূম থেকে আর্যদের আদি অভিযান চলে পশ্চিম য়ুরোপাভিমুখে—ফ্রান্স, ব্রিটেন স্পেনের দিকে। ব্রিটেনে প্রবেশ করে যারা স্টোন হেন্জ বা পাথুরে লাট্ বানিয়েছিল তাদের উৎখাত করলো। ঐতিহাসিকরা এই আদিম আর্য উপনিবেশীদের নাম দিয়েছেন কেলট্। এদের পরেও যারা এলো তারা এখন ওয়েলসের খাস বাসিন্দা। আর্যদের নবীন শাখা জারমান বা টিউটনদের কাছে তাড়া খেয়ে ওয়েলসের পাহাড়ে জঙ্গলে আশ্রয় তারা নেয়,—সে কথায় আমরা আবার আসবো। ফ্রান্সের উত্তর পশ্চিম কোণে ব্রিটানী নামে একটা প্রদেশ আছে। সেখানে আদিম আর্যদের অতি পুরাতন ভাষার চিহ্ন আছে। তারা ব্রিটেন থেকে ঐ দেশে যায়। ব্রিটেনে তাদের চিহ্ন আর নেই, কিছুকাল আগেও কেন্ট জেলায় ছিল। পিছন-থেকে ঠেলা খেতে খেতে স্পেনেও একদল আর্য পৌঁছয়। কিন্তু সেখানকার আদিম বাসিন্দা বাস্ক ও ফিনিকদের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেল যে তাদের কাউকেই আর চেনা যায় না।

শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে যায়। আবার নাড়া পড়ে। আর্যরা বহু শাখায় বিভক্ত হয়ে এবার আল্পস্ পাহাড়ের পূর্বাঞ্চলের গিরিপথ দিয়ে প্রবেশকরে ইতালীর মধ্যে। নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর বসত্ হয়। লাতিন নামে একটা শাখা টাইবার নদীর তীরে সাতমুড়া পাহাড়ের উপর ঘর বাড়ি বানায়। তাদের চার পাশে সুসভ্য ইউট্রাসকানদের বাস; তাদের কাছ থেকে বহু বিদ্যা আয়ত্ত করে নেয় তারা। এরাই কালে 'রোমান'নামে জগৎ বিখ্যাত হয়েছিল।

আর্যদের অপর কতগুলি শাখা য়ুরোপের দক্ষিণ-পূর্বে বলকান উপদ্বীপে

---

*Patriarch, patria = family
Arkhes = Ruler অর্থাৎ প্রজাপতি
প্রজা = Procreation = Generation.
প্রজা শব্দের মূল অর্থ সন্তানসন্ততি, বংশধর। লাতিন Prolettariate এর অর্থ one who serves the state not with property but with offspring (Proles)

ধীরে ধীরে দলে দলে প্রবেশ করছে। এইসব দল গ্রীসে এসে দেখে দেশটার চারদিকে সমুদ্রের খাড়ি—পা বাড়ালেই জল। সাগরতীরে এসে দেখে দূরে দূরে দ্বীপ। যে দেশে তারা এলো সেখানে প্রাচীনকালের উঁচুদরের ঈজিয়ান সভ্য মানুষের বাস। আর্য বর্বরদের হাতের ছোঁয়ায় সে সভ্যতা লোপ পায়—ঈজিয়ানদের কীর্তি কলাপ সব ধ্বংস হয়। শুধু তাই নয়, সাগরপারে ক্রীট দ্বীপের সভ্য লোকেরাও মারা পড়ে এদের হাতে। ক্রীটান সভ্যতা ইতিহাসের পাতা থেকে বোধ হয় এই আর্যদের কোনো শাখার কড়া হাতের স্পর্শে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই আগন্তুক আর্যরা ইতিহাসে গ্রীক নামে খ্যাত। কিন্তু তাদের আসল জাত নাম হেলেনী। এদের কথা অতিবিস্তারে আমাদের পরে বলতে হবে।

বলকান উপদ্বীপে আর্যদের প্রবেশের অনেক আগে পশ্চিম এশিয়ার কোণে এশিয়ামাইনর বা বর্তমান তুর্কীতে ফ্রিজিয়ান নামে একটা অজ্ঞাত-উৎপত্তি সুসভ্য জাতির লোকে এসে উপনিবেশ গড়েছিল। এরা নাকি ক্রীট ধ্বংস হবার পর এখানে আসে—এমন কথাও শোনা যায়। এদের পথ অনুসরণ করে সে দেশে আসে হেলেনীদের নানা শাখা,-ইওলিক, আইওনিক, ডোরিক একিয়ান নামে অনেক উপজাতি। নানা উপভাষা চলিত ছিল তাদের মধ্যে।

য়ুরোপের উত্তরেও এই আর্য মহাজাতির অভিযান চলেছে; নানা নামে, নানা পথে তারা এগিয়ে চলেছে। এইসর জাতের মধ্যে সেরা হচ্ছে টিউটনরা। তারা মধ্য-য়ুরোপের কেলট্‌দের তাড়িয়ে তাদের ঘরবাড়ি দখল করে বসে। সেদিনকার সেই বাস্তহারারা কোথায় গেল কে জানে!

পিছন থেকে আসছে স্লাভ জাতের নানা দল। তাদের চাপে আবার ডেরা-ডান্ডা ভেঙে টিউটনরা চলতে সুরু করে। কালে জারমেনী, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশে গিয়ে তারা ঘরদোর বাঁধে। নানা নামে এখন টিউটনরা পরিচিত। টিউটনদের পিছু পিছু যে স্লাভরা আসছে তারা আজ ইতিহাসে রুশ, পোলস্ক, ইউকরায়েন, যুগো-স্লাভ প্রভৃতি নানা নামে পরিচিত।

এইভাবে আর্যরা ছড়িয়ে পড়ছে য়ুরোপে।—দুর্বল অস্ত্রশস্ত্রহীন মোটাবুদ্ধির লোককে কেউ কৃপা করে না। তাদের সরে যেতেই হয়, আর্যদের অনুকূলে

জায়গা ছাড়তেই হলো। অশ্ব আর অয়স্ বা লৌহ এদের প্রধান সম্বল। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত চলাফেরা করতে সদাই তারা প্রস্তুত, আর শক্ত শাণিত অস্ত্র চালাতেও তারা মজবুত—তাই রণক্ষেত্রে অপরাজেয়।

আর্যদের নানা শাখা য়ুরোপে যেমন ছড়িয়ে পড়ছে—তেমনি তাদের আদি বাসভূমের পূব-তরফের লোকেরা এশিয়ার দক্ষিণে নতুন দেশের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ছে। মধ্যএশিয়া থেকে হিরাটের উত্তরে গিরিপথ দিয়ে পারস্যের মালভূমে হাজির হলো তারা দলে দলে। কিন্তু সে পার্বত্য দেশে খাদ্য কোথায়, গোচারণের ভূমি কোথায়? তাই তাদের কয়েকটা শাখা কুভা (কাবুল) নদীর উপত্যকা ধরে রওনা দিল পূর্বে; এসে পৌঁছল সিন্ধুনদের দেশে প্রথমে সপ্তসিন্ধু (হপ্তহেন্দু) ও পরে পঞ্চ অপ্ বা পঞ্জাবের দোয়াবে। এরাই ইতিহাসে বৈদিক সভ্যতার স্রষ্টা।

আর ওদিকে পারস্যের মালভূমে যারা ছিল তারা ভাবছে মেসোপটোমিয়ায় বা য়ুফ্রাতিস-তাইগ্রিসের দোয়াবে গিয়ে বাস করবে। কিন্তু ইরাকের দোয়াবে যে দুর্ধর্ষ সেমেটিকদের বাস তাদের ঠেলে বের করে দেওয়ার সাধ্য আর্যদের নেই। তাই বাধ্য হয়ে কয়েকটা দল যায় আর্মানিয়ার পাহাড়ী অঞ্চলে, আর সব উপজাতি যেমন মীড়, পারসি প্রভৃতি তারা ইরাণের মধ্যেই থাকতে বাধ্য হয়।

বৈদিক আর্যরা তো ঘুরতে ঘুরতে ভারতে ঢুকে পড়লো; কিন্তু সেখানে আসবার পূর্বেই বোধ হয় তাদের একটা উপজাতি চলে যায় মেসোপটোমিয়ায় য়ুফ্রাতিসতীরে। এরা ইতিহাসে মিত্তানি নামে খ্যাত; এদের দেবতা মিত্র বরুণ, তাছাড়া বৈদিক দেবতা নাসত্য, সূর্য, মরুৎ প্রভৃতির নাম উল্লেখ পাওয়া যায় তাদের দেবতার তালিকায়। এদের কথা আমরা পূর্বে বলেছি।

বৈদিকদের একটা শাখা যেমন মেসোপটেমিয়ার পৌঁছে গেল, তেমনিই ইতালীয়-কেল্টিকদের এক জ্ঞাতিশাখা আর্যনিবাসের পশ্চিম তরফ থেকে ভেঙে বেরিয়ে প'ড়ে পৌঁছে গেল মধ্যএশিয়া পার হয়ে চীনের উত্তর পশ্চিম কোণে। কোথাকার মানুষ কোথায় গিয়ে উঠ্লো। দণ্ডকারণ্যে বা উত্তর প্রদেশে বাঙ্গালী বাস করতে গিয়েছে; ইতিহাস যদি একদিন মুছে যায়

তবে সে যুগের লোক অবাক হয়ে শুধুবে কোথায় পূর্ব বাংলাদেশ আর কোথায় দণ্ডকারণ্য। পূর্বাঞ্চলের লোক এখানে এলো কেমন করে। উত্তর চীনে-ইটালো কেলটিকদের বাস করতে দেখে আমরাও অবাক হচ্ছি কারণ ইতিহাসের সূত্র গেছে ছিঁড়ে। ভারতীয়রা সে-দেশের নাম দেয় কুশ দ্বীপ, চীনা ইতিহাসে কুচা নামে খ্যাত। সেখানে যারা এসে বসবাস সুরু করে তাদের কথা আমরা জান্‌বো বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময়ে।

এশিয়া ও ভারতের ইতিহাসে সুপরিচিত শক (Sakas) জাতি আর্য ভাষাভাষী। বহুকাল যাযাবরের মতন ঘুরে ঘুরে খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে তারা যেখানে এসে উপনিবেশ গড়লো, সে দেশের নাম হয় শক দ্বীপ। এই শকদ্বীপ হচ্ছে মধ্য এশিয়ার সগডিয়ানা, পার্সিয়ান ভাষায় সিয়াস্তান বা শকস্থান। ভারতেও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের বাস ছিল। তারা নিশ্চয়ই শক জাতীয় লোক। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণরা জ্যোতিষী, হোরাবিজ্ঞানী, কুষ্ঠি ঠিকুজী করতে ওস্তাদ।

সেমেটিকরা পশ্চিম এশিয়ার এককোণে প্রতিষ্ঠিত, আর নবীন আর্যরা য়ুরোপ থেকে ভারত পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগে উপনিবেশ গড়ে তুলছে। সাহস ও শক্তি আর্যদের আসোল মূলধন। প্রাচীন জীর্ণ সভ্যতাগুলি তাদের গুণ্ডামির চোটে টিকতে পারলো না। ইতালিতে ইউট্রাসকানরা লোপ পায় আর্য রোমানদের হাতে, বলকান উপদ্বীপ ও ঈজান সাগরের সুসভ্য রাজ্যগুলি ধ্বংস আর্য পায় গ্রীকদের হাতে। ভারতেও হরাপ্পা সভ্যতা তাদেরই এক শাখার হাতে নিশ্চিহ্ন হয়। ষোড়শ শতকে আমেরিকার আদিম সভ্যতা ধ্বংস হয়েছিল স্পেনীশদের দৌরাত্ম্যে।

কিন্তু আর্যরা শুধু ধংস করেনি, সৃষ্টিও করেছে। পুরাতন জাতিদের কাছ থেকে যা নেবার তা তারা ভালো করে নিঙড়ে আদায় করে নেয়। আর্যামির গোড়ামি থাকা সত্ত্বেও তাদের অনেককেই নতুন দেশে প্রবেশ করে প্রাচীন জাতির মেয়েদের বিবাহ করতে হয়েছিল; কারণ নিজেদের 'জাতের' বা বর্ণের মেয়ে তো সঙ্গে বেশি আসতে পারতো না। তাই নূতন ও পুরাতন বাসিন্দাদের মেশামেশির ফলে নূতনতর সভ্যতার জন্ম হলো;

গ্রীসে হলো হেলেনিক সভ্যতা ইতালিতে রোমান সভ্যতা, ভারতে হিন্দু সভ্যতা।

আর্য সভ্যতা য়ুরেশিয়ার মধ্যে আটকা পড়ে থাকলো না। তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ষোলো শতক থেকে ছড়িয়ে পড়লো পৃথিবীর সর্বত্র। মহাসাগর পার হয়ে তারা আমেরিকায়, দক্ষিণ আফ্রিকায়, অষ্ট্রেলিয়ায়, নিউজীলনডে ও অসংখ্য দ্বীপে ছড়িয়ে গেছে। উত্তর ইউরেশিয়া ও মধ্য এশিয়ার প্রান্তর আজ 'আর্য' স্লাভ জাতীয় সোভিয়েত রুশের অন্তর্গত। সর্বত্রই য়ুরোপীয় ভাষা, সাহিত্য বিজ্ঞান চালু হয়েছে। যেখানে আর্য-য়ুরোপ রাষ্ট্র গড়েছে, কিন্তু উপনিবেশ গড়েনি—সেখানেও য়ুরোপীয় সংস্কৃতি বদ্ধমূল হয়েছে, এক কথায়—য়ুরোপীয় ভাষা, সাহিত্য, দর্শন,বিজ্ঞান, সমাজভাবনা স্থানীয় মানুষের জীবনে গভীর রেখাপাত করেছে, পৃথিবীর সর্বত্রই আজ য়ুরোপীয় ভাষার প্রভাব সুস্পষ্ট। পৃথিবীর ইতিহাসে যেমন ভারত, বর্মা, সিংহল আর্যরা সর্বকনিষ্ঠ কিন্তু শক্তি ও চিন্তায় তারাই আজ জ্যেষ্ঠ; অথচ খৃষ্ট জন্মাবার দেড় হাজার বৎসর পূর্বে মাত্র এরা ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে নামে।

চীনদেশের কথা

ইরাকের য়ুফ্রাতিস-তাইগ্রিস, মিশরের নীলনদ, ভারতের সিন্ধু-সরস্বতী, তীরে, এবং ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ও দ্বীপে যখন মানুষ বাহিরের প্রকৃতিকে আয়ত্বে ও আপনার অন্তরকে শান্ত করবার জন্য চেষ্টায় রত—তখন এশিয়ার পূর্বদিকে চীনদেশের হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং তীরে আর এক জাতির লোক সভ্য হবার জন্য চেষ্টা করছে। নদীমাতৃক চীনদেশে স্বল্পসংখ্যক লোকের প্রতিদিনের খাওয়া-পরার ভাবনা ছিল কম, অনুকূল অবস্থায় চীনের মন শুধু পৌরুষ দেখাতেই মত্ত হয়ে ওঠেনি, সুন্দর ও সু-সম জীবন যাপনের আদর্শ তাদের সাধনার বিষয় হয়েছিল আদিকাল থেকে। পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে প্রাচীন-কালের ভাবধারা, ভাষা, লিপি লোকেদের নৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে এখন পর্য্যন্ত চালু আছে সে হচ্ছে চীনদেশ—যদিও সম্প্রতি বদল হয়েছে অনেক।

আমরা যে যুগের কথা আলোচনা করছি, সেই প্রাচীন কালে চীন ছিল অতিক্ষুদ্র দেশ ; এখন মানচিত্রে হলদে রঙ দেওয়া যে বিশাল চীন সাম্রাজ্য দেখা যায় তার কোন অস্তিত্ব ছিলনা। অতীত কালে বাহিরের জগতের কাছে চীনের নাম আর চীনাদের কাছে বাহিরের জগতের কথা প্রায় অজানা ছিল। আজকের চীন একটা মহাদেশের সমান। দুনিয়ার সব লোক এক হয়ে প্রত্যেক চার জনের মধ্যে একজন হবে দাঁড়লে চীনা। এই রাজ্যের পূর্ব দিকে প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণে হিমালয় ও ভারত, উত্তরে গোবি মরুভূমি ও সোভিয়েত সাইবেরিয়া প্রভৃতি দেশ ; পশ্চিমে তিব্বত পেরিয়ে মধ্য-এশিয়া, সেখানে সোভিয়েতদের দেশ ও ভারতের সীমান্ত এসে তাদের সীমান্তকে স্পর্শকরেছে।

পশ্চিমদিক থেকে চীনের মধ্যে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম, নেসটোরীয় খৃষ্টানী, আরবী ইসলাম প্রবেশ করে, একের পর এক সব ধর্মই প্রচারিত হয় ভক্তদের চেষ্টায়। কোনো বিদেশী রাজশক্তি পশ্চিম থেকে চীনকে আক্রমণ করতে পারেনি। অথচ তারই দক্ষিণে অবস্থিত ভারত ১৮ শতক পর্যন্ত পশ্চিম থেকে আগত বাইরের উপজাতিদের আক্রমণ ও অভিযান রুখতে পারেনি, বারে বারে

ভেঙে পড়েছে সেইসব আঘাতে। চীনদেশের উত্তর থেকে বিদেশী এসে বসবাস ও রাজত্ব করেছে কিন্তু কালে তারা মনে-প্রাণে ভিতরে-বাইরে 'চীনা'ই হয়ে গিয়েছে; ধর্ম-বিশ্বাস আচার-ব্যবহারে, ভাষা-ভাবনায় খাস্ চীনাদের সঙ্গে তাদের পৃথক করা যায় না। ভারত যারা জয় করেছিল সেই তুর্কী, মুঘলরা তাদের ভাষা, ধর্ম, আচার-ব্যবহার, আইন কানুন সমস্তই পরাধীনদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। চীনে অতটা সম্ভব হয়নি; সে অন্যের কাছ থেকে যা নিয়েছে, তা নিজেদের মতো করে নূতন ভাবে সৃষ্টি করে তুলেছে।

চীনের সভ্যতা কত প্রাচীন, তা সঠিক বলা যায় না। প্রাচীনত্বের গর্ব সকলেই করে; ভারত বলে তাদের সভ্যতা অন্যূন এককোটি সাতানব্বই লক্ষ বৎসর পূর্বেও বিদ্যমান ছিল [দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃথিবীর ইতিহাস: ভারতবর্ষ]। সুমেরুর আক্কাদরাও ঐ রকম আজগুবি প্রাচীনত্ব দাবী করে। চীনারাও বলে যে আদিমানব ফান-কু ২৭ লক্ষ ৩১ হাজার বৎসর পূর্বে আঠার হাজার বৎসর চেষ্টার পর পৃথিবীকে পিটিয়ে ঠিক করেন! এইসব কথা যাঁরা বলেন বা বিশ্বাস করেন তাঁদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা; তবে আধুনিক শিক্ষা পেয়ে এসব আজগুবি মতামত আজকাল কেউ আর পোষণ করে না।

চীনদেশের পণ্ডিতরা ইতিহাস লিখতে ওস্তাদ। পৃথিবীর আর কোন প্রাচীন দেশের এমন বিস্তারিত ইতিহাস, দেশের বিচিত্র তথ্যপূর্ণ পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যায়না। তবে সব ইতিহাসের আরম্ভ সত্যযুগের কল্পনা দিয়ে। বর্তমানকে নিয়ে মানুষ সুখী নয়, তাই তারা মনে করে অতীতকালে সব সুখ সুলভ ছিল আর ভাবে পরলোকে গিয়ে সব সুখ মিলবে। চীনাদের 'সত্যযুগে' ইআও ও শান (Yao, Shun) রাজারা রাজত্ব করতেন সেটা খৃষ্ট জন্মের ২৩৫৬ বৎসর পূর্বের ঘটনা।

চীনের ইতিহাস স্পষ্ট হলো চৌবংশের সময় থেকে! তারা প্রায় ৮।৯ শত বৎসর রাজত্ব করে (খৃ পূ ১১২২-২২৫)। এঁদের সময়ে রাজ্যশাসন, সমাজব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রথম বই লেখা হয়; কুংফুৎসু, লাওৎসু ঋষিরা এই সময়ের লোক।

চীনদেশে খুব প্রাচীন কালে লিখন পদ্ধতি প্রচলিত হয় এবং সে পদ্ধতি এখন পর্যন্ত চল্‌তি রয়েছে। ছবি এঁকে সব শব্দ বোঝান হয় চীনা লিপিতে।

মিশরীয়দের চিত্রলেখা এই ধরণেরই ছিল। কিন্তু মিশরের হাইরেগ্লিফিক বা চিত্রলেখা বদল হতে হতে লিপি বা অক্ষর মালার রূপ নেয়। চীনে কিন্তু সেটি হয়নি। সেখানে প্রত্যেকটি শব্দকে আলাদা আলাদা চিহ্ন দিয়ে আঁকা হয়ে আসছে, ছবিগুলির সামান্য বদল হয়েছে বটে কিন্তু মূলত ঠিকই আছে রূপটা: 'মানুষ' বলতে। চীনায় একটা চিহ্ন; আমরা ম আ ন উ ষ ইংরেজিতে MAN এই তিনটি অক্ষর ব্যবহার করি। এই অক্ষর গুলিকেই আবার অন্য শব্দ লেখবার সময় ব্যবহার করা যায়; কিন্তু চীনা লিপিতে সেটি হয় না—মানুষের ছবি এঁকে মানুষ গাছের ছবি দিয়ে গাছ বোঝায়, কিন্তু বিশেষণকে তো আঁকা যায় না, 'উজ্জ্বল' কেমন করে লিখবে? সূর্য-চন্দ্র পাশাপাশি এঁকে উজ্জ্বল হলো, 'সততা' লিখতো ছেলের মা এঁকে অর্থাৎ নারী ও পুত্রের ছবি পাশাপাশি এঁকে বুঝতো সততা হাজার হাজার চিহ্ন না শিখলে চীনা ভাষা পড়া যায় না। তাদের সবথেকে বড় অভিধানে ৮০,০০০ চিহ্ন আছে, অবশ্য অর্ধেকের উপর অপ্রচলিত প্রতীক—কে কবে ভুল করে ব্যবহার করেছিলেন—যাকে বলে আর্য। তবে হাজার তিনচার প্রতীক আয়ত্ব করতে না পারলে চীনা সাহিত্য পড়া কঠিন।

চৌ-সম্রাটদের সময় রাজ্যের অনেক উন্নতি হয় বটে, কিন্তু তারা মারাত্মক ভুল করলেন সামন্ততন্ত্র চালু করে। যে-সব সম্ভ্রান্ত বীরেরা চৌ-সাম্রাজ্য গড়বার সময়ে সাহায্য করেন সম্রাট তাদের জমিজমা জায়গীর দিলেন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবার জন্য। সেযুগে এরকম না করলেও সম্রাটরা নিরুপায়। পথঘাট দুর্গম, যানবাহন বলতে বোঝায় ঘোড়া আর পালকি। এক জায়গায় বসে-বসে দূর দেশ শাসন করা অসম্ভব বলেই এই সামন্ত প্রথা প্রবর্তন করতে হয়। পৃথিবীর সকল দেশেই কোন-না-কোন সময়ে এই সামন্ত-শাসন-চক্র চালু করতেই হয় কেন্দ্রীয় সরকারকে। যাইহোক, এই প্রথা প্রথম প্রথম ভালই চলে, তারপর কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাৎ সম্রাট ও তাঁর পরিষদগণ বিলাসে, ব্যসনে যতই দুর্বল হতে থাকে, সামন্তরা নিজ নিজ এলাকায় ততই প্রবল হয়ে ওঠে এবং কালে দেশ বহু উপরাজ্যে টুক্‌রো টুকরা হয়ে যায়।

চীন যখন এইভাবে বহু রাজ্যে বিভক্ত, সেই সময়ে (খৃপূ ৬ শতক) চীনের মহাঋষি কুংফুৎসুর (Confucius) আবির্ভাব হয়।

কুংফুৎসুর জন্মস্থান শানটুঙ প্রদেশের 'লু' রাজ্য। বাল্যকাল থেকেই চীনের পুরাতন সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তাঁর। তাই চারিদিক থেকে সে-সব সংগ্রহ করলেন। কুংএর পাণ্ডিত্যের কথা শুনে 'লু'র রাজা তাঁকে রাজ্য সরকারে বড় চাকুরী দেন। কুংএর ব্যবস্থায় রাজ্যের অনেক কল্যাণ হ'ল কিন্তু রাজাকে নিয়ম মেনে চলতে নারাজ দেখে কুং বিরক্ত হয়ে কাজে ইস্তফা দিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। অনেক ক্ষুদে রাজার দরবারে তিনি ঘুরলেন, সকলেই মাথা নেড়ে ভালো ভালো কথা বলেন, কিন্তু তাঁরা নিজেরা সৎ ভাবে জীবন চালাতে চান না বলেই রাজ্যও চালাতে পারেন না। কুং বলতেন মানুষের নৈতিক জীবন নিষ্পাপ না হলে রাষ্ট্র শাসন কখনো সুন্দর হয় না। মিথ্যা বা ডিপ্লোমেসির উপর রাজ্যের শান্তি কখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কুং-এর মৃত্যুর পর লোকে বুঝতে পারলো কতবড় মহাপুরুষ তাদের মধ্যে বাস করে গেছেন। তখন তাঁর তত্ত্বকথা জানবার, বুঝবার জন্য লোকে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো, তাঁর উদ্দেশ্যে মন্দির নির্মাণ করে দিল, তাঁর গ্রন্থ পড়তে ও তার ওপর টীকা ভাষ্য লিখতে সুরু করলো। তাঁর বইগুলিকে বলে 'বু-কুঙ' বা পঞ্চগ্রন্থ ও 'সু-কুঙ' বা চারপুঁথি। পঞ্চগ্রন্থ প্রাচীন চীনা সাহিত্যের সংগ্রহ, অনেকটা বেদ সংহিতার মতো, আর চারপুঁথি হচ্ছে কুংএর নিজ রচনা যা শিষ্যরা গুরুর জীবদ্দশায় লিখিত বলে বিশ্বাস করতো।

কুংফুৎসুর প্রায় সম-সাময়িক হচ্ছেন ঋষি লাওৎসু বা 'বুড়ো পণ্ডিত'। ইনি বুদ্ধদেব থেকে বছর পঞ্চাশ পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বুদ্ধদেব ও কুংফুৎসু প্রায় একই সময়ের লোক। দুই মহাপুরুষই এশিয়ার দুটো দেশকে নাড়া দিয়ে গেলেন; এঁদের আবির্ভাবের পর থেকেই চীন ও ভারতের যথার্থ ইতিহাসের সূত্রপাত। কুংফুৎসু 'পরিব্রাজক' ছিলেন— বুদ্ধের মতোই ঘুরে ঘুরে উপদেশ করতেন। লাওৎসু শান্ত সমাহিত হয়ে থাকতে ভাল বাসতেন। কালধর্মে যা হয়—নদীস্রোতে শ্যাওলা দাম জমে জলের বহতা দেয় নষ্ট করে; ধর্মের ইতিহাসেও তাই ঘটে। লোকে গুরুকে অনুকরণ করে, তাঁর বাণীকে অনুসরণ করে না। নূতন যুগে নূতন লোকে এসে বললে, মানবো না এসব গুরুদের।

এদিকে চীনদেশময় উপ-রাজাদের উৎপাত চলছে। চৌ-সম্রাটরা আছেন নামমাত্র রাজার আসন শোভা করে। সেই বুদ্‌বুদ ফাটিয়ে দিল চি'ন বংশীয়

উপরাজারা—চৌ-দের খেদিয়ে নিজেরাই সম্রাট হলো। এই রাজবংশ থেকে চীন তার নাম পেয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। চি'ন সম্রাটদের সমসাময়িক হচ্ছেন ভারতের মৌর্য সম্রাটগণ।

চি'ন বংশের চতুর্থ সম্রাট (Huang-ti) হুয়াং-তি (খৃ. পূ. ২৪৭-২১০) প্রিয়দর্শী অশোকের (খৃ. পূ. ২৭৪-২৩৬) প্রায় এককালীন। হুয়াংতির সময়ে চীন সাম্রাজ্য যথার্থভাবে গঠিত হলো। এঁরই সময়ে উত্তর হিউংগ-নু-বা হুন নামে দুর্ধর্ষ যাযাবরের দল চীনের নদীমাতৃক ভূভাগে প্রবেশের চেষ্টা সুরু করে। তাদের রুখবার জন্য চীনের উত্তরে এক বিরাট প্রাচীর তৈয়ারী সুরু হয়। কিন্তু প্রাচীর যতদূর তৈয়ারী হয় সেটা এড়িয়ে হুনরা অন্যপথে চীনের মধ্যে প্রবেশ করে। বহুশতাব্দী ধরে এই প্রাচীর দীর্ঘ মধ্যে হতে দীর্ঘতর হতে থাকে; ক্রমে প্রায় দেড় হাজার মাইল লম্বা হয়েছিল। প্রাচীরের উপর, বুরুজ, ঘোড়সওয়ার পাশাপাশি চলতে পারে এত প্রশস্ত। রাজ্য রক্ষার জন্য এমন প্রচেষ্টা আর কোন দেশে দেখা যায় না; প্রাচীন জগতের লোকে বলতো সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম এই চীনা প্রাচীর।

হুয়াংতির কঠোর শাসনে উত্তর ও দক্ষিণ চীন এক রাজ্য হলো বটে, কিন্তু মূলগত ভেদ ঘুচলো না! উত্তর ও দক্ষিণ চীনের মধ্যে ভাষাগত, আচারগত, স্বভাগত পার্থক্য সুস্পষ্ট, কেউ কাউকে মানতে চায় না, সুযোগ পেলেই বিদ্রোহী হয়। হুয়াংতি দেশকে এক ছত্রতলে আনলেন বটে, কিন্তু প্রশাসনিক ও সামাজিক বিষয় সংস্কার করতে গিয়ে পদে পদে বাধা পেলেন বুড়ো ঝুনো পণ্ডিতদের কাছ থেকে,—তাদের মন কুংফুৎসুর নীতি উপদেশের কঠিন শিকলে আঁটা, নতুন কিছু ভাবতে বা চালু করতে অপরাগ। কিছু রদবদলের কথা উঠলেই তারা প্রাচীন শাস্ত্রের বচন আওড়ায়, দোহাই পাড়ে। মানুষের মনের এই চরম বিকৃতি দূর করবার জন্য হুয়াংতি হুকুম দিলেন যে প্রাচীন কুংফুৎসীয় শাস্ত্র পুড়িয়ে ফেলো। চারিদিকে লোক ছুটলো কুংফুৎসুর শাস্ত্ররাশি পোড়াবার জন্য, সঙ্গে সঙ্গে অন্য লোকে সে-সব লুকোবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো। হুয়াংতির এই উপদ্রব সাময়িক ভাবে সফল হয়েছিল কিন্তু কুংফুৎসুর প্রভাব তাতে কমলো না। ঠিক সেই সময়ে ভারতে অশোক ব্রাহ্মণদের আধিপত্য খর্ব করার জন্য বুদ্ধের বাণী প্রচারে মন দিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেও দেখা গেল অশোকের তিরোধানের পরেই পাটলিপুত্রে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য আবার জেগে উঠলো।

অসুরবানিপালের রাজ্য আক্রমণ করে জানান দিলেন যে নূতন আর্যশক্তি জেগেছে তাঁর রাজ্যের উত্তরে। সেই বারেই রাজধানী নিনেভার দফা শেষ হতো এই পাহাড়ীদের হাতে; কিন্তু হঠাৎ মীড়দের রাজ্যের উপর হামলা করলো শকরা মধ্যএশিয়া থেকে। নিনেভার অবরোধ তুলে হুবক্ষত্রকে আপন দেশ সামলাবার জন্য ছুটতে হলো। অসুর রাজ্য সেবারের মতো রক্ষা পেলো; কিন্তু সেটা বেশি দিনের জন্য নয়। অসুরবানির মৃত্যুর পরে অসুরীয় রাজ্যের দ্রুত অধঃপতন হয়ে চলে। সেই সুযোগে নয়া-বাবিলনের নবপলসুর (খৃঃ পূঃ ৬২৫-৬০৫) মীড়রাজ হুবক্ষত্রের সাহায্য নিয়ে নিনেভা আক্রমণ করলেন। এবার তাকে ধ্বংস থেকে কেউ রক্ষা করতে পারলোনা। ইতিহাসের পাতা থেকে নিনেভার নাম মুছে গেল। দু'হাজার বছর পরে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা মাটি খুঁড়ে তাকে বাহির করেছিল। বোটা, লেয়ার্ড-এর নাম অমর হয়ে আছে এই আবিষ্কারের সঙ্গে।

মীড়দের রাজ্য বেড়ে গেল,—অসুরীয় রাজ্যের উত্তরাংশ পড়লো মীড়দের ভাগে, দক্ষিণাংশ এলো নয়া-বাবিলনের রাজাদের তাঁবে। এবার মীড়দের রাজ্য বিস্তার সুরু হলো। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজশক্তি একে একে সবাই নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। নয়া বাবিলন চকিতের মতো উঠেই নিবে গেল; অসুরীয়রা ধ্বংস হয়েছে মিশরের তেজ অনেকদিনই নির্বাপিত, এখন তারা বিদেশ থেকে ভাড়াটিয়া সৈন্য আনে দেশরক্ষার জন্য—এমন দশা হয়েছে তাদের। কেবল বর্তমান তুর্কীর পশ্চিম সীমান্তে লিডিয়া নামে নূতন একটা দেশ জেগেছে।

লিডিয়ানরা কোন্ ভাষা বলতো, আর তারা কোন্ জাতির অন্তর্গত তার মীমাংসা এখনো হয়নি। পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে এরা ইতালির আদিম-বাসিন্দা ইউট্রাসকানদের একটা শাখা—হতেও পারে, কি করে ছুটকে এখানে এসে রাজ্য গড়েছিল। লিডিয়ানরা খুবই সুসভ্য। বোধহয় খনির কাজ করে, বাণিজ্য করে ধনী হয়ে উঠে। মুদ্রার প্রচলন এরাই প্রথম করেছিল বলে জানা যায়। ধনদৌলত পুঁজি করার সুনাম ও দুর্নাম দুই-ই এরা অর্জন করে। কৃপণ মিদাস রাজা কী স্বর্ণলোভী ছিলেন সে-গল্প সকলেই জানে; তিনি যাতে হাত দেন তাই সোনা হয়ে যায়; এমনকি নিজের মেয়েকে ছোঁয়ামাত্র সে-বেচারা সোনা হয়ে বোবা বনে গেল। এই গল্পের অর্থ হতে পারে যে লোকটা বড় ব্যবসায়ী ছিল, সব কাজেই সফল হোত

বলে লোকে তার নামে এইসব গল্প বানিয়েছিল। এই লিডিয়ানদের রাজ্য হুবক্ষেত্র আক্রমণ করেন; কিন্তু বিধি বাম, সূর্যগ্রহণ দেখা দিল। অশুভ দিন—এদিনে যুদ্ধ করা যায় না! উভয় দেশের রাজারা স্বীকার করলেন সূর্যগ্রহণের সময় যুদ্ধ চলতে পারে না। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়েও শত্রু মিত্র সকলেই ঘোষণা করেছিলেন যীশুখৃষ্টের জন্মদিন 'বড়দিনের' সময় যুদ্ধ বন্ধ থাকবে! ধর্মের দিন সেটা! হুবক্ষত্রের পক্ষে শাপে বর হলো দেশে ফিরলেন—সেখানে নতুন বিপদ ঘনিয়ে উঠেছে।

মীড়দের অধীন জাতির মধ্যে ছিল পারসি নামে আর্যদের এক উপজাতি। মালভূমের মধ্যে পার্সগড় (Pasargade)-এ করুষ নামে সর্দারের দুর্গ ও গড় ছিল। করুষ অনেক কূটনীতির চাল চেলে বাবিলনের রাজাকে দলে টানেন; এবং তারপর দুইজনে সৈন্য সামন্ত নিয়ে মীড়দের রাজ্য আক্রমণ ও জয় করেন। পারস্য ও মীড়দের দেশ মিলে বেশ বড় একটা রাজ্যের পত্তন হলো ইরানভূমে।

এতকাল লিডিয়া, বাবিলন ও মিশরের মধ্যে রাজনৈতিক কূটনীতির দাবা-বোড়ের চাল দিয়ে দিয়ে মীড়রা আন্তর্জাতিক ভারসাম্য বেশ রক্ষা করেই আসছিল; হঠাৎ সেই মীড়রা পারস্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক রাষ্ট্র হলো বলে শক্তির ভারসাম্য পারসিকদের অনুকূলেই গেল। ফলে পশ্চিম এশিয়ায় রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়া পরিস্থিতির আশঙ্কা দেখা দিল। মীড়দের রাজধানী একবাতানা অধিকৃত হওয়ায় পারসিক শাহনশাহ করুষ বহু ধনের মালিক হলেন। রাজ্যবিস্তার ও রাজ্যশাসনের জন্য অর্থের প্রয়োজন—সেটা হাতে আসাতে পারসিক সম্রাটের শক্তি আরো বেড়ে গেল; এতদিন ছিল সৈন্যবল, এবার তার সঙ্গে যোগ হলো ধনবল। আর ধন দিয়ে সব কেনা যায়, মানুষের প্রাণ পর্যন্ত। আর রাজ্য বিস্তারের সময়ে মানুষের প্রাণটার বিশেষ প্রয়োজন। ইতিহাসের নতুন পরিচ্ছেদ সুরু হলো করুষের আবির্ভাবের পর থেকে।

মীড়দের পরাজয়ের খবর পৌঁছলো দূর পশ্চিমে লিডিয়ার রাজ-দরবারে। রাজা ক্রোসাস উৎফুল্ল হয়ে তাঁর রাজ্য বাড়াবার দিকে মন দিলেন। সেই সময়ে পারসিকদের রাজা করুষ একবাতানায় বসে মীড় রাজ্য সামলাচ্ছেন। লিডিয়া-রাজ ক্রোসাসের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি লিডিয়া আক্রমণ করলেন।

যুদ্ধে লিডিয়ানরা হারলো ও ক্রোসাস বন্দী হলেন (খৃ. পূ. ৫৪৭)। ক্রোসাস ছিলেন অসম্ভব ধনী, ধনদৌলতের খুব জাঁক ছিল। বিদেশ থেকে কোন লোক আসলে ধন-ঐশ্বর্য দেখিয়ে গর্ব করতেন। একবার গ্রীস দেশ থেকে সোলন নামে এক জ্ঞানী লোক আসেন দেশভ্রমণে। ক্রোসাস তাঁর ঐশ্বর্য দেখিয়ে জ্ঞানীকে প্রশ্ন করেন 'আমি কি দুনিয়ার সেরা সুখী নই।' সোলন চুপ করে থেকে বল্লেন যে 'মৃত্যুকালে সুখে মরতে পারে সেই সুখী'। বলা বাহুল্য এ উত্তরে ক্রোসাস খুসী হন্‌নি। করুষের সঙ্গে লড়তে গিয়ে, পরাভূত হয়ে ক্রোসাস ভাবছেন বন্দীদশা থেকে মৃত্যু ভাল। স্থির করলেন আত্মাহুতি দেবেন। চিতায় উঠে হঠাৎ সোলন, সোলন' বলে আর্তনাদ করতে লাগলেন। সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল। সোলন তো কোনো দেবতার নাম নয়! করুষ ক্রোসাসকে চিতা থেকে নামিয়ে, সব কথা শুনে বললেন 'তুমি আজ থেকে আমার সভাসদ হয়ে থাকো'। হয়তো এটা একটা গল্প মাত্র। যাইহোক, লিডিয়া জয় করে অনেক ধনের মালিক হয়েছিলেন পারস্যের রাজা। কিন্তু লিডিয়া জয় থেকেই আন্তর্জাতিক জগতে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হলো,—লিডিয়ার পাশেই গ্রীকদের দেশ—আইওনিয়ান প্রভৃতি হেলনী উপজাতিদের বাস। অল্পসময়ের মধ্যে তাদেরও দেশগুলি পারস্য সাম্রাজ্যভুক্ত হলো। গ্রীকদের দেশ অধিকার থেকেই যে-সব সমস্যা দেখা দিল তার কথা পরে আসবে।

মীড়-পারসিকদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে করুষ দিগ্বিজয়ে বাহির হলেন। দিগ্বিজয়ের আসল অর্থ লুঠতরাজ। অন্যেরা যা সঞ্চয় করেছে সেটাকে জোর করে কেড়ে আনার জন্য সকল দেশেই রাজদস্যুর দল দিগ্বিজয়ে বাহির হতেন। এখন সে-দস্যুতার নাম বদলেছে, রূপ পালটেছে—ধর্ম ঠিকই আছে। এখন চলেছে আর্থিক দিগ্বিজয়। যাইহোক, দেখতে দেখতে মধ্যএশিয়ার বক্‌ত্র (বাহ্লিক), সুগুধ (শক), দোয়াবের বাবিলনিয়া প্রভৃতি ভূখণ্ড পারসিক সাম্রাজ্য ভুক্ত হলো। বাবিলনের পুরোহিতরা খুব চতুর; তারা করুষকে নগর দ্বারে আসতে দেখেই মহাআড়ম্বড়ে বরণ করে নিল! তখনকার দিনে বাবিলন ছিল পশ্চিমএশিয়ার আন্তর্জাতিক নগর; বহুজাতির লোকের বাস। তাদের মধ্যে ইহুদীরা দলে ভারি—প্রায় সত্তর হাজার। সত্তর বৎসর পূর্বে নেবুকাদনেজার ইহুদীদের দেশ জয় করে হাজার দশ লোককে বাবিলনে বন্দী করে এনেছিলেন; সেই থেকে তারা এখানেই আছে।

কিন্তু জেরুসালেমের জন্য তাদের মন সদাই ব্যাকুল। তাদের একটা কবিতার তর্জমা করে দিই এখানে।

'যখন জিওনের (জেরুসালেমের) কথা মনে পড়ে বাবিলনের নদীর তীরে বসে আমরা কাঁদি। শর বনের ঘাসে আমাদের বীণা রাখি লুকিয়ে। যারা আমাদের বন্দী করে রেখেছে তারা গান গাইতে বলে, যারা আমাদের সর্বনাশ করেছে, তারা বলে আমাদের আমোদ করতে; বলে 'তোমাদের জিওন দেশের গান করো' হায়, হায়! কেমন করে পরের দেশে বন্দী বেশে জিওনের গান গাই। ও, জেরুসালেম। আমি যদি তোমায় ভুলে যাই, তবে আমার ডান হাত যেন পঙ্গু হয়ে যায়। আর আমি যদি তোমায় স্মরণ না করি, আমার সকল সুখ থেকে যদি আমি ভাল না বাসি তবে আমার যেন বাক্‌রোধ হয়।"

কী মনের দুঃখেই গানটি অজানা কবি রচনা করেছিলেন। যাক্, তাদের দুঃখের রাত শেষ হলো। করুষ বাবিলনে প্রবেশ করে ইহুদীদের মুক্তি দিয়ে দেশে ফিরে যাবার অনুমতি দিলেন। শুধু তাই নয়, জেরুজালেমের ভাঙা মন্দির মেরামতী করবার জন্য অর্থ দিলেন, ও লুঠকরা তৈজসপত্র ফিরিয়ে দিলেন। এখানে একটা কথা মনে হয়—করুষ কি একেবারে নিঃস্বার্থভাবে ইহুদীদের নিজেদের দেশে ফিরিয়ে পাঠালেন। এই সত্তর হাজার ইহুদী বাবিলন থেকে চলে গেলে, পারসিকদের আর্থিক সুবিধা নিশ্চয়ই হলো। হাজার হাজার পারসিকরা এসে দোয়াবে উপনিবেশ গড়লো। ইহুদীরা পারসিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি কৃতজ্ঞচিত্তে বেশ আয়ত্ত করে জেরুজালেম ফিরে গেলো। তার পরোক্ষ ফল সাম্রাজ্যবাদী পারসিকরা নিশ্চয়ই পাবে, একথা চতুর করুষ জানতেন। আজকালও ঠিক অনুরূপ ঘটনা ঘটছে—ধনতন্ত্রবাদী রাষ্ট্র ও সমাজতন্ত্রবাদী রাষ্ট্র উভয়েই অনগ্রসর। তথা-কথিত নিরপেক্ষ দেশের লোকদের নানা সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাদের মনজয় করছেন। এরাই হয় নূতন মতবাদের সমর্থক ও প্রচারক।

করুষ কিছুকাল পরেই ইহুদীদের দেশ আক্রমণ করেন। কিন্তু সে দেশ জয় করতে বিশেষ কষ্ট তাঁকে পেতে হয়নি, হয়তো প্রত্যাবৃত্ত ইহুদীরা সহায় হয়েছিল।

যাক্, রাজ্যজয়ের নেশা—রক্তখাওয়া বাঘের লোভের মতো—মানুষের গন্ধ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়—বাঁচে কি মরে জ্ঞান থাকে না।

কুরুষ খুব বুদ্ধিমান ; কিন্তু রাজ্যজয়ের নেশায় ছুটে চললেন মধ্যে এশিয়ায় শকদের মাঝে। এবার যুদ্ধে হারলেন, শকদের রানী তামিরী কুরুষের কাটা-মুণ্ডুর দিকে তাকিয়ে বললেন 'এতকাল তুমি লোকের রক্তপান করেছ—আজ মরবার পরও তুমি রক্তপান কর।' এই বলে কাটামুণ্ড ছুঁড়ে ফেলে দিলেন রক্তের মধ্যে। এই শ্রেণীর সাহসী ও শক্তিমান পুরুষ দেখা দিয়েছে যুগে যুগে ; পরিণামও সকলের একই রকম হয়েছে। রাজ্যজয়ের লোভে মান গিয়েছে, প্রাণও গিয়েছে।

কুরুষের পুত্র কাম্বুসের (খৃ পূঃ ৫৩০-৫২১) সময় মিশর পারস্যভুক্ত হলো। যে-মিশরের প্রতাপে এককালে পশ্চিমএশিয়া কাঁপতো—আজ সেই দেশ ধূলায় লুটোচ্ছে ; একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস—এই হচ্ছে ইতিহাসের ঘুরনচাকি। এর পর মিশর আর মাথা তুলতে পারেনি।

কাম্বুসের মৃত্যুর পর পারস্যের মধ্যে দেখা দিল অরাজকতা বা বলতে পারা যায় বহুরাজকতা,—অর্থাৎ বহুলোকের যুগপত রাজা হবার জন্য আকাঙ্খা। দেখা দিল অনেক চক্রান্ত, অনেক রক্তপাতের পর অখামনীয় বংশের 'দারায়াবৌস ক্ষয়াথিনাং ক্ষয়থিয়' দারায়ুস (Darius) রাজাধিরাজ বা শাহনশাহ * হলেন। দারায়ুস তাঁর রাজা হবার ঘটনাটি কিছুকাল পরে খুব ফলাও করে পাহাড়ের গায়ে খোদাই করিয়েছিলেন! বাগদাদ থেকে তেহেরান আসা যাবার পথের ধারে কারমানশাহ শহরের নিকট বেহিস্থান নামে এক জায়গায় একটা খাড়া পাহাড়ের গায়ে এই শিলালেখ দেখা যায় ; এখনো সেটা অটুট আছে। তিনশো ফুট উঁচু পাহাড়ের উপর ২৫ ফুট খাড়াই ও ৩০ ফুট চওড়া মাজা পাথরের গায়ে 'লেখ'গুলি-ঘসা খোদিত আছে তিনটা ভাষায়। প্রথমটা পারসিক ভাষায়—বাবিলীয় কোণাক্ষরী লিপিতে উৎকীর্ণ, দ্বিতীয়টি বাবিলনীয় ভাষায় ঐটারই অনুবাদ, আর শেষটি হচ্ছে সুসা (প্রাচীন ইলাম দেশ) প্রদেশের উপভাষায় 'লিখিত'। মধ্যখানে একটা প্রকাণ্ড খোদাই ছবি—দারায়ুস দাঁড়িয়ে—তাঁর ধরাশায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী গোমতের বুকের উপর বাঁ পা চাপানো। আর সামনে আসছে পিঠমোড়া বন্দীর দল—গলায় সব দড়ি বাঁধা। উপরে খোদাই আছেন অহুর মজদা।

* 'ক্ষয়াথিনাং ক্ষায়থিয়' পুরাতন পারসিক শব্দ পরযুগে উচ্চারিত হলো 'শাহনশাহ'। এরই অনুবাদ বোধহয় 'রাজ-অধিরাজ'।

বা অসুর মহাদেব—একমুখ শাদা দাড়ি গোপ, মাথায় মুকুট—শরীর থেকে বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ছে রশ্মির মতো।

পৃথিবীতে আর্য ভাষায় এত পুরাতন শিলালেখ আর নেই। তাই তার খানিকটা তর্জমা এখানে দিলাম, মাঝে মাঝে মূল ভাষা দেওয়া গেছে। বুঝতে পারা যাবে পারসি ভাষার সঙ্গে বৈদিক সংস্কৃতের কত মিল!

দারায়ুস বলছেন "আমার বংশে আমার পূর্বে আটজন রাজা হইয়াছিলেন, ঔর মজদ্ আমাকে রাজা করিয়াছেন [বস্না ঔর মজ্দাহ অদম্ ক্ষয়থিয় । নবম আমি (অদম্ নবম) ঔর মজ্দের কৃপাতে আমি রাজা হইয়াছি [আমিয় ঔর মজদা ক্ষত্রম্ মনাক্রাবর]

"ঔর মজ্দার কৃপায় আমি এই সব প্রদেশের (দাহুব :) রাজা হইয়াছি —পারস্য, সুসিয়ানা, বাবিলন, আসিরিয়া, আরব, মিশর (মুদ্রারা), সমুদ্রের দ্বীপাবলী, সার্দিস, আইওনিয়া, মীডিয়া, আর্মানিয়া, কাপাডোসেয়া, পার্থিয়া দ্রাঙ্গিয়ানা, আরিয়া কোরাসসিয়া, বক্ত্রিয়া সার্দিয়ানা, গান্ধার, সিথিয়া, সাতাগেদিয়া, আরাকোসিয়া মাকা, সর্বসমেত ২৩টি"

তারপর কিভাবে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী গোমতকে কাবু করলেন, কতদেশ জয় করলেন, কেমন ভাবে নয়জন রাজাকে বেঁধে আনলেন তার বর্ণনা দিয়ে বলছেন :

"ঔর মজ্দার করুণা অনুসারেই আমি বরাবর কাজ করে আসছি, আমার এই ঘোষণা এরপর যে-কেহ পড়বে, সে-যেন আমার কথায় বিশ্বাস করে। ইহাকে মিথ্যা মনে করিও না। ঔর মজ্দা আমার সাক্ষ্য, ইহা সমস্ত সত্য, মিথ্যা নহে। এসকল কাজ আমিই করেছি। ঔর মজ্দা আমার সহায় হয়েছিলেন এই কারণে যে আমি দুর্জন বা দুরাচার ছিলাম না. স্বেচ্ছাচারী ছিলাম না, ধর্ম অনুসারেই আমি রাজ্য শাসন করেছিলাম।"

পুরাতন রাজধানী (পাসারগাডা) পার্সগড় থেকে ৩০ মাইল দূরে দারায়ুস নতুন রাজধানী (পার্সিপলিস) পার্সপুরী পত্তন করলেন। রাজধানীর অদূরে পাহাড়েরগায়ে তাঁর নিজের, তাঁর পুত্র জরাক্সেস এবং পরবর্তী শাহনশাহদের কবর আছে।

দুই শ' বৎসর পরে ভারতে অশোক শিলালিপি উৎকীর্ণ করেন ; তাঁর বলবার বিষয়, তাঁর বলবার রীতি দরায়ুসের লেখ থেকে পৃথক ! তিনিও বিজয় চেয়েছিলেন, কিন্তু সে বিজয়ের নাম দেন ধর্মবিজয়।

জারক্সেসের সাম্রাজ্যের মতো এতো বড় সাম্রাজ্য ইতিপূর্বে আর কোনো সম্রাট শাসন করেন নি। অসুরীয়রা সাম্রাজ্য গড়েছিল বটে, তবে সে ছিল ফৌজী শাসন অর্থাৎ সৈন্য ও সেনাপতিরা ছিলেন সর্বময় কর্তা। কিন্তু নয়া পারসিক সম্রাটরা তাঁদের অধিকৃত দেশগুলির ভিতরকার শাসনব্যবস্থায় হাত দিলেন না, স্থানীয় লোকদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখলেন। তবে খবরদারী করার জন্য ক্ষত্রপ বা রাজ্যপাল, পরিদর্শক আর গুপ্তচর মোতায়ান করলেন। এদের মারফত সময়মতো সব খবর পৌঁছাতো রাজ সরকারে। অধীনস্থ দেশগুলি বরাদ্দমতো রাজস্ব—তা সোনায় হোক আর জিনিষপত্রে হোক—নিয়মিতভাবে পাঠালেই কেন্দ্রীয় সরকার খুশি থাকতেন।

সাম্রাজ্য শাসন ও শোষণ করতে গেলে সৈন্য চাই ও ভাল সড়ক চাই; অর্থাৎ রাস্তাঘাট বা গতায়াতের ব্যবস্থাটা ভালো রকম না থাকলে সৈন্যের চলাফেরা সহজ হয় না। তা ছাড়া সাম্রাজ্যের কোথায় কি হচ্ছে তার সংবাদ না পেলে রাজ্যশাসন করা যায়না। রাজধানীর সঙ্গে প্রাদেশিক-নগরের সংযোগ রক্ষার দ্রুত ও সহজ ব্যবস্থা থাকা উচিত, এটা পারসিক সাম্রাজ্যবাদী শাহনশাহ বুঝতে পেরেছিলেন। সেইজন্য সাম্রাজ্যের নানা স্থানের উপরাজধানীর সঙ্গে রাজপথ দ্বারা রাজধানী যুক্ত করা হয়। পূর্বকালের হিটাইত রাজাদের কতকগুলি মজবুত সড়ক সংস্কারের অভাবে নষ্ট হয়েছিল—সেগুলো নতুন ক'রে করা হলো। সাম্রাজ্য স্রষ্টা রোমানরা সাম্রাজ্যময় মজবুত সড়ক নির্মাণ করেছিল এইজন্যই। তাই কথায় বলে All roads lead to Rome সব রাস্তাই রোমের দিকে গিয়েছে। মধ্যযুগের ভারতে তুর্কী মুঘলরা বাদশাহী সড়ক তৈরী করে, আধুনিক কালে ইংরেজ ভারত জয় করতে-না করতেই টেলিগ্রাফ, রেলপথ দিয়ে ভারতকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল।

পারসিক সাম্রাজ্যের পশ্চিমে বর্তমান তুর্কীর স্মির্ণার নিকট লিডিয়ার রাজধানী ছিল সার্দিস, ভূমধ্যসাগর তীরে। সেখান থেকে পারস্যের অন্যতম রাজধানী সুসা পর্যন্ত মজবুত রাজপথ নির্মিত হলো, মাঝে মাঝে সরকারী চৌকী আর ভালো সরাইখানা। সমস্ত পথটাই মানুষের বসতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোদোতস এই সড়কের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন।

সাম্রাজ্যের এক অংশ থেকে অন্য অংশে ঘোড়ার ডাক বসেছে—রাতদিন নিয়মিত সময়ে ঘোড়-সোয়ার ডাক নিয়ে আসে-যায়, একে বলে 'আংগারাম'।

দারায়ুসের সাম্রাজ্য চারদিকে বিস্তৃত। পূর্বদিকে সিন্ধুনদের অপর পার পর্যন্ত বোধহয় সীমান্ত পৌছয়। সবথেকে বেশি রাজস্ব আসে দুনিয়ার সর্বযুগের কামধেনু ভারত অঞ্চল থেকেই। পশ্চিমে মিশর তো পূর্ব থেকেই সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়েছিল। এবার য়ুরোপের দিকে সৈন্য চলেছে। দানিয়ুব নদীর মোহনার উত্তরে কতকগুলি বর্বর উপজাতির কোনো ব্যবহার প্রাদেশিক কোনো পারসিক ক্ষত্রপের কাছে অভদ্র বলে মনে হয়। তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্য য়ুরোপ আক্রমণ। এই অভিযানে এশিয়া মাইনরের উপকূলবাসী আইওনীয় গ্রীক বা যবনরা জাহাজ ও নাবিক দিয়ে পারসিকদের সহায়তা করে। সৈন্যদল তো দানিয়ুব পার হয়ে শত্রুর সন্ধান করছে; কিন্তু শত্রুরা যুদ্ধ করবার জন্য আদৌ উৎসুক নয়। তারা এমন গা ঢাকা দিল যে বন বাদড়, পাহাড়, জলা জঙ্গল খুঁজে শত্রুকে সামনা-সামনি পাওয়া গেল না। এশিয়ার সৈন্যদল থ্রেস মকিদান প্রভৃতি অঞ্চল দখল ক'রে সার্দিসে ফিরে এলো। এটাই হচ্ছে এশিয়ার প্রথম য়ুরোপ অভিযান। য়ুরোপের দখলী দেশে পারসিক ক্ষত্রপ বা রাজ্যপাল নিযুক্ত হলেন।

ইতিমধ্যে এশিয়ার আইওনীয় বা যবনদের মধ্যে পারস্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা দিল। তার পিছনে ছিল গ্রীসের রাষ্ট্রনগরী আথেন্সের উস্‌কানি। আথেন্স গ্রীসের মধ্যে মাথা-চাড়া দিচ্ছে। এই সময়ে মহানগর সার্দিসের মধ্যে দুটো দল—ছিল—একদল চায় শহরে হাঙ্গামা বাঁধিয়ে আথেন্সের সঙ্গে মিতালি করতে,—বৃহত্তর গ্রীসের অঙ্গীভূত হতে। আর একদল পারসিক শাসনে খুশি, তারা ব্যবসায় বাণিজ্য করে, পয়সা রোজগার করে, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে; রাজনীতির মতামত নিয়ে মাতামাতি করতে তারা নারাজ। আথেন্সের উস্‌কানিতে যে দল নাচছে তারা চায় দেশে আথেন্সের মতো 'ডিমক্রেটিক' শাসন ব্যবস্থা চালু করতে। আজও পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে ব্রিটিশ-মার্কিনমার্কা শাসন-বিধি, আর সোবিয়েত রুশ-মার্কা শাসন প্রথা চালু নিয়ে মতান্তর মনান্তর দেখা দিয়েছে। সার্দিসের অনুরূপ সমস্যা—ডিমোক্রেসি না অটোক্রেসি—বহু রাজার ভদ্রবেশী গুণ্ডামি ও একরাজার নিরেট গুণ্ডামির মধ্যে কোনটা গ্রহনীয় তাই নিয়েই মতভেদ। মতভেদ থেকে মনান্তর তারপর একদিন দুই দলে মারামারি হ'তে হ'তে শহরে আগুন লেগে গেল। তাতে শহর শুধু পুড়লো না, গ্রীসে ও পারস্যে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠলো।

দারায়ুস খুব বিরক্ত হয়ে আথেন্সকে শিক্ষা দেবার জন্য সৈন্য পাঠালেন।

বিরাট সৈন্যবাহিনী সার্দিস থেকে বের হলো, গ্রীস ছারখার করতে এশিয়ার সৈন্যদল চলেছে। কিন্তু সামনা-সামনি লড়াইয়ে পারসিক সৈন্যরা গ্রীকদের কাছে হারলো। যুদ্ধটা হয়েছিল আথেন্স থেকে কয়েক মাইল দূরে মারাথন নামে একটা জায়গায়।

এই যুদ্ধের আগে আথেন্স একা কিকরে পারসিক সৈন্য-পঙ্গপালকে রুখবে ভেবে পাচ্ছেনা। স্পার্টা বীরত্বের জন্য খ্যাত তাদের আহ্বান করবার জন্য একজন লোক ছুটলো স্পার্টায়। স্পার্টানরা বললো, 'সামনে পূর্ণিমা, অশুভ দিন—পূর্ণিমার পরে যাবো।' কিন্তু পারসিক সৈন্য তো শুভ দিনের জন্য অপেক্ষা করবেনা। স্পার্টানরা নড়লোনা। লোকটি আবার দৌড়লো এই দুঃসংবাদ নিয়ে।

তিনদিন পরে স্পার্টান সৈন্য এসে দেখে যুদ্ধ ফতে হয়ে গেছে, পারসিক সৈন্যদের আথেনীয়রাই হটিয়ে দিয়েছে।*

যুদ্ধ হিসাবে পারসিকদের পক্ষে মারাথনের যুদ্ধের পরাজয়টা এমন কিছু ঘটনা নয়। কিন্তু আথেনীয়দের কাছে ঘটনাটা খুব বড় হয়ে উঠলো—গ্রীকরা পারস্যের শাহনশাহর সৈন্যদলকে হারিয়েছে বলে খুব একটা সরগোল উঠলো। গ্রীসময় ক্ষুদে ক্ষুদে স্টেটগুলো আথেন্সের সাফল্য দেখে অবাক। ১৯০৪ সালে জাপানের কাছে রুশ সৈন্য পোর্ট আর্থারের যুদ্ধে হেরে গিয়েছিল —তাতে রুশের ইজ্জতের হানি ছাড়া রাজ্যক্ষয় তেমন কিছু হয়নি; কিন্তু জাপনীরা দেখলে যে তারা পৃথিবীর একটা সেরা শক্তির দম্ভ চূর্ণ করতে পেরেছে; সেই থেকে তাদের মনের জোর বেড়ে গেল। ঠিক তেমনিটি হয়েছিল আথেনীয় গ্রীকদের বেলায়। তা ছাড়া হেরোদোতাস পারসিক সমর অভিযানের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন, তা অতিরঞ্জন বলেই মনে হয়।

দারায়ুসের মৃত্যুর পর (খৃঃ পূঃ ৪৮৫) তাঁর পুত্র জারক্সেস নিজে সৈন্য নিয়ে গ্রীস আক্রমণ করবেন ঠিক হলো। এটা দিগ্বিজয়ের বিলাস যাত্রা। পারসিক সাম্রাজ্য শাসনের নিয়মানুসারে প্রত্যেক প্রদেশকে সৈন্য, রসদপত্র, জাহাজ যার যা সাধ্য তাই দিয়ে সাহায্য করতে হয়। নানা জাতির অগণিত সৈন্য নানাবেশে, নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সার্দিসে সমবেত হলো। ভারত

*পারসিকদের আক্রমণ সংবাদ নিয়ে যে লোকটি স্পার্টায় গিয়েছিল, সেই ছুটলো আথেন্স পানে। মারাথনযুদ্ধের বিজয় সংবাদ নিয়ে বাজারে উদ্‌গ্রীব লোক অপেক্ষা করছে যুদ্ধে কি হলো জানবার জন্য। লোকটি গিয়ে চীৎকার করে বললো, আমরা জিতেছি। এই কথা বলেই সেখানে পড়ে মরে গেল। মারাথন থেকে আথেন্স ২৬ মাইল। ম্যারাথন রেস কথাটির উৎপত্তি এখানে।

থেকে সুতির কাপড় পরা লম্বা ধনুক হাতে সৈন্যদল গিয়েছিল। এই যুদ্ধযাত্রার সঙ্গে তুলনা হয় নেপোলিয়নের রুশ আক্রমণ—সতেরোটা জাতির সৈন্য সামন্ত নিয়ে যুদ্ধে যান তিনি। নেপোলিয়নকে জারক্সেসের মতোই হেরে ফিরতে হয়েছিল।

পারসিকদের অধীন দেশ ফিনিশিয়ার টায়ার, সিদন বন্দর থেকে জাহাজ সংগ্রহ হলো হেলেস্পন্টের উপর দিয়ে সেতু বানালো ফিনিক ইনজিনীয়াররা। লক্ষ লক্ষ সৈন্য হাজার হাজার ঘোড়া আটদিন ধরে পেরলো সাঁকো দিয়ে। ঘোড়া জল দেখে পাছে ভয় পায় সেজন্য সেতুর দুপাশে উঁচু করে আড়াল তৈরী হয়।

স্থলপথ ছাড়া জলপথেও সৈন্য চললো। জারক্সেস নিজে লোকলস্কর রানী দাসদাসীদের নিয়ে স্থলপথে গ্রীসে প্রবেশ করলেন। পারসিক সৈন্য গ্রীস প্রায় দখল করলো, আথেন্স পুড়ে ছারখার হলো। কিন্তু জলযুদ্ধে পারসিকরা পারবে কেন, অধিকাংশ সৈন্য জাহাজে কখনো চড়েনি বোধহয়। সালামিসের উপসাগরে পারসিক জাহাজী সৈন্যদের হার হলো।

জারক্সেস দেশে ফিরে এলেন—একজন সেনাপতি ও কয়েক হাজর সৈন্য গ্রীসে থেকে গেল। এক বৎসর পরে সেই সেনাপতিও গ্রীস থেকে বিতাড়িত হলেন।

গ্রীসের মধ্যে পারসিকদের প্রভুত্ব হলো না; কিন্তু চারিপাশে ও এশিয়া মাইনরে এবং নিকটবর্তী দ্বীপগুলিতে পূর্বের মতোই তাদের শাসন চললো আরও দেড়শ বৎসর ধরে, অর্থাৎ ইংরেজ ভারতে যতকাল ছিল, ততটা সময় পারসিকরা একছত্র শাসক ছিল। সার্দিস-এর পারসিক প্রদেশপাল বা ক্ষত্রপ গ্রীসের রাষ্ট্র-নগরীর মধ্যে শক্তির ভারসাম্য সামলে রাখতেন—শক্তির পাল্লা যেদিকে একটু ঝুঁকে, তার পাল্টা দিকে তাঁরা বাটখারা ফেলে (balanc of power) ঠিক করে দেন। গ্রীসের রাষ্ট্রনগরীর মধ্যে কলহ তো লেগেই আছে—ফলে পারসিক ক্ষত্রপের দাবা বোড়ের চালও চলে।

পারস্য সাম্রাজ্য প্রায় দুইশত বৎসর টিকে ছিল সগৌরবে; তারপর হঠাৎ লোপ পেলো গ্রীসের মকিদান রাজ আলেকজেন্দারের অতর্কিত আক্রমণে; সে কথায় আমরা ফিরে আস্‌বো পরে।

আজ পারসিকদের সাম্রাজ্য নাই, তাদের বিশাল নগরীগুলি নিশ্চিহ্ন।

কেবল আছে প্রাচীন পার্সি ধর্ম—কোনো রকমে টিকে আছে, ইসলামী ইরাকের কোণে কোণে ও ভারতের বোম্বাই নগরী, ও তার আশে পাশে ।

স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিলা-লেখ প্রভৃতি অনেক বিষয়ে পারসিকরা অনুসরণ করেছিল বাবিলনীয় ও অসুরীয় সম্রাটদের পদ্ধতি। অবশ্য অনুসরন ও অনুকরণের বাঁধা পথ পার হয়ে, নিজেদের প্রতিভা বলে তারা নূতন পথ একদিন পেয়েছিল। কিন্তু তাদের স্থাপত্যাদির চিহ্ন আলেকজেন্দারের মাতলামির ফলে পুড়ে নষ্ট হয়ে যায় ঃ প্রত্নতত্ত্ববিদদের চেষ্টায় প্রাচীন পারসিক-দের স্থাপত্য, শিল্পকলার নিদর্শনগুলি উদ্ধার পেয়েছে। পার্সিপুরী, সুসা প্রভৃতি *নগরীর প্রাসাদ ও দরবারাদি ইমারতের ফটো বা ছবি দেখলে এখনো* বিস্ময়ে মন ভরে উঠে ; আর ভাবি যারা ভেঙেছিল তারা কী বর্বর ! আর মনে হয়, যারা নিজদেশের স্বাধীনতা রাখতে পারেনি তারা কী অপদার্থ !

পুরাকালের পারসিক আর বৈদিকরা ছিল পরস্পরের জ্ঞাতি ভাই-এর মতো। পারসিকদের ধর্ম ছিল ভারতের বৈদিক ধর্মের অনুরূপ। প্রকৃতির নানা শক্তি নানা নামে পূজা পেতো! এককালে অসুর ও সুর দুইই ছিল আর্যদের দেবতা—পারসিক ও বৈদিক দু'দলেরই শ্রদ্ধা পেতো। বৈদিক সাহিত্যের পুরাতন অংশে অসুর শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশংসা সূচক শুভ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অসুর পন্থীরা যে উন্নত সভ্যতার অধিকারী এমন কথাও পাওয়া যায়। কিন্তু বৈদিক সাহিত্য অসুরদের নিন্দাও আছে, আবাব ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাদের মাঝেমাঝে 'অসুর' বলা হ'য়েছে।

ধর্মমত নিয়ে দুই দলে বিরোধ বাঁধে বোধহয়। বৈদিকরা যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ করে জল, বাতাস, আগুন প্রভৃতির প্রতীক-দেবতা বা সুরদের খুসি করে। কিন্তু পারসিকরা প্রকৃতির স্তুতি ছেড়ে অসুরের বিশুদ্ধ আত্মার উপাসনায় মন দেয়। সোমরসকে গাঁজিয়ে মদ করে খেতে বৈদিকদের খুবই উৎসাহ ; পারসিকরা সোমরস থেকে মদ বানিয়ে খেতে একেবারেই নারাজ। মতভেদ থেকে মতান্তর, মতান্তর থেকে মনান্তর এবং তার থেকে দেশান্তরণ হয়। এঘটনা ইতিহাসে হামেশাই হয়ে আসছে। বৈদিক ও পারসিকদের মধ্যেও ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। ধর্মমত ছাড়া এক

লোকের অন্ন জোটানো নিয়ে সমস্যা নিশ্চয়ই দেখা দিয়েছিল ইরান মালভূমে। বৈদিকরা দেশ ছাড়লো। কুভা (কাবুল) নদী ধরে পূবে চলে এলো পঞ্চনদের দেশে ; পারসিকরা থেকে গেল ইরানের মালভূমে।

পারসিকদের দেবতার নাম অহুর মজ্‌দা। মজ্‌দা শব্দটা বাবিলনীয়দের মহাদেব মরদুক থেকে বিকৃত হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। দারায়ুস প্রভৃতি শাহনশাহরা অহুর মজ্‌দার উপাসক। কিন্তু পারসিক কিম্বদন্তী হ'চ্ছে জরদউষ্ট্র নামে এক ব্যক্তি এদের ধর্মের স্রষ্টা। কিন্তু আশ্চার্যের বিষয় দারায়ুসের বা অপর কারো শিলালেখে এঁর নাম *পাওয়া যায়না ; কিন্তু পরযুগে জরদউষ্ট্রর জীবনকথা অহুর মজ্‌দার উপাসনাদির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।* এর কারণ কি ? তার জবাব পাই যদি আমরা ভারতের ধর্ম সম্বন্ধে একটু ভাবি। ভারতের বৈদিক ধর্ম গেল কোথায় ? কোথায় গেলেন ইন্দ্র, বরুণ, উষা, নাসত্য, আশ্বিনীযুগল ? এখন যেসব দেবতাদের সামনে ছাগ বলি, মহিষ বলি, কবুতর বলি দেওয়া হয়, আর যেভাবে তাঁদের পূজা করা হয়—বৈদিক যুগে সে সব ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ভারতের আদিম বাসিন্দাদের সঙ্গে সামাজিক ভাবে মেশামেশি নিয়ে অনেক কঠোর বিধি বিধান করেও তা বন্ধ করা যায়নি ; এবং তার ফলে স্থানীয় লোকদের ধর্মবিশ্বাস, লোকাচার মাতৃকুলের মারফত ভারতের আর্য জীবনে তিল তিল করে প্রবেশ করে ; কালে সেইসব ধর্মবিশ্বাস, আচার-ব্যবহার তাল হয়ে উঠলো। পণ্ডিতরা ও দার্শনিকরা এই সমস্ত বিরুদ্ধ মত ও বিশ্বাসের মধ্যে একটা ঐক্য দেখাবার জন্য বা সামঞ্জস্য গড়বার জন্য অসংখ্য পুঁথি লিখলেন ; মন্দির গড়লেন; সুন্দর, কিম্ভূত, কুৎসিৎ দেবদেবীদের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে পূজার ব্যবস্থা দিলেন, সংস্কৃত বা দেবভাষায় মন্ত্র বানিয়ে, হিন্দু ধর্মে ও সমাজে তাদের পূজা পাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। সেই নতুন ধর্মের নাম হ'লো হিন্দুধর্ম। ঠিক একরকম ঘটনাই ঘটে ছিল পারসিকদের মধ্যে।

আমরা পূর্বে বলেছি কিভাবে পারসিকরা মীড় বলে একটা দুর্ধর্ষ জাতির দেশ জয় করেছিল ; এই মীড়দের মধ্যে 'মগ' (maga, magi) নামে এক উপজাতি ছিল—তারা আসলে আর্য নয়। ধর্ম বিষয়ে তারা

খুব আচারী—বাবিলনের পুরোহিতদের কাছ থেকে অনেক তন্ত্র মন্ত্র শেখে শাকুনবিদ্যা, নক্ষত্রের ফলাফল সম্বন্ধে অদ্ভুত সব কথাবার্তা আয়ত্ব করে নেয়। এইসব কথা। যারা 'ধর্ম' বলে প্রচার করতে পারে, তারা মূঢ় লোকের মধ্যে পসার জমায় সহজে। ধর্মের নামে নানা রকমের বুজরুকি চলে। 'মগ'দের মধ্যে মৃতদেহ পোড়ানো বা পোতা হতোনা, পঞ্চভূতে মিশিয়ে দেবার জন্য শব ফেলে দেওয়ার রীতি ছিল। মগ-পুরোহিতদের প্রভাবে পারসিকরা এই প্রথাটাই ভাল বলে গ্রহণ করলো। কিন্তু পূর্বে আমরা দেখেছি অখামনীয় শাহনশাহদের মৃতদেহ পাহাড়ের গায়ে গর্তের মধ্যে কবর দেওয়া হতো। এখন কিন্তু বোম্বাই-এর পারসিরা তাদের মৃতদেহ 'টাওয়ার সব্ সাইলেন্স' নামক স্থানে ফেলে দিয়ে আসে। আর ইরানে যে মুষ্টিমেয় পারসি ধর্মী আছে তারাও এই রীতি অনুসরণ করে।

মগপুরোহিতদের প্রভাবে পারসিক ধর্মের অনেক অদল বদল হ'য়ে গেল —জরদউষ্ট্র* নাম এই ধর্মের সঙ্গে মিশলো। জরদউষ্ট্র যে বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদ প্রচার করেছিলেন তা কালে মগ-পুরোহিতদের আচার সর্বস্ব ধর্মের চাপে ঢাকা পড়লো।

পারসিকদের নির্বিকল্প অহুর মজ্দার দুইটা রূপ কল্পিত হয়েছে,—যেমন ভারতের তিন মূর্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। একজন গড়েন, দ্বিতীয়জন পালেন ও তৃতীয়জন মারেন। পারসিক ভাষায় সৃষ্টির 'সৎ' বা সত্য বা অস্তিত্বের নাম 'বহোমনো'। তাঁরা মনে করেন অস্তিত্বের সঙ্গে নাস্তিত্ব আছে মিশে; তেমনি 'সৎ' এর মধ্যে আছে 'অসৎ' বা মিথ্যা। এই সৎ-অসৎ অস্তি-নাস্তির পরিকল্পনা থেকে অংগ্রৈম্যেন্যু বা অহ্রিমন দেবতার কল্পনা আসে। অংগ্রৈম্যেন্যুকে বলা হ'য়েছে 'দৈবনাং দৈবো, অর্থাৎ দেবাদিদেব; যার মানে হচ্ছে সয়তান চূড়ামনি। বৈদিক দেবতারা পারসিদের চোখে হয়েছে অতি বদ্ অপদেতা। এর পালটা জবাব করেছিলেন বৈদিকরা পারসিকদের 'অসুর'কে নিয়ে। এখনতো দুর্গার পায়ের কাছে পড়ে খোঁচা খাচ্ছেন 'অসুর'। এসব পরধর্ম বা মত অসহিষ্ণুতার রূপ।

পারসিক ধর্মমতে অহুর-মজ্দা আলোকের দেবতা, জ্যোতির্ময় বিশ্বাত্মা। অহ্রিমন হলো এঁর উল্টো শক্তি; তারও প্রতাপ কম নয়। ইনি হচ্ছেন

---

*তু জরদ্গব জরদ্কারু জরদ্উষ্ট্র।

সেমেটিকদের সয়তানের (Satan) মতো শক্তিশালী। বৈদিকদের মধ্যে এ ধরনের সয়তানের কল্পনা দেখা যায় না—তবে অপদেবতা, অলক্ষ্মী তো ছিল। বৌদ্ধধর্মে 'মার' বা সয়তানের আবির্ভাব কোথা থেকে কি ভাবে এলো তা খুব স্পষ্ট নয়। কেহ কেহ মনে করে এই 'মার'-ভাবনা মগ-পুরোহিতদের নিকট থেকে কোনো সূত্রে এদেশে এসে পড়ে থাকবে। গৌতম বুদ্ধ ছিলেন শাক্য বংশীয়; অর্থাৎ শকদের কোনো শাখা মধ্য এশিয়া থেকে এদেশে এসেছিল কোনো সময়ে। এই শাক্যরা 'মগ' পুরোহিতদের কাছে শিক্ষা পেয়ে থাক্বে। এ ছাড়া শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলে যারা এদেশে এসেছিল তারা এই মগ পুরোহিত। এদের শিক্ষা থেকেই 'মার' বা সয়তানের কল্পনা হয়তো এসেছিল বুদ্ধের ধর্মে। মোট কথা তত্ত্বগুলির পটভূমি খুবই অস্পষ্ট।

পারসিকরা বাস করতো সেমেটিকদের দেশের কাছে; ফলে সেমেটিকদের ধর্ম সম্বন্ধে অনেক বিশ্বাসও এদের ধর্মকর্মের মধ্যে প্রবেশ করে। তার একটা হ'চ্ছে মৃত্যুর পর অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরক ভোগের কল্পনা। মৃত্যুর পর প্রত্যেক আত্মা বা ফ্রাবসি নিজ নিজ কর্মের জবাব দিহি করবার জন্য স্বর্গ দ্বারে হাজির হন। বিচারে ঠিক হলো ফ্রাবসি পুণ্যাত্মা, তখন স্বর্গে তাঁর অনন্তকালের আশ্রয় মিললো; আর ফ্রাবসি যদি পাপাত্মা হন, তবে চিরকালের জন্য নরকে তাঁকে পাঠানো হলো। পারসিকরা এই মতবাদ শিখেছিল বাবিলনীয়দের কাছ থেকে।

জরদউষ্ট্রের ন্যায় একনিষ্ঠ ব্রহ্মবাদী প্রাচীনকালে খুবই কম দেখা যায়। তিনি সাধক ও সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি প্রাচীন ইরানের ধর্ম বিষয়ক গাথা গুলি সংগ্রহ করেন—যেমন কুংফুৎসু করেন চীন দেশে, যেমন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন নামে একজন বেদব্যাস ভারতে বেদ সংগ্রহ করেন। পারসিকদের সকল প্রকার ধর্ম-জিজ্ঞাসার সংগ্রহের নাম দেওয়া হয়েছে অবেস্তা। পণ্ডিতরা মনে করেন, 'অবেস্তা' শব্দ সংস্কৃত 'বেদ' শব্দের মতো জ্ঞানের মূলধার।

এই ধর্মগ্রন্থ লেখা হয় কৃত্রিম অদ্ভুত লিপিতে; পঞ্চাশটি মাত্র হরপ তাদের সম্বল। এই লিপির পূর্বাপর জানা যায় না; বোধহয় ধর্ম বিষয়ে পুরোহিতদের একচেটিয়াত্ব বজায় রাখবার জন্য এই কৃত্রিম লিপির সৃষ্টিহয়, —যেন যে-সে লোকে ধর্মগ্রন্থ পড়তে না পারে। ভারতেও ঠিক সেই রকম-

টাই হয়েছিল বেদ নিয়ে; বেদ ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া সম্পত্তি—অব্রাহ্মণ পড়বেনা, শুনবে না; বিশেষ কয়েকটি পরিবারের মধ্যে সে-বিদ্যা আড়ষ্ট-ভাবে আটকা ছিল। পারসিকদের তাদের ধর্ম কথা দুর্বোধ্য লিপিতে লিখেছিল, —সব মুখস্থ করে রাখতেন। গুরু শিষ্য পরম্পরায় শুনে শুনে মন্ত্র মনে রাখা হতো বলে ধর্মসাহিত্যকে বা বেদকে বলতো শ্রুতি।

আবেস্তার বাইরেও বিরাট সাহিত্য গড়ে উঠে পরযুগে—সেসব লেখা হয় যে লিপিতে তাকে বলে পহ্লবী। অবেস্তার ভাষা আর বেদের ভাষার আশ্চর্য মিল—যারা বৈদিক ভাষা জানেন, তাদের পক্ষে অবেস্তার ভাষা আয়ত্ব করা খুব সহজসাধ্য, যেমন হিন্দীভাষীর পক্ষে বাংলা শেখা, ওলন্দাজদের পক্ষে জারমান বা ইংরেজি শেখা সহজ।

কিন্তু কালে বেদের ভাষা দুর্বোধ্য হয়ে গেলে মৌখিক ভাষার সংস্কার করে একটা সর্বজনগ্রাহ্য 'সংস্কৃত' ভাষা সৃষ্টি করা হয় কৃত্রিম ভাবে : অবেস্তার ভাষার সেই দশা হয়। নানা জাতির ভাষার, ভাবের ঘাত প্রতিঘাতে নূতন ভাষার জন্ম হ'লো, তার জন্য নতুন লিপি তৈয়ারী হলো—পহ্লবী। কিন্তু এই পহ্লবী ভাষার লিপি সৃষ্ট হয় অত্যন্ত এলো মেলো ভাবে অর্থাৎ সংস্কৃত বর্ণমালা সৃষ্টির মধ্যে যেমন একটা কঠিন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়—সেটি পহ্লবীর মধ্যে অজ্ঞাত। পহ্লবী ভাষাকে নিয়ম বা শক্ত ব্যাকরণের শিকলে বাঁধবার চেষ্টা হয় নি—যেমন হয়েছিল সংস্কৃতের বেলায়; পাণিনী সূত্র বানিয়ে তারই শিকলে ভাষাকে বেঁধে, সংস্কার করে সিধে চলবার পথ বাৎলে দিলেন। আজ হাজার হাজার বৎসর সেই পথ ধরে সংস্কৃত ভাষা চলছে; কিন্তু পারসিকদের ভাষা, লিপি সমস্ত লোপ পেয়েছে—সে ভাষায় নূতন কিছু সৃষ্টি আর হয়নি।

ভারতে আর্য

অধিকাংশ দেশবিদেশের পণ্ডিতদের মত—আর্যভাষীরা ভারতের বাহির থেকে উত্তরপশ্চিম পথ দিয়ে এদেশে প্রবেশ করেছিল। একদল দেশীয় পণ্ডিত উলটো কথা বলেন। তাঁদের মতে আর্যরা এদেশেরই আদি-বাসিন্দা। য়ুরোপের আর্যভাষাভাষীরা যে দলে ভারি—এ যুক্তিটা তাঁরা মানেন না; জ্যামিতির সহজ প্রতিজ্ঞায় বলা হয়েছে অসম্ভব কি? না 'অংশ সমগ্র থেকে বড়' (Part is greater than the whole)। এই সাধারণ জ্যামিতিক সংজ্ঞা এঁরা মানতে চান না। সুতরাং তাঁদের মতামতকে বাদ দিতে পারা যায়।

আর্যরা ভারতে হঠাৎ প্রবেশ করতে পারেনি। বহুকাল ভারতের উত্তরপশ্চিমে গিরিপথের বাইরে তাদের অপেক্ষা করতে হয়। বোধহয় এই সময়ে বৈদিক ও অবৈদিক বা পারসিকদের মধ্যে মনের ও মতের অমিল দেখা দেয়—যার ফলে বেদবাদীর দল ভারতে প্রবেশ করলো। এখানে একটা কথা স্পষ্ট করে বলা দরকার; বেদবাদী আর্যরা একটা 'জাত' নয়—অসংখ্য উপজাতিতে তারা বিভক্ত; আচার-ব্যবহারের মধ্যেও বেশ তফাৎ ছিল। আর সকল আর্য একই সময়ে এদেশে প্রবেশ করেওনি। দীর্ঘকাল ধরে তারা আসে নতুন নতুন দলে—যেমন ঐতিহাসিক যুগে তুর্কীদের নানা উপজাতি, মুঘলদের বিচিত্র শাখা, য়ুরোপীয়দের নানা জাতি এসেছিল।

দেশ-প্রবেশের সময় সকল শ্রেণীর লোকই আসে। বৈদিক যুগ বললেই আমরা মনে করি যে দেশটাতে বুঝি ঋষি মুনিদেরই বাস ছিল—'সমস্ত প্রাচীন ভারতের দেশটা ছিল নৈমিষারণ্য, তপোবন, আশ্রমে পূর্ণ! কিন্তু সেটা আংশিক সত্য হতে পারে, প্রাচীন ভারতের সামগ্রিক বাস্তব মূর্তি তা নয়।

ভাল লোক ধার্মিক লোক, ধূর্তলোক বদ্‌লোক, জুয়াড়ি সবশ্রেণীর লোক এসেছিল। আর সকলেই যে স্ত্রী পুত্র কন্যা সঙ্গে এনেছিলেন তাও নয়। কারণ যান বাহনের অভাব ছিল; দুর্গম পথে ঘোড়ায় চড়ে, গরুবাছুর নিয়ে আসা খুবই কষ্টকর। সকলের বিদ্যা বুদ্ধি বিশ্বাস ও একরকম ছিলনা। এই পাঁচমিশালি জনতা ছিল আর্যদের মধ্যে!

ভারতে পঞ্চনদের দেশে প্রবেশ ক'রে দেশকে আর্যরা তো জনশূন্য পায়নি। হরাপ্পা [হরি য়ুপা] সভ্যতা তখন জ্বল জ্বল করছে সিন্ধু-পঞ্চনদের অববাহিকায়। বড় বড় নগর, বড় বড় ইমারত, কারখানা ঘর। নবাগত আর্যদের সঙ্গে অনেক কাল ধরে বিরোধ চলে পুরানো লোকদের। আর্যদের অশ্বছিল আর ছিল লৌহ অস্ত্র—যা সিন্ধুতীর বাসী শহরে লোকরা চোখেও দেখেনি; ব্রোনজের অস্ত্র শস্ত্রধারীরা হার মানলো লৌহাস্ত্রধারীদের কাছে। গর্দভে টানা শকটাকে পথ ছেড়ে দিতে হলো ঘোড়ায়-টানা রথের কাছে! আধুনিক যুগেও চলছে সেই দ্রুত যানবাহনের পাল্লা ও রেশারেশি। অনেক দেশেই গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়িকে মোটর গাড়ীর জন্য পথ করে দিতে হয়েছে।

আর্যরা নানা জায়গায় গ্রাম পত্তন করলো—চাষবাসের জন্য। খাদ্য চাই সবার আগে—প্রতিদিনই পর্যাপ্ত খাদ্য চাই দেহের শক্তি অটুট রাখবার জন্য। চারদিকে অন্-আর্য শত্রু—লড়াই চলছে তাদের সঙ্গে। পুরাতন লোকেরাও নানা জাতে বিভক্ত—অসুর, দৈত্য, দানব, দাস, নাগ যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব, রাক্ষস, বানর প্রভৃতি অসংখ্য উপজাতি—সকলেই নূতন আর্যদের শত্রু। আর্যরাও খুব হুঁশিয়ার, তারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় বলে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে যতটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রাখবার চেষ্টা করে। নবাগতদেরা বর্ণ ছিল উজ্জ্বল—শীতের দেশে এককালে থাকতো বলে। কিন্তু এদেশের গরমে ভাজাভাজা হয়ে যারা যুগযুগান্ত থেকে বাস করে আসছে তারা ছিল কৃষ্ণবর্ণ। তাই আর্যদের বর্ণভেদের জ্ঞানটা ছিল একটু উৎকট। কিন্তু কালে-কালে এই গোঁড়ামির অনেক বদল হয়। পুরাতন জাতদের সঙ্গে মিশেই আর্যরা নয়া সভ্যতার পত্তন করতে পেরেছিল।

আমরা পূর্বে বলেছি যে আর্যরা বাকপটু জাত। ভারতের আর্যরা বিরাট সাহিত্যের স্রষ্টা। তারা গান গায়, স্তব করে, মন্ত্র পড়ে, ছড়া কাটে,

নাটক অভিনয় করে; নানা গোত্রের কবি বা ঋষিরা এই সব করেন। কালে সেগুলি 'বেদ' নামে বিরাট সংগ্রহ গ্রন্থে একত্র করা হয়। এখানে একটা কথা স্পষ্ট করা দরকার; বেদ শব্দ বললেই ধর্মগ্রন্থ বুঝায় না—কারণ চিকিৎসাশাস্ত্রকে বলে 'আয়ুর্বেদ', হাতীর চিকিৎসা গ্রন্থকে বলে 'গজায়ুর্বেদ'; যুদ্ধবিদ্যার একটাকে বলে 'ধনুর্বেদ।' 'বেদ' শব্দের যথার্থ মানে 'জ্ঞান।' ঋক্ বা মন্ত্রাদির সংগ্রহকে আমরা লৌকিক ভাষায় বলি 'বেদ'; আর বেদ বা জ্ঞানের মূল কথাকে বলি 'বেদান্ত।' লৌকিকভাবে আমরা যে 'বেদ' শব্দ ব্যবহার করি তাও ঠিক ধর্মগ্রন্থ নয়। আসলে সেগুলি আর্যদের সকল প্রকার রচনার সংগ্রহ। কবিতা, কথোপকথন, যজ্ঞের মন্ত্র, দেবতাদের কাছে কত রকমের প্রার্থনা—এটা চাই—সেটা চাই, এত চাই তত চাই করে। জুয়াড়ি বেচারী সর্বস্বান্ত হয়েছে—তার আপসোসের গান। সতীনের ভাবনা চোখের বালিকে কেমন করে বিনাশ করা যায়। এই রকম কত কি যে আছে তার ঠিক নেই। এই সব বিচ্ছিন্ন ঋক্ একজায়গায় 'সংহত' করা হয় বলে তার নাম দেওয়া হয় 'ঋকবেদ সংহিতা'। যে মন্ত্রগুলি কেবল যজ্ঞের জন্য দরকার তার সংগ্রহকে বলা হয় যজুঃ বেদ; যে মন্ত্রগুলি কেবল যজ্ঞের সময়ে সুর করে গাওয়া হয় তাকে বলা হয় সামবেদ। আর সাধারণ লোকে যে সব ধর্ম কর্ম মানে—ভূত ও ব্যাধি তাড়াবার বা ঝাড়াবার জন্য মন্ত্র পড়ে, টোটকা ঔষধ ব্যবস্থা দেয়,—এই সব সংগৃহীত হয়েছে অথর্ববেদে। তবে অথর্ববেদের মধ্যে অতি উচ্চ সাধনার বহু মন্ত্র আছে। বর্তমানে আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশের মধ্যে যেমন ধর্মের গূঢ় কথার আলোচনা দেখতে পাই, সেযুগের নিম্নবিত্ত ব্রাত্য বা প্রায়-অচ্ছুত জনতার মধ্যে মহৎবাণীর সন্ধান পাই। অথর্ব বেদের সবটাই অপাংক্তেয় নয়। কিন্তু প্রাচীনকালে একদল গোঁড়া ব্রাহ্মণ অথর্বকে বেদ বলেই স্বীকার করতে চাইতেন না—তারা বলতেন ত্রয়ী বেদ অর্থাৎ ঋক্, যজু, সাম-এর সমষ্টি। যাই হোক এই চারবেদ বিশেষ গোত্রের বিশেষ বংশের লোকেরাই জানতেন। তারা বংশের বাইরে কাউকে সে সব মন্ত্রাদি শেখাতেন না, পাছে তাদের একচেটিয়া আধিপত্য নষ্ট হয়। কালে কোনো কোনো শাখার মন্ত্র-জানা শেষ লোকটি গেলেন মারা—আর সঙ্গে সঙ্গে সেই মন্ত্রগুলির বা সেই বেদের শাখার হলো লোপ। বেদের অনেক শাখার নাম পাওয়া যায়, কিন্তু বেদ গ্রন্থ পাওয়া যায় না।

কালে বেদের ভাষা দুর্বোধ্য, ক্রিয়াকলাপ জটিল হয়ে উঠেছে। সময়ের

ব্যবধানে লোকে মন্ত্রাদির অর্থ ও প্রয়োগবিধি ভুলে যায়, অথবা ভুল করে ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করতে আরম্ভ করে। তখন দরকার হলো টীকা বা ভাষ্যের। বেদের ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যাখানের জন্ত 'ব্রাহ্মণ' নামে বই লেখা হলো। ব্রাহ্মণ ছাড়া, আরণ্যক উপনিষদ, কল্পসূত্র প্রভৃতি কত রকমের সাহিত্য যে লেখা হতে থাকলো তার হিসাব দেওয়া এ গ্রন্থে সম্ভব নয়। পৃথিবীর কোনো প্রাচীন ধর্ম-সাহিত্য এত বিপুল, এমনি জটিল নয়। কালে মানুষের মন ক্রিয়াকর্মে অভিভূত হয়ে উঠলো। মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ বর্ণের পুরোহিতদের হাতে এসব বিদ্যা, আটক—তাঁদের বিধানে ও শাসনে সকলকেই চলতে হলো। বিদ্রোহ করলে বিপদ—পরলোকের দরজায় ঝাঁপ পড়ে যাবে!

সকল দেশেই পুরোহিত, যোদ্ধা, শিল্পী ও মেহনতী মানুষ নিয়ে সমাজ। আর্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যরা ছিল খাস্ আর্য; খাস্ আর্যদের চিহ্ন যজ্ঞ উপবীত ধারণ। এরা যজ্ঞ করতো উপবীত পরে,—তাই এ'কে বলে যজ্ঞোপবীত বা যজ্ঞসূত্র। আদিযুগে উপবীত সব সময়ে যে গায়ে জড়িয়ে রাখতো তাও নয়। 'কুশের' উপবীতও ধারণ করতো যজ্ঞের সময়। যাগ যজ্ঞ, পশুবলি সোমরস গাঁজিয়ে মদ করে পান করা প্রভৃতিতে আর্যদের ভারি উৎসাহ। যারা যজ্ঞে আগুনের কাছে (ব্রহ্ম Flame) বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়তো তাদের বলতো 'ব্রাহ্মণ' বা Flamen। সমাজ রক্ষার ভার যে সাহসীদের উপর গিয়ে পড়ে তাদের বলা হতো ক্ষত্রিয়। 'ক্ষত্র' শব্দের মানে রক্ষা করা; পারসিকদের মধ্যে 'ক্ষত্রপ' হচ্ছে রাজ্যপাল। উচ্চারণ ভেদে ক্ষত্র হয় 'শয়তিয়' সেই শব্দ থেকে পরযুগে 'শাহ'—শব্দ আসে। দরায়ুসের শিলালেখে আছে 'ক্ষয়াথিয়ানাং ক্ষয়থিয়—শয়তিনাম্ শয়তিয়—অর্থাৎ শাহনশাহ—সংস্কৃত এর তর্জমা হয় 'রাজ অধিরাজ।' যাক্ একথা।

বৈশ্য বা বিশ শব্দের অর্থ হচ্ছে লোক বা People প্রজা বা প্রোলেটা-রিয়েট। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য—তিন বর্ণই 'আর্য'। এদের বাইরে যারা ক্ষুদ্র বা 'শূদ্র' তারা এখন পর্যন্ত বাংলা ভাষায় 'ছোট' লোক নামে অভিহিত হয়ে এসেছে। 'ক্ষুদ্র' শব্দটার তর্জমা করলে ছোট-ই হয়। ক্ষুদ্র প্রাকৃত ভাষায় ছুড্ড, ছুট, ছোট।

কৃষ্ণকায় আদিম মানুষ যারা আর্যদের তাঁবে এলো, তারা আস্তে আস্তে মুনিষদের ভাষা কোনো-রকমে শিখে নিল নিজেদের ভাষার সঙ্গে মিশিয়ে। কালে তারা হলো আর্য সমাজের চতুর্থ বর্ণ। এদের চতুর্থ বর্ণ বা

ফোর্থ এস্টেট বলে। হয়তো অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কারণেই মুনিঋষদের মানতে হয়েছিল। ব্রহ্মার মুখ দিয়ে ব্রাহ্মণরা বলিয়ে নিল যে সকলেই তাঁর দেহ থেকে সৃষ্ট হয়েছে। ব্রাহ্মণ বুদ্ধিমান বাক্‌চতুর, তারা ব্রহ্মার মুখ থেকে বের হয়েছে। ক্ষত্রিয় শক্তিমান, তারা ব্রহ্মার বাহু থেকে ছটকে পড়েছে; বৈশ্য সমাজের স্তম্ভ স্বরূপ, অর্থের যোগান দেয়, তারা ব্রহ্মার উরু থেকে ভেঙে বের হলো। আর শূদ্ররা—এই তিন বর্ণের সেবা করে বলে, তারা ব্রহ্মার পদযুগল থেকে সৃষ্ট হয়ে সেখানে বসেই পদসেবা করতে আছে। এই হলো মোটামুটিভাবে বৈদিক সমাজের কাঠামো। আসলে সমাজনীতির এটা খুব স্বাভাবিক অবস্থা বলেই মেনে নিতে হবে।

কিন্তু যারা আর্যদের কাছে নত হলো না যারা পালিয়ে গেল পার্বত্য অঞ্চলে বা জলাভূমির দিকে—তারা হলো পঞ্চম—চতুর্বর্ণের বাইরে, অচ্ছুত অস্পৃশ্য—আর্য উপনিবেশের কাছে আস্‌তে পায়না; *বেদ শুনলে কানে সিসে ঢেলে দেওয়া হবে বলে ভয় দেখানো হয়। চণ্ডক তপস্যা করছিল বলে শ্রীরামচন্দ্রের হুকুমে তার মাথা কাটা যায়। বেচারা একলব্যকে জঙ্গলের মধ্যে তীরধনুক অভ্যাস করতে দেখে দ্রোণাচার্য 'শিষ্যের' হাতের বুড়ো আঙুলটি কেটে নিলেন দক্ষিণা বলে! এইভাবে পঞ্চমরা থাকতো আর্যদের কড়া শাসনে। আর্যরা মুষ্টিমেয় সংখ্যায়, তাই ইহলোকে আঙুল কাটা, মুণ্ডকাটা, কানে গলন্ত ধাতু ঢালা প্রভৃতি ভয় দেখিয়ে শূদ্র ও পঞ্চমদের শান্ত করে রাখতে হতো।

ধীরে ধীরে আর্যরা উত্তর ভারতের অধিকাংশ জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণরা যান প্রথমে খালি হাতে,—যাগ যজ্ঞ করেন,—তাক লাগিয়ে দেন অবোধ্য ভাষায় মন্ত্র আউড়িয়ে। মূঢ়লোকে ভূতের ভয়ে দেবতার ভয়ে ধরা দেয় তারা ধর্মের জালে। তারপর আসে চাষা-ক্ষত্রিয়ের দল। চাষ-বাস শুরু হয় নদীর ধারে জঙ্গল সাফ করে। বিহার রাজ্যের উত্তরাংশে মিথিলার রাজারা একাধারে ক্ষত্রিয়, আবার কৃষকও বটে। মিথিলার 'জনক' নামে রাজবংশের চাষবাড়ি ছিল।

আর্য উপনিবেশের চারদিকে অন-আর্যের বাস। তাদের সকলেই যে ব্রাহ্মণদের ধর্মের আড়ম্বরে মুগ্ধ হয়ে ধরা দিচ্ছে—তা নয়। রাক্ষস উপজাতির

*এমনকি কয়েক বছর আগে দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণগ্রাম বা অগ্রহারের এক পুকুর পাড় দিয়ে পঞ্চম বর্ণের এক ডাক্তার গিয়েছিলেন বলে পুকুর অপবিত্র হবার জন্য খেসারত চেয়ে মামলা রুজু হয়। অবশ্য কালে চাকি ঘুরে গেছে।

এক সর্দারনী তাড়কা ও আরেক দলের সর্দার মারীচ—এদের উৎপাতে ব্রাহ্মণদের কলোনী অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। তখন ডাক পড়ে অযোধ্যার রাজকুমার রামলক্ষ্মণের রাক্ষস তাড়াবার জন্য। যিনি তাঁদের সঙ্গে চললেন তাঁর নাম বিশ্বামিত্র—ভাবখানা, তিনি সকল লোকের বন্ধু। অনার্যদের সর্দারনী তাড়কা রাক্ষসী বধ হলো—মারীচ দেশ ছেড়ে পালালো, নূতন মিত্রগোষ্ঠির সন্ধানে।

আর্যদের মারাত্মক অস্ত্র ছিল ধনুক-বান—এ অস্ত্র মারীচরা দেখেনি কখনো। আমেরিকার লাল-মানুষ ও আফ্রিকার কালো-মানুষরা বন্দুক দেখেনি যখন আর্য-য়ুরোপীয়রা তাদের দেশ জয় করে।

অযোধ্যার রাজপুত্র রামচন্দ্র পূর্বভারতের ডাঙা-জমি—যেখানে কখনো হাল পড়ে নি 'অ-হল্যা' জমি, উদ্ধার করলেন। 'সীতা' শব্দের অর্থ লাঙলের ফাল; সীতাকে পাওয়া গিয়েছিল চষা-জমিতে কুড়িয়ে। সীতাকে নিয়ে রামচন্দ্র দক্ষিণ ভারত গিয়েছিলেন; তার অর্থ কৃষি প্রসার লাভ করলো দক্ষিণ দেশে। সেসব দেশে অসভ্য বর্বরদের বাস। বানররা তীরধনুক দেখেনি; যুদ্ধ করতো পাথর ও ঢেলা ছুঁড়ে, অথবা হাতাহাতি করে। বালি-সুগ্রীবের কুস্তি-যুদ্ধের কথা সবাই জানি!

এদিকে কিছুকাল থেকে ব্রাহ্মণের সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের রেশারেশি সুরু হয়েছে—কার শক্তি বেশি। ব্রাহ্মণ বংশীয় পরশুরাম কুড়ল নিয়ে নিঃক্ষত্রিয় করলেন দেশটা; ব্রাহ্মণরা বাহাদুরি করবার জন্য বলেন একুশবার ধরণী নিঃক্ষত্রিয় হয়েছিল। ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র পরশুরামের দর্প চূর্ণ করলেন তাঁর ধনুকটি ভেঙে দিয়ে। এইভাবে লড়াই চলে,—কে বৈশ্য শূদ্রের উপর মাতব্বরি বেশি করবে। শেষকালে রফা হলো—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে বললেন 'নরদেব', ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে বললেন 'ভূদেব'। ব্রাহ্মণের প্রয়োজন তার অসংখ্য যাগ যজ্ঞের জন্য বিনামূল্যে ঘৃতপিষ্টকাদির উপকরণের সরবরাহ; ক্ষত্রিয় রাজার অনুগ্রহ না হলে মূর্খ জনতার কাছ থেকে এসব রসদ পাওয়া মুশকিল;—কারণ যাদের হাতে 'দাণ্ডা' বা দণ্ডবিধানের হাতিয়ার তারাই আইন মানাতে পারে।

নীরবে লোকে সব সইতো, ক্ষত্রিয়েরা তাঁদের রাজদণ্ড (বা ইম্পিরিয়াল শক্তি) দেখাবার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ, রাজসেনীয় যজ্ঞ, রাজসূয় যজ্ঞ করতে সুরু করলেন। সে সব ব্যাপারে ভেট জোগাতে জোগাতে ও বেগার দিতে দিতে সাধারণ লোকের হাড় কালি হয়ে উঠে। ইহলোকে বেঁচে থাকবার জন্য রাজাদের

তুষ্টি সাধন, আর পরলোকে সুখে থাকবার আশায় ব্রাহ্মণদের যজ্ঞের রসদ জোগান—এই হয় জনতার কাজ! এইভাবে শোষণ চলে। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে, ক্ষত্রিয়রা দেশকে রক্ষা করতো বাইরের শত্রুর হামলা থেকে; বন্যপশু মারতে হতো তাঁদের; না করলে লোকের শস্যক্ষেত থাকে না। এইজন্য মৃগয়া ছিল রাজধর্ম। শেষকালে বাঘ, সিংহ, হাতী না মেরে রাজারা হরিণ মারতে আরম্ভ করলেন; অধঃপতিত রাজাদের অবস্থা দেখে পণ্ডিতরা বললেন ওটা রাজব্যসন—সাবধান। যাই হোক ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের এই শোষণ নীতির জন্য কেবল যে গরীব 'সাধারণ লোকেই' বিরক্ত তা নয়, শিক্ষিত ভদ্রদের মনেও এই প্রশ্ন উঠেছে। এমন কথাও কেহ কেহ বললেন, বেদগ্রন্থ ব্রাহ্মণ ভণ্ডদের সৃষ্টি—পরলোক নেই। শ্রীকৃষ্ণের মতো বুদ্ধিমান কূটনীতিক লোকও যাগযজ্ঞবহুল ধর্মের নিন্দা করলেন।

ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে প্রশ্ন জেগেছিল মিথিলা ও কাশীর ক্ষত্রিয় রাজাদের মধ্যে। তাঁরা যেসব আলোচনা করতেন, তার অনেকগুলি আছে 'উপনিষদ' নামে গ্রন্থ মধ্যে। এগুলির মূল কথাকে 'বেদান্ত' বলা হয় সাধারণ ভাষায়। দেড়শর উপরে ছাপা উপনিষদ বাজারে চালু আছে—এর মধ্যে খান দশ-বারো পণ্ডিতরা জ্ঞানের চরম কথা বা 'শাস্ত্র' বলে মানেন; বাদবাকি সবই প্রায় সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ—'উপনিষদ' নাম জুড়ে প্রাচীনত্ব সাব্যস্ত করবার চেষ্টা মাত্র।

হিন্দুদের আর একটি বই সকল লোকে জানে—তাকে বলে গীতা। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই গীতার শ্লোকগুলি বসানো হয়েছে। ধর্মের সার কথা বলা আছে এর আঠারোটি পরিচ্ছেদে। শঙ্করাচার্য থেকে গান্ধীজি, অরবিন্দ পর্যন্ত কত শত লোক যে গীতার ব্যাখ্যা করেছেন তার সঠিক হিসাব দেওয়াও শক্ত। লক্ষ লক্ষ গীতা প্রতি বৎসর ভারতে বিক্রীত হয়।

বৈদিক ক্রিয়াকর্মের প্রথম বিদ্রোহী শ্রীকৃষ্ণ; তিনি ক্ষত্রিয়দের মধ্যে ছোটজাতের লোক। তিনি সমস্ত ভারতকে একটা ধর্মরাজ্যে বাঁধবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তবে ধর্মরাজ্যের আধ্যাত্মিক দিকের বুনিয়াদ পত্তন করে যান গীতার মধ্য দিয়ে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বাণী সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা ব্রাহ্মণরা করতে পারেন নি। সমস্ত ব্রহ্মজ্ঞান চাপা থাকলো সংস্কৃত ভাষার মধ্যে—যা সমাজের পনের আনা লোক বুঝতো না। গীতা থেকে গেল 'পণ্ডিত'দের হেপাজতে—জনতার দরজায় তা পৌছলো না। আর শ্রীকৃষ্ণের গীতা

বা বেদান্তের কথা যে সকলে বুঝলো বা মানলো তাও নয়। অবশ্য গীতাকে আমরা যেভাবে মহাভারতের মধ্যে পাই ঠিক সেইভাবে, সেই ভাষায় যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণ কথাগুলি বলেছিলেন কিনা তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তাঁর মতামতকে কোনো সুলেখক বেশ নাটকীয় পটভূমি দিয়ে রচনা করে মহাভারতের মধ্যে বিন্যস্ত করে থাকবেন। গ্রীক দার্শনিক প্লাতোন, সোক্রোতিসের কথাগুলি কি আর হুবহু টুকে টুকে বই লিখেছিলেন? তা তো নয়? তেমনই শ্রীকৃষ্ণের মত সম্বন্ধেও বলা যায়।

মোটকথা নানা রকমের কায়িক ও মানসিক দুঃখের মধ্য দিয়ে জনতার দিন কাটচ্ছিল—তারই বিরুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের এই অভিযান—মানুষকে জ্ঞানে, কর্মে, ভক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলে সে দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে—তাই তিনি ভেবেছিলেন।

মানুষ দুঃখ থেকে কি করে উদ্ধার পেতে পারে, তার কথা নানা মুনি নানা ভাবে বলেন। পরিব্রাজকরা ঘোরেন নগরে নগরে; গ্রামে গ্রামে যান, চত্বরে বা দেবস্থানে বসেন—লোকদের ধর্মের কথা শোনান, নিজের মত প্রচার করেন। নানা মুনির নানা মত, কেহ বলেন—কর্ম করো; কেহ বলেন কর্ম করোনা। কেহ বলেন হত্যাকাণ্ড পাপ; কেহ বলেন পাপ-পুণ্য মনের বিকার, হেসে নাও দু'দিন বইতো নয়। এইরূপ বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছে ভারতের লোকে। এমন সময় এলেন গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর জিন।

বুদ্ধ ও মহাবীর পূর্ব-ভারতের লোক, প্রায় সমসাময়িক। পূর্ব-ভারত কোনো দিনই আর্যামি বা আর্যদের বর্ণ-গোঁড়ামি মানে নি। আর্যাবর্তের লোকেরাও এদের অবজ্ঞার চোখে দেখতো। প্রাচীনকালে একদল ক্ষত্রিয় এসে মগধে রাজ্য পত্তন করে, বিবাহ করে সে-দেশের মেয়েদের; তারা অনার্য রাক্ষস নামে প্রচলিত। জরা নামে এক রাক্ষসীর গর্ভে জন্ম হয় জরাসন্ধের। তিনি মগধের রাজা হন। উত্তর ভারতের ক্ষত্রিয়রা এই আধা-ক্ষত্রিয় জরাসন্ধকে ভয় করে যেমন, ঘৃণা করে তার থেকে বেশি—কারণ সে রাক্ষসী বা স্থানীয় অনার্য নারীর গর্ভজাত সন্তান। পাহাড়ঘেরা দুর্গম গিরি-ব্রজে তাঁর রাজধানী পত্তন হলো। জরাসন্ধ শিবভক্ত; মনে মনে প্রতিজ্ঞা করছেন যে, যে ক্ষত্রিয়রা তাঁকে ঘৃণা করে—সেই ক্ষত্রিয়দের একশটিকে

দেবতার কাছে বলি দেবেন—এ যেন কালাপাহাড়ের প্রতিজ্ঞা। শিব ঠাকুরের নামে নরবলির ব্যবস্থা আর্যধর্ম বিরোধী মত।

ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাথায় এলো ভারতে ধর্মরাজ্য (New order) প্রতিষ্ঠিত করতে হবে—সবকে এক করতে হ'বে। পাণ্ডবরা তাঁর সহায় হ'লো। জরাসন্ধ ও উত্তর ভারতের ক্ষত্রিয়দের একদল এইসব কাজকর্মে যোগ দিতে নারাজ। তাই জরাসন্ধকে শ্রীকৃষ্ণ ছলে হত্যা করালেন—বলে হত্যা করা যাবেনা সেটি তিনিও জানতেন আর হত্যাকারী ভীমসেনও জানতেন। ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণে ঝগড়া ছিল; এখন ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে নিচু-ক্ষত্রিয়ের ঝগড়া দেখা দিল। তারপর মহাভারতে ক্ষত্রিয়ে-ক্ষত্রিয়ে গৃহবিবাদ থেকে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে আঠারোদিনের যুদ্ধে শেষ হলো ক্ষত্রিয়দের শেষ পরাক্রম। মহাভারতের পর আর ক্ষত্রিয়দের কথা শোনা যায় না।

যাক এই যে পূবভারত—যেখানে সদ্‌ব্রাহ্মণদের আসা নিষেধ ছিল এককালে, যেখানে নিচু ক্ষত্রিয়রা সাম্রাজ্য গড়েছিল,—যেখানে পরিব্রাজকদের ঘুরে বেড়াতে দেখলে গ্রামের লোকে কুকুর লেলিয়ে দিত, সেই পূবভারতে বুদ্ধ ও মহাবীরের আবির্ভাবহলো। গৌতম-বুদ্ধ এসে বললেন দুঃখের মূল উচ্ছেদ করো। মূলটা কি ? মনের বাসনা। এক কথায় সমাজ সংসারের সমস্ত বন্ধনের মূলে পড়লো টান। এতকাল ধর্ম ছিল জন্মগত অধিকারের উপরে খাড়া। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ছেলের ব্রাহ্মণত্বে অধিকার, ক্ষত্রিয়ের ছেলের লড়াই করে মরবার ও মানুষ মারবার জন্মগত অধিকার—শূদ্রের জন্মগত পেশা দাসত্ব। এতকাল পরে এক ক্ষত্রিয়সন্তান সিদ্ধার্থ গৌতম মানুষকে 'মানুষ' বলেই ডাকলেন—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ভেদ মানলেন না। সকলেই জাত খুইয়ে নাম খুইয়ে তাঁর সঙ্ঘে প্রবেশ করবার অধিকার পেলো। বুদ্ধদেব মানুষকে তার জাতির গণ্ডি থেকে বের করে এনে ধর্মরাজ্যে এক-আসনে বসবার অধিকার দিলেন। এখন ধর্ম হলো বিশ্বজনীন। এখন থেকে মানুষমাত্রই বুদ্ধের আদর্শ অনুসরণ করবার সুযোগ লাভ করলো। বৈদিক ধর্মের যাগ-যজ্ঞে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যের দাবী ছিল না, বুদ্ধের ধর্মে সকলে নির্বাণ লাভের বা মুক্তি পাবার অধিকারী হলো। বুদ্ধদেব মানুষকে স্বাভাবিক, সৎ, অহিংসক হতে বললেন; আর বললেন গভীর ধ্যানের দ্বারা আপনার অহং বোধকে নিবিয়ে

যাও। সকলেই 'সদ্ধর্ম' পালন করো। বৌদ্ধধর্ম শব্দটা পরে চালু হয়। বুদ্ধের আবির্ভাব থেকে যুগান্তর এলো ভারতের সমাজে।

বুদ্ধদেব তাঁর মনের কথা সাধারণ লোকের কাছে তাদের জানা ভাষায় বলেন; ব্রাহ্মণদের শাস্ত্র লেখা সংস্কৃতে—লোকে তা বোঝে না; বুঝতে হলে ব্রাহ্মণের কাছে যেতে হয়, অর্থবোধের জন্য দক্ষিণা দিতে হয়। বুদ্ধদেব প্রাকৃত বা সাধারণ লোকের ভাষায় কথা বললেন—তাই তাঁর কথ্য ভাষাকে 'প্রাকৃত' বলা হয়।

বুদ্ধ ডাক দিয়েছিলেন সাধারণ লোকদের। যে ভারত-সমাজ শ্রেণী-সংঘাতে দুর্বল হয়ে পড়ছিল, সেখানে বুদ্ধদেব নূতন লোকদের নিয়ে সঙ্ঘ গড়লেন। সাধারণ লোকের কথা, তাদের সুখ-দুঃখের কাহিনী জানতে পারি বৌদ্ধ সাহিত্যে, যা প্রাকৃত বা পালি ভাষায় লেখা। জৈন সাহিত্যেও প্রাকৃত ভাষায় সাধারণ মানুষের কথা শোনা যায়।

বুদ্ধের সমসাময়িক মহাবীর তিনিও জৈনধর্ম প্রচার করলেন লোকের ভাষায়। জৈনদের প্রায় সব গ্রন্থই প্রাকৃত ভাষায় লেখা। অবশ্য পরযুগে বৌদ্ধরা ও জৈনরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্ক-যুদ্ধ করবার জন্য সংস্কৃতে গ্রন্থাদি লিখতে বাধ্য হন। কালে হাজার হাজার বই সংস্কৃতে লেখা হয়; বিপক্ষীয়কে তার ভাষাতেই তাকে আক্রমণ করতে হয়।

বৌদ্ধদের বহু সহস্র গ্রন্থ সংস্কৃতে লিখিত এবং সেই সব সংস্কৃত গ্রন্থই চীনা, তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়।

বুদ্ধের শিষ্যরা ভিক্ষা করে, বড়লোকেরা বা রাজারা 'দান' ক'রে ধন্য হন। বর্ষাকালে তো ঘুরে বেড়ানো যায় না, তাই বিহার নির্মিত হয়—সেখানে পড়াশুনায় ধ্যান ধারণায় চারটে মাস কাটে।

মহাবীরের শিষ্যরা ভিক্ষায় বিশ্বাসী নয়, তারা ব্যবসায় করে, শিল্পী হয়ে ধন সৃষ্টি করে, তাই দিয়ে তারা মন্দির তোলে পুঁথিভাণ্ডার গড়ে। বৌদ্ধদের প্রতাপ, তাদের স্থাপত্য, ভাস্কর্য—সব কিছুরই মূলে ছিল ধনপতিদের দান। পরের হাতে তোলা দান পদ্মপত্রে জল। রাজা বা ধনপতিদের তো মর্জি। হলোও তাই। বৌদ্ধদের প্রতি রাজ-অনুগ্রহ সরে গেলেই, ধনীদেরও মনের হাওয়া উলটো বয়। জৈনরা স্বাবলম্বী বলে আজও ভারতে টিকে আছে, আর বৌদ্ধরা ভারতে রাজানুগ্রহচ্যুত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

হেলেনী বা গ্রীক সভ্যতা।

ভারতে বুদ্ধ, মহাবীর যখন ধর্ম প্রচার করছেন, তখন চীনে কুংফুৎসু, নীতিধর্মের কথা গূঢ় ধর্মতত্ত্ব লাওৎসু শোনাচ্ছেন। পশ্চিম এশিয়ায় প্রায় সেইসময়ে জরদউষ্ট্রর ধর্ম দানা বাঁধতে সুরু করেছে। সেই সময় মধ্যধরণী সাগরতীরে বলকান উপদ্বীপের দক্ষিণে গ্রীস দেশে একটা নতুন জাতির অভ্যুদয় হচ্ছে। ইতিহাসে তারা 'গ্রীক' বলে পরিচিত হলেও তাদের আসল নাম 'হেলেনী'। এরা আর্য ভাষাভাষী। খৃষ্ট জন্মাবার হাজার বৎসর পূর্বে গ্রীসে প্রবেশ করে—কোথা থেকে কি ভাবে তার আভাস দিয়েছি। হেলেনী সাধারণ নাম হলেও তারা অনেক উপজাতিতে বিভক্ত। গ্রীস দেশটা পার্বত্য, তাই এক একটা উপত্যকা মধ্যে এক একটা উপজাতি বসে যায়। তাছাড়া বলা বাহুল্য একদফায় এরা এদেশে আসেনি; এসেছিল দলের পর দলে—যেমন মন ভারতে, তাই গ্রীসে নানা স্থানে নানা স্তরের মানুষকে দেখা যায়।

হেলেনীদের অনেকগুলি শাখা এশিয়-মাইনরে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। হেলেসপন্ট প্রণালী দিয়ে কয়েকটা দল চলে কৃষ্ণসাগর তীরে সোনার সন্ধানে। লোমশুদ্ধ ভেড়ার চামড়া নদীজলে রেখে সোনার কণা সংগ্রহ করে। তার থেকে 'গোলডেন ফ্লীস' পৌরাণিক কাহিনী চালু হয় গ্রীকদের মধ্যে। আরগোনটদের গল্প অনেকেরই জানা আছে গ্রীক উপকথা থেকে। এই আসা-যাওয়ার পথে এশিয়া-মাইনরের (বর্তমান তুর্কী) উত্তরপশ্চিম কোণে পড়ে ইলিয়াম রাজ্য ও তার রাজধানী ট্রয় *। ইউরেশিয়ায় যাওয়া-আসার পথ এখান দিয়েই। আবার সমুদ্র দিয়ে যারা যায়-আসে, নদীর-মুখে মিষ্টিজল নেবার জন্ম জাহাজ তাদের নোঙড় করতেই হয়। হয়তো ট্রয় থেকে খাবারও জোগাড় করতে হতো। এইসব দিক দিয়ে ট্রয়-এর কতকগুলি সুবিধা দাঁড়িয়ে যায় অতি প্রাচীন কাল থেকে। সেই সুযোগে ট্রয়বাসী

*শ্লীমান্ নামে জরমান জাতের এক প্রবাসী আমেরিকান ট্রয়ের পুরোনো নগর খুঁজে অনেক কিছু বের করেন। প্রাচীন কালের ঘর বাড়ির চিহ্ন—অনেক স্তরে পাওয়া গেছে; আদিম যুগ থেকে একের পর এক যুগের চিহ্ন রয়ে গেছে সেখানে।

বা ট্রোজানরা বিদেশী জাহাজীদের উপর বোধহয় জুলুম করতো। এই উপদ্রব বন্ধ করবার জন্য গ্রীস থেকে একদল লোক ট্রয় আক্রমণ ও দীর্ঘকাল অবরোধের পর নগর প্রাচীর ভেঙ্গে নগরে ঢুকে লুট পাট করে থাকবে। এসব ঘটনার কোনো চাক্ষুস সাক্ষী নেই—অনুমানই একমাত্র প্রমাণ।

গ্রীস্ থেকে যে সব বণিকরা কৃষ্ণসাগরে সোনার সন্ধানে যাওয়া-আসা করে, তারা সকলেই সাধুপুরুষ ছিলো না; মেয়ে চুরি করে নৌকায় পাল তুলে পালাতো বলেও গল্প আছে। ট্রয়ের রাজকুমার গ্রীসে গিয়ে তার বন্ধু স্পার্টার রাজার স্ত্রী হেলেনাকে ফুসলিয়ে চুরি করে নিয়ে যান। একাজের প্রতিবিধানের জন্য গ্রীক্‌রা ট্রয়ে দূত পাঠায়; ট্রোজানরা তাদের বলেছিল যে এর আগে যখন তাদের রাজ্য থেকে গ্রীকরা মিডিয়াকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তখন তো তারা কিছু করে নি, এখন কোন লজ্জায় তারা প্রতিবিধানের কথা তোলে? "পারসিক সংবাদ-দাতারা বলেন যে এপর্যন্ত যা ঘটেছিল তা বক্তব্যের মধ্যে নয়, কারণ মেয়ে চুরি তো বদ্ লোকে করেই থাকে, আর মেয়েগুলির নিজের ইচ্ছা না থাকলে কেউ কি কখনো তাদের চুরি করতে পারে? এরূপ বিষয় নিয়ে যারা বিচলিত হয় তারা মূর্খ। কাজেই এই হেলেন-চুরি নিয়ে যে গ্রীকরা এশিয়াতে সৈন্য পাঠিয়ে আক্রমণ করেছিল, তাহা কিছুতেই ঠিক বলে মনে হয় না; এশিয়ার লোকেরা তো কখনো তাদের মেয়ে চুরির জন্য গ্রীস্ আক্রমণ করেনি। কিন্তু গ্রীকরা একটা মেয়ে লোকের জন্য এশিয়ার আক্রমণ করে প্রায়াম (Priam)-এর রাজ্য নষ্ট করে দিল। এর পর থেকেই এশিয়ার লোকে গ্রীকদিগকে তাদের শত্রু বলে মনে করতে আরম্ভ করে। পারসিকদের মতে এশিয়ার অধিবাসীরা সকলেই তাদের নিজের লোক, আর গ্রীস এবং য়ুরোপ পরদেশ।" এই কথাগুলি বলেছেন হোরোদোতোস তার ইতিহাসের গোড়ায়।

যাক্, মেনেলাসের স্ত্রী হেলেনা হরণ, এবং তার পর পর যেসব ঘটনা ঘটেছিল ট্রয় নগরে, তা নিয়ে গ্রীকরা অনেক গাথা বা গানের পালা তৈরী করে। যেসব বীর ট্রয়ের যুদ্ধে গিয়েছিলেন তাদের কাহিনী বা গাথাগুলি এক করে একটা কাব্য খাড়া করেন হোমার নামে এক অন্ধ কবি। এশিয়ার নিকটে এক দ্বীপে তিনি বাস করতেন বলে গল্প শোনা যায়; তবে সেটা কোন্ দ্বীপ? সাতটা দ্বীপের লোক দাবী করে হোমরকে

তাদের লোক বলে। বাল্মীকি, বেদব্যাসকে আমাদের দেশে নানা স্থানের লোক দাবী করে; কত যে বাল্মীকি-আশ্রম আছে তার ঠিকানা নেই—এমন কি মহাকবি কালিদাসকে উজ্জয়িনী থেকে টেনে এনে রাঢ়ের বাঙালি করবারও চেষ্টা হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্র সম্বন্ধে যেসব গাথা লোকমুখে 'প্রাকৃত' বা চল্‌তি ভাষায় চালু ছিল—তার ভাষার গ্রাম্যতা সাফ বা সংস্কার করে ভদ্র বা সংস্কৃত ভাষায় লিখেছিলেন প্রবাদমতে বাল্মীকি। সংস্কৃতের আদি কবি যদি বাল্মীকি হন, তবে তাঁর রামায়ণকেও সংস্কৃত ভাষায় আদি কাব্য বলতে হয়।

গ্রীক কবি হোমারের নামে দুইখানা মহাকাব্য চালু—ইলিয়ড ও ওডেসী। ইলিয়ামের প্রান্তরে দশ বৎসর ধরে লড়াই চলে বলে কাব্যখানির নাম ইলিয়ড। আর এই অভিযানের এক নামকরা বীর—ইউলেসিস যুদ্ধ শেষে ফেরবার সময় যেসব কষ্ট পান, তার কাহিনী বিবৃত হয়েছে ওডেসী কাব্যে; আর তাঁর সতীসাধ্বী স্ত্রী পেনেলোপের দুঃখের কাহিনীও এই কাব্যে বলা হয়েছে। ইলিয়ড, ওডেসীর গল্প খুব পরিচিত, কারণ বাংলায় এসম্বন্ধে অনেক বই বের হয়েছে, সুতরাং সে গল্প এখানে বলার প্রয়োজন নেই।

মুখে-মুখে গাওয়া-গান একদিন গ্রীক্‌রা লিখে ফেললো পাপাইরাসের উপর। এখানে প্রশ্ন ওঠে গ্রীকরা এই লেখার পদ্ধতিটা কোথা থেকে পেলো? আর্যরা বাক্‌পটু জাতি কিন্তু লেখা ও পড়ার জন্য যে অক্ষরজ্ঞানের দরকার সে বিদ্যাটা তারা পায় সেমেটিকদের কাছ থেকে—হেলেনীদের দেশে ফিনিকরা আসে বাণিজ্য করতে; গ্রীক্‌রা দেখে ফিনিক বণিকরা জড়ানো পাপাইরাসের (কাগজের) উপর কি সব আঁচড় কাটে, তাই দেখে কেনাকাটা হিসাব করে, জিনিষ পত্রের ফর্দ মেলায়। বুদ্ধিমান গ্রীক্‌রা বন্দরে বসে বসে ফিনিকদের কাছ থেকে সেমেটিক শব্দের প্রতীকগুলি শিখে নেয় এবং নিজেদের ব্যবহারের জন্য বর্ণমালা খাড়া করে। সেমেটিকদের বর্ণমালায় স্বরবর্ণ নেই; কালে গ্রীক্‌রা লিপির এই অসুবিধা দূর করে নেয়। গ্রীকদের alphabet তৈরী হলো। সেমেটিক ভাষার আলেফ, বে, তে থেকে গ্রীক্ আলফা বিটা বা ইংরেজী [এ, বি প্রভৃতি বর্ণমালা] Alphabet নামে চলিত হয়। সেমেটিকরা ডান দিক থেকে বাম দিকে লেখে—গ্রীক্‌দের প্রাচীন শিলালেখে

প্রথমদিকে ঐ প্রথাই দেখা যায়। তারপর বাম থেকে ডানদিকে লেখবার রীতি প্রবর্তিত হয়। কে কবে এটা করেছিলেন তার ইতিহাস জানা যায় না, তবে লেখার দিক পরিবর্তনে অক্ষরের রূপ উলটে গেল, যে অক্ষরের রূপ ছিল Ǝ তা হলো E আমাদের পরিচিত অক্ষর।

গ্রীসের ইতিহাস হচ্ছে ছোট ছোট রাষ্ট্রনগরীর কাহিনী। সংকীর্ণ উপত্যকার মধ্যে হেলেনীদের ছোট ছোট উপজাতির বাস—সেখানে পুর বা পোলি (polis) কেন্দ্র করে তাদের রাজ্য। নগর গড়ে ওঠে 'নগ' বা পাহাড় অথবা টিলার উপর। সেখানে বানায় অগ্রপুরী বা Akropolis * নগরের আশেপাশে চাষীদের জমি, ক্ষেত খামার।

এইসব রাষ্ট্রনগরীর জনসংখ্যা বেশি নয়। আথেন্সের স্বর্ণময় যুগে আড়াই লাখের মতো লোকের বাস ছিল। থীবস, আর্গোস, কোরিন্থে পঞ্চাশ হাজার থেকে একলাখের মধ্যে, স্পার্টায় আরও কম। এইসব রাষ্ট্রনগরীর বাসিন্দা মাত্রই নাগরিকের অধিকার পেতোনা; নগর-দেবতাকে পূজা ক'রে যারা একটা জ্ঞাতিত্ব বোধ করে তারাই নাগরিক। শাসন কাজে 'ভোট' দিতে তারই অধিকার। নগরের দাস বা স্লেভদের তো ভোটাধিকার ছিলই না। এছাড়া মেয়েদেরও ভোট ছিল না; সুতরাং রাষ্ট্রনগরীর ভোটার সংখ্যা খুব বেশি হতো না।

আদিযুগে নগরে নগরে রাজা ছিল,—তাদের বলতো 'বাসিলিউস'—শব্দটা ইন্দোয়ুরোপীয় বা আর্যভাষা নয়; বোধহয় প্রাক্-গ্রীক শব্দ। কালে অনেক অদল-বদল হতে হতে দেখা গেল গ্রীসের প্রায় সকল রাষ্ট্রনগর থেকে রাজতন্ত্র উঠে গেছে। অনেক জায়গাতেই এক-রাজার বদলে বহু রাজার শাসন আসে—ধনপতিদের ক্ষমতা হয়েছে। স্পার্টায় এক রাজার জায়গায় একজোড়া রাজার উপর শাসনভার ন্যস্ত হয়। আবার কোনো কোনো নগরে রাষ্ট্রের সঙ্গে একেবারে সম্বন্ধশূন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি কতকগুলো বেগানা, বেকার লোক জুটিয়ে হামলা করে রাজশক্তি জবরদস্তিতে বাগিয়ে নিয়ে রাজা হয়ে বসে—এদের বলে 'টাইরেণ্ট।' প্রথম যুগের টাইরেণ্টরা সত্যই কাজের লোক ছিলেন। আজকেও এই হামলা করে শাসনযন্ত্র জবরদস্তির সঙ্গে দখল করার নীতির অবসান হয়নি। তাকে বলে কুদাত (coup d'etat)।

* গ্রীক Akro=সংস্কৃত অগ্র, অগ্র-এর এক অর্থ উচ্চতর স্থান।

গ্রীসের এই ক্ষুদে রাজ্যগুলির মধ্যে কুলীন ছিল স্পার্টা, যেমন রাজস্থানে উদয়পুরের মহারাণারা রাজপুতদের মধ্যে সেরা কুলীন। স্পার্টাই শৌর্যেবীর্যে গ্রীকদের আদর্শ। বংশ কৌলীন্য বিশুদ্ধ রাখবার জন্য তারা সদাই তটস্থ; মাঠের কাজ, চাষবাস, গোপালন—এসব 'ছোটলোকের' কাজ,—রাজ্যের হেলট্ নামে অন্নদাসেদের উপর ঐসব কাজের ভার ন্যস্ত। কুলীন স্পার্টানদের দিন কাটে শরীর চর্চায়, যেমন আমাদের ক্ষত্রিয়দের ছিল যুদ্ধ করাই পেশা। লেখাপড়া, গান বাজনা চর্চা—সাহিত্য, দর্শন, নৃত্য, নাট্য এসবের আলোচনার ধার দিয়ে তারা যেতো না। রাতদিন পালোয়ানি কসরৎ,—কলের পুতুলের মত নিয়মের খিদমদগারি করার নাম 'স্পার্টান' ধর্ম। তাদের রাজ্যে এক জোড়া রাজা আর কয়জন ভদ্রলোকে গবর্মেণ্ট চালায়। তবে একটা ভালো কাজ তারা করে—দক্ষিণ গ্রীস বা পেলোপনেসাস উপদ্বীপের রাষ্ট্র নগরগুলিকে একটা 'লীগ' বা সংঘের মধ্যে বাঁধবার চেষ্টা করে।

গ্রীসের উত্তরাংশে নগরের মধ্যে সেরা আথেন্স; লোকেরা যেমন বুদ্ধিমান তেমনি সাহসী। তারা জাহাজে করে দূর দেশে যায়, ব্যবসায় ক'রে ধন আনে বিদেশ থেকে। আথেন্সের প্রতিদ্বন্দ্বী কোরিন্থ, তাদের সহ্য হয় না আথেন্সের সমৃদ্ধি।

পূর্বে বলেছি—গ্রীস পার্বত্য দেশ। বেশি লোক পোষণ করবার মতো খাদ্য উৎপন্ন হয় না। মানুষের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিও তখন উজ্জ্বল হয় নি, মাটি থেকে ষোলো আনি ফসল উঠাবার বিদ্যাও অজ্ঞাত। তাই বাড়তি লোকের দলকে ভিন্‌দেশে গিয়ে উপনিবেশ করতে হয়—যেমন আজও বেকার ও ফালতু মানুষকে বিদেশে চলে যেতে হয় পেটের দায়ে। তবে আজকাল সরকারের কলোনিয়াল বিভাগ থেকে এসবের ব্যবস্থা হয়, কারণ ইচ্ছামত যেখানে খুসি সেখানে গিয়ে বাসকরা যায় না।—গ্রীক কলোনীগুলি গড়ে উঠে মধ্যধরণী সাগরের তীরে নানা দেশে—বিশেষভাবে সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালিতে। দূরদেশে গিয়ে উপনিবেশ গড়লেও মাতৃনগরীর সঙ্গে তাদের নাড়ীর টানটা থেকে যায়। মাতৃনগরীর শিল্পজাত মালপত্রের প্রধান খরিদ্দার তারা। আথেন্সের কলোনীর লোকেদের দরদ আথেন্সের জন্যই—কারণ সকলেই তারা 'আথেনী' দেবীর সন্তান। কোরিন্থের কলোনীর লোকেরা জননী-জন্মভূমি বলে তাদেরই কোরিন্থকে, 'গ্রীক' বলে কোনো জাতীয়তার ভাব তাদের আদৌ ছিল না।

আধুনিক যুগে দেখা যায় য়ুরোপীয়রা বিদেশে কলোনী গ'ড়ে সেখানেও

ঘরোয়া ঝগড়া টেনে নিয়ে যায় ; দেশে লড়াই সুরু হলেই, বিদেশে কলোনীতে কলোনীতে যুদ্ধ বেধে যায়। গ্রীকরা নিজ নিজ নগরের দেবদেবী যেমন বিদেশে সঙ্গে করে নিয়ে যায়, তেমনি দেশের পুরাতন দ্বেষ-বিদ্বেষও সঙ্গে করে আনে।

বিদেশে বাণিজ্য করতে গিয়ে গ্রীকরা লিডিয়ানদের কাছ থেকে মুদ্রার ব্যবহার শেখে ও তা চালু করে নিজ দেশে। টাকার চল্ হলে অর্থনীতিতে যুগান্তর হয়। মুদ্রা চলনের পূর্বে বিনিময়ে মালপত্র আসতো-যেতো, এখন মালপত্রের বদলে আসছে বিদেশের টাকা বা সোনারূপা। ব্যবসায়ীর হাতে এলো পৃথিবীর সব থেকে মারাত্মক অস্ত্র—টাকা। অচিরেই বুঝা গেল পৃথিবীটা কার বশ।

চিরকাল সব দেশে একই নীতি—টাকায় টাকা টানে ; ধীরে ধীরে অদৃশ্য পথ বেয়ে গরীবের ধন গিয়ে উঠে ধনীর ঘরে। গ্রীসের চাষী মজুরের দশা হ'লো শোচনীয়। ঋণদায়ে জমি বন্ধকী গেলো মহাজনের খপ্পরে। মহাজন-হাঙরের 'হা' চিরকালই সব দেশে একই রকম ; যেখানে দাঁত বসায়—নিঃশব্দে সবটা কেটে নিয়ে চলে যায়। আথেন্সের সাধারণ লোকের হলো সেই মরণদশা।

এমন সময়ে আর্কন বা রাষ্ট্রপতি হলেন সোলন—মহাজ্ঞানী বলে সুনাম তাঁর। অনেক কিছু সংস্কার করলেন—জমি জমা বণ্টন করে দিলেন দরিদ্রের মধ্যে,—সোশিয়ালিজমের প্রথম প্রয়াস। কিন্তু যেখানে জনশিক্ষা নেই—উপর থেকে উপকার পেলে তা ধরে রাখতে পারা যায় না। আইন করে শ্রেণীভেদ ঘুচানো যায় না,—ভেদ বুদ্ধি রয়েছে মানুষের লোভের মধ্যে। লোভের বিষদাঁত উপড়ানো বড়ই কঠিন। তাই সোলনের মৃত্যুর পর সবই লণ্ড ভণ্ড হয়ে যায়। এই সোলনই লিডিয়ার রাজা ক্রোসাসের সভায় গিয়েছিলেন বলে গল্প চলিত আছে—তার কথা আগে আমরা বলেছি।

দেশের জনসাধারণের দুঃখ দারিদ্র্যের সুযোগ নেয় ধূর্ত লোকে—দুঃখীর দরদী সেজে। যুগে যুগে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। আমাদের যুগেও এই শ্রেণীর দাগাবাজের অভাব হয়নি। আথেন্সেও সেরকম লোকের অভ্যুদয় হয়। প্রথম দিকে সত্যই তারা ভাল কাজ করে। কিন্তু

আথেনীয়রা চায় স্বাধীনভাবে মত দিয়ে কাজ করতে; অন্যের জবরদস্তি করা উপকার তাদের অসহ্য। তখন তারা হত্যা করে টাইরেণ্টদের। কালে টাইরেণ্ট হত্যা করাকে পুণ্য কাজ বলে গ্রীসের লোকে বাহবা দেয়। আমাদের দেশেও এক সময়ে রাজনৈতিক হত্যা ধর্মের সামিল ছিল বিপ্লবীদের চোখে। টাইরেণ্ট হত্যাকারী শহীদদের প্রস্তর-মূর্তি স্থাপন করা হয় গ্রীসে। আথেনীয়রা রাজার শাসন বা এককর্তার জুলুমবাজি মানলো না। পৃথিবীতে বোধহয় এরাই প্রথম দেখালো যে রাষ্ট্রশক্তি কোনো বিশেষ রাজবংশের একচেটিয়া হতে পারে না। জনতার মতামত নিয়ে ডিমোক্রেসি প্রথম চালু করলো আথেন্স। আজ দুনিয়ার লোকে গ্রীক্ শব্দ 'ডিমোক্রেসি'র দোহাই দিয়ে ভালো-মন্দ কত কাজই করছে।

আমাদের পৃথিবীর ইতিহাসের মধ্যে দেশ-বিশেষের স্থানিক ঘটনার বর্ণনা হতে পারে না; তাই গ্রীসের ও বিশেষভাবে আথেন্সের ঘরোয়া ইতিহাস এখানে বলা সম্ভব নয়। বাহিরের জগতের সঙ্গে তার যে সম্বন্ধ সেটাই আমাদের আলোচনার মধ্যে পড়বে।

গ্রীসের সামনে এলো দারুন পরীক্ষা। পারসিক শাহনশাহ দরায়ুস সৈন্য পাঠিয়ে দেশটাকে তছ্‌নছ্‌ করলেন। এবং তাঁর পরে সম্রাট জারক্সেস স্বয়ং এলেন লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে, স্থলে জলে আথেন্স আক্রান্ত হলো। আথেন্সে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিল পারসিক সৈন্যরা; কাঠের ঘর-বাড়ি পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেল। ডেল্‌ফি দ্বীপে সিদ্ধমাতা বা ওরাকেল বলেছিলেন লোকদের যে, কাঠের পিছনে আশ্রয় নিতে। একদল লোক বললে, আথেন্সের চারদিকে তো কাঠের খুঁটি রয়েছে পাঁচিলের মতো—আমরা নগরেই থাকবো। অন্য একদল লোক বললে, কাঠের জাহাজে আশ্রয় নিয়ে অন্যত্র যাবো। তাই পারসিক সৈন্যদের আসতে দেখেই পালিয়ে নিকটের সালামিস দ্বীপে আশ্রয় নিল। সাগরে পাহারায় আছে গ্রীকদের জাহাজ বা কাঠের পালতোলা দাঁড়ওয়ালা নৌকা। ফিনিকদের সেই রকমেরই জাহাজে চড়ে পারসিকরা জলে যুদ্ধ করতে এসেছে। গ্রীক্‌রা সাগরে সাগরে ঘোরে, জাহাজ চালাতে ওস্তাদ। জারক্সেসের নৌবাহিনীতে জাহাজের নাবিক হচ্ছে ফিনিকরা; তারা যোদ্ধা নয়। আর জাহাজের পারসিক সৈন্যরা যোদ্ধা, কিন্তু নাবিক নয়। এই অদ্‌ভুত যোগাযোগে ফিনিক ও পারসিকদের হার হলো এই নৌ-যুদ্ধে,

সালামিস উপসাগরে অনেকগুলি জাহাজ জখম হলো, মানুষও কিছু কম মরলো না। জারক্সেস বেগতিক দেখে গ্রীস থেকে সরে পড়লেন।

ঈজান সাগরের দ্বীপগুলি ও পশ্চিম এশিয়ার গ্রীক্‌দের দেশ পারসিকদের হাতে থাকলো আরও শতাধিক বৎসর। সার্দিসে বসে পারসিক-ক্ষত্রপ গ্রীসের রাজনীতি অর্থনীতি অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করতেন, যেমন আজকাল মার্কিনী যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন থেকে দুনিয়ার রাজনীতি-অর্থনীতির কলকাটি নাড়ানো হচ্ছে। বিরোধ বেঁধেছে গ্রীক বনাম পারসিকদের আদর্শের মধ্যে—সুসা ও সার্দিস চায় একছত্র রাজতন্ত্র দুনিয়ায় কায়েম করতে; আথেন্স ও তার কলোনীরা বলে স্বাধীন লোকের মত নিয়ে ডিমোক্রেসি বা জনশাসনতন্ত্র চালু করতে হবে। বর্তমান জগতেও আজ সেই লড়াই চলেছে অন্য নামে, অন্য রূপে—প্রতিদিন ভীষণ থেকে ভীষণতর হচ্ছে সে রূপ!

পারসিকদের সঙ্গে গ্রীসের লড়াই চলছে বলকান উপদ্বীপ ও ঈজান সাগরে; সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ বেঁধে গেল ইতালির দক্ষিণে সিসিলি দ্বীপে; সিসিলিতে গ্রীকদের কলোনী আছে—তারা খুবই সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী। এই দ্বীপের আর একটা অংশে কলোনী করেছে উত্তর আফ্রিকার কার্থেজীয় বণিকরা। উত্তর আফ্রিকায়—আজকাল সেখানে টিউনিস—সেখানে এশিয়া থেকে ফিনিকয়া গিয়ে কার্থেজ (Carthage) বা নয়াশহর পত্তন করেছিল। কার্থেজের লোকেরা জাত্‌ বেনে; দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়, ব্যবসায় করে, টাকা আনে। সিসিলিতে তাদের অনেকগুলি আস্তানা। তারা কালে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে গ্রীক উপনিবেশিকদের।

সিসিলিদ্বীপ গ্রীকদেরও নয়, ফিনিকদেরও নয়; দুই দলই এসেছে ব্যবসায় করতে, কারখানা বানাতে। বুদ্ধি আর দক্ষতার দৌড়পাল্লায় কে জিতবে সেটাই ছিল প্রশ্ন। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বুদ্ধি যার জগৎ তার; কিন্তু ব্যবসায় করতে করতে যখন রাজ্য পত্তন করবার লোভ জন্মে 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি ধর্মের স্থান দখল করে! সিসিলিতে সেটাই হলো—ব্যবসায়ীরা লড়াই সুরু করলো। ফিনিকে-গ্রীকে দ্বীপটার দখলদারী নিয়ে বাঁধলো সংগ্রাম—উভয়েরই মতলব ব্যবসার ক্ষেত্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীকে হটিয়ে দেওয়া, যেমন ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে চলেছিল ভারতে ও আমেরিকায়—তারাও এসেছিল বাণিজ্য করতে।

যুদ্ধ বাঁধিয়ে তোলবার কারণ সহজেই পাওয়া যায়, কিন্তু তার পরিণামের কথাটা প্রথমে মনে হয় না কোনো পক্ষেরই; পারসিকদের সঙ্গে গ্রীকদের যুদ্ধের শেষে দেখা গেল, ফিনিকদের জাহাজ হয়েছে ধ্বংস, তারা ছিল মধ্যধরণী সাগরের একচেটিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যর মালিক। পাখীর পাখা কাটা পড়লে যা হয়, জাহাজ খোয়া গেলে ফিনিক বণিকদেরও তাই হয়। পারসিক যুদ্ধের পর আথেন্স, কোরিন্থ ও অন্যান্য দ্বীপের বণিকরা পুবসাগরের ফিনিকদের বাণিজ্য অনেকটা দখল করে নেয়।

পারসিকরা বিতাড়িত হলে, গ্রীসের মধ্যে আথেন্স কার্যত নেতা হয়ে উঠেছে। পারসিকদের সঙ্গে শেষ যুদ্ধে যিনি তাদের হারিয়ে দেন সেই সেনাপতির নাম থেমিস্টক্লিশ। তাঁর পরামর্শে আথেন্স সরকার সময় মতো জাহাজ নির্মাণ করেছিল বলে পারসিকদের জলযুদ্ধে হারানো সম্ভব হয়েছিল। যুদ্ধের পর আথেনীয়রা নগরে ফিরে এলো—তখন পোড়াকাঠ ছাড়া সেখানে আর কিছু নেই। থেমিস্টক্লিশের পরামর্শে নগরের চারদিকে পাথরের প্রাচীর গাঁথা হলো। এতকাল কাঠের খোঁটা দিয়ে নগর ছিল ঘেরা। সমস্ত আথেনীয়রা রাতদিন খেটে পাঁচিলটা গেঁথে তুললো। আথেন্সকে পাঁচিল গাঁথতে দেখে স্পার্টার হলো রাগ। স্পার্টা গ্রীসের কুলীন নেতা; তার ভয় পাছে নেতৃত্ব তার হাত থেকে খসে যায়। পাঁচিল গাঁথতে নিষেধ করে পাঠালো তারা, কিন্তু আথেনীয়রা থেমেস্টিক্লিশের পরামর্শে সে কথায় কান দিলে না! পাঁচিল গাথা হয়ে গেল। কিন্তু এই পাঁচিল গাথা নিয়ে স্পার্টা আথেন্সের বিরোধের বিষ-বীজ পোঁতা হলো।

পারসিকরা চলে যাওয়ার কয়েক বৎসর পরে পেরিক্লিস নামে এক অসাধারণ পুরুষ আথেন্সের কর্ণধার হন। তিনি দেখেছেন পারসিকদের শাসন ব্যবস্থার কী শক্ত বুনিয়াদ,—গ্রীসে তেমন কিছু নেই। বিচ্ছিন্ন গ্রীসের রাষ্ট্রনগরীগুলিকে ঐক্য সূত্রে বাঁধতে হবে। তিনি ডেলস্ দ্বীপে গ্রীকদের নিয়ে একটা রাষ্ট্রসংঘ * গড়লেন। সকল গ্রীক রাষ্ট্রনগর সংঘের সদস্য হলো। সকলে জাহাজ তৈয়ারী করে পাঠিয়ে দেয় ডেলসে। ডেলস্ সম্মেলনী যখন

* League of Nations এর কেন্দ্র ছিল জেনেভা, নির্দলীয় স্থান; United Nations বা রাষ্ট্রসংঘে এর সদর দফতর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ইয়র্কে নির্মিত হওয়ায় মারাত্মক ভুল করা হয়েছে।

বেশ পুষ্ট হয়ে উঠেছে, তখন পেরিক্লিস মস্ত একটা ভুল করলেন—ডেলসের ধনসম্পত্তি আথেন্সে স্থানান্তরিত করে। আর আথেন্সের শাসন-আদর্শ 'ডিমোক্রেসি' যাতে সকল নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়, তার জন্যও চেষ্টা করতে লেগে গেলেন। চেষ্টা ক্রমে জুলুমে পরিণত হলো। কিন্তু সহজ সাফল্যের নেশায় আথেনীয়রা এই সরল কথাটা ভুলে গেলো যে নিখিল হেলেনী ভাবনা তখন গ্রীকদের মধ্যে অস্ফুট। অল্পকালেই দেখা গেল, গ্রীকরা কারও মুঠোর মধ্যেও থাক্‌বে না, একভাবে নিয়ম মেনেও চলবে না—তারা বিচ্ছিন্ন থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চায়? আথেন্সের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ভাব দেখা দিল। বিদ্রোহ দমনের জন্য নিষ্ঠুরতাও হলো চরম। আজকালও দেখা যাচ্ছে প্রবল রাষ্ট্রীয় শক্তির সঙ্গে মতভেদ হলে দুর্বল জাতির কী দশা হয়! ছলে, বলে, কৌশলে তাকে নিজের দলে টানতে হবে, তাকে নিজের মতাবলম্বী করতেই হবে।

আথেন্সের উন্নতির জন্য পেরিক্লিশ অনেককিছু করলেন; মন্দির, সভাগৃহ, রাজপথ তৈরী হলো; স্থাপত্য, ভাস্কর্যে নগর এমন সুশোভিত হলো যে, তখনকার পৃথিবীর কোথাও তার তুলনা পাওয়া যায় না। পার্থিনন-দেবালয় ভাঙা অবস্থায় এখনো দাঁড়িয়ে আছে—লোকে দেখতে আজও যায়।

কিন্তু এত ঐশ্বর্য, এত প্রতাপ থাকতেও আথেন্স ধ্বংস হলো একদিন। আমরা পূর্বেই বলেছি স্পার্টা গোড়া থেকেই আথেন্সকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দেখে হিংসায় পুড়ে মরছিল। আথেন্সও শক্তিমান হয়ে ছোট খাটো রাষ্ট্র নগরীকে অবজ্ঞা করতে আরম্ভ করেছিল। ফলে ঘরোয়া লড়াই বাঁধলো গ্রীসের মধ্যে। সেই যুদ্ধের আগুনে আথেন্স আবার ধ্বংস হলো—এবার বিদেশী শত্রুর হাতে নয়—এবার নিজেরাই শত্রুরূপে পরস্পরকে ধ্বংস করলো। দীর্ঘকালের এই ঘরোয়া যুদ্ধের নাম পেলোপনেশীয় সমর। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে স্পার্টার সৈন্য এসে একদিন আথেন্সের প্রাচীর ভেঙে দিল—যেটা তারা করতে নিষেধ করেছিল—সেই প্রাচীরই নিশ্চহ্ন হলো।

আথেন্সের পতনের পর স্পার্টা, থীবস কিছুকালের মতো মাতব্বর হয়ে ওঠে, কিন্তু কেউ স্থায়ী হতে পারলো না—একসঙ্গে কাজ করার শিক্ষা তাদের হয়নি বলে। তারপর উত্তর গ্রীসের বুনোদেশ মাকিদনের সদ্য-সভ্য হওয়া রাজা ফিলিপ বিচ্ছিন্ন গ্রীকদের উপর হামলা সুরু করলে অতি সহজেই গ্রীকরা ভেঙে পড়লে। সমগ্র গ্রীস মাকিদনের পদানত হলো,—ডিমোক্রেসি

জনমত, ভোটনিয়ে মাতামাতি, মাথা ফাটাফাটি—সবের শেষ হলো কড়া শাসনে। অশিক্ষিত জনতার হাতে শাসনতন্ত্র এসে পড়লে, তার অসদ্ ব্যবহার হয়েই থাকে এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় সে সব দেশে জবরদস্ত এক-নায়কের শাসন কায়েম হয়; সে শাসন স্থায়ী নাও হতে পারে, কিন্তু ডিমোক্রেসিকে নতুন করে ভাবতে হয় কিভাবে রাজ্য চালানো যেতে পারে ভবিষ্যতে।

মাকিদনীরা গ্রীস্ অধিকার করাতে গ্রীসের রাষ্ট্রনগরের জীবনধারায় যে খুব একটা উলট-পালট হলো তা নয়। পেরিক্লিশের সময় থেকে এবং তারপর পেলোপনেশীয় যুদ্ধের পর হতে সর্বত্রই গ্রীকদের সমাজ জীবন, রাষ্ট্র জীবন, ধর্ম জীবনের মধ্যে অনেক ভাঙাচুরা সুরু হয়। রাষ্ট্রজীবনের কথাই ধরা যাক; বহুকাল ধরে নগরে-নগরে লড়াই-এর ফলে পেশাদারী সৈনিক প্রায় সব রাষ্ট্রনগরেই দেখা দিয়েছে। আগেকার যুগে প্রত্যেক নাগরিক মনে করতো দেশের জন্য যুদ্ধ করা ধর্ম। কিন্তু এখন রাষ্ট্রের টাকা প্রচুর। তাই, টাকা দিয়ে দেশ-বিদেশ থেকে ভাড়া-করা ঠাঙাড়ে আনতে পারা যায়। আগে রাজনীতি সম্ভ্রান্ত বংশীয় বাবুদের হাতে ছিল। কালক্রমে শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার হতে থাকলে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত ধন ছড়িয়ে পড়ে বহুজনের মধ্যে—অতিবিত্ত ও হীনবিত্তের মাঝে উঠেছে নূতন এক 'মধ্যবিত্তর' দল। এরা এখন রজানীতির ক্ষেত্রে মাথা গলাতে আরম্ভ করেছে। চামড়া-বেচা মুচির ছেলে ক্লিওন আথেন্সের রাজনীতিতে বেশ কিছুকাল মাতব্বরি করে নেয়। এটা সম্ভব হয় আথেন্সেই, যেখানে নাগরিকরা সমান ভোটের অধিকারী।

অর্থনৈতিক জীবনে পরিবর্তনটা খুবই স্পষ্ট। গরীব বাপের পয়সা হয়েছে—ছেলেকে সে এখন লেখাপড়া শেখায়, উদ্দেশ্য মানুষ হলে ব্যবস্থাপক সভায় সে একদিন বসবে। সভায় বসতে পারলে কত মান! না-খেটে সভায় হাজিরা দিলেই দিন-মজুরিটা পায়। নেতা হতে গেলে জনতার মন ভুলোবার জন্য বক্তৃতা করতে হয়। কঠিন সমস্যার সহজ সমাধান দিয়ে মূঢ় লোকের মন হরণ করতে পারলে ভোট সহজেই পাওয়া যায়। আথেন্স, সাইরাকিউস প্রভৃতি বড় বড় নগরে বাগ্মিতা বা বক্তৃতা শেখবার জন্য যুবকরা পণ্ডিতদের পয়সা দিত। ইতিহাস, পুরাণ, রাজনীতি, সাহিত্যের বুকনি তারা শেখে। সেইগুলি সভায় শ্রোতাদের শুনিয়েতাদের উত্তেজিত করেও ভোট আদায় করে।

এ ছাড়া বিচারালয়ে বাদী-প্রতিবাদী দু'জনকেই নিজের কথা নিজেই পেশ করতে হয়। মূর্খ জনতার সামনে কে কবে কার নামে নালিশ রুজু করে দেয়, তার ঠিক নেই; তাই সকলেই আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বক্তৃতা করার বিদ্যাটা আয়ত্ত করে রাখে, আইন-কানুনের কথাও কিছু কিছু জেনে নেয়।

যাঁরা এইসব বিদ্যা শেখান তাদের বলে সোফিষ্ট বা পণ্ডিত। এই পণ্ডিত বা সোফিষ্টরা নগরে নগরে জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে ফেরেন। তর্কবিদ্যার জন্ম হলো এই সবের মধ্য দিয়ে। কথার ও শব্দের অর্থ নিয়ে চুলচেরা ভাগ করতে গিয়ে বাক্যের মধ্যে সংগতি, যুক্তি প্রভৃতি অনেক কিছু এসে গেল। কিন্তু বুদ্ধির অস্ত্র যে কেবল আইনের কচকচানির মধ্যে আটকা পড়ে থাকে তা তো নয়। একবার বুদ্ধির দরজা খুলে গেলে, মানুষ ধর্ম, স্বর্গ, নরক, নীতি, দর্শন, বিজ্ঞান সকল বিষয়েই প্রশ্ন তুলে বিচার শুরু করে। বিচারের ফলে পুরাণো দেবদেবী সম্বন্ধে লোকের বিশ্বাস শিথিল হতে লাগলো।

সাহিত্যে তার প্রমাণটা পাওয়া গেল বেশি করে। গ্রীকরা মহাকাব্য লিখেছিল ইলিয়াড ও ওডেসী; মানুষের সঙ্গে দেবদেবীরা বেশ ঘুরে ফিরে বেড়াতেন—যেমন দেখা যায় রামায়ণ ও মহাভারতে,—আমাদের যাত্রার আসরে। কিন্তু পরযুগের কবিরা মহাকাব্য আর কেউ লিখলেন না,—লিখলেন গীতি কবিতা ও নাটক। গ্রীক নাট্যকার ইস্কাইলাস, সফোক্লিস, ইউরিপিদাস, আরিস্তফেনিস গ্রীক সাহিত্যে কেন—বিশ্বসাহিত্যে অমর স্থান পেয়েছেন—যেমন পেয়েছেন আমাদের মহাকবি কালিদাস। এঁদের নাট্যমধ্যে দেবদেবীরা ঘুর-ঘুর করেন না, অলৌকিক ঘটনা রঙ্গমঞ্চে অভিনয়কালে আনেন না; ঐতিহাসিক ঘটনা, পৌরাণিক কাহিনী নূতন রূপ নিয়ে অভিনয় মঞ্চে দেখা দিল। আরিস্তফেনিস তার সময়কার রাজনীতিজ্ঞদেরই মনের সাধে বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ করে নিয়েছেন।

গ্রীকভাষায় নাটক অভিনয় সকল লোকই উপভোগ করতো—কারণ গ্রীকদের ভাষা একটাই। কিন্তু ভারতে সংস্কৃত নাটক মুষ্টিমেয় পণ্ডিত ছাড়া আর কারও ভোগে আসতো না। আমাদের সাহিত্য বিশেষ 'ক্লাসের' মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলে একেই যথার্থভাবে ক্লাসিকস্ বলা উচিত। গ্রীকরা খোলা জায়গায় থিএটর করতো; পাহাড়ের ঢালুতে ধাপ কাটা নাট্যমঞ্চ এখনো দেখা যায়। প্রসঙ্গত বলি ভারতের সংস্কৃত নাটক আবির্ভূত হয়, গ্রীক নাট্যের প্রায় সাত-আট শত বৎসর পরে।

আথেন্স বাইরের সাম্রাজ্য হারালো, কিন্তু অন্তরে যে সম্পদ পেলো তা তুলনাহীন। প্রাচীন বাবিলন, অসুরীয়রা, মিশর, সিরীয়া প্রভৃতি দেশের সভ্যতা সত্যই মরে গেছে; পরোক্ষভাবে তাদের অনেক কিছু পেয়েছি সত্য, কিন্তু প্রতিদিন তাদের আর অস্তিত্ব অনুভব করিনে। কিন্তু প্রাচীন যুগের যা জীবন্তভাবে আমাদের মধ্যে এসে পৌচেছে, তা গ্রীকদেরই দান।

মানুষের মনে অসংখ্য প্রশ্ন—এ জগৎ কি, এসব কেন ও কি করে হলো। প্রাচীনরা দোহাই দিতেন দেবতার; বলতেন দৈবের শাপে বা বরে সব হয়! নবীন গ্রীক্‌রাই এসব প্রশ্নের এবং তাদের সঙ্গে জড়ানো অসংখ্য সমস্যার উত্তর দিল—দৈবের আশ্রয় না নিয়ে। সোফিস্টরা তর্কের দ্বারা মানুষের মনে দিয়েছে নাড়া, এতকাল অন্তরের আঁধার-কোণে বুদ্ধিটা চুপসে ছিল, দেবদেবীদের ভয়ে বাকস্ফূর্তি হতো না মানুষের। এখন সেই চাপা বুদ্ধিটার ঢাকনি গেল খুলে —গ্রীসে দর্শনশাস্ত্রের জন্ম হলো।

সভ্যতার ঢেউ উত্তরে ঠেলে চলেছে—মিশর, ক্রীট, স্পার্টা, আথেন্স থীবস ও সেখানে থেকে উত্তরগ্রীসের পাহাড়ী দেশ মাকিদনে গিয়ে একদিন তরঙ্গ পৌঁছলো। মাকিদনের বন্য সর্দারের পুত্র ফিলিপ থীবসের রাজদরবারে জামিন হয়ে বাস করেন অনেক কাল। থীবসের সভ্যতা দেখে বালক মুগ্ধ নয়নে। মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে রাজা হয়ে মাকিদনীদের সভ্য করার দিকে মন দিলেন। মাকিদনের কাছে থ্রেস দেশে সোনার খনি থাকায় টাকার অভাব হলো না ফিলিপের। স্বর্ণধন হাতে আসলে সৈন্যবল সংগ্রহ সহজ হয়। জান্‌বাজ সৈন্যদের নয়া কায়দায় রণশিক্ষা দিয়ে অপরাজেয় করে তুললেন ফিলিপ। মাকিদনীয় সৈন্যদলের মেরুদণ্ড হলো অশ্বারোহীর দল, দিগ্বিজয়ের প্রধান সহায় এরা, আজকালকার রণসজ্জার মোটর বাহিনী, ট্যাংক, সাঁজোয়াগাড়ি। এই সুশিক্ষিত, দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী সৈন্যদল নিয়ে ফিলিপ দিগ্‌বিজয়ে বের হলেন। সমস্ত গ্রীস নত হলো। আথেন্স বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল; ডিমোস্থানীস নামে এক বাক্যবাগীশ রাজনীতিক ফিলিপের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে লোকদের উত্তেজিত করলেন। কিন্তু উত্তেজক কথা বলে বা শুনে কোনো দেশ লড়াই-এ জয়ী হয় না। ফিলিপ সমস্ত গ্রীসকে এক সংঘ মধ্যে আসতে বাধ্য করলেন। কিন্তু রাষ্ট্রনগরীর নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য

যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তার ব্যবস্থাও দিলেন—অর্থাৎ সাম্রাজ্যের মধ্যে অটোনমি বা আত্মশাসন অধিকার।

ফিলিপের অপঘাত মৃত্যু হলো—নিজ স্ত্রীর দেওয়া বিষে। তারপরে মাকিদনের যিনি রাজা হলেন ইতিহাসে তিনি আলেকজেন্দার নামে খ্যাত। মাকিদানী হলেও শিক্ষায় দীক্ষায় আলেকজেন্দার ছিলেন পুরো গ্রীক। ছোটবেলা থেকে গ্রীক পণ্ডিতদের কাছে গ্রীক সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির শিক্ষা পান ফিলিপ আথেন্সের বিখ্যাত দার্শনিক আরিস্তোতলকে আলেকজেন্দারের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। এঁর শিক্ষার গুণে গ্রীক সংস্কৃতির সকল কিছুকে আলেকজেন্দার ভালবাসতে শিখলেন। কিন্তু এতো ঘসা-মাজাতেও কয়লার রং বদলালো না। মাকিদানী বন্য-বর্বরতা আলেকজেন্দারের কোনো দিনই ঘোচেনি। থীবস জয় করে অধিবাসীদের ক্রীতদাসের বাজারে বিকিয়ে দেন, নগর লুটপাট করেন; কিন্তু গ্রীক্ কবি পিন্ডারের কবরটি অটুট রাখলেন; এখানে দেখা গেল বর্বর মাকিদানী ও সংস্কৃতিবান গ্রীকের দু'টো মন।

গ্রীসের শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে আলেকজেন্দার দিগ্বিজয়ে বের হলেন—পারসিক শাহনশাহর মতো হতে হবে এই তার আকাঙ্ক্ষা। সঙ্গে চল্লিশ হাজার সৈন্য—পদাতিক ও ঘোড়সোয়ার। হেলেসপন্টের ওপারে পারসিক সাম্রাজ্য। পারসিকদের তৈরী প্রশস্ত পাথুরে সড়ক দিয়ে গ্রীক সৈন্যসামন্ত চললো এশিয়ার ভিতর দিয়ে।

বর্তমানে যে দেশ তুর্কী রাজ্য, তার পশ্চিমাংশটা ছিল গ্রীকদের বাসভূমি। আজ একজন গ্রীকও সে-রাজ্যে নেই; কেন নেই, কোথায় গেল সে-কথায় পরে আসবো। এই গ্রীকরা পারসিকদের হাত থেকে উদ্ধার পেলো বটে, কিন্তু স্বাধীন হলো না—মাকিদনের কবলে পড়লো। পরিবর্তনটা হলো তপ্ত খোলা থেকে লাফিয়ে উঠে জ্বলন্ত আগুনের মাঝে পড়ার মতো। দুই'শ বৎসর পারসিকরা এ অঞ্চলে রাজত্ব করেছিল—কিন্তু লোকেদের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়নি। গ্রীকদের অধীন হবার পর তাদের পরিবর্তনটা হলো গুণগত, যথাস্থানে সে আলোচনায় আসা যাবে।

পারসিক শাহনশাহ দরায়ুস কদমানাসস মাকিদন রাজকে বাধা দেবার জন্য যুদ্ধে এলেন ; কিন্তু সিরীয়ার প্রান্তরে ইসাস নামে স্থানে গ্রীকদের কাছে হেরে পালিয়ে গেলেন। এবার সিরীয়ার পাশেই ফিনিকদের দেশ। এরাইতো পারসিকদের গ্রীস আক্রমনে সাহায্য করেছিল জাহাজ দিয়ে, হেলসপণ্টের উপর সেতু বানিয়ে—রসদপত্র যুগিয়ে। সেই ফিনিকদের শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু সমুদ্র পথে আক্রমন করার মতো নৌবল মাকিদনের কোথায় ? তাই তারা স্থলপথে এসে টায়ার নগর অবরোধ করলো—এ যেন পিছন থেকে এসে হঠাৎ জাপ্‌টে ধরে ফেলার মতো। দশমাস টায়ারবাসীরা লড়ে ; তারপর আর পারলে না। মাকিদানী সেনা নগরে ঢুকে সমস্ত লুটে পুটে নিল—টায়ার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ! গ্রীকদের নৌ বাণিজ্যের বড় রকম প্রতিদ্বন্দ্বী ফিনিকরা সুতরাং এদেরই ধ্বংস করা বিশেষ প্রয়োজন।

এর পর ফিনিশিয়া থেকে সিনাই উপত্যকা দিয়ে মাকিদনরাজ আলেক-জেন্দার মিশরে প্রবেশ করলেন। মিশর তখন পারসিক সাম্রাজ্যের অংশ। তাই মিশরীয়দের জয় করতে খুব বেশি কষ্ট করতে হলো না। সেখানে আলেকজেন্দার আপনাকে 'ফারায়ো' ব'লে ঘোষণা করলেন,—আমোন-রা-র পূজা দিলেন—ভাবখানা 'আমি তোমাদের লোক'। দেশ জয় করে নীলনদের মোহনায় এক নগর-বন্দর পত্তন করলেন—টায়ারও সিডনের প্রতিদ্বন্দ্বী হবার জন্য। তাঁর নামের বন্দর আলেকজেন্দ্রিয়া এখনও রয়েছে,—অবশ্য তার অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে এই আড়াই হাজার বৎসরের মধ্যে। আলেকজেন্দ্রিয়ার কথায় আমরা আবার ফিরে আসবো।

মিশর থেকে ফিরে এসে এবার গ্রীকরা চলেছে পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বংস করতে। মেসোপটেমিয়ার নিনেভার কাছে আর্বেলার প্রান্তরে পারসিক সম্রাটের বিপুল সৈন্যদলের সঙ্গে গ্রীকদের শেষে লড়াই হলো। যুদ্ধে হেরে সম্রাট দরায়ুস পালাচ্ছেন পথে তাঁরই এক ক্ষত্রপ তাঁকে খুন করলো—যেমনটি ঘটেছিল যুদ্ধে পরাভূত পলায়মান সিরাজদ্দৌলার জীবনে।

বাবিলনে প্রবেশ করে আলেকজেন্দার স্থানীয় পুরোহিতদের ধন দিয়ে ভক্তি দেখিয়ে সম্মানিত করলেন, দেবতাদের কাছে ষোড়শোপচারে পূজা দেওয়াতে তারা তো আশ্চর্য। পুরোহিতরা ধূর্ত, তারা বেশ জানে রাজা যিনিই হোন তাকে তুষ্ট করতে পারলে তাদের ধর্মের ব্যবসাটা বন্ধ হবে না। বিজয়ী রাজাও জানে ধর্মধ্বজী পুরুতদের খুসি করে রাখলে মূঢ়

জনতাও ঠাণ্ডা থাকবে। পুরুতরা যা বোঝাবে তাই জনতা ঘাড় পেতে মেনে নেবে। সাধারণকে ধর্ম নিয়ে মাতামাতি ও নাচানাচি করতে দেওয়া রাষ্ট্র-নায়কদের একটা মস্ত রাজনীতিক ফিকির।

এদিকে পারসিক সম্রাট পলাতক—রাজধানী সুসা ও পার্সিপুরী অরক্ষিত—সহজেই গ্রীকদের দখলে এলো নগর দুইটি। বহুযুগের ধনরত্ন জমা ছিল কুটরিতে কুটরিতে; সে সব প্রায় বিনা বাধায় আলেকজেন্দারের হস্তগত হলো। পার্সিপুরীর বিশাল প্রাসাদ—এখনো তার ভগ্নাবশেষের ছবি দেখলে ও সেও সম্বন্ধে বই পড়লে মন বিস্ময়ে ভরে যায়। কিন্তু সেই প্রাসাদ একদিন মাকিদন-রাজ মদ খেয়ে উন্মত্ত অবস্থায় পোড়াবার হুকুম দিলেন। বন্য মাকি-দনীয়ের অসংযত রূপটি প্রকাশ হয়ে পড়লো। সমস্ত প্রাসাদ ছাই হয়ে গেলো; সেই সঙ্গে চামড়া বা পুস্তের উপর লেখা পারসিকদের ধর্মগ্রন্থ সব পুড়ে নষ্ট হলো। পৃথিবীতে এত বড় বর্বরতা খুব কমই ঘটেছে—অবশ্য বিংশ শতকের মহাযুদ্ধ দু'টির কথা বাদ দিলাম।

পার্সিপুরী থেকে গ্রীক সৈন্যরা চললো পুবমুখে। পথে মধ্য এশিয়ার শকদের দেশ অধিকার করে, কাবুল বা উত্থান দেশের মধ্য দিয়ে এসে উপস্থিত হলেন ভারতের উত্তরপশ্চিমে (খৃ. পূ. ৩৩৭—৩২৪)।

ভারতে প্রবেশের পর আলেকজেন্দারকে প্রত্যেক পদক্ষেপে লড়াই করতে হয়েছিল। সৈন্যরা এমন প্রতিরোধ কোথায়ও পায়নি। আলেকজেন্দার ভাবছেন পূবদিকে যাবেন—গঙ্গারাঢ় অঞ্চল পর্যন্ত গেলে কেমন হয়। কিন্তু নন্দবংশের রাজাদের পরাক্রম সম্বন্ধে চরদের মুখে যা খবর পেলেন, সেসব শুনে গ্রীক সৈন্যরা আর এক পা-ও আগাতে রাজি হলো না। আলেকজেন্দার তাঁবুর মধ্যে রেগে মাথার চুল ছিঁড়ে ছটফট করতে থাকেন; সৈন্যরা কিছুতে আর পূর্বদিকে যাবে না। বাধ্য হয়ে ফিরতে হলো গ্রীকদের।

ফেরবার সময়ে গ্রীকরা নূতন পথ ধরলে। সেনাপতি নিয়ার্কাস চললেন সিন্ধু নদ দিয়ে। গ্রীকদের ধারণা সিন্ধুনদ নীলনদের সঙ্গে মিশেছে। ভূগোল সম্বন্ধে কী অদ্ভুত ধারণা ছিল সে যুগে। হিমালয়ের পাহাড়ে গাছ কেটে তাই দিয়ে নৌকা বানানো হয়েছিল। নিয়ার্কাস ভাসলেন সিন্ধু দিয়ে। আর

আলেকজেন্দার বেলুচিস্থানের মধ্য দিয়ে নয়া পথে চললেন। সে পথ অজানা। খুব কষ্টের পর বহুদিন পরে সুসায় পৌঁছুলেন।

সুসা পারসিকদের দ্বিতীয় রাজধানী। নগরীর বৈভব, লোকেদের ভদ্রতা, রাজপুরুষদের আদব কায়দা, মেয়েদের সৌন্দর্য সবই গ্রীকদের মুগ্ধ করে। আলেকজেন্দার এইসব দেখে শুনে ভাবছেন, আর দেশে ফিরে যাবেন না—পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে রাজধানী স্থাপন করবেন। শুধু তাই নয়; বিবাহাদি দিয়ে গ্রীক ও পারসিকদের মধ্যে মিলন ঘটাবেন। আলেকজেন্দার নিজেই পারসিক দুইটি রাজকুমারীকে বিবাহ করলেন—তাদের একজন দরায়ুসের কন্যা, অন্য জন তাঁর ভাই-এর মেয়ে। তারপর আশীজন গ্রীক সেনাপতিও দশহাজার গ্রীক সৈনিক—যার যেমন অবস্থা, সেইমত পাত্রী জোগাড় করে দেওয়া হলো বিবাহ। পারসিক যুবকদের গ্রীক ভাষা শিখাবার ব্যবস্থা করা হলো। ত্রিশ হাজার পারসিক জোয়ান গ্রীক রণনীতি শিখতে সুরু করলো। একে বলে সাংস্কৃতিক বিজয়।

অন্যদিকে গ্রীকদের উপর হুকুম হলো পারসিক পোষাক পরতে হবে সবাইকে; পারসিক কায়দায় তাঁর সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করতে হবে; মোট কথা তিনি যে পারসিক শাহনশাহ তাই প্রমানের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন; আলেকজেন্দার এবার ঘোষণা করলেন যে তিনি জিউস আমোন-এর সন্তান—দৈব অধিকার তাঁর! সুসা থেকে বাবিলনে এসে ঠিক করলেন, সেখানে হবে তাঁর নূতন সাম্রাজ্যের রাজধানী। এমন সময়ে গেলেন মারা (খৃঃ পূঃ ৩২৩)। তখন আলেকজেন্দারের বয়স মাত্র একত্রিশ বৎসর। সুসা ও বাবিলনে দুই বৎসর বাসকালে অনেক পরিবর্তন করেছিলেন পারস্যের।

আলেকজেন্দার সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত; কেউ বলেন তিনি দেবতার মতো মানুষ—আদর্শবাদী। কেউ বলেন তিনি দানব—মাতাল, লম্পট, দস্যু-সর্দার। আসলে তিনি দেবতাও নন, দানবও নন; ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান লুণ্ঠনকারী, ভিতরে ভিতরে পাকা সাম্রাজ্যবাদী—এবং তাঁর সেই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হবে গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর। উদ্দেশ্য সাধনের আশায় পারসিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেছিলেন; কিন্তু আসলে সেটা প্রয়োজনের তাগিদেই করতে হয়। কারণ, পারসিক সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হতে গেলে, তাঁকে

পারসিকদের সহায়তার উপরই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে; গ্রীক সৈন্য তো মুষ্টিমেয়; গত দশ বৎসরের যুদ্ধে, ব্যাধিতে কত শত মরে গেছে; বয়সও সকলের দশ বছর বেড়ে গেছে। পারস্যের বিশাল সাম্রাজ্য রাখতে হলে পারসিকদের সহায়তা ছাড়া তা সম্ভব হবে না। পারসিকদের মন ও মেজাজটা গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি দিয়ে তৈরী করতে পারলেই সেটা সম্ভব হবে। আলেকজেন্দারের বিশ্বাস ছিল গ্রীকরা পারসিকদের মেয়ে বিবাহ করে, পারসিক পোষাক পরে পারসিকদের মতো হয়ে যাবে। ঠিক এইটাই চেয়েছিলেন আকবরশাহ ভারতের বাদশাহ হয়ে। তাঁর সমস্যা অনেকটা এই ধরণেরই।

কিন্তু আলেকজেন্দারের অকাল মৃত্যুতে সমস্ত উলট পালট হয়ে গেল। মরবার সময় তাঁকে নাকি জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি সাম্রাজ্য কা'কে দিয়ে গেলেন; তিনি বলেছিলেন 'বীর শ্রেষ্ঠকে' (to the bravest)। বীরভোগ্য বসুন্ধরা। অর্থাৎ জোর যার মুলুক তার। হলোও তাই। তিন জন প্রধান সেনাপতির মধ্যে হানাহানির ফলে সাম্রাজ্যটা তিন টুকরা হ'য়ে গেল। সেনাপতি সেল্যুকাসের ভাগে পড়ে সিন্ধু থেকে সিরীয়া পর্যন্ত এশিয়ার পশ্চিম অংশ। সেনাপতি প্‌টলেমি পেলেন মিশর। আর মাকিদন ও গ্রীস থাকলো অন্যের হাতে। বারোবৎসরে আলেকজেন্দার এশিয়ায়, আফ্রিকায় ৭০টি নগর পত্তন করেন—কয়েকটি ভারতেও ছিল।

সেল্যুকাস এশিয়াংশের সর্বেসর্বা। তাঁর কথা ও ভারতের সঙ্গে গ্রীকদের সম্বন্ধের কথা আমরা পরে আলোচনা করবো। এখন মিশরে প্‌টলেমি নামে যে-সেনাপতি বড় কর্তা হয়ে বসলেন তাদের কথা বলা যাক্।

মিশরে সেনাপতি প্‌টলেমি (খৃ. পূ. ৩০৫-২৮৩) ও তার বংশধরগণ প্রায় দুইশত বৎসর রাজত্ব করেন—তারপর এই বংশের শেষ রাণী ক্লিওপেট্রার সময় মিশর চলে গেল রোমানদের হাতে (৩০ খৃ. পূ)। খৃষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতক থেকে মিশর এসে পড়লো হেলেনী সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিবৃত্তির মাঝে। পট্‌লেমি সম্রাটদের চেষ্টায় আলেকজান্দ্রিয়া ধনে, মানে, ঐশ্বর্য ইমারতে গ্রীক জগতে সেরা নগর হয়ে উঠে। দলে দলে গ্রীক ও মাকিদানীয়রা আসে—মিশরের বদ্বীপ ও নগরে নগরে উপনিবেশ গড়ে। গ্রীক্ ব্যবসায়ীদের চেষ্টায় আলেকজেন্দ্রিয়া শিল্প ও

বাণিজ্যের সুবৃহৎ কেন্দ্র হয়ে উঠে। গ্রীকরা 'মূল্য' দিয়ে জিনিষ কেনে বেচে; মুদ্রার প্রচলন হলো মিশরে এই প্রথম—এর পূর্বে আদিযুগ থেকে পারসিক শাসনের অবসানকাল পর্যন্ত ব্যবসায়-বাণিজ্যে চলতো বিনিময় প্রথায়। গ্রীক শিল্পীরা জিনিষপত্র তৈয়ারীর নতুন মান প্রতিষ্ঠিত করে। তাদের স্পর্শে মিশরীয়দের শিল্প ও কলার নতুন প্রাণ আসে। জলের খাল, বাঁধ, বন্দর, আলোকস্তম্ভ বা বাতিঘর প্রভৃতি নির্মাণ কার্যে গ্রীকরা যে নৈপুণ্য দেখালো, তা মিশরীয়দের কাছে অজ্ঞাত। কৃষিও গ্রীকদের উপদেশে এমন উন্নত হলো যে, কালে মিশর হলো প্রাচ্যদেশের শস্যের গোলা। গ্রীস থেকে জলপাই (Olive) এর চারা এনে আবাদ হলো। রান্নার জন্য জলপাই এর তেলের চাহিদা সর্বত্র। তাই মৃৎভাণ্ডে ভরে তেল চালান যায় য়ুরোপের বন্দরে বন্দরে। ভাল জাতের ভেড়ার আবাদ হওয়াতে, দামী পশম উৎপন্ন হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে। পাপাইরাস শর থেকে কাগজ তৈরীর শিল্প খুব প্রসার লাভ করে চলেছে; কারণ, পুরাণো পুঁথির চাহিদার জন্য অনুলিখন বা কপি করার ব্যবসায় বেড়ে চলেছে। বহু লোকের জীবিকা হ'লো এই সব শিল্প থেকে।

প্‌টলেমি বংশীয় রাজা ও গ্রীক উপনিবেশিক ব্যবসায়ী ও সম্ভ্রান্তদের টাকাকড়ির একটা মোটা অংশ খরচ হতো গ্রীক সংস্কৃতি প্রচারের খাতে। চিরকালই বিজয়ী জাতির ধুরন্ধররা বিজিতের সংস্কৃতিকে অবহেলা ও অবজ্ঞা এবং নিজেদের সাহিত্য সংস্কৃতি পরাজিতদের পক্ষে অবশ্য গ্রহনীয় করে আসছেন, তাঁরা মনে করেন এতেই সাম্রাজ্য বাদ বা ওদের সার্থকতা।

প্‌টলেমিদের চেষ্টায় আলেকজেন্দ্রিয়াতে বিরাট এক কলামন্দির বা মিউজিয়াম স্থাপিত হয়। গ্রীকদের কলালক্ষ্মী বা মিউজ (Muse) থেকে মিউজিয়াম কথাটা এসেছে। কিম্বদন্তী প্রায় দশ লক্ষ পুঁথি সেখানে সংগৃহীত হয়। পুঁথিগুলি পাপাইরাসে লেখা,—আমাদের দেশের ঠিকুজি-কুষ্ঠির মতো পাকিয়ে রাখা হতো। এই কলামন্দিরে পণ্ডিতরা অধ্যয়ণ, অধ্যপণা করেন। এখানে পুরাণো পুঁথির অনুলেখন হয়। এখানে বক্তৃতা ঘর, ভোজনগৃহ, চিত্রশালা, বাগান, ছায়াবীথি, কৃত্রিম ফোয়ারা, পথের ধারে পাথরের মূর্তি প্রভৃতি কতরকমের কত কী যে ছিল। সমস্ত চিহ্ন আজ লুপ্ত।

কিন্তু এত ঐশ্বর্যের মধ্যে সাধারণ মিশরীয়দের অবস্থাটা—চাঁদের অন্ধকার

পিঠের মতো—দশা শ্রমদাস বা কৃষাণ-মজুরের সমতুল। ব্যবসায়-শিল্প কলা সবইতো গ্রীকদের হাতে। মিশরীয়দের কাজ হলো জল তোলা ও কাঠ ফাড়া বা সোজা ভাষায় আধমরা হয়ে বেঁচে থাকা।

পার-আলেকজেন্দার হেলেনিক যুগে গ্রীকদের সব চেয়ে বড় দান—যা আজকের দিনেও লোকে ভুলতে পারেনি,—সেটা হচ্ছে তাদের বিজ্ঞানের অনুশীলন ও আবিষ্কার। অদৃশ্য মনোজগতের রহস্য সম্বন্ধে চিন্তন ও মনন করতে গিয়ে দর্শনশাস্ত্রের জন্ম হয়। আর চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় মারফত দুনিয়াটার সঙ্গে পরিচয় থেকে বিজ্ঞানের জন্ম।

গণিতের একটা বড় শাখা জ্যামিতি। আলেকজেন্দ্রিয়াতেই প্রথম জ্যামিতি বিজ্ঞানের রীতিমত আলোচনা ও গবেষণা সুরু হয়। ইউক্লিড নামে গাণিতিক পণ্ডিত ১৩ খানা পুঁথিতে (পাপাইরাসের জড়ানো পুঁথি) জ্যামিতি সম্বন্ধে যেসব তত্ত্ব লিখে রেখে গিয়েছিলেন, তা আজ প্রায় দুই হাজার বৎসর ধরে ছাত্ররা পড়ে আসচে। নীলনদের বানে প্রতি বছর দেশ যায় ডুবে; তারপর জল নেমে গেলে কার জমি কোথায় ও কতটা, তাই নিয়ে প্রজাদের মধ্যে বাঁধে বিবাদ। সেইসব মাপ জোকের হিসাব সম্ভব হলো ইউক্লিডের জ্যামিতি বা জমি-মাপা বিজ্ঞান চর্চা থেকে।

গ্রীকরা দর্শন সম্বন্ধে এত তত্ত্ব ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে এত তথ্য রেখে গেছেন যে, এ দুটো বিষয় নিয়েই একটা বই লেখা যায়। আদিযুগে দার্শনিক ও বিজ্ঞানীর মধ্যে ভেদ ছিল কম। আকাশের নক্ষত্রগুলি যে মেডুসা রাক্ষসীর মাথা বা পেগাসাসের ঘোড়া নয়—এ ধারণা পণ্ডিতদের দূর হয়ে গেল—যেদিন তারা বিশ্বজগতের রহস্য সম্বন্ধে কিছুটা ওয়াকিবহাল হলো। আর্কিমিডিস-এর নাম বিজ্ঞান-ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। গ্রহনক্ষত্র, চন্দ্র সূর্য, জল-হাওয়া, গাছপালা, জীব-জন্তু সম্বন্ধে গবেষণা সুরু হয়েছে; দেহতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব, ব্যাধি ও তার কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন, ঔষধের সন্ধান, পরীক্ষা ও প্রয়োগ—সবই চলেছে যুগপত।

গণিতের সাহায্যে পৃথিবীর আকার কিরূপ, তার ব্যাস কত ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রায় নির্ভুল তত্ত্ব তারা জানতে পারে। ইরাটোসথানেস (খৃ. পূ. ৩ শতক) বললেন, পশ্চিম দিকে চলতে আরম্ভ করলে এক সময়ে ভারতে পৌছানো যাবে। কলম্বাস প্রায় আঠারো শত বৎসর পরে এই

পশ্চিম মুখেই যাত্রা করেন ভারত পৌঁছবার আশায়। ইরাটোসথানেসের জন্মস্থান আফ্রিকা; প্‌টলেমি সম্রাট তাঁকে আলেকজেন্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারের ভার দেন।

পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে মূঢ় লোকের যে ধারণা থাকে, গ্রীকদেরও এককালে তাই ছিল। তবে আরিসটার্কাস বলেন যে সূর্য পৃথিবী থেকে অনেকগুণ বড়ো আর পৃথিবী ঘুরছে বলে দিনরাত হয়। আর সূর্যের চারি দিকে চলছে বলে ঋতু পরিবর্তন হয়। বলা বাহুল্য, সে যুগে কেউ তার কথা বিশ্বাসই করেনি! যেমন গ্যালেলিওর কথা মধ্যেযুগে কেউ মানতে চায়নি।

গাছপালা পশুপক্ষী সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন আলেকজেন্দারের গুরু আরিস্তোতল; আলেকজেন্দার দিগবিজয়ের সময় যেখানে যা উদ্ভিদ বা প্রাণী পেতেন তা আথেন্সে পাঠিয়ে দিতেন গুরুর কাছে; আরিস্তোতলই ভাল রকম করে এ সবের শ্রেণী বিভাগ করেছিলেন।

প্রাচীন গ্রীক রাষ্ট্রনগরীর লোকেরা ছিল কূয়োর বেঙের মতো; মনে করতো তাদের নগরই বুঝি সারা দুনিয়া। কিন্তু পার-আলেজেন্দার যুগে নানা দেশের সঙ্গে গ্রীকদের আসা যাওয়া মেলামেশা হচ্ছে,—পারসিক ফিনিক, মিশরীয়, ইহুদী, ভারতীয় ও আরও কত জাতি উপজাতির ধর্মমত, আচার ব্যবহারাদির সঙ্গে এখন তাদের পরিচয়। গ্রীকরা এখন বুঝেছে যে দুনিয়াটা খুব বড় জায়গা, আর সেখানে বিচিত্র লোকের বাস সংসারটা কেবলমাত্র হেলেনী ও বর্বরের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে নেই; হেলেনীদের ছাড়াও মানুষ আছে এবং তাদের থেকেও সুসভ্য মানুষের অভাব নেই। এইসব দেখে শুনে গ্রীকদের মনের ও মতের বদল হয়ে যাচ্ছে। মানুষের চিরকালের প্রশ্ন—জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য; এর সমস্যা চিন্তাশীল লোকদের ভাবিয়ে তোলে। ভাবুকদের মধ্যে কেউ বললেন দুনিয়াটা চলেছে কঠোর নিয়মের নিগড়ে বাঁধা যন্ত্রের মতন; কেউ বা বললেন দেবতাদের ইঙ্গিতে ও ইচ্ছায় সব হচ্ছে। লোকে জানে বজ্র ডাকে ইন্দ্রের বা জিউসের ইচ্ছায়; নূতন যুগের ভাবুকরা বললেন প্রাকৃতিক কারণে শব্দ হয় ইন্দ্র বজ্রের শব্দ করেন না। মানুষের চিরকালের প্রশ্ন জগতে এত দুঃখ কেন—দুঃখ থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে, কি করলে সুখী

হওয়া যাবে। নূতন যুগের মানুষে পুরাতন যুগের মানুষের মতো প্রকৃতির কাজ কর্ম দে'খে—ভয়ে ভক্তিতে আর তার তোয়াজ করে না, পুরাণো বিশ্বাসে সন্দেহ জাগে। শিক্ষিত গ্রীকদের মনে প্রশ্ন ও সন্দেহ জাগিয়ে তোলে তর্কবাগীশ সোফিস্টরা—তাদের মধ্যে সেরা তার্কিক সোক্রোতিস (Prince of Sophists)।

দুনিয়ার যে কয়জন মহাপুরুষকে সকালে উঠে স্মরণ করবার মতো, তাদের মধ্যে সোক্রোতিস একজন। আমাদের দেশের কবীর দাদুর ন্যায় সোক্রোতিস কারুশিল্পী ছিলেন; পাথর কেটে মূর্তি গড়া ছিল জীবিকা। সেই শিল্পীর মনের মধ্যে কোথা থেকে এলো যুক্তির তীক্ষ্ণ অস্ত্র! লোকে বিশ্বাস করে বলেই সব কথা মানতে হবে—এই মূঢ়তার বিরুদ্ধে সোক্রোতিসের জেহাদ। তাঁর টোল বা আখড়া ছিল না। পাঁচ দশ জন লোকের সঙ্গে দেখা হলে, তাদের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিয়ে দেখাতেন যে তারা যা জানে তা ভুল। আথেন্সের বাজারে প্রায়ই তাঁকে দেখা যায়—যুবকরা তাঁকে ঘিরে কথা শুনছে, তর্ক করছে। আথেন্সের সময়টা তখন খুবই মন্দ। সেখানে গণতন্ত্র আছে সত্য, কিন্তু সেটা দাঁড়িয়ে গিয়েছে হাটের শাসন। মূর্খ নীচাশয় লোকে নাগরিকের অধিকার-বলে বিধান সভার সদস্য হয়। তাদের ধারণা সোক্রোতিস আথেন্সের ছেলেগুলোর মাথা খাচ্ছেন, দেব-দেবীর প্রতি বাপ-পিতামহের আমলের বিশ্বাস ও ভক্তির বুনিয়াদ ভেঙে দিচ্ছেন লোকটা সমাজ ও রাষ্ট্রের শত্রু। এই অপরাধে সোক্রোতিসের মৃত্যুদণ্ড হলো।

সোক্রোতিসের শিষ্যদের মধ্যে প্লাতোন ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমান! সোক্রোতিস লেখাপড়া জানতেন কিনা জানা যায় না। তিনি যেসব কথা বলতেন সেগুলো প্লাতোন বোধহয় টুকে রাখতেন। তারপর তিনি অনেক কাল ধরে সেগুলিকে সাহিত্যের মত করে লিপিবদ্ধ করেন; অবশ্য সব কথাই যে সোক্রোতিসের মুখের বাণী তা নয়। প্লাতোন যা বুঝেছিলেন সেইটা বুঝাবার জন্য সোক্রিতিসের সঙ্গে তাঁর শিষ্যদের কথোপকথনের মধ্যে অনেক সব যুক্তি তর্ক এনে ফেলেছেন। প্লাতোন আথেন্সের এক বাগানে (academy) গুরুর কথা ব্যাখ্যান করতেন; বহুলোক আসতো সেসব শোনবার জন্য। প্লাতোনের অনেক কথার মধ্যে

একটা কথা এখনো মনে রাখাবার মতো। তিনি বলেছিলেন বা গুরুর মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন যে, মানুষ যে সামাজিক ও রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ থেকে দুঃখ পায়, তার কারণ মানুষের সাহসের একান্ত অভাব। সাহস করলেই সে মুক্তি পায়। আসলে, ভিতরে যে কতটা শক্তি আছে সে-সম্বন্ধে সে চেতনাহীন। প্লাতোনের বহু কথা মনে রাখার মতো। একটা মাত্র উল্লেখ করেছি Civilisation moves on discussion—অর্থাৎ সভ্য মানুষ যুক্তি-তর্কের উপর নির্ভর করে চলে। প্লাতোনের বইগুলি গ্রীক ভাষায় লেখা; য়ুরোপের সমস্ত ভাষায় তার তর্জমা আছে। বাংলায় কিছু অনুবাদ হয়েছে।

প্লাতোনের আকাদামিতে বহু ছাত্র ছিল; আরিস্তোতল (খ্রী. পূ ৩৮৪-৩২২) তাঁর শিষ্যস্থানীয়।

আজকালকার অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বুনিয়াদ পত্তন করেন আরিস্তোতল; জীবতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব থেকে রাষ্ট্রতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব পর্যন্ত এমন কোনো বিষয় নেই যে-সম্বন্ধে তিনি গ্রন্থ লেখেন নি। বিজ্ঞানের গবেষণা সূত্রপাত তাঁর থেকে। তাঁর ছাত্র মাকিদানপতি আলেকজেন্দার বিদেশে লড়াই করতে গিয়েও গুরুমহাশয়ের জ্ঞানতৃষ্ণার কথা ভোলেন নি; তাই নিয়মিতভাবে নানা রকম গাছপালা, জীবজন্তু পাঠিয়ে দিতেন আথেন্সে।

আরিস্তোতল বাক্য Logos-কে সুচিন্তিতভাবে প্রকাশ করবার পদ্ধতি শেখালেন। বাক্যের মধ্যে কেবল যুক্তি থাকলেই সাহিত্য হয় না, বাক্যের মধ্যে রসও থাকা চাই—তাই এই রসশাস্ত্র সম্বন্ধেও গ্রন্থ লিখেছিলেন। রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থ 'পোলিটিকা' ও তাঁর গুরু প্লাতোনের 'রিপাবলিক' এখন পর্যন্ত সকল দেশের বুদ্ধিমান ছাত্ররা পড়ে থাকেন; এত কালের পুরাণো জিনিষ বলে বাতিল করতে পারেন নি। প্রায় সমসাময়িক বলে ধরা হয় ভারতের কৌটিল্যকে। তাঁর 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থ পুরাতত্ত্বের জিনিষ হয়ে চাপা পড়ে ছিল, ভারতীয়দের জীবনদর্শনের সহায় হতে পারেনি। য়ুরোপে মধ্যযুগে গোঁড়া খ্রীষ্টানরা গ্রীক সাহিত্য পড়তো না, কিন্তু আরিস্তোতলের অনেকগুলি বই তাদের অবশ্য পাঠ্য ছিল। অনেক সময়ে গ্রীক জানতো না বলে লাতিন ভাষায় তর্জমা পড়তো। আরবরা অরিস্তোতলের বই আরবী ভাষায় তর্জমা করেছিল এবং তাদের মধ্যে পণ্ডিতরাও এঁকে গুরুর মতো ভক্তি করতেন।

গ্রীসের সকল ভাবুকই যে একই রকমের চিন্তা করতেন, তা মনে করলে ভুল করা হ'বে। প্লাতোনের সমসাময়িক—সোক্রোতিসের আর এক শিষ্য ছিলেন আন্তিসথেনিস (Antisthenes ৪৪৪ ?—৩৭১ খ্রী. পূ.); আথেন্সে এঁর টোলে যেসব লোক আসে তাদের নাম হয় সিনিক্ (Cynic)। এঁর প্রধান চেলা দিওজেনিস—ছেঁড়া কাঁথা জড়িয়ে একটা মাঠির গামলার মধ্যে বসে থাকেন—কৃচ্ছ্রসাধন তাঁর ধর্ম। সোক্রোতিসের মতই বলেন, 'নিজেকে জানো' কিন্তু তার সঙ্গে যোগ করবেন, 'প্রকৃতির অনুকূলে বাস করো।' 'প্রকৃতির অনুকূলে' বাস করার তো কত রকম অর্থ হতে পারে।

জেনো (Zeno) নামে ভাবুক আথেন্সে এলেন কাইপ্রাস থেকে। তিনি বললেন সুখে-দুঃখে সমান থাকো, লাভ-ক্ষতিতে না হবে উল্লসিত, না হবে দুঃখিত; ভাল মন্দ যাই আসুক—'সত্যেরে লহ সহজে'। এদের বলে স্টোইক।

তত্ত্বদর্শী এপিক্যুর সম্বন্ধে লোকের খুবই ভুল ধারনা। অসংযত, অতি বিলাসী কাউকে দেখলে লোকে বলে 'এপিক্যুরেন। এপিক্যুর বলেছিলেন বটে যে মানুষ সুখ চায়; কিন্তু দেহের সুখ নয়, মনের সুখ বা আনন্দই মানুষের কাম্য। তিনি বলতেন, "মনের কষ্ট হয়, চিন্তা উদ্বেগ হয়—এমন কিছু করে কোনো লাভ নেই। সুখ তো মনের, তাকে উদ্‌ব্যস্ত করো না।"

গ্রীকদের মধ্যে যত ভাবুক জন্মেছিলেন, সবার কথা বলা সম্ভব নয়! ভারতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের সময় যেমন বহু মত চলিত ছিল আমাদের দেশে—গ্রীসে অবস্থাটাও খানিকটা সেই রকমের। আর ভারত ও গ্রীসের সময়টাও প্রায় একই।

মানুষের মনের মধ্যে পুরাণো ধর্মতত্ত্ব অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যেমন বিপ্লব দেখা দিয়েছে, ঠিক তেমনটি ঘটছে তার বাহিরের জীবনেও। গ্রীকরা পারসিক সাম্রাজ্য জয় ও অধিকার করেছে; বহু শতাব্দীর সোনা রূপা মণি-মাণিক্য যা এশিয়ার ও মিশরের রাজপ্রাসাদে ও নগরে ধনীদের অন্ধকার কুঠরির মধ্যে পোঁতা ছিল—তা প্রায় নিঃশেষে লুণ্ঠিত হয়ে হেলেনীয়দের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমেরিকা আবিষ্কার হবার পর স্পেনীশরা যেমন ইন্‌কাদের ধনরত্ন লুঠ করে ধনী হয়েছিল,—ভারত দখল করে ইংরেজ

ঈস্ট ইনডিয়া কোম্পানির ভৃত্যরা যেমন লক্ষ লক্ষ টাকা লুট করে ইংলনডকে ধনী করেছিল—পারস্য রাজ্য জয়ের পর গ্রীকদেরও সেই দশা হয়।

খাস গ্রীস থেকে হেলেনিক জগতের অন্যত্র যেসব নগর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার মধ্যে আন্তিয়োক, পেরাগামাম, রোডস দ্বীপের নগরগুলি ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যে প্রাচীন নগরীদের ম্লান করে দিয়েছে। বাসের গৃহ হয়েছে সৌধ, অট্টালিকা হয়েছে প্রাসাদ তুল্য বিলাসব্যসনের কেন্দ্র। ঘর মহা-মূল্য আসবাবে পূর্ণ, পারসিকদের অনুকরণে। ভোজের সভা এখন শেষ হয় মদের তাণ্ডবে। গৃহস্থ ঘরে অগণিত দাস দাসী—হুকুম তামিল করবার জন্য সদাই হাজির।

ধনীর বিলাস সামগ্রী সরবরাহ করে ব্যবসায়ীরা,—দেশ বিদেশ থেকে আনে নানা রকমের জিনিষপত্র। এই সব ব্যবসার মধ্যে সব থেকে বড় ব্যবসা ছিল দাসদের নিয়ে বিকিকিনি। ঈজান সাগরের গ্রীকদের তীর্থক্ষেত্র ডেলস্‌দ্বীপ এখন হয়েছে ক্রীতদাসের হাট। দাস-ব্যবসায়ীরা গর্ব করে বলতো সে দরকার হলে একদিনে তারা দশ হাজার দাসদাসী সরবরাহ করতে পারে। দেশে দেশে দাস সংগ্রহের আড়কাটি ছিল নিশ্চয়ই।

সাধারণ শ্রমিক ও কৃষকদের দুর্দশার শেষ নেই; সব কাজইতো করছে ক্রীতদাসে—অন্যেরা কোথায় পাবে কাজ। টাকা জমে উঠছে মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ীর হাতে। ফলে অনিবার্য শ্রেণী সংগ্রাম দেখা দিয়েছে সমাজ জীবনে, এখন আর লোকে পুরাণো ধর্ম উপদেশ ও নীতি কথার বুকনি বা ছেঁদো, কথা কানে তোলেনা; তারা অবিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাহীন। কোনো কোনো ভাবুক ইউটোপিয়া বা রামরাজ্যের কল্পণা করেন; প্লাতোনের 'রিপাবলিক গ্রন্থ সেই রামরাজ্যের স্বপ্ন।

গ্রীক সভ্যতা—সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালি থেকে পূব দিকে সিন্ধু পঞ্চ-নদ তীর পর্যন্ত ব্যাপ্ত। গ্রীক্‌রা একছত্র রাজ্যতলে কখনো থাকেনি। ছোট ছোট অসংখ্য স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠে গ্রীক্‌-জগতে। কিন্তু সর্বত্র গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি বেশ ভাল করে শিকড় গাড়ে। গ্রীক্ ভাস্কর, স্থপতি, চিকিৎসক, জ্যোতিষী, নট নটী, নারী দেহরক্ষী বা যবনী ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিম এশিয়ায় ও উত্তর ভারতে। ভদ্রলোক মাত্রেই শেখে গ্রীক ভাষা; কালে পশ্চিম এশিয়া, মিশর, ইসরেইল প্রভৃতি দেশে গ্রীকই হয়ে দাঁড়াল প্রধান শিক্ষণীয়

ভাষা আমাদের দেশে ইংরেজির মতো—সংস্কৃতির বাহক, আভিজাত্যের স্মারক।

কয়েক পৃষ্ঠা আগে আমরা বলেছিলাম আলেকজেন্দারের মৃত্যুর পর তাঁর সেনাপতিরা তাঁর সাম্রাজ্য ভাগাগাগি করে নেয়—অবশ্য অনেক লড়াইয়ের পর। পশ্চিম এশিয়া পড়ে সেল্যুকাসের ভাগে। এবার সেখানেও দেখা দিল বিপ্লব। ইরান দেশে পারদ বা পার্থিয়ান নামে এক জাতি গ্রীকদের দেশ ছাড়া করলো। ভারতের পশ্চিম থেকে গ্রীকদের তাড়ালো মৌর্য বংশের চন্দ্রগুপ্ত। অল্পকাল পরে মিশরে ও পশ্চিম এশিয়ায় রোমানরা প্রবেশ ক'রে সেসব দেশ দখল করে বসে। খাস গ্রীসও রোমানদের অধিকারে এসে গেল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের মধ্যেই গ্রীকদের রাজনৈতিক ক্ষমতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যা থাকলো চিরকালের মতো অমর হয়ে তা তাদের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান আর শিল্পকলার আশ্চর্য নিদর্শনগুলি। গ্রীক ভাষা পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় চালু ছিল—৭ম শতকে আরবে ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত। রোমানরা প্রায় ছয়শ' বৎসর এ-অঞ্চলে প্রভুত্ব করেও তাদের লাতিন ভাষা চালু করতে পারেনি। কিন্তু ৭ম শতকে ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রীক ভাষা অচল হলো আর প্রবল হলো আরবী ভাষা। গ্রীক ভাষা সীমিত হলো বলকান উপদ্বীপ ও কাছাকাছি দ্বীপের মধ্যে। এশিয়া মাইনরের পশ্চিমে যে গ্রীক ভাষীরা ছিল, তারাও প্রথম মহাযুদ্ধের পর তুর্কদের উৎপীড়নে দেশ ছেড়ে গ্রীসের মধ্যে গিয়ে উঠেছে। গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি কতকগুলি দ্বীপ ছাড়া আর দেশের বাইরে গ্রীসেও কোথাও নেই।

পূর্বভারত

পূর্বভারতে গঙ্গারাঢ়ের রাজাদের পরাক্রমের কথা গুপ্তচরদের মুখে শুনে আলেকজেন্দার আর সেদিকে এগুতে সাহস করেন নি—সে কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। এই পূর্বভারতে পাটলিপুত্র নামে মহানগরীতে তখন নন্দ বংশের রাজারা একছত্র অধিপতি। ভারতে এখন আর 'ক্ষত্রিয়' রাজারা শাসক নন, সর্বত্রই 'নূতন' লোকে রাজা হচ্ছে। ব্রাহ্মণরা কুলপঞ্জী তৈরী করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন—এই নূতন রাজারা ক্ষত্রিয়—সূর্য বংশ, চন্দ্র বংশের সঙ্গে তাঁদের যোগ। জনশ্রুতি নন্দরাজার এক দাসীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন চন্দ্রগুপ্ত। দাসীপুত্রের কোনো স্থান নেই রাজবাড়িতে। তাই একদিন ভাগ্য অন্বেষণের জন্য চন্দ্রগুপ্ত বেরিয়ে পড়েন পাটলিপুত্র থেকে। ঘুরতে ঘুরতে উত্তরপশ্চিম ভারতে আলেকজেন্দারের শিবিরে হাজির হন বলে গল্প আছে—হয়তো গ্রীক রণনীতি শেখবার জন্য অথবা সাহায্য নিয়ে নন্দদের উচ্ছেদ করবার মতলবে। কিন্তু আলেকজেন্দার তাঁকে পছন্দ করেনি মনে হয়। তারপর কোনো এক সময়ে চাণক্য * (কৌটিল্য) নামে এক অতি চতুর ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এই চাণক্যর রাগ ছিল শূদ্র নন্দবংশের উপর! তাঁকে নাকি এক সময়ে রাজা অপমান করেছিলেন। প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি ঘুরছেন, এমন সময়ে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো—এ যেন মণিকাঞ্চন যোগ। চাণক্যের কূট পরামর্শে নন্দবংশের পতন, চন্দ্রগুপ্তের মগধের সিংহাসন প্রাপ্তি ঘটলো।

ইতিহাসে এদের মৌর্য কেন বলে তা নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে; কেউ বলেন দাসী মুরার গর্ভজাত বলে, মায়ের নামে তাঁদের বংশ-পরিচয় হয়! আবার একদল বলছেন তাঁর চন্দ্রগুপ্তের হীনজন্ম নয়—হিমালয়ের পাদদেশে পিপ্পলীবনে মোরিয় নামে ক্ষত্রিয়কুলে তাঁর উদ্ভব হয়েছিল বলে মৌর্য নামে খ্যাত। এসব হচ্ছে অতি পাণ্ডিত্যের গবেষণা।

* কৌটিল্যের অর্থনীতি বাংলাতে অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক অনুবাদ করছেন জেনারেল প্রিণ্টার্স থেকে প্রকাশিত।

মগধের গদি পাবার পর সমস্ত উত্তরভারত চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যভুক্ত হয়; এবং তারপর পঞ্জাবও গ্রীকদের কাছ থেকে তিনি উদ্ধার করেন। গ্রীকরা ভারতে যে খুব বেশি সৈন্য রেখে গিয়েছিল তা মনে হয় না, দেশী রাজারা গ্রীকদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু বাবিলনে আলেকজেন্দারের মৃত্যুর পর গ্রীক সেনাপতিরা যখন নিজেদের মধ্যে লড়াই নিয়ে মত্ত, সেই সুযোগ বোধহয় পঞ্জাবে মগধের শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রথম পূবভারতের রাজশক্তি উজান ঠেলে এসে উত্তরভারতে প্রভুত্ব স্থাপন করলো।

আলেকজেন্দারের মৃত্যুর পরে সেনাপতি সেলুকাস রাজা হয়ে ভাবছেন পূর্ব সাম্রাজ্যের অশান্তি ও অরাজকতা সামলে নিয়ে আলেকজেন্দারের মতন তিনি আবার ভারত জয় করবেন। এবার কিন্তু আর সুবিধা হলো না। বোধ হয় গ্রীকদের যুদ্ধ করার ধাঁজটা মৌর্যরা আয়ত্ত করে নিয়েছিল; তাই চন্দ্রগুপ্তের কাছে সেল্যুকাসকে হার মানতে হলো। যুদ্ধের শেষে সন্ধির সর্তানুসারে তিনি ৫০০ হাতী পেলেন চন্দ্রগুপ্তের কাছ থেকে; হাতীর বদলে চন্দ্রগুপ্ত পেলেন কাবুল, গান্ধার, হিরাট প্রভৃতি দেশাংশ। যুদ্ধে হাতী ছিল সে যুগের ট্যাংক। এগুলি পেয়ে নিশ্চয়ই সেল্যুকাস পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধে কাজে লাগিয়েছিলেন; কারণ 'হাতী যুদ্ধ করে' এখবর তাদের কাছ তখনো অজানা। আরও জানা যায় যে উভয়ে রাজার মধ্যে একটা 'বিবাহ সম্বন্ধ' স্থাপিত হয়, ঐতিহাসিক এই কথাটুকু নিয়ে সেল্যুকাসের কন্যাকে চন্দ্রগুপ্ত বিবাহ করেছিলেন বলে একটা গল্প সৃষ্টি করা হয়েছে।

যাই হোক; সন্ধির সর্তানুসারে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থেনিস নামে এক রাজদূত এলেন; ভারত থেকে রাজদূত বাবিলনে বা আন্তিয়োকে গিয়েছিল কিনা জানা যায় না। মেগাস্থেনিসের কথাই কি জানা যেতো যদি য়ুরোপীয় পণ্ডিতরা সে-বিষয়ে গবেষণা না করতেন। মেগাস্থেনিস ভারত সম্বন্ধে যে একখানা বই লিখেছিলেন সেটা বহুকাল লুপ্ত হয়ে গেছে। তবে পুঁথিখানা হারিয়ে যাবার পূর্বে গ্রীক ভৌগোলিকরা তাঁদের গ্রন্থে মেগাস্থেনিসের 'ইন্ডিকা' থেকে যেসব অংশ উদ্ধৃত করেছিলেন, সেগুলি জারমান পণ্ডিত শোয়েনবেক প্রায় একশ বছর আগে সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। তখন থেকে মেগাস্থনিসের কথা আমরা জানলাম। এই গ্রীক দূতের পূর্বে

হেরোদোতস ও আরও কয়েক জন গ্রীক ঐতিহাসিক ভারত সম্বন্ধে শোনা কথা সংগ্রহ করে কিছু কিছু লিখে ছিলেন, কিন্তু মেগাস্থেনিস * প্রতক্ষ্যদর্শী বলে তাঁর কথাই প্রামাণ্য হয়েছে।

চন্দ্রগুপ্তের সম্বন্ধে যা কিছু খবরাখবর পাওয়া যায়, তা গ্রীকদের বই থেকে; তাঁর নাম গ্রীকে হয়েছে Xandrogottos। চন্দ্রগুপ্তের সহায় ও মন্ত্রী চাণক্য কৌটিল্যর লেখা বলে একখানা সংস্কৃত গ্রন্থ বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় দক্ষিণ ভারতের এক পুঁথিশালায় হঠাৎ পাওয়া গিয়েছিল। 'অর্থ-শাস্ত্র' নাম দিয়ে তা ছাপা হয়েছে—তর্জমা হয়েছে অনেক ভাষায়, বাংলাতেও অনুবাদ পাওয়া যায়। অনেক পণ্ডিত এই পুঁথি ও মেগাস্থেনিসের ভ্রমণ বৃত্তান্ত মিলিয়ে মৌর্যযুগের শাসন-ব্যবস্থার আদর্শ কি ছিল, সে সম্বন্ধে বই লিখেছেন। অর্থশাস্ত্র যে চন্দ্রগুপ্তের সময়েই লেখা—সে-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার যখন সম্রাট, সিরিয়ার গ্রীক্ সম্রাট তাঁর দরবারে দিওমখোস নামে একজন গ্রীক রাজ-দূত পাঠান; মিশরের প্‌টলেমি সম্রাটও এক দূত পাঠিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। তাদের কোনো লেখা এখনও কারো হস্তগত হয়নি।

চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে অনেক পারসিক স্থপতি, ভাস্কর, শিল্পী এদেশে এসেছিল। পারস্যে হ্‌খামনীয় শাহনশাহদের সাম্রাজ্য লোপ পেলে সে দেশ থেকে শিল্পীরা আসে দলে দলে নূতন রাজাদের আহ্বানে। শিল্পকলায় রুচি ও রীতির বদল হতে থাকলে নিজের দেশেই বেকার হলো পারসিক শিল্পীরা। পূবভারতে মৌর্য্য সম্রাটদের যশের কথা শুনে এদেশে আসে তারা কাজের ধান্ধায়। নূতন সম্রাট ও নূতন ধনীর দল নিশ্চয়ই এদের আশ্রয় দিয়েছিল। সেই শিল্পীদের পরিকল্পনা মতো চন্দ্রগুপ্তের নূতন প্রাসাদ নির্মিত হয়। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোকের সময়ে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিলা-লেখের কাজে পারসিক শিল্পীদের হাত স্পষ্ট।

অশোক সম্রাট হয়ে অনেক দেশে জয় করেন; তারপর কলিঙ্গ বা বর্তমান ওড়িষ্যা জয় করবার সময় হাজার হাজার মানুষকে যুদ্ধে মরতে

*তু মেগাস্থেনিস, ফা-হিয়েন ও হুয়েনৎসাং, মার্কোপোলো, ট্রাভার্নিয়ের ও বার্নিয়ের, ফাদার ডুবোয়া—এঁরা ভারতের কথা বিদেশে প্রচার করেন। রজনীকান্ত গুহ মেগাস্থেনিসের 'ভারত বিবরণ নামে গ্রন্থ বাংলায় মূল গ্রীক থেকে অনুবাদ করেছিলেন।

দেখে তাঁর মনের পরিবর্তন হয়। তিনি বুদ্ধের ধর্ম গ্রহন করে তথাগতের বাণী দেশবিদেশে প্রচারের ব্যবস্থা করলেন। বুদ্ধের তত্ত্বকথার মধ্যে তিনি যান নি, যা সকল মানুষের কর্তব্য বা ধর্ম, যা ভদ্র, যা শুভ, যা মঙ্গল কর্ম, অর্থাৎ যা সদ্‌ধর্ম তাই করবার জন্ম লোকদের উপদেশ দিলেন। অশোকের প্রচার ব্যবস্থায় নূতনত্ব ছিল। ভারতের নানা জায়গায় বড় বড় সড়কের কাছে পাহাড়ের গায়ে, অথবা লাট বা স্তম্ভে তাঁর উপদেশ খোদাই করালেন। পাহাড়ের গায়ে খোদাই করে লেখার পদ্ধতি ভারতে তখন পর্যন্ত অজানা। অশোকের শিলালেখ দেখলেই বুঝা যায় যে খোদাইকারী ছিল আনাড়ী; তারা যে-লিপি পাথরে খুদেছে তা জানে না। লিপি-গুলি পরিচ্ছন্নভাবে খোদাই হয়নি। আসলে, এভাবে আত্মকথা পাথরে খোদাই করার রীতি এদেশে নূতন। পারসিক শাহনশাহ দরায়ুস যেভাবে তাঁর কাহিনী বেহিস্তানের পাহাড়ের গায়ে লিখিয়েছিলেন, অশোকের শিলা-লেখগুলি সেই ধরনেরই জিনিষ।

পারসিক প্রভাবের খুব বড়ো প্রমান রয়েছে কাশী সারনাথের স্তম্ভ। স্তম্ভের উপর যে চার-সিংহের মূর্তি খোদাই আছে—তা পারসিক শিল্পীদের হাতের বলেই মনে হয়। অবশ্য পারসিকরা শিখেছিল অসুরীয় ভাস্করদের কাছে—সিংহ-খোদাই কাজে অসুরীয় শিল্পীরা ছিল প্রাচীন জগতে তুলনা-হীন ওস্তাদ। আশোকের সারনাথের সিংহ এখন ভারতের সরকারী মুদ্রা বা সীল্‌ হয়েছে; সিংহেরা আছেন ধর্মচক্রের উপর দাঁড়িয়ে। আসলে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এক সাহেব স্তম্ভের ভাঙা টুকরা গুলি সাজাবার সময় ভুল করে ধর্মচক্রের উপর সিংহ খাড়া করলেন; বোধহয় ব্রিটিশ-সিংহ উপরেই থাকবে ভেবেছিলেন। আসলে হিংসার প্রতীক সিংহের উপরই ধর্মচক্রটা ছিল।

অশোক বললেন পৃথিবীর সব থেকে বড় জয় যুদ্ধে হয় না—ধর্ম-বিজয়ই আসল জয়। লোকদের ধর্ম-শিক্ষা দেবার জন্ম ধর্মমহামাত্র নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত হয়, তাঁদের কাজ শিলালেখের নীতি কথাগুলি প্রচার করা, লোকের নৈতিক জীবন দেখা শোনা।

এছাড়া ভারতের নানা স্থানে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী পাঠালেন বুদ্ধের বাণী প্রচারের জন্ম। দক্ষিণ ভারতের চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র ও কেরলপুত্র

প্রভৃতি রাজ্যে। সমুদ্রপারে সিংহলের রাজা তিস্স-এর দরবারে ভিক্ষুরা গেলেন। দুইজন প্রচারক সুবর্ণভূমি বা বর্তমান দক্ষিণ বর্মায় গিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। সিংহল আজ ভারত থেকে সকল রকমেই পৃথক; কিন্তু সেখানকার লোকে বুদ্ধের ধর্ম পেয়েছিল এই পূবভারত থেকেই। কিছুকাল পূর্বে রাজকুমার বিজয় সিংহ বাংলা দেশ থেকে লঙ্কায় গিয়েছিলেন বলে সেই দ্বীপের নাম হয় 'সিংহল'। সিংহলের ভাষা উত্তর ভারতের সংস্কৃত ঘেঁষা—বাংলা ও গুজরাতির সঙ্গে মিল বেশী—দক্ষিণী দ্রাবিড় ভাষাবর্গের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই; তবে লিপিটা দক্ষিণী ছাঁদের।

ভারতের কাছাকাছি দেশ, দ্বীপ ছাড়িয়ে ভিক্ষুরা চললেন দূর দুরান্তের দেশে। পশ্চিমএশিয়ার আন্তিয়োকস থিওসের সিরিয়া রাজ্যে, পটলেমি ফিলাডেলফাসের মিশর রাজ্যে, মাকিদনের রাজা আন্তিগোনসের দেশে, এপিরাসের আলেকজেন্দার ও উত্তর আফ্রিকার সাইরিনের (Cyrene) মাগস রাজার দরবারে ভিক্ষুদের পাঠালেন অশোক। এইসব দেশের সঙ্গে ভারতের বণিকদের যাওয়া-আসা ছিল, পথ-ঘাট দুর্গম হ'লেও অজানা ছিলনা; তা না হ'লে নিরস্ত্র ভিক্ষুদের কোন সাহসে তিনি পাঠাবেন।

অশোকের ভিক্ষুরা পশ্চিমএশিয়ায় বুদ্ধের ধর্ম প্রচার করে কোনো স্থায়ী সংঘ গড়তে পারেন নি। তবে মনে হয় কয়েকটি ক্ষুদ্র স্থানে তাঁদের প্রভাব থেকে যায়—যেমন 'এ-সেনী' ও 'মনি' সম্প্রদায়ের মধ্যে। মহামুনি মনির ধর্মে বুদ্ধ, জরদুষ্ট্র, খ্রীষ্টের নাম উল্লেখ করা আছে। কেউ কেউ বলেন গ্রীক্ স্টোইকদের দর্শনতত্ত্বের মধ্যে বুদ্ধের কথার আভাস পাওয়া যায়। খৃষ্টানদের মধ্যে মঠে (Monastery) সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীদের বাসের ব্যবস্থা বৌদ্ধ বিহার কল্পনারই প্রতিধ্বনি—এরকম মতওপোষণ করতে দেখা যায়।

প্রিয়দর্শী অশোক সম্বন্ধে বলা যেত পারে, তিনি কাঠের ভারতকে পাথরে গড়ে দিয়েছিলেন। রাজধানী পাটলিপুত্রের চারপাশে কাঠের খোঁটা ছিল প্রাচীরের মতো, রাজপ্রাসাদ কাঠের তৈরী ছিল বলে মনে হয়। সেই পাটলিপুত্রকে শুধু পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা হলো না, বুদ্ধের জীবনের সঙ্গে যে যে স্থান জড়িত, সেসব স্থানে পাথরের লাট ও স্তূপ তিনি তৈয়ারী করে দিলেন।

অশোকের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য শুধু ভেঙে গেলনা, তাঁর সদ্ধর্মও রাজসরকারের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হলো। কারণ ব্রাহ্মণদের শক্তি ও

শাঠ্য সাময়িকভাবে রাজপ্রতাপে নির্জীব হয়ে ছিল মাত্র; ব্রাহ্মণরা ধর্ম ব্যবসায়ে তাদের একচেটিয়াত্ব বন্ধ হবার ভয়ে একেবারে মরিয়া হয়ে ওঠে। পাটলিপুত্রে আবার ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জয় হলো। পশুহত্যা করে যাগযজ্ঞ আবার সুরু হলো অশোকের রাজপ্রাসাদের মধ্যে। প্রাচীন মিশরে ইখনাতোনের পর যা ঘটেছিল তার পুনরাবৃত্তি হলো।

আমরা লিখি ফাউন্টেন পেন্ বা নিবদেওয়া কলমে কাগজের উপর। কিন্তু আড়াই হাজার বৎসর আগে অশোকের সময় লোকে কোন্ হরূপে কি দিয়ে, কিসের উপর তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতো? আমরা দেখলাম অশোকের সময় সবপ্রথম পাহাড়ের গায়ে বা পাথরের উপর ছেনি দিয়ে কেটে কেটে হরপ লেখা হয়। এ লিপি কোথা থেকে এলো—এ-প্রশ্ন স্বভাবতই মনে ওঠে। আজকাল ভারতে তিনটি লিপি বর্গ—১ম সংস্কৃত বা দেবনাগরী ও উত্তর ভারতের হিন্দী, গুরুমুখী, নেওয়ার গুজরাটি, বাংলা, অসমিয়া, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষার লিপিমালা; ২য়—দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়ী লিপি বা তেলেগু, তামিল, মালয়ালম, কান্নাড়ী ও সিংহলী; এবং ৩য়—আরবী লিপি, যার থেকে পারসি, উর্দু, সিন্ধী, কাশ্মীরী লিপি হয়েছে। এছাড়া অবশ্য ইংরেজী বা রোমান লিপি এসেছে। অশোকের সময় দুই ধরনের লিপি ব্যবহারের কথা আমরা জানি। উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে (পশ্চিম পাকিস্তানে) ছিল খরোষ্ঠী লিপি—ডান দিক থেকে বাম দিকে সে-লিপির লেখপদ্ধতি। আর সর্বত্র ব্রাহ্মীলিপি বাম থেকে ডানে সে লেখার রীতি। ভারতের অধিকাংশ লিপির জনক এই ব্রাহ্মীলিপি। এই লিপিমালার উদ্ভব কোথায়—ভারতে না ভারতের বাহিরে, এবিষয়ে পণ্ডিতদের নানা মত। সে সমস্যার মীমাংসার ভার লিপিতাত্ত্বিকদের উপর ছেড়ে দেওয়া যাক; তার মধ্যে প্রবেশের প্রয়োজন আমাদের নেই। তবে এই লিপি থেকেই দক্ষিণ ভারতের লিপির জন্ম হয়, এই লিপিই তারপরে সিংহল, বর্মা, সিয়াম, কম্বোজ প্রভৃতি দেশে বদলাতে বদলাতে চালু হয়—এ তত্ত্বটা জেনে রাখা দরকার।

আবার উত্তরের ব্রাহ্মীলিপি থেকে গুপ্তযুগের নাগরী লিপির উদ্ভব হয়ে মধ্য এশিয়াতে এই লিপি চালু হয় এককালে। তারপর ৭ম শতকে এই গুপ্ত লিপির অদল বদল করে তিব্বতীরা তাদের নূতন লিপি তৈরী

করে নেয়। ভারতের লিপি একদিন বহুদূর দূরান্তে চালু হয়েছিল যেমন মধ্যযুগে হয় আরবী লিপি, বর্ত্তমানে ইংরেজি বা রোমান এবং রুশীয় বা সিরিল লিপি চালু হয়েছে। লেখনী ও লেখ্য পদার্থের ভেদে হরপের আকৃতির বদল হয়। এর ফলে দক্ষিণী-ব্রাহ্মীর যে রূপ হয়েছে, তাকে আর চেনা যায় না—মিশরীয় চিত্রলেখা, হাইরেটিক বা প্রতীকাভাস ফিনিক লিপি, গ্রীক লিপি, ইংরেজী বা রোমান হরপ্ও ঠিক এই একই নিয়মে নানা রূপ নিয়েছে। দক্ষিণ ভারত, বর্মা, সিয়াম, কম্বোজের লিপি যে ব্রাহ্মী থেকে উদ্ভূত তা হঠাৎ বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু সবার জননী ব্রাহ্মী লিপি।

পারস্যদেশ

ভারতের উত্তরপশ্চিম থেকে গ্রীকরা বিতাড়িত হবার প্রায় সমসময়ে পারস্য থেকেও গ্রীকদের সরতে হয়েছিল। অট্টালিকার এক কোণে ভাঙন ধরলে সমস্ত ইমারত ধসে পড়তে সময় লাগেনা। আমাদের যুগে অস্ট্রিয়া, তুর্কী, জাপানের সাম্রাজ্য কী তাড়াতাড়িই লোপ পেলো! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও গিয়েছে—'কমনওএলথ' নাম দিয়ে কোনো রকমে একটা অবাস্তবতাকে খাড়া করা আছে। গ্রীক সাম্রাজ্যের সেই দশা!

পারস্যের উত্তর থেকে যারা গ্রীকদের তাড়ালো—তারাও মৌর্যদের মতো অকুলীন বেগানা জাত। এরা পারদ বা পার্থিয়ান, মধ্যএশিয়ার বাসিন্দা—দরায়ুসের শিলালেখে এদের নাম খোদাই পাওয়া যায় বটে, তবে এমন কোনো বৈশিষ্ট্যের আভাস পাই না তখন। পারদরা মধ্য-এশিয়া থেকে সভ্য ইরান দেশের মধ্যে কখন ও কিভাবে প্রবেশ করেছিল, তার ইতিহাস স্পষ্ট নয়। আরসাকি (Arsakes) নামে এক ব্যক্তি চন্দ্রগুপ্তের ন্যায়ই জনমত জাগিয়ে ইরানে স্বাধীন রাজ্য পত্তন করেন। পারদরা যোদ্ধা জাত। ঘোড়ায় চড়ে লড়তে—এমন দক্ষ জুড়িদার কেউ ছিলনা। অশ্বের উপর বসে, চলতে-চলতে অব্যর্থ সন্ধানে তীর ছুড়তে তারা পারতো। যাই হোক, আরসাকির ভাই ত্রিদত্ত (Tiridates) মধ্য-এশিয়ার বক্ত্রিয়া বা বাহ্লিকের গ্রীক সর্দারকে দলে টেনে সেল্যুকাস বংশীয় রাজাদের পারস্য ছাড়া করলো। [২৪৭ খ্রী, পূ,]। সেল্যুকাসী বংশের আন্তিয়োকস রাজা য়ুফ্রাতিস তাইগ্রীসের সমতল দোয়াব থেকে রাজধানী সরিয়ে সিরীয়ায় গিয়ে নূতন নগর পত্তন করলেন অরন্তোস (Orantes) নদীর ধারে। সেই নগর কালে আন্তিওক (Antioch) নামে খ্যাত হয়। তার স্থাপত্য সৌন্দর্য, তার শিক্ষা ব্যবস্থা পশ্চিম এশিয়ায় সুপরিচিত ছিল; এ সবই গ্রীক বা হেলেনিক সংস্কৃতির প্রকাশ। আজ সে নগর সিরীয়ার অন্তর্গত—আরব-ইসলাম সংস্কৃতির নগণ্য স্থান (Antakaya)।

পারদ রাজাদের নাম ছিল 'দত্ত' দিয়ে—মিত্রদত্ত, ত্রিদত্ত ইত্যাদি।

এরা জরদউষ্ট্রের ধর্ম মেনে চলতো না। অহুর-মজদা এদের প্রধান দেবতা ছিলেন না, দেবতা ছিলেন মিত্র বা মিথ্র, অর্থাৎ সূর্য। আর্যদের যেসব শাখা ইরান ও মধ্যএশিয়ায় থেকে যায়—তাদের একদল মহাদেবতার নামকরণ করে অহুর-মজদা, আর একদল নাম দেয় মিত্র। মিত্র বৈদিক দেবতা; বেদে কিন্তু মিত্র ও বরুণ সর্বদাই যুগ্মনামে উল্লিখিত; পৃথক ভাবে একবার মাত্র 'মিত্র' দেবতার নাম পাওয়া যায়। পারদরা এই মিত্রের বা সূর্যের উপাসক, সূর্যের উপাসনা এরা চালু করে। আর্যদের যে এক শাখা মেসোপটেমিয়ায় 'মিত্তানি' নামে এককালে খ্যাত ছিল, তারা মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, নাসত্য (অশ্বিনীদ্বয়)-এর উপাসনা করতো। জরদউষ্ট্র ইরানের ধর্ম সংস্কার করবার সময় মিত্র-এর নাম দেবতাদের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেন। তার কারণ, বোধহয় 'মিত্রধর্ম' বাবিলনীয়দের ধর্মের সঙ্গে মিশে জীববলি ও বিশেষভাবে বৃষবলি প্রবর্তন করে। জরদউষ্ট্র ধর্মের মধ্যে জীববলির স্থান একেবারে রাখেন নি। কিন্তু জরদউষ্ট্র বাদ দিলে কি হয়? পরবর্তী সময়ে 'মগ' পুরোহিতরা পারস্য ধর্মের মধ্যে 'মিত্র'কে আবার ঢুকিয়ে নিয়েছিলন। ভারতে বৈদিক ধর্মের দেবতারা একের পর একে যজ্ঞের আহুতি না পেয়ে সরে গেছেন—এলো নতুন নতুন লৌকিক দেবতা—অনেকেরই জন্ম অন্-আর্যকুলে; তেমনি হয়েছিল পারসিক ধর্মেও।

নিষ্ঠুর, যুদ্ধপ্রিয় জাতির মধ্যে মিথ্রধর্মের আদর হলো বেশি। হেলেনিক ভাস্বররা পারদদের ফরমাইসে মূর্তি খোদাই করে দিল; যেমন তারা করছিল উত্তরপশ্চিম ভারতে ও গান্ধারে—বুদ্ধের মূর্তি গড়ে। বুদ্ধের মূর্তি গ্রীকরাই প্রথম খোদাই করে ভক্তদের ফরমাইসে; তারপর পাইকারি দরে তৈয়ারীর কারখানা বসে গেল—ভক্তদের চাহিদা দেখে। রোমানরা পশ্চিম এশিয়া জয় করে; সেখানে তারা 'মিথ্র' দেবতার তামসিক পূজা উৎসব দেখে তো মুগ্ধ। নিজেদের দেশে নিয়ে গেল এই দেবতার পূজা। কালে রোমান সাম্রাজ্যের নানা জায়গায় মিত্রর পূজা মহাসমারোহে হতে দেখা গেল। সুদূর ব্রিটেনে রোমান সৈন্যরা এই দেবতা সঙ্গে করে নিয়ে যায়—মিথ্রর খোদাই মূর্তি পাওয়া গিয়েছে সেখানেও।

পারদদের ভাষা লেখবার জন্য পুরাতন কোনাক্ষর লিপি প্রথম প্রথম ব্যবহৃত হয়—পরে তারা নূতন লিপি উদ্ভাবন করে; তবে সে লিপিকে ঠিক

নূতনও বলা যায় না--মনে হয় ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে আরামাইক লিপির রূপান্তর। পারসিক ধর্মের গ্রন্থাদি এই লিপিতে লেখা হয়। পারদ সম্রাট বলযশশ (Vologeses) এর সময় (খ্রী. অ. ৫১-৭৭) পারসিকদের ধর্মগ্রন্থ 'অবেস্তা' প্রথম সংগ্রহ করা হয়।

পারদরা পারস্যে প্রায় চার শত বৎসর রাজত্ব করেছিল—তুলনার জন্য বলতে পারি—আকবরের রাজত্বকাল থেকে ব্রিটিশের ভারতত্যাগ পর্যন্ত কালটা। নিতান্ত অল্প কম সময়। এই যে চারশত বৎসর পারদরা রাজত্ব করে, তার প্রথম দিকে তাদের লড়াই চলে হেলেনিক গ্রীকদের সঙ্গে। তারপর খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে সংগ্রাম চলে রোমানদের সঙ্গে। হেলেনিক গ্রীক সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসাবে রোমানরা এসে হাজির হয় পশ্চিম এশিয়ায়। পশ্চিম এশিয়া তাদের সাম্রাজের অন্তর্গত হবার পর থেকেই রোমানদেব দৃষ্টি পড়ে আছে মেসোপটেমিয়া বা য়ুফ্রাতিস তাই-গ্রিস দোয়বের উপর। তাদের পক্ষে দোয়াব দখল নিতান্ত প্রয়োজনীয়—কারণ এটাই পশ্চিম এশিয়ার খাদ্যভাণ্ডার। আরও একটা কারণ ছিল দোয়াব দখলের। চীন থেকে রেশম ও অন্যান্য সামগ্রী রোমে আসে ইরানের মধ্যে দিয়ে। পারদরা ইরানের অধীশ্বর হওয়ার পর থেকে, তারা তাদের দেশের মধ্য দিয়ে বিদেশী বনিকদের অবাধ যাওয়া-আসা সম্বন্ধে এমন কড়াকড়ি করতে থাকে যে, কালে বাণিজ্য পথটাই অচল হয়ে যায়। এখন রোমানরা চায় এই পথ খুলতে; পথের বাধা দূর করে দূর প্রাচ্যর সঙ্গে সম্বন্ধটা আবার স্থাপন করতে। এবং সেইজন্য পারদদের সঙ্গে লড়াই। পারদদের দেশ আক্রমণ করতে এসে জুলিয়াস সীজারের সমসাময়িক রোমান সেনাপতি ক্রেসাস যুদ্ধে প্রাণ হারালেন (খ্রী. অ. ৫৩)। সেনাপতির কাটামুণ্ড পারদ-সম্রাট বরদ (Orodes)-এর সাম্নে যখন ধরা হলো, তখন তিনি এক গ্রীক নাটকের অভিনয় দেখছেন। এই ছোট একটি ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি ইরানদেশে পারদদের সময়ে গ্রীক সভ্যতা ও সাহিত্যের কী প্রভাবই ছিল। গ্রীক সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ও সাহিত্যের সমঝদার হয়ে পারদরা গ্রীক বা রোমানদের সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে ছিল কাঁটা। রোমানরা ইরান মালভূমি ভেদ করে আর পূব দিকে আগাতে পারলো না।

পারদরা চারশত বৎসর রাজত্ব করার পর খ্রীষ্টীয় ৩য় শতকে পারসিক সাসানীয়রা শাহনশাহ হলেন; তাদের কথা পরে আসবে।

পারদরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিল। শকরা ছিল তখন সে-অঞ্চলের অধিপতি; তাদের হারিয়ে পারদরা দখল করে উত্তরপশ্চিম ভারতের একটা অংশ। শকদের পরেই পারদ এদেশে আসে ব'লে সংস্কৃত ব্যাকরণে 'শকপার্থিব' সমাস নামে সূত্র আছে।

এই পারদ (পার্দ) বা পহ্লবদের এক রাজার নাম গুদুফর বা গণ্ডোফোরেস। গল্প আছে যীশুখ্রীষ্টের ভক্ত সাধু টমাস্ এঁর রাজত্বকালে ভারতে আসেন এবং প্রাণ দেন ধর্মের জন্য।

·

ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত ও মধ্যএশিয়া পর্যন্ত গ্রীকদের রাজ্য উপরাজ্য বিস্তৃত ছিল। ভারত সীমান্ত থেকে তাদের দূর করেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, পারস্য থেকে বিতাড়িত করেছেন পারদ জাতির আর্সিকি বংশের রাজারা। মধ্য এশিয়া থেকে সব শেষে লোপ পায় বক্ত্রিয়ান গ্রীকরা। মাঝখানে একবার সিরীয়ার সেল্যুকাসী বংশের অন্তিয়োকস ভারত আক্রমণ করেন (খ্রী. পূ. ২০৬); তখন মৌর্য-সূর্য অস্ত গেছে—খদ্যোৎ-রাজ্য অনেক জ্বলছে মিট মিট করে। অন্তিয়োকস 'ভারতবাসীগণের রাজা সুভগসেন'-এর নিকট থেকে হাতী আদায় করে দেশে ফিরে যান—সেটা যুদ্ধে হেরে রাজকর কি প্রীতিবশে দান তা বোঝা যায় না। আন্তিয়কেস তাঁর জামাই ডেমেত্রিয়াসকে বক্ত্রিয়ার স্বাধীন রাজা করে দিলেন। ইনিও ভারতের উপর হামলা করেন। শোনা যায় পাটলিপুত্র পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে আসেন।

বক্ত্রিয়া এখন গৌরবের চূড়ায় আসীন, ব্যবসায়-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ বহু নগর সেখানে। সে-সময়ে পশ্চিম এশিয়ায় গ্রীক শিল্পী, ভাস্কর, চিকিৎসক, জ্যোতিষীদের নামডাক সর্বত্র। পারসিক শিল্পীদের প্রভাব যেমন মৌর্য পর্বে স্পষ্ট—এখনকার যুগে বক্ত্রিয়ান গ্রীকদের প্রভাব তেমনি প্রবল। এই গ্রীকরা ভারতের ভাস্কর্য শিল্পে নূতন প্রাণ এনে দিল। উত্তরপশ্চিম ভারতের ও গান্ধারের বৌদ্ধরা এককালে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল বলে মনে হয়—তার প্রমাণ সেখানে অসংখ্য স্তূপ বিহারের যে ধ্বংসাবশেষ মাটি খুঁড়ে আবিষ্কৃত হয়েছে। স্থানীয় বৌদ্ধদের ফরমাইসে গ্রীক শিল্পীরা নিজেদের কল্পনামতো বুদ্ধের মূর্তি পাথরে খোদাই করে। মূর্তির কী চাহিদা। মাটি খুঁড়ে কত হাজার বুদ্ধ মূর্তি যে পাওয়া গিয়েছে, তার ঠিক নেই। গ্রীকদের খোদাই-করা বুদ্ধমূর্তির পূজা সুরু হলো—এযুগে গুরুঠাকুরদের ফোটো-ছবি, মাটির বা

প্লাস্টারের মূর্তিপূজা রেওয়াজের মতো। ভাস্কর্য ছাড়া গ্রীক জ্যোতিষ ও মুদ্রা-ঢালাই পদ্ধতি ভারতে প্রচলিত হয়; সংস্কৃতে জ্যোতিষের নাম হোরাশাস্ত্র। হোরা শব্দটা গ্রীক অর্থ সূর্য। তবে এই বিদ্যাটা গ্রীকরা পেয়েছিল মিশর থেকে—হোরাস প্রাচীন মিশরীয়দের দেবতা। মুদ্রা অর্থাৎ রাজার চিহ্ন ছাপা টাকার প্রচলন—গ্রীকদের কাছ থেকে আসে এদেশে। মুদ্রাকে গ্রীকরা বলতো দ্রাখ্‌মা (আধুনিক 'দাম' শব্দ ঐ গ্রীক শব্দের বিকৃতি)।

গ্রীক রাজাদের নাম ছাপা অনেক মুদ্রা পাঞ্জাবে ও গান্ধারে মাটির তলায় পাওয়া গেছে। এইসব রাজাদের মধ্যে মিনান্দারের নামছাপা কয়েকটা টাকা কাবুল থেকে মথুরা পর্যন্ত নানা স্থানে পাওয়া গেছে। তাই দেখে মনে হয় এই গ্রীক রাজা উত্তরভারতে অনেকদূর পর্যন্ত দখল করেছিলেন। কিন্তু স্থায়ী রাজ্য গড়তে পারেন নি। মিনান্দার খুব সম্ভব বৌদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর নামে একখানা পালি গ্রন্থ চলিত আছে। নাগসেন নামে এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে রাজা মিনান্দারের বৌদ্ধ দর্শন নিয়ে আলোচনা হয়,—প্লাতোনের লেখা সোক্রোতিস ও তাঁর শিষ্যদের মধ্যে আলোচনার ঢঙে লেখা এ-বই। পালি সেই গ্রন্থের নাম 'মিলিন্দ পঞ্‌হো' (মিলিন্দ প্রশ্ন)। বই খানির বিষয়বস্তু চীনাভাষাতেও লিখিত হয়—'ভিক্ষু নাগসেন সূত্র' বা "পি-চিউ না-সিএন-চিং" নামে চীনা-ত্রিপিটক অন্তর্ভুক্ত। এসবের ইংরেজি তর্জমা হয়েছে। পালি বইটি বাংলায় অনুবাদ হয়েছিল।

বকত্রিয়ার গ্রীকদের এখন অবস্থা প্রায় দ্বীপবাসীর মতো—গ্রীক জগতের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন, সব দিকেই অগ্রীক স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠেছে।

আমাদের আলোচ্য পর্বে গ্রীকদের শক্তিকেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন বক্‌ত্রিয়ানদের দেশে এসে পড়ছে মধ্যএশিয়ার মরুচর উপজাতির দল। শক, ইউচি প্রভৃতি নানা নামে মরুচররা পরিচিত। এদের চাপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল বক্‌ত্রিয়ার হেলেনিক সংস্কৃতির শেষ শিখা। প্রায় পাঁচশ বছর পরে গ্রীকদের দেশ বক্‌ত্রিয়া আবার বর্বর দেশে পরিণত হলো। এখন সে দেশ সোবিয়েত মধ্যএশিয়ার অন্তর্গত মুসলীম রাজ্য—লোকে জানে না গ্রীকদের বৈভবের কথা।

উপরে ঃ গ্রীক মন্দির । পেরিক্লিস
নিচে ঃ গ্রীক অভিনয়ের স্থান

উপরে ঃ সুমেরুয়দের জীবন ও জীবিকার চিত্র
নিচে ঃ উর-এর মন্দির-গাত্রে খোদাই

পার্থিয়ান। পর্বতগাত্রে খোদাই
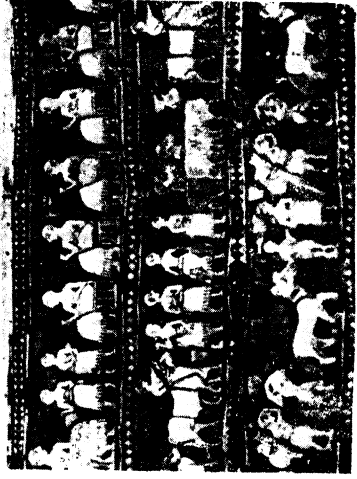
গ্রীক ভাস্কর্য। বংশীবাদিকা

ক্রীট : মাইনসের সিংহাসন

পামিয়ারা নগরের দৃশ্য
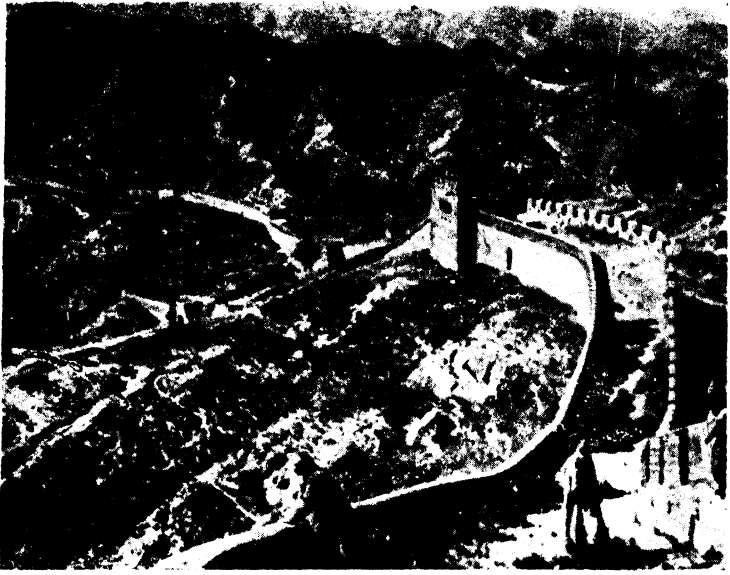
চীনের প্রাচীর

পরাজিত রোমান সেনাপতি পার্থিয়ান সম্রাটের পদানত

অসুরবানিপাল শিকাররত

ইউট্রাসকান ভাস্কর্য

গ্রীক নারী
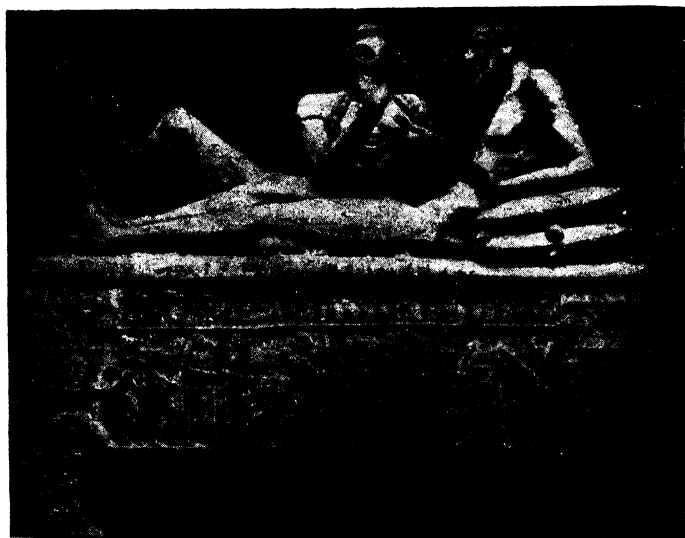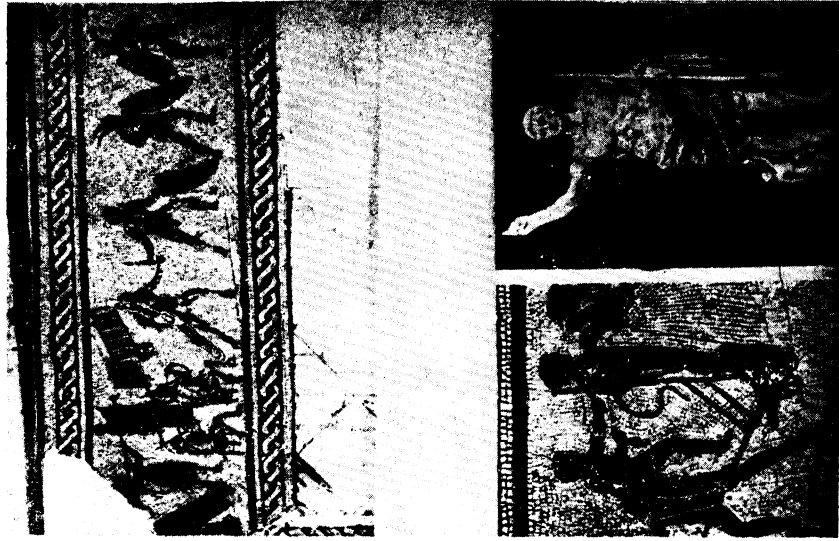
সিংহের মুখে বন্দী। সম্রাট অগাস্টাস
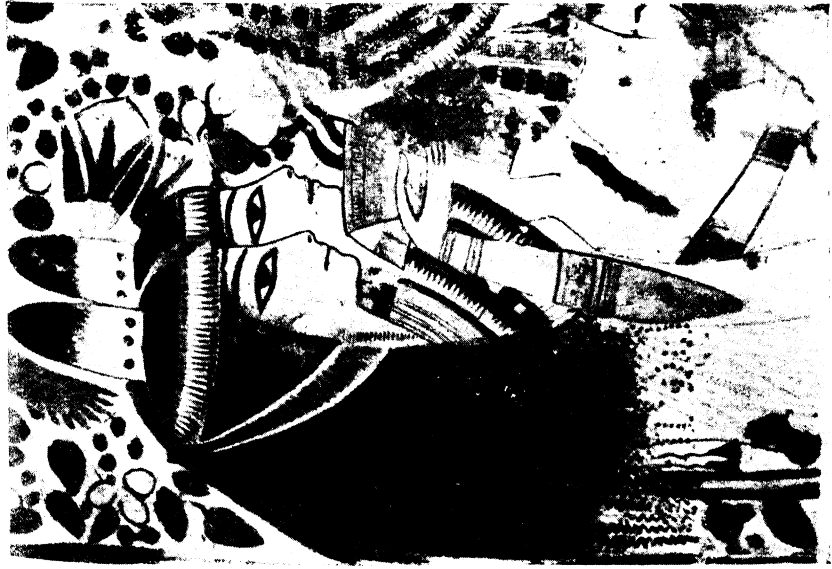
চিত্র। কবর গৃহ হইতে
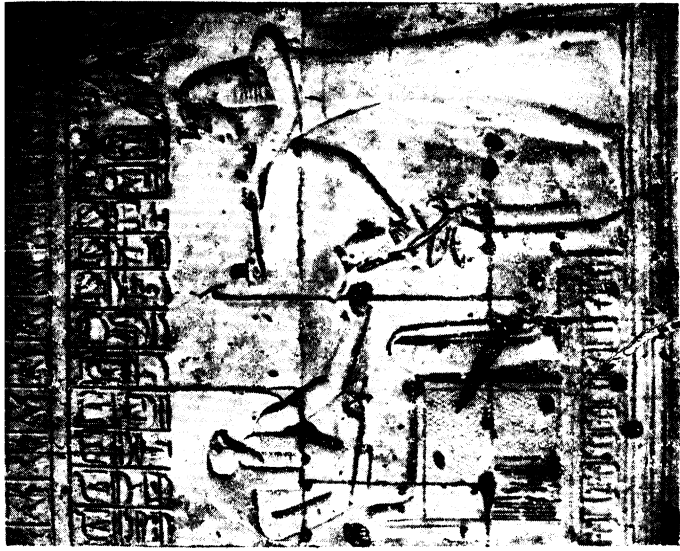
ফারোয়া ও মৃত্যুদেবতা। মিশরীয় লিপিখোদিত

গ্রীক মূর্তি তৈরীর কারখানা

লকসরের মন্দির
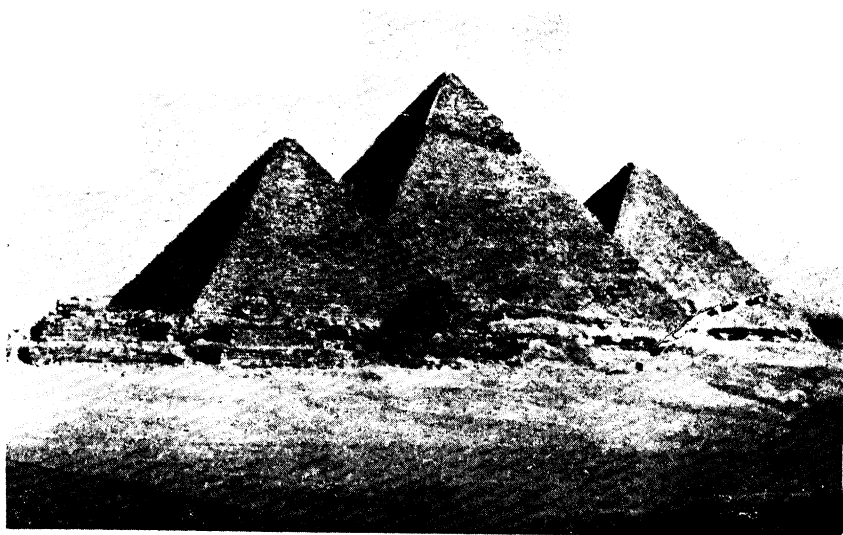
পিরামিড

রোমের সেতু

স্ফিঙ্কস। মেমফিস মন্দির এলাকায়
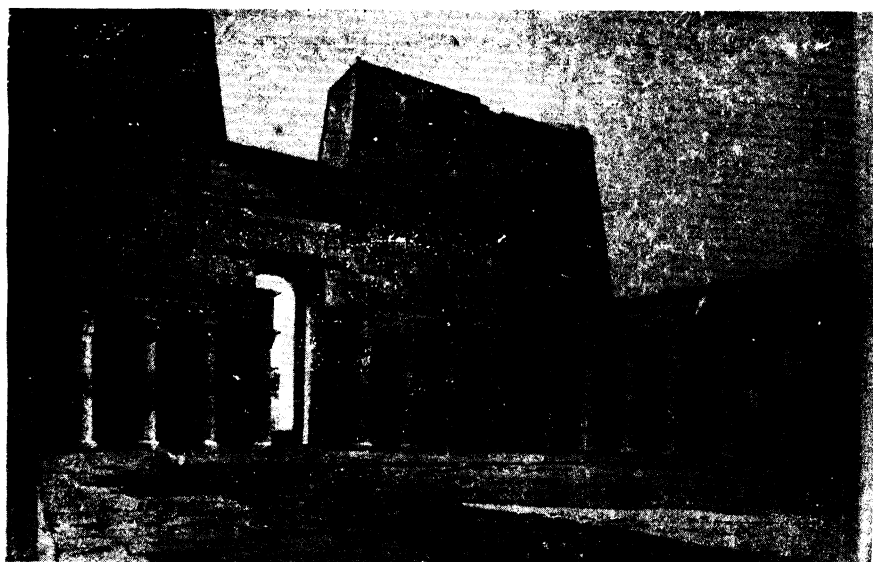
হোরাস-এর মন্দির
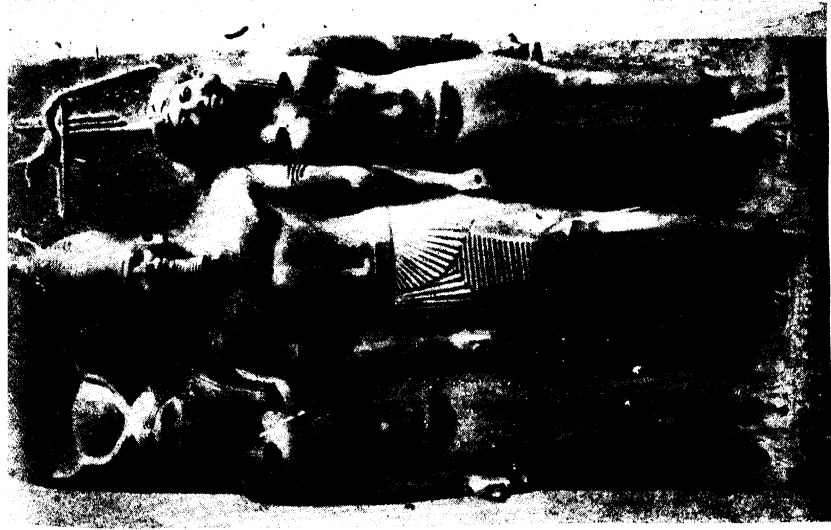
রাজা ও দুই দেবী
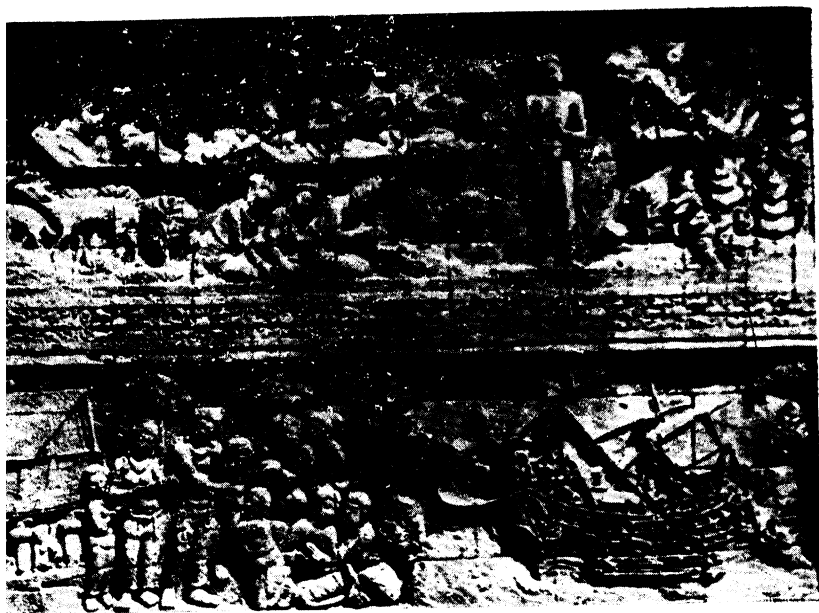
ফারোয়া রামেসিসের মূর্তি

বরবুদুরের মন্দির-গাত্রে খোদাই

মিশরের মন্দির

অশোকস্তম্ভ শিলালিপি

বাবর
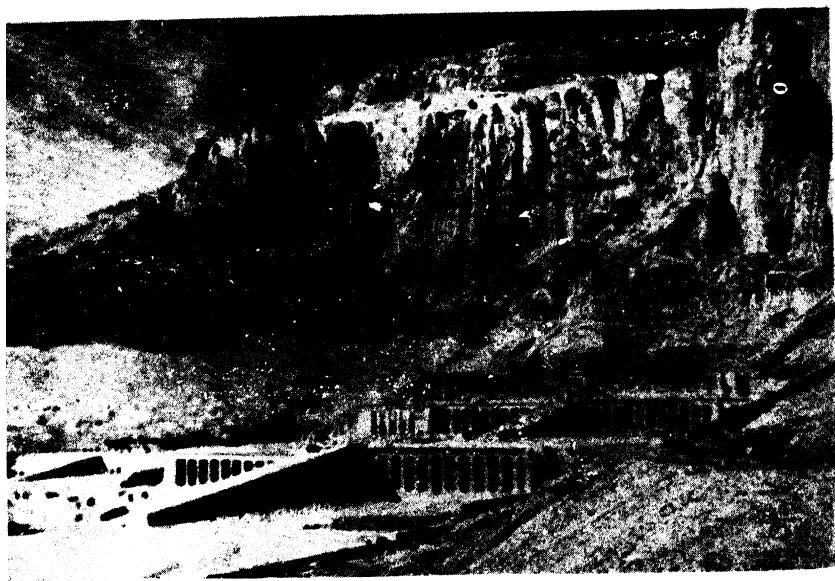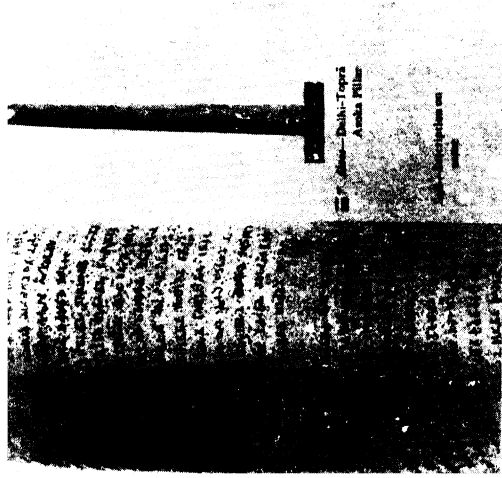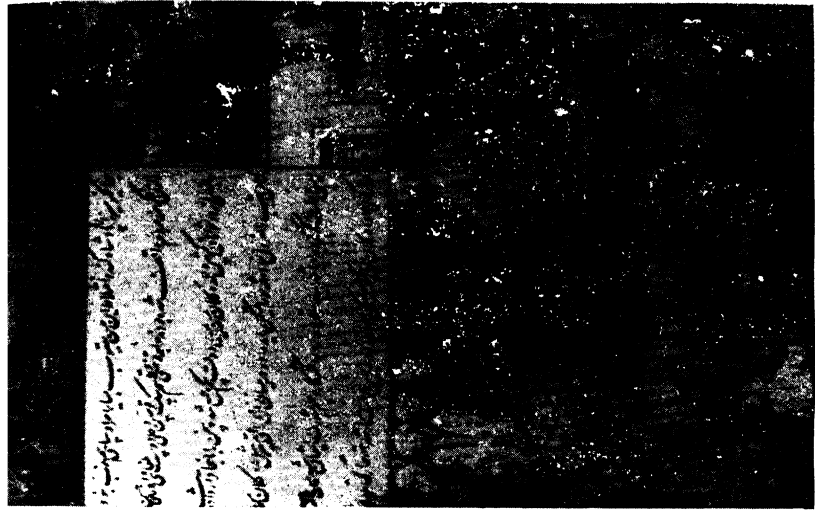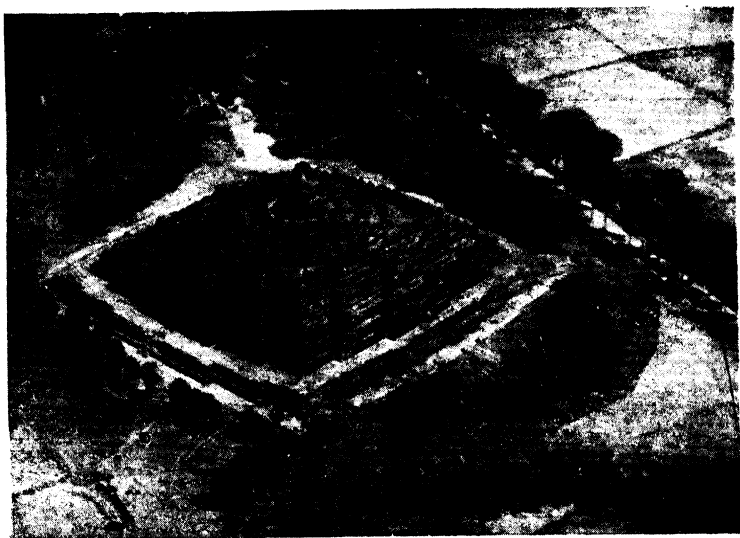
বরবুদুর
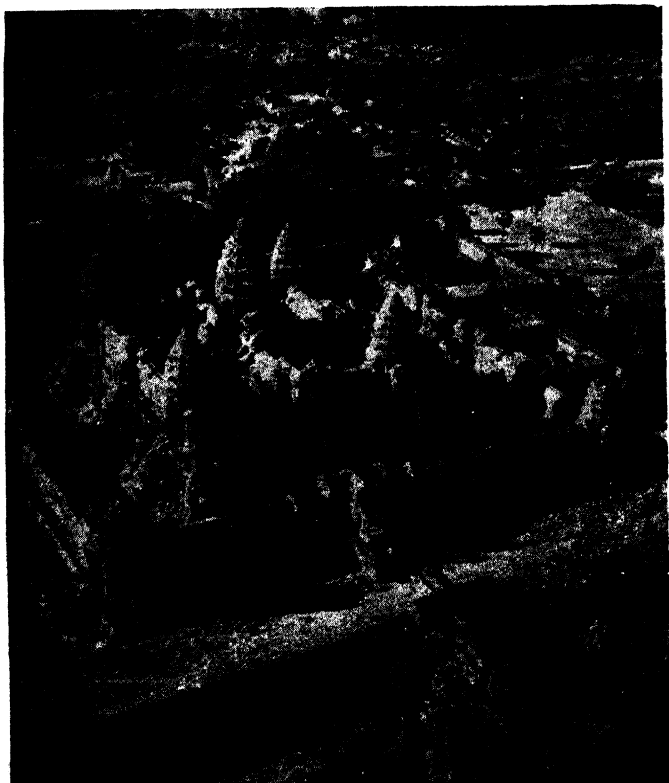
শক। কুষাণ। কনিষ্ক।

পৃথিবীর ইতিহাসের দিক থেকে খুব বড় ঘটনা হচ্ছে মধ্যএশিয়ায় মংগোল মহাজাতির নানা মরুচর, অর্ধ-যাযাবর ও যাযাবর শাখা-উপশাখার মধ্যে ঠাঁই নড়া-নড়ির পালা। কয়েকশত বৎসর আগে দক্ষিণ য়ুরোপ ও মধ্যএশিয়ার আর্য ভাষাভাষীদের মধ্যে এই ঠাঁই নড়ানড়ির ঠেলা-ঠেলিতে প্রাচীনযুগের অনেক সভ্যদেশ নিশ্চিহ্ন হয়েছিল ; এবার মধ্যএশিয়ার পূর্বদিকে মরু প্রান্তরের মধ্যে যেসব যাযাবর জাতির বাস, তাদের মধ্যেও সেই রকমই ঠেলাঠেলি সুরু হয়েছে। লোকসংখ্যা বাড়ে—পশুপাল বাড়ে—ঘাসের জমি সে-অনুপাতে বাড়ে না। সকলেরই মুখে এক কথা —খাদ্য চাই, ঠাঁই চাই। শস্যশ্যামল চীনদেশে রাজ্যশাসনের কড়া ব্যবস্থা ; মহাপ্রাচীর খাড়া হয়ে রয়েছে তাদের দেশের উত্তরে ক্রোশের পর ক্রোশ ব্যেপে। চীনে প্রবেশ করা কঠিন। এইসব মরুচরদের মধ্যে হিউং-নু বা হুনরা সব থেকে দুর্ধর্ষ। তারা চীনের মধ্যে তো ঢুকতে পারছেই না, বরং দেখছে চীনা চাষীর দল তাদের দখলী-দেশে ঢুকে ডাঙাজমি ভেঙে চাষ সুরু করছে। হুনরা চাষের কাজ জানে না, বোঝেও না। তাই তারা নতুন দেশের খোঁজে পশ্চিমদিকে তেপান্তরে রওনা দিল।

ঘরছাড়া হুনদের পথে পড়ে ইউচি নামে আর একটা উপজাতির লোক। হুনদের ঠেলা পেয়ে তারা দেশ ছাড়া হয়ে আগিয়ে চলে। ইউচিরা পড়ে গিয়ে শকদের দেশে—বক্ত্রিয়ার উত্তরে। শকরা তাড়া খেয়ে পড়ে গিয়ে বক্ত্রিয়ান গ্রীকদের দেশে। বক্‌ত্রিয়া সোনার দেশ—ছারখার হলো শক ও তাদের পিছুপিছু এসে-পড়া ইউচি বর্বরদের আক্রমণে।

শকরা যায় কোথায়? কাছেই ভারত। সেখানে গ্রীকদের চিহ্ন আর নেই। মৌর্য সাম্রাজ্যও ভেঙেচুরে শেষ হয়ে গেছে। তার জায়গায় অসংখ্য ক্ষুদে রাজার ক্ষুদে ক্ষুদে দেশ,—কারও সঙ্গে কারও যোগ নেই, মারামারি কাটাকাটি লেগেই আছে। এমন অনুকূল দেশ আর কোথায়? শকরা ভারতে প্রবেশ করলো। তারপর তক্ষশিলা, মথুরা, উজ্জয়িনী,

এমনকি পশ্চিম সাগরতীরের ভৃগুকচ্ছ—বর্তমান বোম্বাই রাজ্যের বরোচ বন্দর—পর্যন্ত উপনিবেশ গড়লো। রাজ্য স্থাপন করে উপাধি নিল ক্ষত্রপ, মহাক্ষত্রপ ; এ উপাধিগুলো পারসিকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল—সেই উপাধি নিয়ে শকরা রাজত্ব আরম্ভ করলো। পরযুগেও তুর্কী-মুঘল মুসলমান রাজারা পার্সি উপাধি নিয়ে আসেন, ইংরেজও আনে তাদের ভাষায় চলিত উপাধি সব। শকদের প্রচলিত অব্দ 'শকাব্দ' চালু হলো ; যেমন পরে হয় 'হিজরী' সন, আরও পরে 'খ্রীষ্টাব্দ'। ভারত স্বাধীন হবার পর 'শকাব্দ'টাকে ভারতের সরকারী অব্দ * বলে মেনে নিয়ে চালু করা হয়েছে। কিছু কালের মধ্যে শকদের রাজারা ভারতীয় নাম নিয়ে হিন্দু হয়ে গেলেন—সেরকম দৃষ্টান্ত ভারতে ভূরিভূরি ; আমাদের নিকটতম রাজ্য অহোম্, ত্রিপুরা, কোচবিহার ও কাছাড় রাজ্যের রাজাদের নামের ও ধর্মের বদল হয়ে যায়। হিন্দুসংস্কৃতি নিয়ে তাঁরা হিন্দু নাম নিয়েছিলেন। মুসলমান যুগে হিন্দুর মুসলমানী নাম গ্রহনের বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। শকদের এক বিখ্যাত রাজার ভারতীয় নাম রুদ্রদামন—গুজরাটের জুনাগড়ের পাহাড়ে তাঁর শিলালেখ আছে। আর একজন গ্রীক বাসুদেবের নামে এক স্তম্ভ নির্মাণ করেন। সেই গরুড়ধ্বজ স্তম্ভ মধ্য ভারতের বেসনগরে (প্রাচীন বিদিশা) এখনো খাড়া রয়েছে।

শক ছাড়া আর একটা মরুচর জাতিও নূতন দেশে বসবাসের জন্য ঘুরছে ; এদের সাধারণ নাম চীনারা দেয় ইউ-চি। নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে শেষকালে মধ্যএশিয়ায় অক্ষু (অকসাস=আমুদরিয়া) নদী তীরে বসতি করতে আরম্ভ করে। পাঁচটা উপজাতিতে তারা বিভক্ত ; এদের এক করেন কুষাণ শাখার সর্দার কুজুলকদফিস ; ইনি পারস্যের সীমান্ত থেকে সিন্ধুনদ তীর পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। এই বংশের সেরা রাজার নাম কনিষ্ক ; উত্তরভারতের অনেকখানি দখল করে পুরুষপুরে (পেশোয়ার) রাজধানী পত্তন করেন। তিনি কোন্ সময়ের লোক—তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে খুবই মতভেদ—কেউ বলেন 'শকাব্দ' (খ্রী. অব্দ. ৭৮) তাঁর প্রবর্তন ; আবার কেউ বলেন, তিনি দ্বিতীয় শতকের লোক। সাধারণভাবে ৭৮ খ্রীষ্টাব্দটাই তাঁর অভিষেকের সময় বলে মেনে নিতে পারা যায়।

* ইং ১৯৬৬, ২২ মার্চ=বাং ৮ চৈত্র, ১৩৭২=নূতন বর্ষ ১ চৈত্র ১৮৮৮ শকাব্দ

কনিষ্ক ভারতের সম্রাট ছিলেন সত্য, কিন্তু মধ্যএশিয়ার অনেকখানি তাঁর তাঁবে ছিল। চীনা ইতিহাস থেকে জানা যায় চীনের এক রাজকুমার সন্ধিসর্ত পালনের জামিনদার হিসাবে রাজধানী পুরুষপুরে আটক ছিলেন; কিসের যুদ্ধ, কিসের সন্ধি—সেসব কথা জানা যায় না। তবে মনে হয়—নিশ্চয়ই চীনারা একটা কোনো যুদ্ধে হার মেনে এই ব্যবস্থা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

কনিষ্ক যেমন বীর তেমনই চতুর। ধর্ম বিষয়ে সকল ধর্মের প্রতি সমান অনুরাগ—আকবর শাহের মত; কারণ তাঁর সাম্রাজ্য মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, জরথুষ্ট্রীয়, গ্রীক, বাবিলনীয় দেবদেবীর উপাসক, নানা ধর্মের লোকের বাস; সকলেরই ধর্মে স্বাধীনতা স্বীকার করা বুদ্ধিমান রাজনীতিজ্ঞের কাজ। তবে এসত্ত্বেও বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল, কারণ তাঁর সময়ে তারাই ছিল দলে ভারী ও ক্ষমতাবান সম্প্রদায়। কনিষ্কের মধ্যস্থতা ও চেষ্টায় কাশ্মীরের কোনো স্থানে বৌদ্ধদের এক সংগীতি আহূত হয়েছিল। বুদ্ধদেবের মহানির্বাণের পর প্রায় পাঁচশত বৎসর কেটে গেছে; এর মধ্যে শিষ্য ভক্তদের ভিতর—বুদ্ধদেব কি বলেছিলেন তা নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। খুবই স্বাভাবিক। কারণ, বুদ্ধদেবের অনেক শিষ্যই তাঁর উপদেশ শুনতো; সকলের বিদ্যা, বুদ্ধি বোধশক্তি স্মৃতিশক্তি একরকম তো ছিল না। ফলে সকলেই নিজ নিজ মত ব্যাখ্যান ক'রে বলেন—'ভগবান বুদ্ধ এই রকম বলেছিলেন'। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরেই রাজগৃহে একটা সংগীতি বসেছিল বলে কিম্বদন্তী আছে। তারপর অশোকের সময় একবার বসে। এবার কনিষ্ক আহ্বান করলেন সংগীতি। এখানে লক্ষ্য করার বিষয়—ধর্ম সম্বন্ধে মতভেদের বিবাদ মীমাংসার জন্য রাজার হস্তক্ষেপ বৌদ্ধরা মেনে নিচ্ছে। এ প্রথা ব্রিটিশযুগে চালু ছিল—ব্রিটিশ এজলাস ও পার্লামেণ্ট ধর্মের বিবাদের শেষ মীমাংসা করে দিতেন।

মতভেদ বা বুদ্ধির তারতম্য থেকে বৌদ্ধদের মধ্যে আঠারোটা সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল—তবে প্রধানত দু'টো ভাগের মধ্যে তারা পড়ে,—হীনযান ও মহাযান। হীনযানীরা বুদ্ধদেব কি বলেছিলেন, কি করেছিলেন সেইগুলিই আঁকড়ে ধরে বসে আছেন; আর যারা বুদ্ধদেবকে দেখেনি—যারা তাঁর বাণী পড়েছে বা অন্যের মুখে শুনেছে—তাদের মত হচ্ছে আগিয়ে চলবার দিকে, পাঁচরকম লোকের সঙ্গে মিশে তাদের প্রয়োজন

মতো বুদ্ধের বাণী প্রচার করতে হ'বে। নবীনরা প্রবীনদের বা স্থবির দের মানতে চায় না; তারা দলে ভারি; তার বলে—সঙ্ঘের মত নিয়ে কাজ করতে হ'বে। তারা নিজেদের বলে 'মহাসাঙ্ঘিক' (Rule of the majority)। এছাড়া ধর্মের খুঁটিনাটি, দর্শনশাস্ত্রের কচ্‌কচানি নিয়েও মতভেদ দেখা দিয়েছে। মতভেদটা যদি কেবল শুষ্ক তর্কের কোঠায় সীমিত থাকে, তবে হয়তো বিরোধটা রাজদরবার পর্যন্ত পৌঁছয় না। আসল বিরোধ বাঁধে সম্পত্তি নিয়ে; বৌদ্ধ গৃহস্থরা পূণ্য সঞ্চয়ের জন্য ভিক্ষুদের জমিজমা, ধনদৌলত দান করতেন। সে সম্পত্তি বিপুল। সমস্যা দাঁড়ালো সেইসব সম্পত্তির উপর মাতব্বরি করবে কারা। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবিকার নির্ভর এইসব সম্পত্তির উপর; কে বা কারা দখলীদার হবে—সেটাই কলহের মূল।

বুদ্ধদেবের মহানির্বাণের পর প্রায় পাঁচশত বৎসর গত হয়েছে; এর মধ্যে বহু শ্রেণী ও বর্ণের লোক বুদ্ধের বাণী গ্রহণ করেছে। শিক্ষিত ব্রাহ্মণরাও বৌদ্ধমত মেনেছেন; এঁরা বুদ্ধের কথা ও মত সংস্কৃতে ভাষায় লেখেন—প্রাকৃত ভাষার চলিত্‌ বা পালী ত্রিপিটকের সব মত এঁরা মানতেন না। নবীন দল বললেন, মহাসঙ্ঘ যা মানবে, তাই হবে শ্রেষ্ঠ পথ বা মহাযান এই মতভেদের মীমাংসার জন্য কনিষ্ক কাশ্মীরে মহাসংগীতি (Conference) আহ্বান করলেন। কনিষ্ক আহূত সংগীতিতে বহু ভিক্ষু এলেন। স্থির হলো বৌদ্ধ শাস্ত্র সংকলন ও তার ব্যাখ্যানের ব্যবস্থা ও নিস্পত্তি করতে হ'বে। এই সংগীতির পর হীনযান ও মহাযানের মধ্যে ভেদটা স্পষ্ট হয়। উত্তরভারতে জয়যুক্ত মহাযানীদের ভিক্ষু প্রচারকরা মধ্যএশিয়ায় চীন ও তিব্বতে বুদ্ধের বাণী নিয়ে এগিয়ে গেলো। আর পূবভারতের মহাযানীদের নানা শাখা প্রবল হতে থাকলে, হীনযানীদের প্রচারকেন্দ্র সরে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হ'লো সিংহলে। সেখান থেকে ভিক্ষুরা যায় বর্মা, সিয়াম, কাম্বোজ প্রভৃতি দেশে তাদের দক্ষিণী মত নিয়ে। মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে মহাযানাদের ধর্মগ্রন্থ সংস্কৃতে আর হীনযানীদের ত্রিপিটক পালি বা প্রাকৃতে লেখা। কনিষ্কের রায়ে মহাযানীদের জয় হলো।

রাজ অনুগ্রহ, রাজ সম্মান প্রভৃতি পাওয়াই হলো ভারতে বৌদ্ধদের উন্নতির ও অবনতির কারণ। যতদিন তারা বিশেষ কোনো বৌদ্ধ রাজা

বা বুদ্ধভক্ত সম্রাটের আর্থিক সহায়তা লাভ করেছিল,—ততদিন তারা অব্যাহত উন্নতির পথে আগিয়ে চলে। রাজবংশের বদল তো প্রায়ই হয়; অনেক সময়ে ধর্ম সম্বন্ধে মতভেদের সুযোগ নিয়েই রাজবংশের অভ্যুদয় হয়! কখনো প্রতিক্রিয়াপন্থী সমাজের পক্ষ নিয়ে কখনো প্রাগ্রসরী-মতবাদীদের আনুকূল্য পেয়ে সিংহাসনে পায় নূতন রাজবংশ।

আজ তিব্বতে যে বিপ্লব দেখা দিয়েছে তা সেখানকার বেকার, শোষক লামাদের বিরুদ্ধে জাগরণ; লামারা বহু শত বৎসর মানুষের ধর্ম-মূঢ়তার সুযোগ নিয়ে সমগ্র জাতটাকে শুষে খাচ্ছিল। তাদের প্রতীক হচ্ছেন বুদ্ধ ভগবানের অবতার দালাইলামা, পাঞ্চেন লামারা। বুদ্ধের ধর্মের কী বিকৃতি রূপ যে সদ্‌ধর্মের নামে চলছে, তা পড়লে অবাক হতে হয়। বুদ্ধদেব বুদ্ধিমান লোক ছিলেন—ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনো কথা তিনি বলেন নি—তিনি মানুষকে তাঁর নিজস্ব ধ্যানলব্ধ সত্যকে জাগাবার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু কালে তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বসালো গুরুর স্থানে, দেবতার স্থানে—ভগবানের স্থানে—তাঁর মূর্তির কাছে স্তব করে, ধর্ণা দেয়—আশীর্বাদ ভিক্ষা করে। বুদ্ধের ধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে অনেক তফাৎ।

রোম ও রোমান

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে বেশির ভাগ দেশ বা রাজ্যের নাম হয়েছে কোনো উপজাতির নাম থেকে; অ্যাঙ্গেলস থেকে ইংল্যান্ড, ফ্রাংকদের থেকে ফ্রান্স, দয়েচ থেকে দয়েচলান্ড—জারমেনির দেশী নাম। এরকম আরও উদাহরণ দেওয়া যায়। মানুষের নাম থেকে দেশের ও জাতির নাম হয়েছে যেমন—আমেরিকা, বলিবিয়া। মানুষের নাম দিয়ে নগরের নাম অগনিত। কিন্তু নগরের নাম থেকে একটা জাতি ও একটা সভ্যতা নাম পেয়েছে—তার একমাত্র উদাহরণ হচ্ছে 'রোম'। পশ্চিম এশিয়ায় যখন রোমান সাম্রাজ্য ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানকার লোকও গর্ব করে বলতো—'আমি রোমান'। ব্রিটিশ যুগে ভারতীয়রা ব্রিটিশ সাবজেক্ট বা প্রজা বলে সাম্রাজ্য মধ্যে অনেক দাবী-দাওয়া করতো। কিন্তু 'আমি ব্রিটন' বা ব্রিটিশ এ দাবী করতো তারাই যাদের খাস ব্রিটেনে জন্ম।

ইতালির রাজধানী রোম, এই মহানগরীর এক অংশে ক্যাথালিক খ্রীষ্টান জগতের ধর্মগুরু পোপ বাবাজির প্রাসাদ ভাটিকান। সেই ভাটিকান রোম এখন পৃথক একটি রাজ্য, জাতিসংঘের সদস্য। কিন্তু আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে রোম ছিল টাইবার নদীর তীরে সাতটা টিলার উপর গরীব লোকের বস্তি।

প্রাচীন ইতালিতে অনেক জাতি ও উপজাতির বাস। আপেনাইন পাহাড়—শিরদাঁড়ার মতো ইতালির মাঝখানে খাড়া। তার উত্তরে আল্পস পর্বতের তলা পর্যন্ত অতি বিস্তৃত উর্বর জমি; সেখানটা দখল করে আছে গল্ নামে এক জাতি। দক্ষিণপূর্ব কোনটায় গ্রীকদের কলোনী—লোকে তাদের বলে 'গ্রেক্' অর্থাৎ পরদেশী; সেই নামে তারা পরিচিত হয় ইতালিতে—কালে সকলেই তাদের 'গ্রীক' বলতে সুরু করে—আসলে তারা হেলেনিক, নিজেদের তারা 'হেলেনি' বলে; এখনো 'গ্রীস্' দেশ আছে অন্যজাতের মানচিত্রে, গ্রীকদের নিজেদের মানচিত্রে তারা লেখে হেলেনি। ঔপনিবেশিক

এই গ্রীকরা ব্যবসায়ী ও বানিয়া হলেও সুসভ্য ও সৌন্দর্যপ্রিয়। এই গ্রীকদের সঙ্গে রোমান ইতিহাসের মাঝপাতায় আবার আমাদের দেখা হবে।

আপেনাইন পর্বতের পশ্চিম ও দক্ষিণে ছিল আর একটা পুরাতন জাতি—ইতিহাসে তারা ইউট্রাস্কান নামে খ্যাত। এদের সাম্রাজ্য ছিল না—ছিল বারোটা নাম-করা নগর। গ্রীকদের কাছ থেকে ইউট্রাস্কানরা লেখবার বিদ্যাটা শিখে নেয়। এছাড়া আরও অনেক কিছু আয়ত্ব করে নানা ভাবে। গ্রীক লিপিতে ইউট্রাস্কানদের ভাষায় খোদাই-লেখা পাথর-পাটা অনেক পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু তাদের লিপি পড়া গেলেও তাদের ভাষা এখনো বোঝা যায়নি।* এই ইউট্রাস্কানরা আসলে ইতালির আদিবাসিন্দাই নয়। এরা কোথা থেকে এলো এত সভ্যতা নিয়ে, তার সঠিক খবর পাওয়া যায় না।

এই ইউট্রাস্কানদের দক্ষিণ সীমান্ত টাইবার নদীর পারাপারের ঘাট বা 'তীর্থ (Ford) ছিল; তারই অপর পারে সাত-টিলা বা অনুচ্চ পাহাড়, সেখানে এসে বসতি আরম্ভ করে লাতিন উপজাতির লোকে। জায়গাটা নিরাপদ—উঁচুতে অবস্থিত বলে অনেকখানি দূরটা দেখা যায়। আবার নদীর ওপারে সুসভ্য ইউট্রাস্কানদেব বাস—তাই ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা ও কাজকর্মের সুযোগ মেলে।

রোম নগরীর পত্তন সম্বন্ধে নানা প্রবাদ—নেকড়ে বাঘের ঘরে মানুষ-হওয়া দুই ভাই রোম্যুলাস ও রেমাস এই নগর পত্তন করে ব'লেও গল্প আছে। অন্য মতে 'রোমা' শব্দের মানে হচ্ছে সীমান্তের ঘাঁটি (March)। লাতিন্ নামে উপজাতির লোকেরা ইউট্রাসকানদের রুখবার জন্য নাকি এখানে ঘাঁটি বেঁধে ছিল; কিন্তু কালে বুদ্ধিমান ইউট্রাসকানরা এসে নগরের উপরে প্রতিপত্তি সুরু করে দেয়। এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, বাংলা দেশের পশ্চিমে সাঁওতাল পরগনার সঙ্গে; সেখানে বুদ্ধিমান বাঙালি ও চতুর বিহারীরা বাস করতে এসে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছে—স্থানীয় লোকদের পাত্তা পাওয়া দায়। রোমেও হয় অনেকটা সেই ধরণের অবস্থা। যাই হোক রোমের এই নয়া নগরে লাতিনদের মধ্যে রাজা (Rex) শাসন কাজ চালান। তবে রাজার ছেলে রাজা হয় না—লোকে

*ক্রীট, মহেঞ্জোদোড়ার শীলমোহরের মত এদের লিপিও অঙ্কের অবুঝ দৃষ্টির মতো চেয়ে আছে।

নির্বাচন করে যোগ্য লোককে, যেমন গাঁয়ের মোড়লকে করে থাকে। কালে ইউট্রাসকানরা সমস্ত শক্তি হাতিয়ে নেয় এবং তাদের কয়েকজন 'রাজা' নগরের সত্যই অনেক উন্নতি করেন। এই রাজারা (Rex) ভাল ভাল আইন জারি করে লোকদের অনেক সুবিধা করে দেন। কিন্তু শেষের কয়েকজন রাজারা প্রজাদের উপর খুব পীড়ন সুরু করলে নগরের লোকে উত্যক্ত হয়ে বিদ্রোহী হয়; এবং তারপর রাজাদের দেয় তাড়িয়ে। লোকে স্থির করে, ভবিষ্যতে তাদের নগরে আর কখনো কেউ 'রাজা' (rex) হ'বে না,—যে রাজার সমর্থন করবে—সে হবে মহাপাতক। মজার কথা সেই 'রাজ্যহীন' রাষ্ট্রে 'রাজা'র স্থলে 'সম্রাট্'কে তারা সর্বশক্তিমান করে একদিন বরণ করে নেয়।

লোক বা পাব্লিকাস নিয়ে যে শাসন চালু হ'লো তাকে বললে, রিপাবলিক * ; এই লাতিন শব্দটি এখন সকল দেশেই সুপরিচিত। আমরা যে ডিমোক্রেসি বা জনতার শাসন অধিকার দেখছি—রোমে কিন্তু সেটার অস্তিত্ব ছিল না; শাসন ব্যাপার ছিল মুষ্টিমেয়ের মুঠোর মধ্যে। নগরে গোড়া থেকে যেসব পরিবার এসে বাস করে আসছিল,—স্বভাবত প্রতিপত্তি ছিল তাদেরই একচেটিয়া। জমিজমার মালিক তারা, চাষবাস তাদেরই বেশি। নূতন নূতন লোকেরা তাদেরই বাবামশায় বলে (পিতৃস্থান) মুরুব্বি পাকড়ায় —ও তাদের ধরে নগরে এসে বাসকরতে পায়। নূতন লোকে মুরুব্বিদের বশে থেকে, তাদের কথা শুনে চলে (clientis) * *। কালে রোমের সমাজে হয়ে দাঁড়ায় দুটো দল বা 'জাত'—একদল ভদ্রলোক ও আর এক দল আমাদের দেশের শূদ্র, ক্ষুদ্র 'ছোট লোকের মতো'। ভদ্রলোকদের পেত্রিশিয়ান (Pater—Father—Tris), আর যারা তাঁবে থাকতো তাদের বলা হতো প্লীবিয়ান জনতা। আমাদের দেশের মতো খাওয়া-ছোঁওয়া নিয়ে বাছবিচার ছিল না সত্য, কিন্তু এই দুই জাতের মধ্যে বিবাহ হতো না এবং আরও অনেক বিষয়ে তাদের বাধা ছিল বিস্তর; যেমন প্লীবরা সরকারী কাজকর্ম পেতো না, মন্দিরের পুরোহিত হবার অধিকার তাদের ছিল না। কিন্তু যুদ্ধের সময় লড়তে যেতে হতো নিজ নিজ লাঠি,

---

* Res, concern, Publicus.

---

* * Cliens = Cluere = hear obey. তু. সং শ্রু ধাতু শোনা শ্রাবক।

সড়কি, ঢাল, তরবার নিয়ে—পায়ে হেঁটে। আর বড়লোকেরা যেতেন ঘোড়ায় চড়ে, তাঁদের আপন গোষ্ঠির ঘোড়শোয়ারী দলের সঙ্গে। লড়াই করে পাওয়া জমি-জমা, লুটের মাল ভাগ-বাটোয়ারা হতো পিতৃস্বানদের মধ্যে। 'সিনেট' নামে বৃদ্ধ গ্রাম-মোড়লদের পঞ্চায়েত কালে হয়ে ওঠে আমাদের ব্যবস্থাপক সভার মতো; সিনেটের দ্বারা আইন কানুন তৈয়ারী, রাষ্ট্রের কর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি হয়। এই সিনেট যেখানে বসে সেই ঘরে কিন্তু প্লীবরা ঢুকতে পায় না। দু'জন করে কন্সাল বৎসরে বৎসরে নির্বাচিত হন—তাঁরা দু'জনেই পিতৃস্বান।

•

ইতিমধ্যে টাইবার নদীর অপর পারে নানা কারণে ইউট্রাসকানদের পতন সুরু হয়েছে। পতনের প্রধান দুটো কারণ। বহুকাল মধ্যধরণী সাগরের ব্যবসায়ে সিসিলির গ্রীক উপনিবেশিকদের এরা ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী; তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে এদের জাহাজগুলো পড়ে মারা। জাহাজ ডুবলে হঠাৎ জাহাজ বানানো যায় না—সময় লাগে অনেক। বিপদের উপর বিপদ, উত্তর থেকে এলো গল্ নামে দুর্ধর্ষ জাতি,—ইউট্রাসকান নগরের উপর করলো হামলা। ইউট্রাসকানরা সামলাতে পারলে না এই ধাক্কা। সেই সুযোগে রোমানরাও কয়েকটা নগর দখল করে নিলো। রোম নগরের বাইরে 'রোমান'দের রাজ্য পত্তন হলো।

প্লীবরা জমিও চষে, যুদ্ধেও যায়; যুদ্ধে গিয়ে মরে বা জখম হয়ে ফিরে আসে। যুদ্ধের সময়ে জোয়ানরা থাকে দূরে, চাষ হয় না ভালো করে, জমিতে ফসল ফলে কম। বুড়ো হাবড়া লোক যারা গাঁয়ে থাকে—তারাই কোনো রকমে চাষ সামলায়। তারপর ধার ক'রে খায় পিতৃস্বানদের ঘরে; শুধতে না পেরে কয়েদে যায়, অথবা ভূমিদাস হয়ে বংশ পরম্পরায় কাটায় ধনীর চাষবাড়ির কাজে। একবার লোকে বিরক্ত হয়ে রোম নগর ছেড়ে আলাদা জায়গায় গিয়ে নূতন নগর পত্তন করবে ভেবেছিল। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাদের ফিরিয়ে আনা হয় সেবারের মতো। এই হুমকীর ফলে সিনেটে বা আইনসভায় প্লীবদের প্রতিনিধি বা 'ট্রিবিউন' পাঠাবার অধিকার তারা পায়। এই বোধহয় প্রথম যখন শাসক গোষ্ঠিকে জনতার দাবী মানতে হলো। কিন্তু সভায় যাবে কারা? কাথাবার্তা বলতে পারে তো ভদ্র-

লোকেরা—যাদের দোরে এরা পড়ে আছে এতকাল। সুতরাং অনেক কাল ধরে পিতৃস্বানদের কেউ না-কেউ ট্রিবিউন হয়ে সভায় যেতেন।

এতদিন রোমে লিখিত আইন ছিল না, বিচার চলতো খেয়ালখুশি মতো। এবার কতকগুলি লোককে গ্রীসের আথেন্স পাঠিয়ে দেওয়া হলো সেখানকার আইন-কানুন দেখেশুনে আসবার জন্য। গ্রীসে তখন সোক্রোতিস জীবিত; হেরোদোতস তাঁর ইতিহাস লেখবার জন্য মাল মশলা তৈরী করছেন। সেই সময়ে রোমানরা গ্রীসে যায়। আইনগুলি বারোটা তামার পাটায় খুদে সিনেটঘরের সাম্‌নে রেখে দিল—সকলেই যাতে দেখতে ও পড়তে পারে। পাঠকের মনে আছে—বাবিলনে হান্নুরাবি পাথরের উপর দেশের আইন খোদাই ক'রে প্রচার করেন।

এখানে একটা প্রশ্ন—রোমানরা লিখতে পড়তে শিখলো কোথা থেকে! এই লেখবার রীতি তারা জানতে পারে দক্ষিণইতালির গ্রীকদের অথবা প্রতিবেশী ইউট্রাসকানদের কাছ থেকে। গ্রীক লিপি একটু বদলে হয়েছে রোমান লিপি। এদের ভাষাকে বলে লাতিন। রোমানদের সেই লিপির কিছুটা ধাঁজ বদলেছে এই দুই হাজার বৎসরের মধ্যে। আর্যভাষাভাষী সমস্ত জাতির লোক—হেলেনীয় ও স্লাভীয়রা ছাড়া—এই রোমান লিপি ব্যবহার করে; সেই লিপি পৃথিবীময় ছাড়িয়ে পড়েছে। এমনকি ভারতের অনেকগুলি আদিম জাতির ভাষায়, এমনকি সুসভ্য তুর্কিরাজ্যে, ইন্দোনেশিয়ায়, ইন্দোচীনে এই লিপির চল হয়েছে। চীনাদের জটিল লেখপদ্ধতির বদলে রোমান লিপি চালুর কম্যুনিস্ট চীন কথা ভাবছে। ভারতের বহুলিপির স্থলে 'রোমান' লিপি প্রচলনের প্রস্তাব মাঝে মাঝে শোনা যায়। পুরাতন ইতিহাসের পাতা হাঁতড়িয়ে রোমানদের কথা জানতে হয়—কিন্তু তাদের লিপি আমরা নিত্য ব্যবহার করছি ইংরেজি পড়বার ও লেখবার সময়, ভুলে যাই একে বলে রোমান লিপি (Roman Script)।

প্লীবদের প্রতিনিধি ট্রিবিউনরা সিনেটের সদস্য হয়ে একটা বড় অধিকার পেলো; সভার মধ্যে ঢুকে কিছু বলতে পারে না। দরজার কাছে বসে তারা সভ্যদের হৈ চৈ শুনতে পায় মাত্র কিন্তু তবে আইন পাশ হবার সময়, যদি তারা বলে বসে 'ভিটো' 'ভিটো' তা হলে সব ঠাণ্ডা! আর সে আইন চালু হতে পারবে না। 'ভিটো' শব্দের মানে—'আমি নিষেধ করছি।' একটা

হুমকিতে সব বানচাল হয়ে যেতে পারে। এইভাবে প্লীবরা একটু একটু করে রাজনৈতিক অধিকার আদায় করে নেয়। কিন্তু মানুষ কি সহজে জন্মগত সুখসুবিধা, অধিকার অন্যকে ছেড়ে দেয়? কিন্তু ছাড়তেই হয় অর্থনৈতিক কারণে।

টাকা একহাতে থাকে না, সে চলবেই। সমাজের লোকেও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না—সে হয় এগুবে—না হয় পিছুবে। কালান্তরে শিল্পী হয়ে, ব্যবসা বাণিজ্য করে প্লীবরাও 'বড়লোক' হয়ে উঠছে, লেখাপড়া শিখিয়ে ছেলেদের 'সভ্য' করে তুলছে; আইন-কানুন এরা বুঝতে সুরু করেছে। অধঃপাতে যাওয়া পিতৃস্বান পরিবারের ছেলেদের, আর উঁচুতে-উঠে পড়া প্লীব নওাজোয়ানদের দিয়ে তৈরী হলো এক নূতন মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া সমাজ—যাদের পয়সা খুব বেশি নয়, কিন্তু বিদ্যা ও বুদ্ধিবলে সকলকে চালাবার ক্ষমতা অর্জন করেছে। রোমের সমাজে এই নূতন মধ্যবিত্তরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাপে পিতৃস্বানদের কৌলীন্যর গোঁড়ামি গেল ভেঙে, এমনকি বিবাহাদি বিষয়ে পূর্বের বাধা গেল উঠে। পিতৃস্বান-প্লীবদের বিবাহ হলো আইনসিদ্ধ। সামাজিক ভেদ ঘুচে যাচ্ছে সত্য, কিন্তু দেখা দিচ্ছে নূতন সমস্যা—কাঞ্চন কৌলীন্য আসছে সমাজে। লোকে বেশ বুঝছে পৃথিবী টাকার বশ। সকলে ঝুঁকছে ধনদৌলত রোজগারের দিকে কারণ ধন হলেই জন বা মানুষ পাওয়া যায় এবং ধন ও জন হলেই রাজ্যের উপর প্রভুত্ব করা যায়। ধন লোভ শান পেতে পেতে সমাজে শ্রেণীসংঘাত সরু হলো এই সময় হতে।

ইউট্রাসকানরা ঘরে-বাইরে মার খেয়েছে,—জলযুদ্ধে সিসিলির গ্রীকদের কাছে,—দেশের ভিতর গল্‌দের কাছে। এবার রোমানদের আক্রমণের পালা। সুসভ্য ইউট্রাসকানদের বড় বড় নগরী একটারপর একটা দখল হতে। থাকলো। রোমানরা অনেক কিছু ভাল-মন্দ সংস্কার পেলো। কর্কশ জীবনে অনেক পরিবর্তন এলো। শিল্পকলায় ইউট্রাসকানদের খুব নামডাক। তাদের কবরের মধ্যে যেসব রঙ করা পোড়ামাটির পাত্র পাওয়া গিয়েছে—তা এখন পর্যন্ত লোকে অবাক হয়ে দেখে। ইউট্রাসকানদের ধর্ম থেকে রোমানরা অনেক আবর্জনা কুড়িয়ে নেয়—বহুকাল সেসব ভার তাদের বইতে হয়।

ইউট্রাসকানদের দেশ দখল হলে লোকে 'রোমান' হয়ে রোমবাসীদের সমতুল্য অধিকার পেলো আইনের চোখে; এটা রোমানদের একটা নূতন পরীক্ষা। এতকাল অন্যের দেশ জয় করে বিজিতদের সকলের চোখে হীন করে রাখা ছিল রেওয়াজ, কিন্তু রোমানরা বিজিতদের সমান অধিকার দিয়ে বললে যে তোমরাও 'রোমান'। এইভাবে ইতালির মাঝখানে নূতন আদর্শের আওয়াজ তুলে রোমানরা শক্তিশালী হয়ে উঠলো; তাদের রাজ্য বৃদ্ধির পথে চললো।

লাভ আর লোভের মধ্যে তফাৎ একটা ইলেকের। মধ্য-ইতালি লাভ করে রোমানদের চোখ পড়লো দক্ষিণ ইতালির গ্রীকদের উপনিবেশগুলির ওপরে। অতি-সুসভ্য, অতি-সমৃদ্ধ তারা—তাদের ধন ঐশ্বর্যের তুলনা নেই।

রোমের সিনেটে সম্ভ্রান্তদের আসন টলমল করছে—মধ্যবিত্তরা জাগছে; শ্রেণী সংগ্রাম দেখা দিচ্ছে নানা ভাবে সমাজের নানা কোঠায়। এই অবস্থায় বুদ্ধিমান সম্ভ্রান্তের দল দেশের লোকের মনোযোগটা রোমের ঘরোয়া বাদবিতণ্ডা থেকে বাইরের দিকে দিলেন ঠেলে; অর্থাৎ রোমের মধ্যে বসে আসন ও অধিকার নিয়ে টানাটানি করার চেয়ে জনতার মাথায় অন্যের দেশ জয়ের বুদ্ধিটা ঢোকাতে পারলে কিছুকালের মতো নিশ্চিন্ত থাকা যায়—এই সহজ রাজনীতিক চাল চাললেন সিনেটরা! দক্ষিণ ইতালির গ্রীকদের সঙ্গে ছুতায় নাতায় লড়াই দিল বাঁধিয়ে; পরদেশ জয় করবার জন্য জনতাকে উত্তেজিত করা খুব সহজ।

দক্ষিণ ইতালির টরেণ্টাম ও সিসিলির সাইরাক্যুস গ্রীকদের সেরা দুই উপনিবেশ। শিল্প শোভায়, ব্যবসায়-বাণিজ্যে ধনৈশ্বর্যে এখন এরা মাতৃভূমি গ্রীসকে টেক্কা দিচ্ছে। কিন্তু কথায় বলে 'স্বভাব যায় না মলে', আর কয়লা ধুলেও সফেদ হয় না। দেশে থাকতে গ্রীকদের নগরে নগরে বা জাতে-জাতে যে ঝগড়া চলতো, তা তারা সঙ্গে করে এনেছিল বিদেশে। এটা যে কেবল গ্রীকদের বৈশিষ্ট্য তা বলা যায় না; সব জাতই চিরদিন এটি করে আসছে। বর্তমান যুগে পর্তুগীজ, স্পেনীশ, ডাচ্, ইংরেজ, ফরাসীরা য়ুরোপের বাইরে যে মহাদেশে গিয়ে কলোনী গড়েছিল, সেখানেই য়ুরোপের

ঝগড়া নূতন দেশেও বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণ ইতালীর টরেন্টো ও সিসিলির সাইরাকুসের ঘরোয়া যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দী দলের একপক্ষ ডাক দিলো রোমানদের; তারা তো মুখিয়ে আছে বিবাদ বাঁধিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য। আর প্রতিপক্ষ বেগতিক দেখে ডাক দিয়ে আনলো—সুদূর গ্রীস্ থেকে এপিরাসের রাজা পিরাসকে। পিরাসের রাজ্য ছিল এখনকার আলবেনিয়ার দক্ষিণে এপিরাস-এ। এরা খাঁটি গ্রীক নয়, আদিমযুগের লোকেদের বংশধর—এখন 'গ্রীক' হয়েছে শিক্ষা-দীক্ষা পেয়ে মাকিদানবাসীদের মতোই। পিরাস-এর পূর্ব-পুরুষরা আলেকজেন্দারের মাতুল গোষ্ঠির লোক। পিরাস (খ্রী. পূ. ২৯৫-২৭২) আলেকজেন্দারের কীর্তিকাহিনী প'ড়ে-শুনে তাঁরই মতো দিগ্বিজয়ী হ'বার স্বপ্ন দেখছিলেন। এপিরাসের উপকূলে দাঁড়ালে ইতালির তীরভূমি দেখা যায়। পশ্চিম জগতে নূতন সাম্রাজ্য গড়বার কল্পনা জাগছে পিরাসের মনে। পূর্বদিকে এগুবার তো আশা নেই কারণ সেখানে সেল্যুকিড ও পটলেমিরা এশিয়া ও আফ্রিকায় জাঁকিয়ে বসে রাজত্ব করছে। টরেন্টাম থেকে আহ্বান আসলে মহআনন্দে পিরাস যুদ্ধ-যাত্রা করলেন।

সৈন্য সামন্ত, লোকলস্কর ও কুড়িটা যুদ্ধের হাতী নিয়ে পিরাস (Pyrrhus) সাগর পার হলেন। রোমানরা কখনো হাতী চোখে দেখেনি। এসব হাতী সংগ্রহ হতো আফ্রিকার জঙ্গল থেকে; যুদ্ধের সময় এরা ছিল আজকালকার ট্যাংকের মতো; সমস্ত ভেঙে-চুরে গুঁড়িয়ে চলতো। এই যুদ্ধে রোমানরা হারলো। পিরাস সৈন্য নিয়ে দক্ষিণ ইতালি জয় করে* রোম মহানগরীর কাছে হাজির হয়ে ভাবছেন রোমানরা এবার সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আসবে; কিন্তু রোমানরা অটল, অচল—কিছুতেই কোনো আপোষ মীমাংসা করবার জন্য এগিয়ে এলোনা।

পিরাসের দুঃসাহস দেখে রোমানরা দেশের বাইরে মিত্র খুঁজতে গিয়ে পেলো কার্থেজকে। কার্থেজীরা উত্তর আফ্রিকার বাসিন্দা—ব্যবসায়ে মধ্যধরণী সাগরে একছত্র অধিপতি—তাদের যুদ্ধ জাহাজও অনেক। এই কার্থেজীয়দের অনেক ব্যবসার আড়ত ছিল সিসিলি দ্বীপে। রোমের পক্ষে কার্থেজীয়দের যোগদান করতে দেখে পিরাস খুশিই হলেন। তিনি দেখলেন এই সুযোগে কার্থেজীয়দের ধ্বংস করা যাবে,—তারা তো সমুদ্রে গ্রীকদের বখেরাদার। তাদের গর্ব চূর্ণ করবেন ভেবে যখন সিসিলি আক্রমণ করলেন,

---

* ইংরেজিতে Phrase আছে, Pyrrhic Victory: a Victory gained at great cost, like that of Pyrrhus over the Romans at Asculum.

তখন তাঁর গ্রীক মিত্ররা স্বপ্নের মতো রণাঙ্গন ছেড়ে উধাও হয়েছে—কাউকে দেখা গেল না ত্রিসীমানায়। ওদিকে সমুদ্রে কার্থেজীয়রা পিরাসের নৌবহর দিল জখম করে। সমস্ত জাহাজ ডুবি হ'লে গ্রীক্‌রা তো সিসিলি'তে আটকা পড়বে—দেশে ফেরাই হবে দায়! তাই তাড়াতাড়ি পিরাস তাঁর রাজ্য এপিরাসে ফিরে এলেন; আলেকজেন্দারের মতো সাম্রাজ্য গড়বার স্বপ্ন গেল ভেঙে। পিরাসের দেশে ফিরবার আরও একটা কারণ ছিল; গল্‌ নামে জাতির একটা শাখা বলকান উপদ্বীপে ঢুকেছে। এবার তাঁর নিজের রাজ্যই বুঝি যায়!

দেখতে দেখতে সমস্ত দক্ষিণ ইতালি রোমানদের দখলে এলো,—রাজা-হীন রাষ্ট্রের একটা নগরীর তাঁবে সমস্ত ইতালি উপদ্বীপটা এসে গেলো। কিন্তু এই রাজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে রোমের নূতন নূতন সমস্যা দেখা দিল।

নূতন দেশের অধিবাসীদের বশে রাখবার জন্য রোমের সিনেট প্রথমেই পাঠিয়ে দেন রোমান চাষীদের দেশের ভিতর গিয়ে চাষ ও বাস করবার জন্য। আর রোম থেকে বড় বড় শহর পর্যন্ত রাজপথ নির্মাণ করা হয়। আমরা ভারতের ইতিহাসেও এটা দেখতে পাই। মুসলমান যুগে দেশের মধ্যে বড় বড় বাদশাহী সড়ক তৈরী হয়েছিল আর অধিকৃত রাজ্যের মাঝে মাঝেই মুসলমান কস্‌বা বা থানা ও বসতি স্থাপিত হতো। ভারতের মানচিত্র একটু মনোনিবেশকরে দেখলে জানা যাবে যে কয়েকখানা গ্রামের পরে পরেই মুসলমান পাঠানদের একটা করে কলোনী ফৌজদাররা বসিয়েছিলেন। অধিকৃত দেশের লোককে সদা-ত্রস্ত রাখেন ও তাদের উপর কড়া নজর রাখবার জন্য এইসব ব্যবস্থা। সামাজ্যবাদীদের এইটা খুব বড় অস্ত্র।

ইতালি তো বিজিত হলো। রোমানরা সমস্ত নগরের লোকদের 'রোমান' নাগরিকের অধিকার দিয়ে বুঝিয়ে দিল যে তারাও সাম্রাজ্যের অংশীদার; যারা শত্রু ছিল তারা হলো মিত্র। আমাদের যুগে ইংরেজ-বুয়রে যুদ্ধে বুয়ররা যায় হেরে; কিন্তু দশ বৎসর যেতে না যেতে ইংরেজ বুয়রদের নানা অধিকার দিয়ে এমন আপনার করে নিল যে চার বছর পরে ১৯১৪ সালে জারমানদের সঙ্গে যুদ্ধে, এই বুয়রদের সেনাপতি হলেন ব্রিটিশের পরম মিত্র। রোমানরাও তাই করে দক্ষিণ গ্রীকদের জয় করে নিল।

রোমের শাসন ব্যবস্থায় প্রতিনিধি নির্বাচন করে কাজ চালাবার রীতি চালু হয় নি। রোম মহানগরী শাসনচক্রের কেন্দ্র,—সকল 'রোমান'কে রোমে

এসে ভোট দিতে হয়। কিন্তু সেটা দূর দূরান্তবাসী লোকেদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। ফলে রোমের জনতাই সকল শ্রেণীর কাজের উমেদারদের ভোট দিয়ে বেছে নেয়—কি সিনেটে, কি অন্যসব কমিটিতে। এর ফল হয় খুবই সাংঘাতিক। দূর প্রান্তের কোনো জবরদস্ত নেতার সিনেট প্রবেশের ইচ্ছা হলে, তাকে রোমে আসতে হতো ভোটের জন্য। কিন্তু রোমে তো শুধুহাতে এসে সিনেটের সদস্য পদ পাওয়া যায় না। তাই রোমে এসে সেখানকার লোকদের খানা-পানা দিয়ে, সার্কাস দেখিয়ে মন ভুলিয়ে দলে টেনে ভোট সংগ্রহ করতে হয়—সেজন্য রীতিমতো পয়সা খরচ হয়। প্রতিনিধি পাঠাবার ব্যবস্থা থাকলে এসব হতে পারতো না। কালে রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংসের এটাও হয়েছিল একটা কারণ।

রোম এখন ইতালির সর্বেশ্বর। মধ্যধরণী সাগর ইতালিকে তিন দিকে ঘিরে আছে। এই সাগর অনেকটা হ্রদের মতো—একটা দিক মাত্র খোলা—অতলান্তিক মহাসাগরে যাওয়া-আসার সংকীর্ণ প্রণালী জিবরলতর। মধ্য ধরণী সাগরতীরে তখন রোম ছাড়া চারটা রাজ্য প্রবল। বলকান উপদ্বীপে মাকিদানী সাম্রাজ্য—সমস্ত গ্রীস এখন তাদের তাঁবে। এশিয়ার উপকূলে সিরীয়ায় হেলেনিক সাম্রাজ্য। আফ্রিকার মিশরে প্টলেমিদের রাজ্য; এই তিনটা রাজাই গ্রীকদের—সকলেই। মাকিদনপতি আলেকজেন্দারের সেনাপতিদের বংশধর। এ কয়টি ছাড়া আছে উত্তর আফ্রিকায় কার্থেজীয়দের একবিশাল সাম্রাজ্য; এরা সেমেটিক মহাজাতিভুক্ত ফিনিকদের শাখা কার্থেজ বা কাথাডা নামে নগর গড়ে খ্রীষ্টাব্দের প্রায় ৭০০বৎসর পূর্বে—রোম পত্তনের একশ বৎসরের মধ্যে; সুতরাং প্রায় সমসাময়িক। কার্থাডা শব্দের অর্থ হচ্ছে নূতন শহর যমন নেপল্স অর্থাৎ নিও-পোলিস নবপুরী বা 'নবনগর'। ফিনিকদের অস্তিত্বের কথা ইতিহাসের পাতায় আলেকজেন্দারের পরে আর পাওয়া যায় না—এখন তাদের কন্যানগরী কার্থেজের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ মধ্যধরণী সাগরে। কার্থেজ ছাড়া ফিনিকদের আরও অনেকগুলি ছোট ছোট কলোনী ছিল আফ্রিকার সাগরতীরে ও বহু দ্বীপের মাঝে; কালে সবাই কার্থেজের কুক্ষিগত হয়।

* প্রাচীন কালের নাম Pillars of Hercules; স্পেনের ভিতর পাহাড়ের নাম ছিল Calpe; আফ্রিকা অংশের নাম ছিল Abila। জিবরলতর আরবী নাম।

কার্থেজও রোমের মতো রাজাহীন রাষ্ট্র। তবে রোমের সঙ্গে তার অনেক তফাত। রোমানরা সাম্রাজ্য গ'ড়ে বিজিতদের 'রোমান' হবার অধিকার দেয়, কাগজে-কলমে প্রবাদে বচনে সকল রোমানের সমান অধিকার তারা স্বীকার করে নেয়। আর কার্থেজীয়রা উত্তর আফ্রিকার অনেকটা দেশ দাসভূমে পরিণত করে রাখে। ব্যবসায় বাণিজ্য করে তারা অতুল ধনের মালিক। অপরিমিত ধন সঞ্চয়ের যা অবশ্যম্ভাবী পরিণাম তাই ঘটেছে এদের জীবনে। তারা ভাবে টাকা দিয়ে সব কেনা যায়,—সৈন্য পাওয়া যায় শত্রু মারবার জন্য ও শত্রুহস্তে মরবার জন্য, জাহাজ বানানো যায় বাণিজ্য করবার জন্য, তারা জানে' পৃথিবীটা কার বশ। ঘুষ দিয়ে শত্রুপক্ষের লোকদের কেনা যায়!

আফ্রিকার মধ্যে তারা নিজেরা যায় লোকও পাঠায়; ধরে আনে হাতী, সংগ্রহ করে আনে হাতীর দাঁত, ঔষধপত্র আর আনে নিগ্রো দাস শিকলে বেঁধে। মধ্যধরণী সাগরের তীরে তীরে ও দ্বীপে দ্বীপে তাদের ব্যবসার কেন্দ্র, বন্দরে বন্দরে ঘুরছে তাদের বাণিজ্য তরণী পাল তুলে—শিকল আঁটা দাসের দল জাহাজের খোলের মধ্যে বসে দাঁড় টানছে। সে সময়ে বাণিজ্যে কেউ তাদের সমকক্ষ নেই, প্রতিযোগী হবার শক্তিও কেউ ধরে না।

আজকার মানচিত্রে আফ্রিকার উত্তরে যে টিউনিসিয়া রিপাবলিক আছে, সেখানে ছিল কার্থেজ। কার্থেজের অপর পারেই সিসিলি দ্বীপ। এই দ্বীপে গ্রীক্‌রা কলোনী করে আছে বহুকাল—সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কার্থেজীয়দেরও আর্থিক স্বার্থ জড়িয়ে আছে দ্বীপের সঙ্গে—কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের তাদের অনেক কুঠি সেখানে। সিসিলি দ্বীপের উপর মাতব্বরি কারা করবে তাই নিয়ে চলে রেষারেষি—যেমন আজও চল্‌ছে পৃথিবীর নানা দেশে প্রবল পক্ষদের মধ্যে। রোম দেখছে কার্থেজীয়রা ধীরে ধীরে তাদের দেশের গা ঘেঁষা-দ্বীপ সিসিলিতে কায়েম হয়ে বসছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিপদটা রোমানদেরই বেশি; তাই যে করে হোক্‌ এই সেমেটিক বন্যা রুখতেই হবে।

রাজনীতিকদের পক্ষে, যুদ্ধ বাঁধাবার কারণ খুঁজে বের করা কঠিন হয় না। যুদ্ধ বাঁধলো সাগর-পারে; কিন্তু রোমানরা তো আর সাগরচর জাত

নয়। তাই জল যুদ্ধে হারলো তারা। কার্থেজীয়দের ঝড়ে-ভাঙা একটা জাহাজ পড়লো এসে ইতালির উপকূলে। রোমানরা সেটাকে মডেল্ করে নিয়ে, অনেকগুলি জাহাজ বানিয়ে ফেললো,—আপিনাইন পাহাড়ে যথেষ্ট ভালো কাঠ পাওয়া যায়। জাহাজ চালাবার জন্য তারা নিযুক্ত করলো দক্ষিণ ইতালির গ্রীকদের, তারা জাত-নাবিক—পয়সা পেলেই নোকরী করে। এই নূতন নৌবহর নিয়ে কার্থেজীয়দের সঙ্গে শক্তির পরীক্ষা ক'রে রোমানরাই জয়ী হলো;—কার্থেজীয়দের তাড়ালো। বর্তমান যুগে এধরণের ঘটনার সঙ্গে অনেকবার দেখা হবে।

রোমের সঙ্গে কার্থেজের সন্ধি হলো, কিন্তু শান্তি এলো না। কার্থেজের নূতন বিপদ দেখা দিল। যুদ্ধে নিছক ভাড়াটিয়া সৈন্যরা কার্থেজে ফিরে বকেয়া বেতন দাবী করলো; যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে রাজকোষের নগদ টাকা সব শেষ হয়ে গেছে; আর জাত-বানিয়া কার্থেজীয়রা সবাই প্রায় এক কিন্তু একজন ধনকুবের, সহজে টাকা বের করতে নারাজ। ফলে ভাড়াটিয়া সৈন্যরা বিদ্রোহী হয়ে নগরে ভীষণ উপদ্রব সুরু করলো। অনেক কষ্টে বিদ্রোহ দমন হলো। এই সময়ে রোমান সিনেটরগণ খুবই ভদ্রতা দেখান; —নিজেদের জাহাজে করে কার্থেজে খাদ্য সরবরাহ পর্যন্ত করেছিলেন। এইভাবে বাইশ বৎসর শান্তিতে কাটলো। এই সময়ের মধ্যে কার্থেজ ব্যবসায় বানিজ্য ক'রে আবার শক্তিশালী হয়, যেমন প্রথম মহাযুদ্ধে জারমানরা হেরে যাবার পর বিশ বৎসরের মধ্যে সামলে উঠেছিল।

কিন্তু রোমের গণতন্ত্রের শাসনপ্রধানরা বা কন্সালরা প্রতিবৎসর নির্বাচিত হন; তাই সেখানে রাজনীতির পলিসি বা অভিপ্রায় যে একভাবেই চলবে তা আশা করা যায় না। নূতন সিনেট ও কন্সালদের দৃষ্টি পড়লো সার্দিনিয়া দ্বীপের উপর। সার্দিনিয়া ও কর্সিকা দ্বীপ দু'টোই ছিল কার্থেজীয়দের দখলে। সার্দিনিয়াতে রূপোর খনি আবিষ্কার হয়েছে, তাই রোমানদের সে দ্বীপটা পাওয়া একান্ত হয়ে উঠলো। ছুতানাতায় যুদ্ধের হুমকি করলে রোমানরা। কার্থেজীয়রা বেনের জাত, যুদ্ধ ভালোবাসে না প্রথম যুদ্ধেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। তাই রোমানদের অনেক করে বোঝালো যে তারা শান্তিকামী ব্যবসায়ী—যুদ্ধে তাদের আদৌ ইচ্ছা নেই। রোম কি এ-কথা শোনে? যুদ্ধের থেকে সোয়াস্তি ভালো ভেবে কার্থেজীয়রা

সার্দিনিয়া ছেড়ে দিল রোমানদের। এই খনির লোভে যুদ্ধ চিরকাল হয়ে এসেছে, এখনো মানুষের সে-লোভের শেষ হয়নি। কোথায় পেট্রোলিয়াম তেল, লোহার খনি, বক্সাইটের স্তর, য়ুরেনিয়ামের আকর,—সেসব পাবার জন্য প্রবল শক্তিদের মধ্যে কী রেশারেশি চলছে!

এক কূল ভাঙে তো আর এক কূল গড়ে। সার্দিনিয়ার রূপোর খনি গেলো, স্পেন দেশে কার্থেজীয়রা নূতন খনির সন্ধান পেলো। সেই ধন পেয়ে কার্থেজ আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এইসব দেখে-শুনে রোমের বুকে হিংসা ও লোভের আগুন আবার জ্বলে উঠে। স্পেনরাজ্যের সীমানা নিয়ে কার্থেজের উপর জবরদস্তি সুরু করলো রোমানরা, তারা ব'লে পাঠালো এব্রো নদীর দক্ষিণ পর্যন্ত কার্থেজীয়দের সীমানা—তার উত্তরের দেশ রোমানদের। অথচ রোমানরা যে সে-দেশ কখনো জয় করেনি, অথচ তাদের প্রভাবের আওতায় পড়ে ঐ অঞ্চল। এই অজুহাতে রোমানরা হুমকি করতে থাকে; মোটকথা কোনো রকমে কার্থেজকে যুদ্ধে নামানো ছিল রোমের আসল উদ্দেশ্য।

প্রবল রাষ্ট্রশক্তিগুলি নিজ নিজ এলাকার আশে-পাশের দুর্বল দেশ গুলিকে আপন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আওতায় টানবার (sphere of influence) জন্য কী কাণ্ডটা-ই না করে আসছেন এবং আজও করছেন, এর থেকে যত বিরোধ ও বিপত্তির সৃষ্টি।

এবার যুদ্ধের চাকি ঘুরতে চল্‌লো কার্থেজীয়দের অনুকূলে। এবার রোম-কার্থেজী বা পিউনিক যুদ্ধের নেতা কার্থেজীয় সর্দার হানিবল। হানিবলের মতো দুঃসাহসিক রণ-ধুরন্ধর নেতার জুড়ি মেলে না। হানিবল স্পেনেই মানুষ—আট বৎসর বয়সে কার্থেজ ত্যাগ করে বাপের সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলেন—দেশ কখনো দেখেনি। কার্থেজের বানিয়া শাসক গোষ্ঠিকে তিনি চিনতেন না; আর তারাও এই যুদ্ধকামী বীরের ভাবগতিক বুঝতো না। যাই হোক, হানিবল ঠিক করলেন রোমানদের দেশে ঢুকে তাদের উচিত শিক্ষা দিতে হবে। স্পেনের সৈন্য স্পেনের ধনে পুষ্ট; কার্থেজের রাজকোষ থেকে তাদের খরচ জোগাতে হবে না শুনেই বানিয়া কার্থেজীয়রা ভারি খুসি! হানিবল যদি জয়ী হয় তো তাদেরই লাভ। আর হারলে তাদের লোকসান নেই!

বিরাট বাহিনী নিয়ে স্থলপথে হানিবল ইতালি আক্রমণে চললেন। সঙ্গে নিলেন বহুশত যুদ্ধের হাতী। স্পেন ও গলিয়া (ফ্রান্স) মধ্যে পিরীনীস পাহাড়ের জঙ্গল ভেদ করে তারা এসে পড়লো দক্ষিণ ফ্রানসে। সামনে বিশাল রোননদী, নৌকা করে সব সৈন্য, লটবহর পার করানো হ'লো—সেটা সহজ কাজ নয়। কিন্তু আসল পরীক্ষা সুরু হলো আল্‌পস পাহাড় পার হবার সময়। হাজার হাজার সৈন্য, সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া হাতী নিয়ে এই অজানা আল্লসের গিরিপথ অতিক্রম করতে গিয়ে অনেক লোকসান হ'লো হানিবলের। সাধারণ মানুষের প্রাণের মূল্য নেই রণ-ধুরন্ধরদের কাছে। তারা সুমুখের দিকে চোখ রেখে আগিয়ে চলে—পাশে কারা খদের মধ্যে হাতী সমেত গড়িয়ে পড়লো—সে দিকে দৃষ্টি দেবার সময় নেই। আহত ও মুমূর্ষদের আর্তনাদ শুনতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ হতে পারে—কিন্তু তাতে কর্ণপাত করবার সময় কোথায়—আগিয়ে চলতে হবে—সামনে বর্ষা! বর্ষার আগে ইতালির সমতলে পৌছতেই হ'বে—খাদ্য চাই সরঞ্জাম চাই, সে সব লুটপাট করে লড়াই করতে হবে!

ইতালিতে হানিবল প্রবেশ করলেন সেই পঙ্গপাল সৈন্যদল নিয়ে। তারপর চললো যুদ্ধের জোয়ার-ভাঁটা ষোলো বৎসর ধরে। এতো বৎসর ধরে একটানা এমন যুদ্ধ পৃথিবীতে কখনো হয়নি। ইতালি তছনছ হলো উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূব থেকে পশ্চিম। কিন্তু রোমে ঢুকবার সাহস হলো না হানিবলের। রোমানরা কয়েকবার যুদ্ধ করে এমনভাবে হারলো—আর এত লোক হারালো যে, কার্থেজীয় সর্দারের সঙ্গে 'সম্মুখ সমরে' তাল ঠুকতে তারা সাহস পেল না। দূর থেকে আগলে আগলে ঘুরতে থাকে—সুবিধা পেলেই অতর্কিতে আক্রমণ করে—রসদপত্র আটকায়, সম্মুখ যুদ্ধ কিছুতেই আসে না।

হানিবলের সৈন্য তো অফুরন্ত নয়; ষোলো বৎসর আগে যেসব সৈন্যরা এসেছিল তাদের সংখ্যাও কমছে প্রতিদিন দু'দশটা করে, আর তাদের দেহের শক্তিও আসছে কমে বয়স বাড়ছে বলে। কার্থেজে সৈন্যের জন্য লিখলে তারা সোজা জবাব দিল কোনো সহায়তা তারা করতে পারবে না। এদিকে রোমানরা স্পেনের সঙ্গে হানিবলের যোগা-যোগের পথ দিল বন্ধ করে। হানিবলের ভাই সৈন্য নিয়ে আসছিল স্পেন থেকে, তাদের রুখে দিল বাধপথে। হসক্রুবলের মাথা কেটে

ডালি পাঠিয়ে দিল হানিবলের শিবিরে। এরপর রোমানরা আর একটা বড় রকম চাল চাললো, তারা সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দিল কার্থেজ আক্রমণ করবার জন্য। হানিবল এসেছিলেন রোম জয় করতে; এখন দেখা গেল রোমানরাই কার্থেজের দরজায় হানা দিতে হাজির।

কার্থেজ থেকে দূত এলো হানিবলকে সসৈন্যে দেশে ফিরে যাবার হুকুম নিয়ে। সেখানকার অবস্থা খুবই মন্দ। ইতালির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত দেখে, কার্থেজের প্রতিবেশী, চিরশত্রু নিউমিডিয়ান্‌রা কার্থেজ আক্রমণ করেছে। হানিবলকে ফিরতেই হলো। কিন্তু সেদেশ তার সম্পূর্ণ অজানা, লোকেরা অপরিচিত। কার্থেজীয় সৈন্যর সঙ্গে জামা (Zama) নামে একটা জায়গায় যুদ্ধ হলো রোমানদের। যুদ্ধে হানিবল হারলেন,। হানিবলের পরাজয়ের অর্থ কার্থেজের ধ্বংস—কারণ রোমান সৈন্যরা তখন সেখানে মোতায়েন রয়েছে।

সন্ধি হলো রোমে কার্থেজে। সন্ধির শর্তগুলি পড়লে—প্রথম মহাযুদ্ধের পর পরাজিত জারমেনীর উপর যেসব কঠোর শর্ত চাপানো হয়—তারই কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রথমত কার্থেজের জাহাজগুলি গেল রোমের দখলে; কার্থেজের অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধোপকরণ সমস্ত দিতে হলো রোমানদের হাতে তুলে; এর উপর বহু কোটি টাকা যুদ্ধের খেসারত চাপলো। উপনিবেশের মধ্যে স্পেন ছেড়ে দিতে হলো রোমকে।

হানিবল কার্থেজের ভিতরের দুর্নীতি ও গলদ ঘোচাবার অনেক চেষ্টা করলেন। ভাবছেন—আবার ভাঙা ঘরে খুঁটি দিয়ে তাকে মজবুত ক'রে তুলবেন। কিন্তু বানিয়া গোষ্ঠি শান্তি চায় যেকোন শর্তে। তারা মনে করে যত নষ্টের গোড়া হানিবল, তাই তারা তাঁকে রোমানদের হাতে সমর্পণ করে দেবার জন্যও ষড়যন্ত্র করতে লাগলো। এর আভাস পেয়ে হানিবল দেশ ছেড়ে পালালেন। তার পরের কথা আর ইতিহাসের বিষয় নয়। ইতিহাসের আঙিনায় উল্‌কার মতো তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল; এমন কিছু রেখে যাননি—যার কথা এখন লোকে স্মরণ করতে পারে—তাঁর অসীম বীরত্ব ও সাহস ছাড়া।

পঞ্চাশ বৎসর কেটে গেল; এর মধ্যে রোমান সমাজে যুগান্তর এসেছে

সিসিলির গ্রীক নগরীর সভ্য সমাজের চালচলন, তাদের মার্জিত মনের বুদ্ধি বিবেচনা, তাদের শিল্পকলা, তাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের বিশালতা ও গভীরতা— সবই রূঢ় রোমানদের কাছে অদ্ভুত সৃষ্টি বলে মনে হয়। দক্ষিণ ইতালির যেসব গ্রীক্ নগরী রোমের বিরুদ্ধে হানিবলকে সাহায্য করেছিল, তাদের উপর রোমান সিনেটরদের কোপটা গিয়ে পড়লো এবার। সেই সব নগরীর ধন দৌলত লুট হলো, শিল্প-শোভার অনেক নিদর্শন পৌঁছলো গিয়ে রোমানদের ঘরে ঘরে। সেসব ভাস্কর্য আসবাবপত্র রোমানরা কখনো চোখেও দেখেনি। গ্রীকদের ভাষা সাহিত্যের স্বাদ তারা পেলো এই দক্ষিণ ইতালির গ্রীকদের কাছ থেকে। রোমান যুবকদের সেসব সাহিত্য পড়বার জন্য কী উৎসাহ! রোমান নওজোয়ানের দল পরাজিত গ্রীকদের সাহিত্যের সৌন্দর্যে এমনভাবে মুগ্ধ হলো যে, বৃদ্ধ সিনেটরগণ তা দেখে শুনে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

রোমের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে হুহু করে বদল হয়ে চলেছে; নিম্ন শ্রেণীর প্লীব ও উচ্চ শ্রেণীর পিতৃস্থানদের ভেদ অনেক কাল ঘুচে গেছে। এখন সে-সমাজে ধনী ও নির্ধনের শ্রেণী সংঘাত সুরু হচ্ছে। হিংসার বিষবীজ চারদিকে বোনা চলেছে—পরোপকারের নামে। এমন অবস্থায় সিনেটে রব উঠলো কার্থেজকে ধ্বংস করতে হবে। হানিবলের অন্তর্ধানের পর কার্থেজীয়রা কোনো রকমে ব্যবসায় বাণিজ্য করে টিকে ছিল—তার বেশি ফালতু কিছু করবার মতো শক্তি তাদের ছিল না; তবুও রোমানদের ভয়—আবার যদি জাগে! শেষ পর্যন্ত কার্থেজ ধ্বংস করাই হলো—নিষ্ঠুরভাবে অমানুষিক অত্যাচার করে সোনার নগরী পুড়িয়ে ছারখার করে দিল রোমানরা। ধ্বংস হবার আগে কার্থেজীয়রা যে বীরত্ব ও আত্মত্যাগ দেখিয়েছিল, পূর্বে যদি তার কিছুটাও দেখাতে তবে এই দারুণ পরিণাম হয়তো এভাবে ঘটতো না। ভাগ্যবিধাতা সেদিন হেসেছিলেন। তখন কে জানতো কয়েক শ' বৎসর পরে ভান্ডাল নামে এক উপজাতির লোকে এই টিউনিস থেকে গিয়ে সোনার রোমকে পুড়িয়ে ছারেখারে দেবে। যথাস্থানে সে কথা আসবে।

রাজাহীন রোমের রাজ্য বাড়তে বাড়তে এখন বহুদূর পৌঁচেছে;

দক্ষিণে সিসিলি, আফ্রিকায় কার্থেজ, পশ্চিমে স্পেন বা আইবেরিয়াণ উপদ্বীপ এখন রোমান আধিপত্য মধ্যে এসেছে। অপরিমিত ধন দৌলতের সঙ্গে নগরে আসছে নানা জাতির ক্রীতদাসের দল—যুদ্ধে বন্দী অগণিত নরনারী। এইসব বিদেশী দাস-দাসী, বন্দী-বন্দিনীরা রোমান সমাজ জীবনে বিপুল পরিবর্তন আনলো, নাগরিক জীবনে অনেক আবর্জনা জমিয়ে তুললো। রোমান সমাজে যে দারুণ সমস্যা ঘনিয়ে আসছে, সেকথা কারও মনে হচ্ছে না। একদিন রোমানদের এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল—আসবে সে কথা যথাস্থানে।

রাজ্যের মধ্যে আর্থিক সমস্যা দেখা দিলে অর্থাৎ সাধারণ লোকের খাওয়াপরার অভাব হলে অসন্তোষের আগুন গুমরে ওঠে। তখন বুদ্ধিমান শাসক-গোষ্ঠি আপনাদের আসন বজায় রাখবার জন্য জনতার মনটা দেশের বাইরে কোন একটা যুদ্ধের দিকে চালিয়ে দেন। ধূর্ত শাসকগোষ্ঠি রব তোলেন 'রাষ্ট্র বিপন্ন, ধর্ম বিপন্ন সংস্কৃতি বিপন্ন'। রোমানরা জানে দেশের বাইরে একটা যুদ্ধ বাঁধাতে পারলে অনেক লাভ। নূতন দেশ জয় হলে, সম্ভ্রান্ত বংশের বেকার যুবকরা 'প্রদেশে' (province) ভাল চাকরী পায়। তাই এবার রোমানদের মন গেল গ্রীকদের রাজ্যগুলি জয় করবার দিকে।

মধ্যপ্রাচ্য বলতে এখন বুঝায় এশিয়ার পশ্চিমস্থিত ইহুদী আরবদের রাজ্যগুলি—তার সঙ্গে মিশরকেও ধরা হয়; বর্তমানে এখানকার প্রধান ভাষা আরবী। আর যেযুগের কথা এখন আমরা আলোচনা করছি, অর্থাৎ খ্রীষ্ট জন্মাবার দুইশত বৎসর আগের পর্ব—তখন এই দিকটা ছিল গ্রীক্ ভাষীদের দেশ। মাকিদনাধিপতি আলেকজেন্দারের মৃত্যুর পর একশ' বৎসরের মধ্যে এই অঞ্চলটা গ্রীক্ সভ্যতা পেয়ে নূতন জাত হয়ে গেছে। গ্রীক ভাষা, গ্রীক সাহিত্য, গ্রীক দর্শন, গ্রীক শিল্পকলা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে,—বহু শতাব্দী রোমানদের তাঁবে থাকবার পরেও যীশুখ্রীষ্টের জীবনী ইহুদীরা গ্রীক ভাষায় লেখে। মোটকথা, এই বিরাট হেলেনিক মহাদেশের পরে রোমানদের লুব্ধ দৃষ্টি পড়লো।

গ্রীসের মধ্যে মাকিদনের রাজা চারদিকে উদ্ধত শত্রুদের দেখে ভয় পেয়ে ভাবছেন যে, সমস্ত গ্রীসকে একসূত্রে বাঁধতে না পারলে গ্রীসের

স্বাধীনতা আর বেশিকাল টিকবে না। মাকিদনের এই প্রয়াসের কথা জানতে পেরে রোমান সিনেট; গ্রীসের রাজাদের স্বাধীনতা বজায় রাখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। রোমান সৈন্য এসে মাকিদন-রাজকে যুদ্ধে হারিয়ে দেওয়াতে অন্যসব গ্রীক্‌রা খুব খুসি, স্বাধীনতা তো যেতে বসেছিল, গ্রীকদের ভাগ্যে রোমানরা এসে মাকিদনকে ঘায়েল করলো। কোরিন্থের নিখিল গ্রীক ক্রীড়া প্রদর্শনীতে রোমান কন্সাল ঘোষণা করলেন যে গ্রীক রাষ্ট্রগুলি সবাই স্বাধীন—তারা কেউ কারও অধীন নয়—মাকিদনেরও নয়। সভায় কী উল্লাস এই ঘোষণায়। রোম যে ভীষণ চাল চেলেছিল, তা মূর্খ গ্রীক্‌রা তখন বুঝতে পারলে না—যখন বুঝলো তখন স্বাধীনতা হারিয়ে রোমের দাস বনেছে। ভারতে ঠিক এইরূপ ঘটনা ঘটে মারাঠাদের নিয়ে; ইংরেজ কূটনীতিকদের বুদ্ধির চালে সিন্ধিয়া, হোলকার, ভোঁসলা, গায়কাবাড়রা পেশোয়ার বন্ধন ছিন্ন করে স্বাধীন রাজা হয়েছিলেন। তারপর তাঁদের কি হয়েছিল তা সকলেরই জানা।

মাকিদনকে রোমের কাছে হারতে দেখে, এবং গ্রীকদের মধ্যে টুক্‌রো টুক্‌রো স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠতে দেখে এশিয়ার পশ্চিমস্থিত সিরীয়ার গ্রীক রাজা আন্তিয়োকসের সাধ গেল গ্রীস্ আক্রমণ করতে। আন্তিয়োকস ছিলেন সেল্যুকাসের বংশের রাজা। তাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে সাম্রাজ্যের পূর্ব দিকে। আলেকজেন্দার পঞ্জাব পর্যন্ত যে-সাম্রাজ্য গড়েছিলেন, তা এখন স্বাধীন হয়ে গিয়েছে,—ভারতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও ইরানে আরসিকি রাজবংশের অভ্যুদয় হয়েছে। পূবের রাজ্য হারিয়ে আন্তিয়োকস ভাবছেন পশ্চিমে রাজ্য বিস্তার ক'রে লোকসানটা পুষিয়ে নেবেন। কার্থেজীয় বীর হানিবল আপনার জাতের লোকের কাছ থেকে তাড়া খেয়ে আশ্রয় নিয়েছেন এঁর দরবারে; হানিবলের পরামর্শে আন্তিয়োকসের এই যুদ্ধ অভিযান। গ্রীস দেশ আক্রমণ করছে সিরীয়ার গ্রীক্‌রা,—এ যেন কলোনীর লোকের পক্ষে মাতৃভূমি আক্রমণের অপরাধ—টনক নড়লো রোমের; রোমানরা সৈন্য পাঠালো গ্রীসে। থার্মোপোলির গিরিপথে যুদ্ধ হলো—সিরীয়ার সৈন্য রোমানদের কাছে পারবে কেন? রোমানদের রণনীতি ও অস্ত্রশস্ত্র গ্রীকদের থেকে অনেক উন্নত।

এই ঘটনার পর এশিয়াবাসী সিরীয়ানরা রোমানদের শত্রু হয়ে উঠলো।

সিরীয়ার অপরাধ ক্ষমা বা উপেক্ষার অযোগ্য। রোমানদের প্রভাব ও আওতার-মধ্যে-থাকা রাজ্য গ্রীস তারা আক্রমণ করে! এমন ধৃষ্টতা! সুতরাং রোমান রাজনীতিকদের মতে সিরীয়া রাজ্য এখন আক্রমণ করা যেতে পারে। রোমান সৈন্য ও সেনাপতিরা সিরীয়া সহজেই জয় করে নিলো। কী বৈভবে, কী ঐশ্বর্যে আন্তিয়োক, পেরাগারাম প্রভৃতি সিরীয়ান নগরগুলি উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। গ্রীসের নগরগুলি সুন্দর বটে, কিন্তু এশিয়ার গ্রীক নগরীর সঙ্গে ঐশ্বর্যে, সৌন্দর্যে তুলনা হয় না! সেসব নগর লুট করলো রোমানরা; লুটের মাল রোমে পৌঁছলে লোকের তাক্ লেগে গেল সেসব দেখে।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে রোম নগরী মধ্যধরণী সাগরের একছত্র অধিপতি হয়েছে। একশ বৎসর আগে সে ছিল পঞ্চ শক্তির অন্যতম—নিচের ধাপে স্থান। আজ তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। রোম এখন কার্থেজীয় সাম্রাজ্যের মালিক, রোম এখন আলেকজেন্দারের সাম্রাজ্যর মালিক, বাকি শুধু মিশর জয় করতে। এমনকি সুদূর কৃষ্ণসাগর (পণ্টাস) তীরের মিত্রদত্তের রাজ্যও রোমের দখলে এসে গিয়েছে।

সম্রাটহীন সাম্রাজ্যর পরিধি বাড়ছে, রোমে বিপুল ধন আসছে—দাসদাসী আসছে। তার সঙ্গে দেখা দিচ্ছে নাগরিক জীবনের অসংখ্য সমস্যা। সিসিলি, আফ্রিকা, মিশর থেকে আমদানী গম এসে রোমের বাজার দিল ছেয়ে; সেখানকার শস্যর দাম অনেক কম। ইতালির চাষীরা লোকসানী চাষের কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে—জমিজমা ধনীদের কাছে বিক্রয় করে, গ্রাম অঞ্চল ছেড়ে শহরে চলেছে কাজের সন্ধানে। ধনীরা সস্তায় চাষের জমি কিনে ফেলে; বড় বড় চাষবাড়ি ও খামার করে, সস্তায়-কেনা জোয়ান দাসদের দিয়ে কাজ চালায়। ভিলা বা প্রমোদগৃহ বানায় শহর থেকে দূরে গ্রামেরও বাইরে—আরামে তাদের দিবস যায়।

এত ঐশ্বর্য, এত বিলাস। তাই সমাজের ভিতর পতন ধরেছে। বিদেশে যে রোমান সৈন্যরা যায়; তাদের একাংশ সেখানেই বিয়ে করে ঘরসংসার পাতে। আবার বিদেশ-থেকে-আনা ক্রীতদাসের দল মুক্তি পেয়ে নিম্নস্তরের রোমান ঘরের মেয়ে বিয়ে সংসার করে। নানা সংকর জাতের জন্ম হয়

এইভাবে। ধনী ও নির্ধনের মধ্যে ভেদটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে—তবে এখনো মুখর বা মারমুখো হয়ে ওঠেনি। শ্রেণী সংগ্রামের দিন ঘনিয়ে আসছে—তা দুই-একজন দরদী লোক বুঝছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ ধনী—ঈসপের গল্পের একচক্ষু হরিণের মতো ছুটে চলেছে, জানেনা ব্যাধ অব্যর্থ লক্ষ্য স্থির করছে কানা চোখটার দিকেই।

ধনহীন, ভূমিহীন, কর্মহীন জনতা রোমে ভিড় করছে। এরা সকলেই রোমান, সকলেই ভোটার। ধনীরা এদের তোয়াজ করেন ভোটের জন্য; সস্তায় শস্য দেন, সার্কাস দেখান, থিএটারে পাঠান; নানাভাবে রঙ তামাসা দেখিয়ে মন ভুলিয়ে ভোটটি আদায় করবেন। ভোটের জোরে সিনেটের সদস্য হতে পারলে টাকা রোজগারের নানা পথ খুলে যাবে। অতি বুদ্ধিমান লোকে টাকা ধার করেও জনতার তোষণ করে; তারা ভালো করে জানে একবার পার-সাগর রোমান প্রভিন্সে একটা কোনো পদ নিয়ে ঘুরে আসতে পারলেই দেনা তো শোধ হবেই—তার উপরেও যা থাকবে তা দিয়ে জীবনটা সুখেই কাটবে।

সত্য তাই হয়ে চলেছে। নূতন হঠাৎ-ধনীদের ঘরবাড়ি যা তৈরী হচ্ছে, তা দেখে গরীবের তাক্ লাগে। গ্রীক ভাস্কর্য দিয়ে বাগান সাজানো—ঘরের মেঝেতে মোজাইক্ কাজ ; দামী সুন্দর, সুন্দর আসবাবে ঘরগুলি পূর্ণ। দাসদাসী ঘরে ঘরে ঘুরছে; ছেলে মেয়েরা কুটোটি নাড়ে না। মেয়েরা ঘরনী গৃহস্থের কাজে অমনোযোগী, সাজ-সজ্জা, রঙঢং নিয়ে সদাই ব্যস্ত; অধিক সন্তান জন্ম দিতেও এখন নারাজ। অথচ এককালে রোমান মেয়েদের গর্ব ছিল তাদের সন্তানরা। বিলাসে, ব্যসনে, উচ্ছৃঙ্খলতায় তাদের দিন যায়। কেটো নামে এক সিনেটর এসবের খুব নিন্দা করতেন বলে, মেয়েরা তাঁর উপর খুব অসন্তুষ্ট—তাদের ভাবখানা—'হেসে নাও দুদিন বইতো নও'।

গ্রীক্ বা হেলেনিক সভ্যতার ছোঁয়াচ পেয়ে রোমানদের জীবনে অভাবনীয় পরিবর্তন এনে দিয়েছে। রোমানরা সবপ্রথম দক্ষিণ ইতালিতে গ্রীকদের সংস্পর্শে আসে তারপর সিসিলির গ্রীক কলোনিগুলি অধিকৃত হয়। এরপর যখন খাস্ গ্রীস্ ও এশিয়ার হেলেনিক সভ্যতার স্পর্শ পেলো—তখনই এদের জীবনে এলে যুগান্তর। ইসলামের আদিযুগে খলিফাদের যে দেব-চরিত্রের কথা আমরা পড়ি—তার সঙ্গে আস্মান জমিন ফরাক বোগদাদের খলিফা বা মধ্য যুগের বাদশাহদের। রোমের রিপাবলিকের প্রথম যুগে যেসব রোমানের নাম

ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছে, এখন সে শ্রেণীর লোক দুর্লভ; সকলেই প্রাচ্য দেশের অর্থাৎ হেলেনিকদের অনুকরণ ও অনুবর্তন করবার জন্য ব্যস্ত। হোরেস নামে এক কবি বললেন 'বিজিত হেলেনিদের কাছে বিজয়ী রোমানদের পরাজয় হয়েছে।'

গ্রীক প্রভাব কি পরিমাণ এসে পড়েছিল, তার দুই একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। মাকিদন লুঠ করে একজন রোমান সেনাপতি ২৫০ গাড়ি বোঝাই ভাস্কর্য ও শিল্পকলার বিচিত্র নিদর্শন দেশে এনেছিলেন। আথেন্স অধিকৃত হলে ৫০০-এর উপর ব্রোন্জ ও মার্বেলের মূর্তি রোমে আসে। পম্পাই নগরীর কোনো ধনীর গৃহে মেঝের উপর সেকন্দরের যুদ্ধের উৎকৃষ্ট মোজাইক পাওয়া গিয়েছে—সেটা গ্রীস্ থেকে সংগৃহীত। এ রকম লুঠ যে কেবল রোমানরাই করেছিল তা নয়, চিরদিনই বিজয়ীরা বিজিত দেশের শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নিজেদের দেশের চিত্রশালা ও ম্যুজিয়ামের জন্য নিয়ে গিয়েছে। লন্ডনের ব্রিটিশ ম্যুজিয়ম, ইনডিয়া অফিস লাইব্রেরী, প্যারিসের ল্যুভেরে ভারতের, দূর-প্রাচ্যের ও মধ্য-প্রাচ্যের অনেক কিছুই সুরক্ষিত আছে। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলবো ভাগ্যে তারা নিয়ে গিয়েছিল, যত্ন করে রেখেছিল, তাই এখনো সেগুলো আছে।

রোমানদের লাতিন ভাষার যুগান্তর হলো গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা থেকে। রোমের আদিযুগে লাতিন ভাষার নাম-করা সাহিত্য কিছু নেই। গ্রীকদের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই রোমানরা গ্রীক ভাষা ও সাহিত্য পড়তে আরম্ভ করে এবং সেই আদর্শে গ্রন্থাদি লিখতে সুরু করে। গ্রীস্ থেকে ধরে আনা বন্দী দাসদের মধ্যে বহু শিক্ষিত লোক ছিল; ধনী রোমানরা তাদের গৃহশিক্ষকের পদ দিতেন। তাদের কাছে থাক্‌তে থাকতে সন্তানেরা গ্রীক সাহিত্য রসে ভরপুর হয়ে উঠতে লাগ্‌লো। আমাদের দেশে ইংরেজি নিয়ে ঠিক এই ধরনের ব্যাপারটাই ঘটেছে—অবশ্য এখানে সম্বন্ধটা রাজা ও প্রজার।

রোমানরা যে গ্রীকদের পায় তারা পার-সোক্রোতিস যুগের লোক; সোক্রোতিস, প্লাতোন, আরিস্তোতল প্রভৃতি মনীষীরা গ্রীক্‌দের প্রাচীন ধর্ম, পুরাণ, দেবদেবীর প্রতি অন্ধ বিশ্বাস ও অচলা ভক্তি অনেকটা ঢিলা করে দিয়েছিলেন। রোমানরা যখন গ্রীস্ দখল করে, তখন সেখানকার শিক্ষিতরা

প্রায় নাস্তিকের কোঠায় পড়ে। গ্রীক্‌রা রোমে এসে এই সব মতই প্রচার করে। ফলে রোমের ঘরছাড়া একটা শ্রেণীর মধ্যে গ্রীক মনের এই সুস্থ অবিশ্বাসটা সংক্রামিত হয়। আবার এর সঙ্গেই নিম্নস্তরের জড়পূজা ও বহুদেববাদও এসে পড়েছে দেশের মধ্যে হেলেনিক পাশ্চাত্য এশিয়া থেকে।

আমাদের এই পৃথিবীর ইতিহাস গ্রন্থে রোমানদের কাহিনীর স্থান খুবই বড়ো; কেননা এইখানেই সব প্রথম শ্রেণীসংগ্রাম মুখর হয়ে ওঠে। এখানেই সভ্য মানবের জন্মগত অধিকারের দিকে তাকিয়ে বিজ্ঞান সম্মতভাবে আইন-কানুন রচিত হয়; আর শ্রেণী-সংগ্রামকে শমিত করবার চেষ্টা চলে এদের মধ্যে। রোমের পিতৃবান ও প্লীবিয়ানদের শ্রেণী সংগ্রাম সেই দেশের স্থানিক ইতিহাস হলেও, এই ঘটনাই নানা দেশে নানা নামে বারে বারে দেখা দিয়েছে বিচিত্র বেশে। আসল লড়াইটা চলে সর্বহরা ও সর্বহারাদের মধ্যে। প্রোলিটারএট কথা আজকাল প্রায়ই শোনা যায়—কম্যুনিস্টদের বুলি হচ্ছে ডিক্‌টেটরশিপ অব দি প্রোলিটরিএট অর্থাৎ সর্বহারা দরিদ্রের হুকুমত—সর্বহারাদের মেনে চলবে অর্থাৎ বড় লোকের এতো শতাব্দীর দুষমনীরই পাল্‌টা জবাব হবে ধনীদের ও বুনেদীদের সর্বহারা করে পথে বসানো। বলাবাহুল্য কোনটাকেই সুস্থ মতবাদ বলা যায় না। আদর্শ রাষ্ট্র কুলীন-অকুলীন কাউকেই দূরে ঠেলে রাখবে না।

রোমে প্রাচীন কালে কতবার আইন পাস হয়েছে—ফালতু জমি গরীবদের মধ্যে ভাগ করে দেবার জন্য। কিন্তু আইনে দেশ চলে না—লোকের ধর্মবোধ গভীর ও সমাজ-শিক্ষা বিজ্ঞান সম্মত ও ব্যাপক না হলে, কাগজের মতোয়া দিয়ে রাজ্যের উন্নতি হয় না। ধনীদের অর্থবলে তারাসব কিনতে পারে—কারণ অভাব অনটনের অলক্ষ্মী গরীবের দরজায় চিরকাল বাঁধা।

এইসব অনাচার দূর করবার দিকে দৃষ্টি গেল ভদ্রবংশের যুবকদেরই; উচ্চ বংশের শিক্ষিত লোকেই তো সর্বহারা অস্পৃশ্য অজাতদের পক্ষ নিয়ে চিরদিন লড়াই করে আসছে। রোমের গ্রাকিদের দুই ভাই গরীবের হয়ে লড়তে গিয়ে প্রাণ দেন। আমরা পূর্বেই বলেছি সিনেটের সদস্যরা সরকারী

জমি দখল ক'রে ক্রীতদাস দিয়ে চাষবাস করে আসছেন—প্রতিবাদ কেউ করেনা—কারণ সকলেই 'মাসতুতো ভাই'। টিবেরিয়াস গ্রাকাস ট্রিবিউন হয়ে এইসব জমিজমা গরীব চাষীদের মধ্যে ভাগ করে দেবার ব্যবস্থা করতে গেলেন। সম্ভ্রান্তদের অনেক কৌশল জানা আছে—আইনের ব্যাখ্যাতা তো তারাই। টিবেরিয়াস আইনের কচ্‌কচানি না-মেনে জোর করে সব কিছু করতে গেলেন। কিন্তু ভোটের সময় দাঙ্গায় তিনি মারা পড়লেন। আইন না-মানার চেষ্টা হলো রোমে। এর উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক—উচ্ছৃঙ্খলতা প্রশ্রয় পেলো 'ভালো কাজে'র নামে। এর পর থেকে জনতার 'উপকার' করবার দোহাই দিয়ে সুরু হলো ক্ষমতা নিয়ে কামড়া কামড়ি রক্তারক্তি; সেই রক্ত গঙ্গার বানে রিপাবলিক শাসনতন্ত্র একদিন গেলো ভেসে।

সিনেটরদের মধ্যে শক্তি নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে—সেনানায়কদের শক্তি হঠাৎ যায় বেড়ে। তারা সৈন্যর সাহায্যে হামলা করে রাষ্ট্রশক্তি নেয় কেড়ে। আজও দুনিয়ার অনেক রাজ্যেই সেটা ঘটছে। রোমের সেনাপতি মারিয়াস সেটি করলেন। রোমের সমাজে কী পচ্‌ ধরেছে—তার একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হ'বে।

আফ্রিকার নিউমিডিয়া দেশের রাজা রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন। তারপর ঘুষ দিয়ে সিনেটর ও কন্সালদের মুখ তিনি এমন ক'রে বন্ধ করে দেন যে এই বিদ্রোহের ব্যাপার নিয়ে সিনেটে কোনো আলোচনাই উঠতো না। শেষকালে সেনানায়ক মারিয়াস নিউমিডিয়ার রাজা জগুর্থাকে শায়েস্তা করেন। রাজ্যের আইনকর্তা ও শাসক গোষ্ঠির মধ্যে মতের ও মনের মিল না থাকলে, ও রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সুখ শান্তির অভাব দেখলে, বাহিরের শত্রুরা তার পূর্ণ সুযোগ নেয়; এই সময় উত্তর থেকে জারমানিকজাতির এক উপশাখার লোক ইতালির মধ্যে ঢুকে পড়ে। তাদের তাড়িয়ে মারিয়াস রোমকে রক্ষা করেন। ফলে মারিয়াসের সুনাম রটলো সাধারণের মধ্যে, তারা দেখছে রিপাবলিকের জমা-পাপ মারিয়াসই সাফ করতে পারবেন।

সম্ভ্রান্তরা চুপ করে নেই; তাদের কায়েমী স্বার্থ সুদৃঢ় করবার জন্য সুল্লা অস্ত্র ধরলেন। অনেক বৎসর ধরে দুই দলে লড়াই চললো—যেমন

চলেছিল ফরাসী বিপ্লবের সময় ফ্রান্সে—রাজপক্ষ ও রিপাবলিক পক্ষের মধ্যে—যেমন চলেছিল রুশিয়ায় শ্বেতরুশ ও লাল ফৌজের মধ্যে—যেমন চলছে-থেকে-থেকেই ইসলামী রাজ্য-সমূহে, লাতিন আমেরিকার রিপাবলিকে, যেমন চলছে আফ্রিকার স্বাধীন রাজ্য গুলিতে। এই ঝগড়া মারামারির পরিণাম হলো মারিয়াসের নির্বাসন—সাধারণ লোকের পরাজয়ই এক রকম। সম্রান্ত সিনেটররা সুল্লাকে চিরস্থায়ী ডিক্‌টেটর পদ দিয়ে কৃতজ্ঞতা দেখালেন—যেমন ঘটেছিল নেপোলিয়ন বোনাপার্টির বেলায়। অথচ রোমের রিপাবলিকের কড়া আইন অনুসারে কেবলমাত্র সঙ্কটকালে ছয়মাসের জন্য ডিক্‌টেটরের পদ সৃষ্টি হতে পারতো; সেখানে আজ চিরস্থায়ী হুকমতি পেলেন সুল্লা। বেশ বোঝা যাচ্ছে রিপাবলিকের অন্তিমদশা ঘনিয়ে আসছে। •

এরপর বুদ্ধিমান সেনানায়করা বুঝে নিলো 'দাণ্ডা যার, মোষ তার' যে, সৈন্য থাক্‌লে হামলা করে রাষ্ট্রশক্তি দখল করা সহজ,—সিনেটরদের ভোট আদায় করাও শক্ত হয় না কারণ দাঙ্গার ভয় তাদেরও আছে। এই সাহসিক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জুলিয়াস সীজার। দল ভারি করবার জন্য পম্পাই ও ক্রেসাস নামে দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তিনি সঙ্গে জুটিয়ে নেন। পম্পাই ছিলেন বড় যোদ্ধা, ক্রেসাস ছিলেন অতুল ধনসম্পদের মালিক। এই তিনজন বীরকে লোকে বলতো ত্রয়ীর (টায়ম্বিরেট)—তিনে এক, একে তিন।

এশিয়ার কৃষ্ণসাগরতীরে পণ্টাস্‌ রাজ্যের মিত্রদত্তকে যুদ্ধে হারিয়ে পম্পাই সে-দেশ দখল করেন। কাজটা নিতান্ত সহজ ছিল না—কোথায় রোম আর কোথায় ব্ল্যাক সী! মিত্রদত্ত বংশের রাজারা বহুকাল লড়ছে রোমানদের সঙ্গে! এছাড়া জলদস্যুদের উৎপাতে মধ্যধরণী সাগরে জাহাজে করে ব্যবসায় বাণিজ্য অচল হতে চলেছিল; সেই সাগর নিরাপদ করলেন পম্পাই। তারপর সিরীয়ার গ্রীক রাজ্য জয় করে আসেন।

জুলিয়াস সীজার বুদ্ধিমান কুটনীতিজ্ঞ ও যোদ্ধা। বক্তৃতা করে লোকের মন ভুলাবার অসাধারণ শক্তি তাঁর। এর উপর গালিয়া বা বর্তমান ফ্রান্সদেশ জয় করে রোমান সাম্রাজ্য সীমানা অনেকদূর বাড়িয়ে দেওয়াতে লোকে খুবই খুসি। গালিয়া দেশ জয় করে দেশে ফেরবার অনুমতি চাইলেন; সিনেট তা দিল না। তাদের ভয়—পাছে সীজার আবার

স্থল্লার মতো একছত্র অধিপতি হয়ে বসেন। জুলিয়াস সীজার সেনাপতি মাত্র, রুবিকান নামে এক নদী পার হলেই তিনি বিদ্রোহী বলে সাব্যস্ত হবেন। সীজার অনেক ভাবলেন, শেষকালে বললেন, হাতের পাশা ছোড়া হয়ে গেছে (The die is cast); এই বলেই ঘোড়াশুদ্ধ রুবিকান নদীতে নেমে পড়লেন ইংরেজিতে কথা আছে, to cross the Rubicon.

সীজার সৈন্য নিয়ে ইতালিতে ফিরলেন। এসে শোনেন তাঁর মিত্র ক্রেসাস পারস্যের পহ্লব শাহনশাহর রাজ্য আক্রমণ করতে গিয়ে মারা পড়েছেন। এর কথা আমরা পারস্যের ইতিহাসে উল্লেখ করেছি। পম্পাই রোমে একছত্র—তিনি সেখানে বসে কলকাটি টিপে সীজারকে দূরে সরিয়ে রাখবার মতলবে আছেন। সীজার সেটা বুঝতে পেরেই সিনেটের আদেশ না মেনে রোমে স-সৈন্য হাজির হলেন। সীজার আসছেন শুনেই পম্পাই বেগতিক বুঝে সরে পড়লেন। সীজার তাঁকে তাড়া করে চললেন, স্পেন, গ্রীস ও শেষকালে মিশরে গিয়ে তাঁর নাগাল পেলেন; কিন্তু ধরতে পারলেন না, তার আগেই ঘাতক তাঁকে হত্যা করেছিল।

সীজার ভাল রকমেই জেনেছিলেন যে তিনি যদি যুদ্ধে হারেন তবে সিনেটররা তাঁকে বধ করবেই। সেই বুঝেই তিনি বিদ্রোহী হয়েছিলন সিনেটের বিরুদ্ধে। স্থল্লা যেমন করে তাঁর প্রতিপক্ষীয়দের হত্যা করেছিলেন, পম্পাই জয়ী হলেও তাই করতেন, এবং সীজার সুনিশ্চিত জানতেন যে তিনিই তার প্রথম বলি হতেন।

সীজার মিশর জয় করলেন—তখন সেখানে পট্‌লেমি বংশের শেষ বংশধর ক্লিওপেট্রা রানী—যেমন রূপসী, তেমনই ধূর্ত। দেশতো জয় হলো, কিন্তু তরুণ সেনাপতি সীজার ছলনাময়ী রানীর প্রেমে আটকা পড়লেন। বৎসর কাল সেখানে থেকে—সিরীয়া, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি দেশ ঘুরে যখন রোমে ফিরলেন তখন তিনি জনতার কাছ থেকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা পেলেন। বিজয়ী সীজার রোমের শাসন ভার নিলেন; কিন্তু কোনো পক্ষের কাউকে কোনো শাস্তি দিলেন না,—স্থল্লা, মারিয়াসের মতো রক্তগঙ্গায় রোম ভাসালেন না। তারপর অনেক হিতকার্যে মন দিলেন—যা বহু বৎসর রোম রাজ্যে হয় নি। জনতা খুব খুসি।

বুদ্ধিমান সীজার সকলপক্ষকে খুসি ক'রে সিনেটের হাত থেকে প্রায় সমস্ত

ক্ষমতাই নিজের মুঠোর মধ্যে এনে ফেললেন। অন্যদিকে রিপাবলিকান দলের মুষ্টিমেয় আদর্শবাদীরা রোমে একনায়কত্ব কায়েম হ'তে দেবে না ব'লে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তারা প্রাচীন রোমের সংবিধান পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। অবশেষে সীজারকে সিনেট গৃহে তারা একদিন হত্যা করলো। সীজারের মৃত্যুতে রিপাবলিকতন্ত্রের অবসান ও একনায়কত্বের উত্থান হ'ল রোমে; অর্থাৎ রিপাবলিকানরা যা করবেন ভেবেছিলেন, ঘটলো ঠিক তার বিপরীতটা।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। রোমের মধ্যে বা বাইরে রণপতিরা যাই করুন না কেন, রোমান সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা একরকম ঠিকই ছিল। বানিজ্য অবাধে চলছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিচিত্র উন্নতি হচ্ছে সাম্রাজ্যের নানাস্থানে। কল্যানরাষ্ট্র স্থাপনের জন্য সীজার অনেক রকম আইন-কানুন করেন। এতদিন অলস জনতাকে রোমে বসিয়ে-বসিয়ে সস্তায় বা বিনামূল্যে খাদ্য সরবাহ করা হয়ে আসছিল। সীজার সেইসব কালতু লোকদের উপনিবেশ গড়বার জন্য নানা দেশে পাঠিয়ে দিলেন; সে সব দেশে রোমান শক্তি ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হবার সহায় হলে।

সীজার সুপণ্ডিত ছিলেন; তাঁর লিখিত যুদ্ধকাহিনী লাতিন ভাষার উৎকৃষ্ট গদ্য সাহিত্যের নমুনা। আমরা যে বারোমাসের বৎসর ব্যবহার করি, তার প্রবর্তক সীজার। রোমান বিজ্ঞানীদের ধরে তিনি পঞ্জিকার সংস্কার করালেন। দশ মাসে চান্দ্র-বৎসরের প্রচলন ছিল—সৌর্য বৎসরের গণনায় চান্দ্র-বৎসরে এগার দিনের ঘাটতি। তাঁর পঞ্জিকা সংস্কার করার প্রায় দেড় হাজার বৎসর পর আর-একবার সংস্কার করা হয়েছিল—পোপ গ্রেগরীর আদেশে। পূর্বে বৎসর আরম্ভ হতো মার্চ মাসে; তাই সেপটম্বর; অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাস ছিল যথাক্রমে সপ্তম অষ্টম নবম ও দশম মাস; কিন্তু সীজার দুটো মাস যোগ করে দেন; সে দুটো মাসের নাম লোকে পরে দেয় জুলাই ও অগস্ট। জুলিয়াসের নামে জুলাই ও সম্রাট অগস্টাসের নামে অগস্ট। দু'মাস যোগ হওয়াতে ডিসেম্বর হলো দ্বাদশ মাস—যদিও তার অর্থ হচ্ছে দশম।

সীজারের হত্যাকারীরা ভেবেছিলেন যে রোমে রিপাবলিকান শাসন পুনর প্রবর্তিত হবে ও এককর্তৃত্বের অবসান হবে। আদর্শবাদীদের সে-আশা পূর্ণ হলো

না। সিনেট আণ্টনি নামে এক ব্যক্তির উপর কাজ চালাবার ভার অর্পণ করলো! ওদিকে সীজারের ভাগ্নের-পুত্র অকৃটেভিয়ানকে গ্রীস থেকে আনবার জন্ত লোক গেল—তাঁকে সীজার পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন; গ্রীসে তিনি পড়াশুনা করছেন—বয়স মাত্র আঠারো বৎসর। সীজারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিশাল—তার মালিক ইনি।

অকটেভিয়ান বালক হলেও বুদ্ধিমান। রোমে ফিরে এসে আণ্টনিকে প্রথমে দলে টানেন। তারপর সিনেটরদের সহায়তায় আণ্টনিকে মিশরের কর্তা করে পাঠিয়ে দিলেন, সেদেশ সীজার কিছুকাল আগে জয় করেছিলেন। মিশরে গিয়ে আণ্টেনি রানী ক্লিওপেট্রার মোহিনী শক্তির টানে মনুষ্যত্ব হারিয়ে একেবারে ভেড়া বনে গেলেন, তার দুর্দশা দেখে সিনেট আণ্টনিকে সেখানে না রাখাই স্থির করলেন; কিন্তু বুঝা গেল আণ্টনি ও ক্লিওপেট্রার মতিগতি ভালো নয়। তার রোমের শাসন-আওতায় থাকবেনা। তখন অকটেভিয়ান নৌ-সৈন্ত নিয়ে মিশর আক্রমণ করলেন, মিশরীয়রা পরাভূত হলো। আণ্টনি ও ক্লিওপেট্রা বেগতিক দেখে আত্মহত্যা করলো। আণ্টনির মৃত্যুতে অকটেভিয়ান হলেন অখণ্ড রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বীহীন নেতা আর ক্লিওপেট্রার মৃত্যুতে প্‌টলেমি বংশের অবসান হলো তিনশ' বৎসর পরে। প্‌টলেমিদের শাসনকালে হেলেনিক মিশরের কি উন্নতি ও পরিবর্তন হয়েছিল, সে সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে রোমে যে রক্তারক্তি ও রাষ্ট্রের শক্তি নিয়ে রণ-পতিদের মধ্যে কাড়াকাড়ি চলছে—তাতে সাধারণ লোকের কোনো আনন্দ নেই; তারা শান্তি চায়; শান্তিতে ব্যবসায় বানিজ্য ও চাষবাস করতে পেলে লোকে খুসি। চতুর অকৃটেভিয়ান সিনেটরদের মানমর্যাদা এতটুকুও ক্ষুণ্ণ না করে একে একে সমস্ত অধিকার নিজের হাতে বাগিয়ে নিলেন; বরং বলা যায় সিনেটররা তাঁর হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে যেন কৃতার্থ হলো! সৈন্তাধ্যক্ষকে লাতিন ভাষায় বলতো ইমপিরেটর—হুকুমদার; অকৃটেভিয়ান কে সেই পদ তারা দিল; নগরের প্রধান ব্যক্তিকে বলতো 'প্রিন্সেপ'—সে উপাধিতে ভূষিত করা হলো। প্রধান পুরোহিতকে বলে 'পন্টিফাস'—অকৃটেভিয়ানকে সেখানেও তারা বসালো। এইভাবে একটার পর একটা অনেক পদ পেলেন। শেষকালে সিনেট তাঁকে বললো 'অগস্টিস'

বা মহামহিম। ইতিহাসে অক্‌টেভিয়ান অগস্টাস নামেই পরিচিত; অষ্টম মাসকে অগস্ট নাম দেওয়া হলো তাঁরই নাম থেকে। ইংরেজিতে গৌরবময় সাহিত্যিক ও শিল্পকলার যুগকে আগস্টাইন পর্ব বলে। অগস্টাস ৪৪ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর সিনেটররা ভক্তিতে গদগদ হয়ে তাঁকে দেবতার মতো মন্দিরে আসন করে দেন—রীতিমতো সম্রাটের পূজা সুরু হলো তাঁর তিরোধানের পর থেকে—রোমেশ্বর বা জগদীশ্বর বা হলেন।

অগস্টাস যে সাম্রাজ্য স্থাপন করলেন—প্রায় দুইশ' বৎসর তা ভালো ভাবেই টিকে ছিল। কিন্তু তারপর আর সম্ভব হয় না। মানুষের বিজ্ঞানবোধ বাড়ছে, বিদ্যাচর্চায় বুদ্ধি খুলছে, নূতন ধর্মবোধ জাগছে, এই সব কার্য কারণের ফল দেখা দিল রাজ্য শাসন ব্যাপারেও। এই সময়ে রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল উত্তরে রাইন নদ ও দানিয়ুব, পশ্চিমে অতলান্তিক মহাসাগর, দক্ষিণে সাহারা মরুভূমি ও পূর্বে ইরান মালভূমি। দানিয়ুব ও রাইনের অপর পারের বাসিন্দাদের সাধারণত বলা হয় 'জারমেনিক' জাত—অসংখ্য ছোট ছোট উপজাতি বা ট্রাইবে তারা বিভক্ত। পূর্বদিকে য়ুফ্রাতিস-তাইগ্রিসের দোয়াবের অধীশ্বর পার্থিয়ানরা। বর্বর যুদ্ধপ্রিয় জারমেনিকদের সহিত উত্তরে ও দুর্ধর্ষ সুসভ্য পার্থিয়ানদের সঙ্গে পূর্বদিকে বহুকাল রোমের লড়াই চলেছিল। দানিয়ুব, য়ুফ্রাতিস-তাইগ্রিস নদীদ্বয় পার হয়ে রোমানদের পক্ষে রাজ্য বিস্তার করা সম্ভব হলো না। শেষপর্যন্ত তাদের মৃত্যুবাণ এলো রাইন-দানিয়ুব নদীর ওপার থেকে।

অগস্টাস যে-সাম্রাজ্য পত্তন করেছিলেন তা এক হিসাবে পারস্যের শাহনশাহদের আদর্শেই গড়া। পারস্যের আদর্শ প্রত্যক্ষভাবে এঁরা পাননি; সেটা পেয়েছিলেন মিশর থেকে। মিশরের প্‌টলেমিরা সামাজিক ব্যাপারে প্রাচীন ফারায়োদের, আর শাসন-ব্যাপারে পারস্যের শাহনশাহদের নীতি অনুসরণ ক'রে বাদশাহগিরি পত্তন করেছিলেন। রোমান সম্রাটদের আদর্শ হলো এই প্‌টলেমিরা;—রাজা-পূজা সেখান থেকে আমদানী হয় রোমে। সে কথায় পরে আসা যাবে আবার।

সম্রাটদের শাসনের এই দু'শো বৎসর রোমের স্বর্ণময় যুগ। ইতিহাসের পাতায় দুশো বছর পর্বটা খুব অল্প মনে হয়—কারণ একছত্রে সেটা লেখা

যায়, কিন্তু বাস্তবে দুশো বৎসর বলতে বোঝায় ব্রিটিশরা যতকাল ভারতে ছিল ততদিন, মুঘলরা দিল্লীতে যতদিন ছিল তত কাল অর্থাৎ সাত আট পুরুষ বংশপরম্পরায় বাস করে এই দুই শতাব্দীর মধ্যে। এই পর্বে রোমের সাহিত্য, শিল্পকলা, বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়। লাতিন সাহিত্যের প্রথম সূত্রপাত হয় গ্রীক থেকে তর্জমা দিয়ে। অগস্টাসের সময় রোমের ঐতিহাসিক লিভি (Livy), মহাকাব্য ঈনীদ রচয়িতা ভার্জিল, গীতিকবি হোরেস, পৌরাণিক কাহিনী রচয়িতা ওবীদ প্রভৃতি অনেকেই জন্মেছিলেন। লাতিন গদ্য বক্তৃতা সাহিত্য ভাষা ও ওজোগুণে প্রাচীন জগতে তুলনাহীন। আর একটা বিষয়ে রোমানরা পৃথিবীর ইতিহাসে অমর স্থান দখল করে রয়েছে, সেটা হচ্ছে তাদের আইন। সভ্য পৃথিবীর লিখিত আইন গ্রন্থের খনি হচ্ছে 'রোমান ল'।

রিপাবলিক যুগে গণ-আন্দোলনের ফলে সিনেটকে আইন লিপিবদ্ধ করতে হয়েছিল। বারোটা ফলকে বিধিবিধানগুলি খোদাই করিয়ে সিনেটঘরের সামনে খাড়া করে রাখার যে-ব্যবস্থা হয় তার কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু রাজ্য বিস্তার লাভ করছে, সমাজ জটিল হচ্ছে, ধনী-দরিদ্রের সংঘাত বাড়ছে—সুতরাং আইনও নিত্য-নূতন তৈরীর প্রয়োজন হয়ে চলেছে। ন্যায় ও অপক্ষপাতিত্বের উপর বিচার নির্ভর করে—সেকথা রোমান জুরিস্ট বা ব্যবস্থাপকগণ অতি স্পষ্ট করে বুঝেছিলেন। বহুশত বৎসরের আইন তন্নতন্ন করে ঘেঁটেঘুঁটে বিচার করে সম্রাট জাস্টিনিয়ানের সময় (৫২৭—৬৫ খ্রী অ) পণ্ডিতগণ বৈজ্ঞানিকভাবে সেগুলি লিপিবদ্ধ করেন। সেই 'রোমান ল' সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। রোমানল'র অনেক শব্দ আমাদের দেশের আইনের মধ্যে এসে গিয়েছিল ব্রিটিশযুগে—এবং সেগুলি আমাদের নয়া সংবিধানে মেনে নেওয়া হয়েছে। লাতিন কত শব্দ আমরা যে ব্যবহার করি তা আমাদের সর্বদা মনে থাকেনা—মিউনিসিপ্যালিটি, গ্যালারি, প্রিন্স, প্রভিন্স, সিনেট, এম্পারার, জুরি, ম্যাজিস্ট্রেট, মানডামাস, হেবিয়াস কর্পাস প্রভৃতি শব্দের তালিকা আরও বড় করা যেতে পারে। দুনিয়ার সভ্য আইনের উৎস রোমান ল'।

সাম্রাজ্য প্রসার ও বাণিজ্য বিস্তার প্রায় একসঙ্গেই চলে। মধ্যধরণী সাগরে রোমান বাণিজ্য তরণী পালতুলে চলে—জাহাজের খোলের ভিতর

শিকলে বাঁধা ক্রীতদাসের দল দাঁড় টানে। সাগরে চলাফেরায় বিপদ এখন কম—জলদস্যুরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়েছে, পম্পাই সেটা ভালোভাবে করে গিয়েছিলেন। সাগরের মধ্যে ডোবা-পাহাড়ে আঘাত খেয়ে জাহাজ ডুবি হতো—এখন সেসব জায়গায় বাতিঘর উঠেছে। জলপাই-এর তেল জ্বালিয়ে বাতিঘরে আলো করা হয়—তা দেখে নাবিকরা হুঁশিয়ার হয়। সাগরতীরে অনেক পোতাশ্রয় নির্মিত হয়েছে—ঝড় তুফানে আশ্রয় নিতে পারে। সাম্রাজ্যের সর্বত্র একই রকমের মুদ্রার প্রচলন হওয়ায় ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধা বেড়েছে বিস্তর। রোমান মুদ্রা কেবল যে রোমান সাম্রাজ্য মধ্যে চলতো তা নয়, বাইরেও তার চাহিদা ছিল। দক্ষিণ ভারতের কয়েকটা জায়গায় প্রচুর রোমান মুদ্রা মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে। রোমান বণিকরা পারস্যসাগর থেকে জাহাজে করে ভারত মহাসাগর তীরের নানা দেশে যেতো, ভারতেও আসতো মশলাপাতি সংগ্রহ করতে। এখন রোমানদের পয়সা হয়েছে—নানা দেশ থেকে নানা জিনিষপত্র কিনে আনছে বণিকরা। ধনী রোমানদের খাবার টেবিলে কত দেশের থেকে আনা খাদ্যবস্তু, মশলাপাতি দিয়ে মুখরোচক করা হচ্ছে—অলস ধনীর রসনার তৃপ্তির জন্য। চীন থেকে রেশমী কাপড় আসে রোমের বাজারে; এখন ধনীরা আর শনের-সুতোর কাপড়, (টোগা) ব্যবহার করে না, তারা চীনের রেশম, ভারতের সুতির কাপড় পরে। মৃতদেহ পোড়াবার জন্য গুগ্‌গুল আসে আরব থেকে। এসবই ধনীদের আভিজাত্যর নমুনা। অপব্যয় নিয়ে সকল দেশে সকল যুগেই জাতীয়তাবাদী দার্শনিক ও অর্থ-নীতিকরা কত কথা বলে আসছেন; কিন্তু বলা বাহুল্য পণ্ডিতদের সেসব কথা জনতার কানে পৌঁছয় না। ধর্মহীন লোককে নীতিকথা বললে তারা বিরক্ত হয়। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে রোমানদের ধনৈশ্বর্য যেমন বাড়ছে, তাদের আলস্য, বিলাস ও পাপ শতগুণ বাড়ছে। এত বৈভব, এত ধনৈশ্বর্যের মধ্যে প্রশ্ন থেকে যায়—কয়জন এই ঐশ্বর্যের ভাগ পায়। ধনীদের সমস্ত কাজ কর্ম করে তো ক্রীতদাসের দল—চাষবাড়িতে, খনিতে, শিল্পে, দোকানে—সর্বত্রই পেটভাতায় পোষা মানুষ-পশুর দল কাজ করে। কালে মুক্তিপাওয়া দাসেরা সমাজের এক কোণে স্থান করে নেয়।

রোমের গণতন্ত্র বা রিপাবলিক শাসন কার্যত লোপ পেয়েছে—অবশ্য

কাগজে কলমে ঠিক আছে সব। রিপাবলিকের কাঠামোটা বহু শতাব্দী টিকে ছিল। অগস্টাসের মৃত্যুর পর সম্রাট-এর পদ বংশ পরম্পরা হয়; কিন্তু এখনো সিনেট তাঁদের নির্বাচন করেন—তাঁরা রাজমুকুট পরেন না, রাজা উপাধি গ্রহণ করেন না, রিপাবলিক যুগের উপাধি গুলিই ধারণ করেন। মরবার পূর্বে সম্রাট তাঁর গদিতে কে বস্‌বে তার ব্যবস্থা করে যান—সিনেটরগণ সেই মতো কাজ করেন। অবশ্যি সে-ব্যবস্থা যে সকলে মানে—তা নয়। কে সম্রাট হবে—তা নিয়ে গোপন হত্যাকাণ্ড চলে, দাবীদারদের মধ্যে লড়াইও করতে হয়।

সম্রাটদের অশেষ ক্ষমতা। ভালো লোক সম্রাট হলে কত ভালো কাজ করেন! মন্দ লোক সম্রাট হলে তার শতেক গুণ মন্দ কাজে কেউ বাধা দিতে পারে না। সম্রাটের হাতে অসীম ক্ষমতা,—সৈন্য তাঁদের আজ্ঞাবহ, ধনভাণ্ডারে তাদের অবাধ প্রবেশ! মুখের কথায় কারো মাথায় শিরোপা ওঠে, সামান্য ইঙ্গিতে কারও শির দেহ থেকে ছটকে পড়ে! ধন আস্‌ছে রোমান সাম্রাজ্যের চার কোণ থেকে; সম্রাটরা ব্যয় করছেন নিজেদের খেয়াল-খুশি মতে। বাধা দিতে গেলেই সংগ্রাম; সেই সংগ্রামে অনেক সম্রাট মারা পড়েন। সম্রাটদের প্রধান একটা কাজ ছিল রোমের কর্মহীন, অলস জনতার তোষণ—তারা সকলেই ভোটদাতা অর্থাৎ এক হিস'বে মুনিব। সুতরাং তাদের খুসি রাখবার জন্য মিশর থেকে কেনা শস্য কম দামে বা বিনা পয়সায় দেওয়া হতো। তারপর তাদের শূন্য মনকে আমোদ দিয়ে ভরে রাখার ব্যবস্থা করতে হতো। থিয়েটর, সার্কাস বিনা খরচায় তারা দেখতে পায়; রোমান সার্কাসে ঘোড়ার রথের দৌড়পাল্লা ছিল সব থেকে উত্তেজক খেলা। ক্রমে ক্রমে উত্তেজনার মাত্রা বাড়াতে হচ্ছে; গ্লাডিয়েটর নামে পেশাদার কুস্তিগীররা আঙিনায় কসরত দেখায়, হারলেই খেলা শেষ হয় না! একজনকে মরতেই হবে! রক্তমাখা দেহে জোয়ান পালোয়ানকে পড়ে যেতে দেখে জনতার কী উল্লাস। বন থেকে হিংস্র জন্তু ধরে এনে কলোসিয়ামের আঙিনায় ছেড়ে দেওয়া হয়; নিরস্ত্র বন্দী বা পলাতক দাসকে সিংহের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। সিংহ অভাগাদের ছিঁড়ে ফেলে একটা থাবার ঘায়ে—দেখতে কী মজা লাগে! ভদ্র, অভদ্র সর্বশ্রেণীর নরনারী দেখে ব'সে ব'সে,—তাদের মনের মধ্যে কোনো দাগ পড়ে না যেন! নৈতিক অবনতির চরমে না পৌঁছলে মন এমন অসাড় হয় না।

রোমের ভিতরটা যতটা কদর্য হয়ে উঠেছে—প্রদেশগুলি ততটা হয় নি। কালে সুবিধার জন্ত বিশাল রোমান সাম্রাজ্যকে চারটা মণ্ডলে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম অংশে পড়ে—এসিয়া-আফ্রিকার অধিকৃত দেশগুলি, দ্বিতীয়তে পড়ে বলকান উপদ্বীপ ও দ্বীপাবলী, তৃতীয়তে পড়ে রোমান বা লাতিন রাজ্য যার মধ্যে পড়ে ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি দেশ, আর চতুর্থ অংশে পড়ে দানিয়ুব-রাইন নদীতীরের দেশ।

এই বিশাল সাম্রাজ্যর পশ্চিমাংশ লাতিন ভাষা ও রোমান সংস্কৃতি গ্রহণ করে—ইতালি, ফ্রান্স, স্পেনের ভাষা লাতিন থেকে ভেঙে তৈরী। কিন্তু পূর্বদিকে তা হয় নি—সেখানে গ্রীক ভাষা কায়েম ছিল বহু শতাব্দী ধরে ইসলাম এসে আরবী ভাষা চালু করার পূর্ব পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়া গ্রীক ছিল সভ্যতার ভাষা। কিন্তু কালে কালে গ্রীসের বাইরে গ্রীক ভাষা লোপ পায় একেবারে আর লাতিন ভাষার প্রসার হলো খ্রীস্টিয় চার্চের আশ্রয় পেয়ে। খ্রীষ্টের জীবনও বাণী গ্রীকভাষায় লিখিত হলেও সে-ভাষা খ্রীষ্টানদের ধর্মের ভাষা হলো না—চল্ হলো লাতিন ভাষা—যা ছিল রোমের বাদশাহী-ভাষা—যে-টা রোমের খ্রীষ্টান সমাজের পোপ বাবাজীর ভাষা। লাতিন ভাষা-জাত উপভাষা স্পেনীশ ও পোর্তুগীজের মাধ্যমে খৃষ্টধর্মও রোমান লিপি নিয়ে য়ুরোপের জ্ঞান বিজ্ঞান ছড়িয়ে পড়লো অতলান্তিক মহাসাগরের অপর পারে, এশিয়ারও নানা স্থানে। এটাই হলো সাংস্কৃতিক বিজয় বা ধর্মবিজয়—অবশ্য এর সঙ্গে আছে রাজনৈতিক দিগ্ বিজয়। যার মূল উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার।

দুইশত বৎসর রোমের সম্রাটদের গৌরব ভালোভাবেই টিঁকে ছিল, তারপর কে সম্রাট হবে তা নিয়ে সুরু হলো মারামারি, ষড়যন্ত্র, গুপ্ত হত্যাকাণ্ড। কালে রাজার দেহরক্ষী বা প্রিটোরিয়ান গার্ডরা হয়ে উঠলো নিয়ামক। পূর্ব দেশের প্রদেশপালরা চঞ্চল হয়ে ওঠে—তাঁদের মনে হয়, রোমের লোকই যদি কে সম্রাট হবে ঠিক করতে পারে, তবে তারাই বা পারবে না কেন—তাদের হাতে এতো সৈন্য! সকলেরই মনের বাসনা রোমের বাদশাহ হবেন। বহু রক্তারক্তির পর কনস্টান্টাইন সম্রাট হলেন চতুর্থ শতকে। কিন্তু তিনি রাজধানী রোম থেকে সরিয়ে নিয়ে বৈজয়ন্তিয়মে পত্তন করলেন, বৈজয়ন্তিয়মের নূতন নাম হলো সম্রাটের নামানুসারে কনস্টান্টিনোপল—এখন তার তুর্কী নাম ইস্তানবুল। কালে রোমানদের

নূতন সাম্রাজ্যের নাম হয় পূর্ব রোমান সাম্রজ্য বা বৈজয়ন্তিয়াম সাম্রাজ্য। কয়েক শতাব্দী পরে রোমের সঙ্গে গ্রীকদের সমস্ত সম্বন্ধ যায় চুকে। কনস্টান্টিনোপল হয়ে উঠলো গ্রীক সংস্কৃতির কেন্দ্র,—প্রাচীন কালের স্পার্টা আথেন্স, কোরিন্থ থেকে সভ্যতার ভারকেন্দ্র সরতে সরতে উত্তরে চলে এসে বস্‌পরাস প্রণালীর ধারে আশ্রয় পেলো। প্রায় ১২০০ বৎসর কনস্টান্টি-নোপল ছিল গ্রীক সভ্যতা, গ্রীক সংস্কৃতি, গ্রীক খ্রীষ্টানী চার্চের কেন্দ্র। ১৪৫৩ অব্দে তুর্কীরা এই নগর দখল করার পর গ্রীক সংস্কৃতির অবসান হয়।

রোমান সাম্রাজ্যের সর্বত্রই ভাঙন ধরেছে—সীমান্ত আটকানো যাচ্ছে না, প্রদেশপালরা সৈন্য সামন্ত নিয়ে রোমের দিকে রওয়ানা হ'য়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি করছেন—সুযোগ বুঝে জারমেনিক উপজাতির লোক দলে দলে দীর্ঘ সীমান্তের আলগা ঘাঁটি ভেদ করে রোমান সাম্রাজ্য মধ্যে ঢুকে পড়েছে, গালিয়র (ফ্রান্স) মধ্যে প্রবেশ করলো ফ্রাংক উপজাতি, ইতালির মধ্যে প্রবেশ করলো নানা জারমানিক উপজাতি ; প্রথমে তারা আসে ক্রীতদাস হ'য়ে, খালি হাত, পা বাঁধা। তারপর আসে ভাড়াটে সৈন্য হয়ে, হাতিয়ার নিয়ে। এই ভাড়াটে সৈন্যদের নেতারাই এককালে ইতালির রক্ষাকর্তা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু রোমকে কেউ রক্ষা করতে পারলো না—৫ম শতকের মধ্যে রোমের সমস্ত বৈভব লুণ্ঠিত হ'লো, সমস্ত ইতালি হ'লো বহু রাজার রাজ্য। এর মধ্যে রোমের খ্রীষ্টীয় বাবাজী চার্চের (পোপ) কোন রকমে টি'কে থাকলেন—আর টি'কিয়ে রাখলেন জ্ঞানের দীপটিকে নানা দিকের ঝড়ঝাপটা থেকে। সে কথায় পরে আবার আসবো।

খ্রীষ্টধর্ম

য়ুরোপের ইতিহাসে দুটো ঘটনা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রোমান সাম্রাজ্যের রাইন-দানিয়ুব নদীর সীমান্ত ভেঙে বর্বর জারমেনিকদের প্রবেশ, আর দক্ষিণপূর্ব কোণে দীনবেশে কয়েকজন সাধুর প্রবেশ। একদল প্রবেশ করলো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, ঘোড়ায় চড়ে—জোর করে রাজ্য জয় করবে বলে; আর একদল এলো নিরস্ত্র—অহিংসার বাণী প্রচার করে, মার খাবার ও মরবার জন্য প্রস্তুত হয়ে। এরা হলো যীশুখ্রীষ্টের শিষ্য। আমরা প্রথমে খ্রীষ্টধর্মের কথাই বলবো। কিন্তু সে-কথা বলবার পূর্বে—কি পটভূমে রোমে খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুদয় হলো, সে সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

খৃষ্টীয় প্রথম শতকে রোমান সাম্রাজ্য বহুদুর বিস্তৃত। কত জাতি, উপজাতির লোকে তাদের পৃথক পৃথক ভাষা, সাহিত্য, পৃথক ধর্মবিশ্বাস নিয়ে এখন আপনাদিগকে রোমান বলে পরিচয় দেয়। সাম্রাজ্যের নানা অংশ প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে যুক্ত। রোমান সৈন্য বাহিনী দ্রুত চলাফেরা করে সেই পথ দিয়ে, বণিক ব্যবসায়ী আসে যায়,—পথ ঘাট এখন অনেক নিরাপদ।

রোমানরা বহু দেবদেবীর পূজক। নূতন দেশে গিয়ে তারা দেখে লোকে কত রকমের, কত নামের দেবতার পুজো দেয়। রোমানরাও সেইসব দেবতার পুজো করে—ভয় ও ভক্তিতে। দেশে ফেরবার সময় সঙ্গে করে আনে সেই সব দেবদেবীর মূর্তি বা তাদের প্রতীক। আসলে ধর্ম সম্বন্ধে রোমানরা যেমন উদাসীন, তেমনই উদার, কে কি পুজো করে—তা নিয়ে মাথা বড় ঘামায় না। প্রাচীন জগতে লড়াই চলে জাতির সঙ্গে জাতির—আর প্রত্যেক জাতি উপজাতির সহায় হন নিজ নিজ ঠাকুর দেবতারা; যে-জাতি যুদ্ধে জেতে, তারা পরাজিত জাতির দেবতার মন্দির লুটপাট করতে আর ভয় পায় না, কারণ সে-দেবতার জোর থাকলে তো তিনি তাঁর ভক্তদের রক্ষা করতে পারতেন! তা যখন পারেন নি—তখন সে

দেবতা মিথ্যা। আবার অনেকক্ষেত্রে বিজয়ীরা পরাজিত দেবতার নাম পাল্‌টে দেন—নিজেদের অনুকূলে, আর তাদের পূজা পার্বনে যাতে ব্যাঘাত না হয় সে ব্যবস্থা করে দেন। এসবের কারণ, ভিতরে ভিতরে ভয়—কি জানি কি হয়! হিন্দুধর্মে অনেক দেবদেবী প্রবেশ করেছেন বেদ পুরাণে যাদের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। এসব দেবতারা ভালো না-করতে পারেন মন্দতো করতে পারেন এই ভয়ে আড়ষ্ট। তাই সেই সব গ্রাম্য দেবতাদের পূজো দিয়ে, বলি দিয়ে, তোয়াজ চলে। বাংলা দেশে ইংরেজ বেনেরা কালীঘাটে পূজা পাঠিয়ে দিতো। হিন্দুরা খুসি হতো ইংরেজ বেনিয়াদের তাদের ঠাকুরাণীর প্রতি ভক্তি দেখে!

পশ্চিম এশিয়া ও মিশর জয়ের পর থেকে রোমানদের অনেক পরিবর্তন আরম্ভ হয়। মিশরের ধর্মে পূজাপার্বনের অন্ত ছিল না। ধর্মবিপ্লব সেখানে খুব কমই হয়েছিল। সাম্রাজ্য বিস্তার ও সম্রাটের শক্তি বাড়তে থাকলে ফারায়োরা একদিন দেবতার মতো সম্মান লাভ করেন। পুরোহিত ও স্তাবকদলের চেষ্টায় রাজা-পূজা খুব জাঁকিয়ে চালু হয়। প্‌টলেমি গ্রীকরা মিশরে রাজা হয়ে বসলে রাজা পূজাটা আরও ভালভাবে জমকিয়ে লোকে করতে আরম্ভ করে। পারস্যেও সেটা রেওয়াজ ছিল—আলেকজেন্দার বাবিলনে বাসকালে সেইসব অনুকরণ করতে আরম্ভ করেছিলেন মাত্র। তারপর প্‌টলেমিরা আলেকজেন্দ্রিয়ায় রাজাধানী পত্তন করে ধীরে ধীরে রাজা-পূজা প্রবর্তন করলেন সে দেশে।

আলেকজেন্দ্রিয়া আন্তর্জাতিক বন্দর, মধ্যপ্রাচ্যের সকল জাতি ও ধর্মের লোক সেখানে আসে-যায়। মিশরীয় গ্রীকরা স্থানীয় অসংখ্য দেবদেবীর মধ্য থেকে অসিরিস এপিস, ইসিস ও হোরাস-কে বেছে নিয়ে তাদের একটা নাম দেয় সিরাপিস (Ser-ap-is)—অসিরিসের সির, এপিসের আপ্‌ ও ইসিসের ইস্‌ জুড়ে শব্দ ও দেবতা তৈরী হ'লো। এই ত্রিমূর্তির একরূপ নিয়ে মন্দির উঠলো ; পূজা উৎসবের ব্যবস্থা হ'লো। এই সিরাপিস কালে গ্রীক জিউস (Zeus), রোমীয় জুপিতর, পারসিক মিত্র বা সূর্য দেবতার সঙ্গে অভিন্ন ব'লে স্বীকৃত হয়। ইসিস ও তার পুত্র হোরাস-এর মন্দিরে মায়ের কোলে শিশু হোরাস প্রতিষ্ঠি হলো, এ যেন মাদোনার কোলে যীশু, যশোদার কোলে কৃষ্ণ। এই ইসিস হোরাসের মূর্তি মিশরীয় গ্রীক স্থাপত্যে প্রচুর। সিরাপিসের মন্দিরের পুরোহিতরা বিবাহ করতেন না,

বৌদ্ধভিক্ষুদের মতো মাথা নেড়া থাকতেন। এরা লোকদের শোনায়, আত্মা অমর; মৃত্যুর পর তারা পরলোকে সুখে থাকবে অনন্তকাল ধ'রে; যারা এ-জন্মে দুঃখ পায়—তাদের পক্ষে এটা খুবই সান্ত্বনার বাণী; তাদের বিশ্বাস সিরাপিস তাদের মুক্তিদাতা।

প্‌টলেমিদের পর রোমানরা যখন মিশর দখল করে, তখন সেখানে রোমান সৈন্য, রোমান বণিক আস্‌ছে দলে দলে। স্থানীয় দেবদেবীর অলৌকিক শক্তির কথা তারা শোনে; সিরাপিসের মূর্তি নিয়ে যায় দেশে যথা-বিধি পূজার ব্যবস্থা করে সেখানে গিয়ে।

পশ্চিম এসিয়ায় মিথ্‌্রধর্ম এককালে খুব প্রবল ছিল। প্রাচীন পারসিকদের মধ্যে একটা শাখা সূর্যের পূজা করে 'মিত্র' নামে; কিন্তু তারা পূজায় বলি দেয় ব'লে জরদউষ্ট্রীয়দের সঙ্গে পৃথক হয়ে যায়। এদেশে যেমন ছাগবলি প্রশস্ত —মিথ ধর্মীদের বৃষহত্যা ছিল পূজার প্রধান অঙ্গ; এবং বৃষের রক্ত নিয়ে মাখামাখি করায় ছিল ভক্তদের আনন্দ—যেমন মহিষ বলির পর এদেশেও হতো—মহিষমর্দিনী দুর্গা পূজার সময়। রোমান সৈনিকরা মিত্রধর্ম নিয়ে গেল রোমে—এমনকি তারা যখন ব্রিটেন জয় করতে যায়—সেখানেও এই পূজা প্রবর্তন করে। এছাড়া কত দেবদেবী ভক্তদের কাঁধে চড়ে রোমে ও ইতালির মধ্যে আশ্রয় পেলো তার ঠিক নেই। সকলেই নিজ নিজ দেবতার উদ্দেশ্য মন্দির নির্মাণ করে—পূজা নৈবেদ্যর ব্যবস্থা দেয়।

পারস্যের শাহনশাহর আদব-কায়দা অনুকরণ করেন আলেকজেন্দার। তারপর তাঁর মৃত্যুর পর পশ্চিম এশিয়া ও মিশরের গ্রীক্‌ রাজারা সেই আড়ম্বর বহুগুণ বাড়িয়ে চলেন আন্তিয়োক ও আলেকজেন্দ্রিয়ায়। পটা্‌লেমি বংশীয়রা মিশরের ফারায়োদের ধারা অবলম্বন করে প্রজাদের কাছ থেকে দেবতার সম্মান দাবী করলেন। সম্রাটদের জন্য মন্দির নির্মিত হলো—তার মধ্যে রাজমূর্তি পূজা হয় দেবতার মতো। প্‌টলেমিদের পর যখন রোমানরা মিশরের মালিক হলো তখন তারা দেখে বিশাল রোমান সাম্রাজ্য মধ্যে অসংখ্য জাতির বাস—তাদের না আছে ধর্মে মিল, না আছে ভাষায় মিল,—সমস্ত আলগা ঢিলে। নানা জাতির মানুষদের একটা ঐক্য সূত্রে বাঁধতে না পারলে সাম্রাজ্যর ভিত্তি শক্ত হবে না—একথা বুঝেছিলেন রাজনীতিবিদরা। রোমান ঐক্যর প্রতীক খাড়া হলো সম্রাট—আর তার পূজা হলো জনতা

বন্ধনের সূত্র, যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বন্ধনে ইংলণ্ডের রাজা বা রানী ছিলেন উপনিবেশগুলির মিলন প্রতীক।

রোমান সাম্রাজ্য দেবতা বা রাজার মূর্তি পূজায় আপত্তি একমাত্র ইহুদীদের। ইহুদীরা রোমান সাম্রাজ্যের নানা স্থানে উপনিবেশ গড়েছে—তাদের বুদ্ধি ও শক্তি অসাধারণ; কিন্তু তারা অপৌত্তলিক বলে এই রাজা-পূজার সঙ্গে আপোষ করতে পারে না।

ইহুদীদের আদিবাস (ইসরেইল) ফিলিস্তান প্‌টলেমি রাজাদের ভাগে পড়েছিল। গ্রীকরা তাদের অধিকৃত নূতন রাজ্যে দলে দলে এসে উপনিবেশ গড়ে। শিল্পী আসে, বণিক আসে—আসে অভিনেতা, নটনটী, কারুজীবি—এমনকি বেকার পণ্ডিতের দল। দেখতে দেখতে গ্রীকভাষা হলো ইহুদী ভদ্রের ভাষা। গ্রীক ভাবে চলাফেরা হলো ইহুদী সমাজে আভিজাত্যের লক্ষণ। কিন্তু সকল শ্রেণীর ইহুদীই যে গ্রীক বা হেলেনিক ভাবাপন্ন হয়েছিল, তা তো নয়। ইহাদের মধ্যে বিরোধ বাঁধলো। প্রবীনে নবীনে সকল দেশে সর্বকালে ঘটে আস্‌ছে যা প্রাচীনরা হীব্রুভাষায় আলোচনা করে, শাস্ত্রগ্রন্থ হীব্রু ভাষায় লেখে। নবীনের দল গ্রীক শেখে, হীব্রু ভাষার তোয়াক্কা রাখে কম, অনেকটা ভারতের হিন্দুদের দশা। হীব্রু ভাষা ছিল সংস্কৃতের মতো, সকলে তা বুঝত না; আরামাইক ছিল কথ্য ভাষা। ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ গ্রীক ভাষায় তর্জমা হয়েছিল ইতিমধ্যে আলেকজেন্দ্রিয়াতে। এই অনুবাদকে বলে সেপ্টুয়াজেন্ট সেইটাই নবীনরা বোঝে—এ যেমন হিন্দুদের ইংরেজি তর্জমা পড়ে বেদ, উপনিষদ্ বুঝা। তিনশ' বছরের মধ্যে উত্তর মিশর ও পশ্চিম এশিয়ার এমন পরিবর্তন হয়ে গেল যে, যীশুখ্রীষ্টের কথা লেখা হলো গ্রীকভাষায়। তুলনা হতে পারে উনবিংশ শতকের ভারতের সঙ্গে—রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ইংরেজিতেই সবকিছু লেখেন, বক্তৃতাদি ইংরেজিতই দেন;—কারণ শ্রোতারা হিন্দুধর্মের সারকথা সংস্কৃত থেকে পড়তে পারে না—শিক্ষিতেরা ইংরেজি ভাষা বোঝে।

শতকের আরম্ভ হবার পূর্বেই প্রাচীন জগতের সর্বত্রই পুরাতন দেবদেবীর প্রতি লোকের অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস অনেকখানি শিথিল হয়ে এসেছিল। অথচ মানুষের বিজ্ঞান বা দর্শনবিষয়ক জ্ঞান তখনো পাকা ভিত্তির আশ্রয় পায়নি,—কি নিয়ে সে থাকবে? একটা কিছু সে চায়।

গ্রীক দার্শনিকরা নানা মত নানা পথ বাৎলাচ্ছেন সত্য, কিন্তু মানুষের মন তো তৃপ্তি পাচ্ছে না! স্টোইক দার্শনিকরা লোকদের সহিষ্ণু হতে উপদেশ করছেন; ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভর করতে বলেছেন; সুখ দুঃখকে সহজ ভাবে গ্রহণ করবার উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু সাধারণ লোকের মন এতে সায় দেয় না, তারা চায় ভাবালুতা, রসের উত্তেজনা—ভুলতে চায় প্রতি দিনের দৈন্য, অপমান, দুঃখ। গ্রীকদের মধ্যে (ইলুশিয়ান মিস্ট্রিজ) এক প্রকার তন্ত্রাচার ছিল, আথেন্সের নিকটে তাদের আখড়া। সেখানকার উৎসবে মেয়েপুরুষে, ধনীগরীবে, মুনিব-ভৃত্যে যোগ দেয়। রোমানরা এই উৎসবে হাজির হয়—খুব মজা লাগে। আধুনিক ভারতে বৈষ্ণবদের আখড়ায় সর্বশ্রেণীরই লোক দেখা যায়, হরিসংকীর্তন বা হরিলুটের সময় সব 'জাত' যোগ দেয়।

সমস্ত হেলেনিক মন ভেঙে পড়েছে দুটো ভাগে। একটা দিকে দার্শনিকদের সন্দেহবাদ বা জিজ্ঞাসা, অন্যদিকে শান্তির সন্ধানে মূঢ় লোকের রসের জন্য, রহস্যের জন্য ব্যাকুলতা। এই দুনিয়ায় তাদের বড় কষ্ট, বড় দুঃখ—তাই তারা আশা করে পরপারে গিয়ে অনন্ত সুখে থাকবে।

হেলেনিক জগতে ও রোমান সাম্রাজ্যের জনতার এই যখন মনের ভাব ও ভাবনা—সেই সময় ফিলিস্তানে ইহুদীদের মধ্যে নূতন এক ভক্তিধর্মের উদয় হলো। প্রবর্তকের নাম যীশু। গরীব ছুতোরের ছেলে—তাও কানীন জন্ম। যীশু প্রচার করলেন ভগবান সকলের পিতা—কেবল ইহুদীদের দেবতা নন। ইহুদীদের বিশ্বাস তা'রা মহাদেব যাহাবার বিশেষ সৃষ্টি—তাঁর মনোনীত মানুষ, তিনি কেবল ইহুদিদেরই হেপাজত করেন। যীশু বললেন ঈশ্বর সর্বমানবের। একথা ইহুদীদেব পুরোহিতরা মানে না, জেনটাইল বা অ-ইহুদীরা সুন্নত করে না, একেশ্বর মানে না—তাদের সদ্‌গতি হতেই পারে না। এখন এই ছুতোরের খেপা ছেলেটা যা-খুশি তাই প্রচার করে বেড়াচ্ছে, ধর্মকর্ম সে কিছু জানে না, মানেও না। গ্যালিলি হ্রদের ধারের কয়েকটা জেলে, কয়েকটা গরীব দুঃখী, কুঠে, খোঁড়া ভিরমীর ব্যায়রামি, দুষ্ট মেয়েমানুষ তার কাছে আসে—তাঁর কথা শোনে। ইহুদী পুরোহিতরা রোমান প্রদেশপালের কাছে নালিশ ক'রে বলে, লোকটা বলছে সে মুক্তিদাতা, মেসায়া। লোক খেপাচ্ছে—ওর শাস্তি

হওয়া উচিত। লোকটা রোমান আধিপত্য নষ্ট করতে চায়, এমন কথাও পুরোহিতরা বড় কর্তাদের কানে তোলেন। তারা বলেন, এ লোক সমাজের শত্রু, ধর্মের শত্রু, তার রাজ্যের শত্রু; চরম শাস্তি হওয়া চাই। সে যুগের প্রথা অনুসারে ক্রুশ কাঠে বিঁধে যীশুকে হত্যা করা হলো। ভারতে শূলের উপর চড়িয়ে মানুষ মারা হতো এক সময়ে—এখন ফাঁসি কাঠে লটকে দেওয়া হয়। তবে শূল কখনো ধর্মের প্রতীক হয়নি, তবে ত্রিশূল হয়েছে শৈবদের ধর্ম প্রতীক। কালে ক্রুশ চিহ্ন খ্রীষ্টীয় জগতের ধর্মের চিহ্ন হয়ে দাঁড়ালো। যীশুকে কবর দেওয়া হলো চোর ডাকাতের শ্মশানে। ভক্তরা খুঁজেই পেলোনা কবর, রাষ্ট্র করলো যীশু স্বর্গে চলে গেছেন। লোকের বিশ্বাস-শক্তি অসাধারণ।

যীশুর মৃত্যুর পর তাঁর চেলাদের উপর খুবই উৎপীড়ন চলে। বেচারারা ফিলিস্তান ছেড়ে সিরীয়ায় আশ্রয় নেয়। এইক্ষুদ্র গোষ্ঠির প্রতি দৃষ্টি গেল সল্ নামে এক ইহুদী মহাপণ্ডিতের; সল্ যেমন ইহুদীশাস্ত্রে পণ্ডিত, তেমনই গ্রীক দর্শনশাস্ত্রে। হঠাৎ তাঁর জীবনের পরিবর্তন হয়ে গেল একদিন। তিনি যীশুর বাণীতে মুগ্ধ হলেন এবং তাঁর কথা প্রচারে জীবন উৎসর্গ করলেন। সল্ খ্রীষ্টের শিষ্য হয়ে পুরাণো নাম বদলে পল্ নিয়েছিলেন; সেই নামে তিনি ত্রিশ বৎসর সিরীয়া, মাকিদন, থেসেলি, গ্রীস্ ইতালি পরিভ্রমণ করে বেড়ান; গ্রীক ভাষায় যে বাইবেল আছে, তার মধ্যে পলের পত্রধারায় খ্রীষ্ট ধর্মের মূল কথা ব্যক্ত হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয়—ইহুদী হয়ে পল্ যীশুখৃষ্টের ধর্ম নিয়ে পত্র লিখেছেন গ্রীক ভাষায়।

রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে যীশুর বাণী প্রচারিত হতে থাকলো; লোকের মন একটা কিছু আশ্রয়ের জন্য পূর্ব হতেই তৈয়ারী হয়েই ছিল—যীশুর উপদেশ সহজেই তারা গ্রহণ করলো।

খ্রীষ্ট ও তাঁর ধর্মতত্ত্ব নিয়ে গত দু'হাজার বৎসরের মধ্যে যত বই লেখা ও ছাপা হয়েছে, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব। পৃথিবীর এমন কোনো ভাষা নেই, যাতে 'নূতন বাইবেল' বা গ্রীকভাষায় লেখা যীশু খ্রীষ্টের জীবনী ও বাণীর তর্জমা না হয়েছে; পৃথিবীর এমন কোনো অংশ নেই যেখানে খ্রীষ্টের বাণী প্রচারিত না হয়েছে; পৃথিবীর এমন কোনো

ধর্ম বা সমাজ নেই, যার উপর খ্রীষ্টের বা খ্রীষ্টানির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব না পড়েছে। এই মহাশক্তির জন্মভূমি এশিয়া—সে এশিয়া তখন রোমানদের অধীন, অথচ এরই প্রভাবে ইতিহাসের পরবর্তী ঘটনায় উলট-পালট হয়ে গেল।*

পৃথিবীর ইতিহাসে যে খ্রীষ্টধর্ম বিপ্লব আনলে, সেই ধর্মের পটভূমি সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। ইহুদীদের মধ্যে যীশুখ্রীষ্টের জন্ম হয়। সে-সময়ে ইহুদীরা রোমানদের অধীন। তার পূর্বে প্রায় তিনশ বছর এরা গ্রীকদের অধীন ছিল—মাঝে মাঝে স্বাধীন হবার জন্য বিদ্রোহ করেছে। সিরীয়ার গ্রীকরা ইহুদীদের জোর করে হেলেনি বানাবার কত চেষ্টা করে ছিল! সিরীয়ার রাজা আন্তিয়োকস (১৭৫ খৃ, পূ,) ইহুদীদের মন্দির অপবিত্র করে নানা ভাবে উপদ্রব চালান জনতার উপর; মন্দিরে পুতুল বসিয়ে তার সামনে পূজা দেবার জন্য লোকদের উপর হুকুম হয়। কিন্তু লোকে তা মানতে পারে নি বলে খুবই নির্যাতীত হয়।

কিন্তু কালের প্রভাবে, অর্থনৈতিক কারণে ইহুদীদের জীবনে পরিবর্তন হয়ে চলেছে। ইসরেইলের ইহুদীদের থেকে মিশরের ইহুদীদের মধ্যে পরিবর্তনটা হয় বেশি করে। ইহুদীদের মাতৃভাষা আরামাইক, ধর্মের ভাষা হীব্রু; আমাদের দেশে লোকে বলে দেশজ ভাষা (প্রাকৃত)—ধর্মকথা শোনে সংস্কৃত থেকে। মিশরের ইহুদীরা তাদের ধর্মের দেবভাষাই গেল ভুলে—গ্রীক্ হয়েছে তাদের মাতৃভাষা সদৃশ, যেমন আমাদের দেশে হয়েছে ইংরেজি। সেইজন্য তাদের ধর্ম গ্রন্থ হীব্রু থেকে পণ্ডিতদের সাহায্যে গ্রীক্ ভাষায় তর্জমা করা হয়—ইহুদীরা সেইটা পড়তো। বাইবেলের গ্রীক তর্জমা সেপ্তুয়াজেন্টের কথা আগেই আমরা বলেছি।

ইহুদীদের খাস দেশ ফিলিস্তান রোমানদের কবলে পড়ার পর, তাদের উপর বাদশাহী অত্যাচার কমলো না। কিন্তু এতো করেও পশ্চিম এশিয়াকে 'রোমান' বানানো গেল না, লাতিন ভাষা চালু হলো না—গ্রীক ভাষাই র'য়ে গেল। রোমানরা ইহুদীদের দেশ জয় করে সিরীয়াপ্রদেশ ভুক্ত

---

* পৃথিবীতে হাজার দুই ভাষা ও উপভাষা চলিত আছে; তার মধ্যে ১০৪০টি ভাষায় সমগ্র বাইবেল নূতন টেস্টামেন্ট অথবা চার গস্‌পেল বা সুসমাচার অনূদিত হয়েছে। পৃথিবীর চলতি ও মৃত ভাষার সংখ্যা আন্দাজ করা হয়েছে ৩০৭৬।

করে দেয়। স্থানীয় শাসক নিযুক্ত হন হিরোদ—ইনি রোমানও নন, ইহুদীও নন,—ইনি এসিয়ান গ্রীক। হিরোদ ও তাঁর বংশধর শাসকরা ইহুদীদের সব কিছুকেই পাশ্চাত্য আদর্শে অর্থাৎ হেলেনিক ভাবে গড়তে চান। **কিন্তু সকল শ্রেণীর ইহুদী এটা মানতে প্রস্তুত নয়। তারা দেখছে একদিকে খৃষ্ট ভক্তরা ইহুদী ধর্মের বুনিয়াদই আগাগোড়া বদলাতে চাইছে, আর এক দিকে হিরোদরা তাদের হেলেনি বানাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এই দুই রকম আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য ইহুদীরা হীব্রু ভাষায় লেখা ধর্মশাস্ত্রকে পুঁথিবদ্ধ করলে; কিন্তু হীব্রু ভাষা কম লোকেই বুঝতো বা জানতো।

ইহুদীদের মধ্যে আমরা যাদের প্রাচীনপন্থী বলছি তারাও একটা সঙ্ঘ নয়। তাদের মধ্যে একদল শাস্ত্রবাদী, তারা পুরাতন হীব্রু বাইবেলের মূল বক্তব্য থেকে এক চুল নড়বার পক্ষপাতী নয়; প্রাচীন গ্রন্থ সম্বন্ধে কে কি টীকা টিপ্পনী করেছেন তা এরা গ্রাহ্যের মধ্যে আনতো না। এদের বলতো সাদুইচি (Sadducce বা Zadok অথবা Tsaddiaq বা ন্যায়-পন্থী)! প্রতিদ্বন্দ্বী দল ফারিসি—আমাদের দেশের ব্রাহ্মণদের মতো, স্নানাহ্নিকনিষ্ঠ, উপবাসপটু, শুচিতারক্ষার জন্য সদাই উৎকণ্ঠিত। এঁরা ধর্মশাস্ত্র থেকে স্মৃতিশাস্ত্র বেশি করে মানেন। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণরা যেমন বেদবেদান্ত থেকে স্মৃতিশাস্ত্রর চর্চাটাই বেশি করতেন এককালে—ফারিসিদেরও সেই দশা। এদের বাইরে এসেনি (Essene), তারা কৃচ্ছ্রসাধক।*

পণ্ডিতরা বলেন যে বুদ্ধ, জরদউষ্ট্র ও পিথাগোরাসের মতের প্রভাব পায়। এককালে পশ্চিম এশিয়ায় বৌদ্ধদের সঙ্ঘ ছিল; তাদের প্রভাবে হয়তো এসেনিরাও সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে থাকতে ও সমবেতভাবে সমস্ত ভোগ করতে শিখেছিল, তারা বলে 'আমরা তোমরা সবাই তাঁর'।

কিন্তু এই ধর্মভাব ও ধার্মিকতাই ইহুদীদের সমগ্র চেহারা নয়। তারা ব্যবসায়ী শিল্পী, স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি। তারা স্বাধীনতা ফিরে পেতে চায়—বহু বৎসর তারা গ্রীক ও রোমানদের বিরুদ্ধে লড়েছে। কিন্তু

** বাংলা দেশে ইংরেজ আমলে খ্রীষ্টানী তথা ইংরেজিয়ানায় শিক্ষা প্রচার করবার জন্য চেষ্টা হয়। সেই প্রচেষ্টার ফলে দেশের লোক পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হয়। বাংলা দেশে খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্ম উভয়ের আক্রমণ থেকে সনাতনী-ধর্ম বাঁচাবার জন্য নব্যহিন্দু আন্দোলনের জন্ম।

*হীব্রু ভাষায় এদের বলে Chitsonim (outsiders) বা বাইরের লোক। ফারিসি ও সাদুইচিরা ইহুদী সাইনাগগ বা সমাজের ভিতরের লোক—এসেনীরা জাত-ইহুদী হলেও—তাদের সমাজের বাইরে ছিল।

কিছুতেই যখন তারা তাদের উৎকট স্বাজাত্য বোধ ও অতিধর্মীয় মনোভাব রোমানদের দানবীয় সাম্রাজ্যবাদের কাছে নত হলো না তখন রোমানরা ইহুদীদের উপর শেষ মারণাস্ত্র ছাড়লো—জেরুসালেম মন্দির ধ্বংস ক'রে, নগর লুঠ ক'রে, তাদের ঘরছাড়া ক'রে (৭৮ খৃ. অ.) তবে শান্ত হলো। রোমানদের সময় সর্বহারা হয়ে ইহুদীরা জেরুসালেম থেকে বিতাড়িত হলো। ইহুদীদের ইতিহাসের উপর পরদা পড়ে গেল। তারা দেশ ছাড়া হয়ে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু তারা যেখানেই থাকুক, তারা ইহুদীই রয়ে গেল, কোনো দেশে বাস করে সেদেশের লোকের সঙ্গে মিশে 'এক' হতে পারলে না। প্রায় উনিশ শ' বৎসর পরে তারা ইসরেইল রাজ্য গড়েছে। কিন্তু চারদিকের আরবদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবেই আছে—কিছুতেই মিশ খাচ্ছে না। তাদের মুসলমান প্রতিবেশীরা এদের সহ্য করতে পারছে না—প্রতিদিন নানা রকমের সমস্যা লেগেই আছে, সে আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হব না।

ইহুদীদের এই পটভূমি থেকে খ্রীষ্টান ধর্মকে বিচার করতে হবে। এর আসল উৎস ইহুদী ধর্ম ও সেমেটিক সংস্কৃতি। খ্রীষ্টানদের অনেক প্রথা ও বিশ্বাসের মূল হচ্ছে আদিম সেমেটিক ধর্মে; তবে খ্রীষ্টধর্ম যে ইহুদী ধর্মের পুনরাবৃত্তি নয় সে কথা মনে রাখতে হবে। শিখধর্ম নানক নামে এক হিন্দু প্রচার করলেও—সে ধর্মকে হিন্দু ধর্ম বলা যায় না।

ইহুদীদের বুনিয়াদী ধর্মমতের সঙ্গে কালে মিশে যায় গ্রীক দর্শন, এসেনীদের কৃচ্ছসাধন তত্ত্ব ও নানা উপধর্মের বোঝা। এই সব নিয়ে খ্রীষ্টানীর জন্ম হয়। খ্রীষ্টের মাতা মেরী ও তাঁর ক্রোড়ে শিশু-যীশুর কল্পনা তারা গ্রহণ করেছে মিশরীয়দের অসিরিসের কোলে হোরাস-এর মূর্তি থেকে। খ্রীষ্টের জন্মদিন দক্ষিণায়ন দিনে (২৩ ডিসেম্বর) কল্পনা করা হলো। রবিবার-পূণ্যদিন বলে স্বীকার করা হয়—মিত্রধর্মীদের খুসি করবার জন্য। এধরনের কত বিশ্বাস, কত আচার ও কুসংস্কার যে ঢুকেছে ধর্মের নামে তার বিশ্লেষণ করা আমাদের কাজ নয়।

রোমানরা দুনিয়ার কত অপ-ধর্মকে আশ্রয় দিয়েছে, কত পাপ কদাচারকে মেনে নিয়েছে—কিন্তু খ্রীষ্টানদের তারা সহ্য করতে পারলো না। খ্রীষ্টানরা

মনে করে তারা যা বিশ্বাস করে সেটাই সত্য, আর সব মিথ্যা। তারা কোনো দেবদেবী মানে না, কোনো দেবতার নামে আদালতে শপথ গ্রহণ করে না। তারা ভগবানকে মানে, যীশুকে জানে তাঁর প্রেরিত পুত্র বলে। রোমান সম্রাটের মূর্তি বা প্রতীকের সম্মুখে পূজা নৈবদ্য তারা দেবে কেমন করে? ওটা যে মানুষের প্রতিমা বা পুতুল,—তার কাছে কি দেবতার ফুল দেওয়া যায়।

রোমানরা তাদের সাম্রাজ্যের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে চায় সম্রাটকে কেন্দ্র করে, সেই জন্যই তো সম্রাট পূজার ব্যবস্থা। খ্রীষ্টানদের সঙ্গে বিরোধ বাঁধলো এই বিষয়টা নিয়ে। এছাড়া খ্রীষ্টানরা প্রচার করছে সে ধনী ও গরীবের ভেদ ঘুচোতে হবে। এটা যে সর্বনেশে বুলি—এই ভেদের উপরইতো সাম্রাজ্য দাঁড়িয়ে। তারা আরও বলছে স্বর্গে সকলের সমান অধিকার—প্রভু ও দাস, মুনিব ও 'মুনিষ', নবাব ও নফর—ভগবানের চোখে সমান—সেটাই বা কি করে সম্ভব? দাসের দল যদি সাম্য দাবী করে তবে তো ধনতন্ত্রবাদের ভিত্ যাবে ধ্বংসে। এই সকল কারণে রোমান সম্রাটদের চোখে খ্রীষ্টানরা হলো সমাজদ্রোহী, রাজদ্রোহী সুতরাং তাদের ধ্বংস করতে হবে—নইলে সাম্রাজ্য টিকবে না। সুরু হলো খ্রীষ্টানদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন। সাধু পল্‌কে রোমে তারা বধ করলো। সম্রাট নিরো ছিলেন অত্যাচারের প্রতিমূর্তি; গল্প আছে যে তিনি তার রাত্রি-বেলায় সার্কাস মণ্ডপ আলোকিত করতেন খ্রীষ্টানদের মশাল বানিয়ে—কাপড়ে তেল দিয়ে মানুষগুলোকে জড়ানো হতো—তারপর খোঁটায় বেঁধে আগুন দেওয়া হতো মশালের মতো জ্বলে তারা সার্কাস মণ্ডপ উজ্জ্বল করতো। নিরো রোমের নোংরা সুবুরা পাড়ায় আগুন লাগলে—দোষটা চাপিয়ে দেন খ্রীষ্টানদের উপর।

কলোসিয়াম নামে বিরাট এক খোলা রঙ্গালয় সম্রাটরা নির্মান করেন; অনেক হাজার লোক সেখানে বসে থিয়েটার সার্কাস দেখতে পেতো। সেই কলোসিয়ামে রোমের জনতাকে খুসি করবার জন্য নানা রকমের নিষ্ঠুর খেলা দেখানো হতো; তার মধ্যে একটা হচ্ছে খ্রীষ্টানদের বন্য পশুর সামনে ফেলে দেওয়া। গ্লাডিএটর নামে পেশাদার পালোয়ানদের সঙ্গে লড়বার জন্য খ্রীষ্টানদের আনা হতো; কিন্তু খ্রীষ্টানরা কাউকে আঘাত করবে না—দাঁড়িয়ে মার খেতো ও মরতো। এ সম্বন্ধে অনেক কাহিনী আছে—তবে তার সকলগুলো সত্য না-ও হতে পারে। তবে মতামতের

পার্থক্য থাকার জন্য মানুষ মানুষের প্রতি কী নিষ্ঠুর হতে পারে তার উদাহরণ আধুনিক কালেও কম পাওয়া যায় না। শক্তিমানরা চিরদিনই চেয়ে আসছেন দুনিয়ার সব মানুষকে একমতের মুখোস পরিয়ে এক' করবেন, সবাই একধরণে চলবে, একভাবে উঠবে বসবে খাটবে। একই বুলি আউড়িয়ে তারা হবে খাঁটি দেশের মানুষ! কিন্তু অনেক ধর্মকথা বলে, অনেক নরহত্যা করে, কোনো মহাপুরুষ বা বীরপুরুষ তার সফল মূর্তি দেখতে বা দেখাতে পারেন নি। কারণ মানুষই একমাত্র জীব যে তার অতীতের পুনরুক্তি নয় ও যে চিরকাল অতীতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে আসছে, কখনো বা অতীতকে মুছে ফেলে বিপ্লবী হয়েছে।

যীশু খৃষ্টের জন্মের তিনশ' বৎসর পরে (খ্রী অ ৩১৩)*রোমান সম্রাট কনস্টাণ্টাইন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে ইতালির মিলানো শহর থেকে ফতোয়া দিলেন যে খৃষ্টানরা এখন থেকে তাদের ধর্ম অনুসারে চলতে পারবে। এই ঘোষণায় সবপ্রথম খ্রীষ্টান-অখ্রীষ্টান আইনের চোখে সমান অধিকার পেলো, এটা ইতিহাসের একটা বড় ঘটনা।

কনস্টাণ্টাইন ক্রুশে মানুষকে পেরেক দিয়ে ঠুকে হত্যা করবার প্রথা বন্ধ করে দিলেন। আর ঘোষণা করলেন যে রবিবার হবে বিশ্রামের দিন। ইহুদী ধর্মের বিশ্বাস যে ভগবান ছয় দিন ধ'রে ক্রমান্বয়ে জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েন ও সপ্তম দিনে বিশ্রাম নেন। ইহুদী মতে শনিবার হচ্ছে সাবাথ্ বা বিরাম দিন। কন্স্টাণ্টাইন ঘোষনা করলেন রবিবার হবে সাবাথ্। এটা করার কারণ হচ্ছে খানিকটা রাজনৈতিক চাল। এই সময়ে সাম্রাজ্যর সর্বত্র সূর্য বা মিত্রপূজার খুব চল। সেই মিত্র (সূর্য) পূজকদের খুসি করবার জন্য রবিবার হলো ছুটির দিন। খ্রীষ্ট ধর্মের সঙ্গে রবিবারের সাবাথের কোন সম্বন্ধ নেই। এখন পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে রবিবার হচ্ছে ছুটির দিন।

রোম ছিল অখণ্ড রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী। তাই ধর্ম প্রচার হোক আর সওদা কেনাবেচা হোক—লোকে আসে সেখানে। সাধু পল সেখানেই আসেন ধর্ম প্রচার করতে। এই রোমেই পরে এসেছিলেন সাধু পিটার। লোকবিশ্বাস পিটারের হাতে যীশুখ্রীষ্ট স্বর্গের চাবি দিয়ে গিয়েছিলেন! তিনি রোমে একটি ছোট আরাধনা মন্দির নির্মাণ করেন, মুষ্টিমেয় সমবিশ্বাসী

জমায়েত হয় সেখানে। কালে সেখানে রোমের বিশাল সেণ্টপিটার্স চার্চ (পিটারের গির্জা) ধীরে ধীরে খাড়া হয়। ইহুদী ও খৃষ্টানদের ধর্মস্থান জেরুসালেম রোমানরা ধ্বংস করেছে—এখন রোমানদের রাজধানী রোমই হলো খ্রীষ্টানদের প্রধান তীর্থক্ষেত্র। পিটারের খ্রীষ্টমন্দিরের সেবায়েৎ 'বাবাজি'-কে লোকে ভয় ও ভক্তি দুই করে। স্বর্গের চাবি তার হাতে! ('বাবাজি'—ইতালীয় ভাষায় Papa—যার থেকে পোপ শব্দ হয়েছে)। রোমের পোপ এককালে দুনিয়ার খ্রীষ্টানদের ধর্মগুরু ছিলেন—এখনো বহু কোটি ক্যাথালিক খ্রীষ্টান তাঁকে গুরু বলে মানে। তাঁর দর্শন পাবার জন্য হাজার হাজার লোক এখনো পার্বণদিনে সাধু পিটারের গির্জার বিশাল চত্বরে জমায়েত হয়।

কনস্টাটাইনের সময় থেকে রোমান সাম্রাজ্যের ভারকেন্দ্র রোম থেকে সরে বৈজয়ন্তীয়মে (কন্স্টান্টিনোপল) গেলে, রোমের কোনো রাজনৈতিক শক্তি প্রতিপত্তি নাথাকা সত্বেও পোপই হয়ে রবলেন সর্বেসর্বা। রাষ্ট্রশাসন শোষণ কেন্দ্র ও ধর্ম কেন্দ্র রোমান সাম্রাজ্যের দুই দেশে, দুই ভাষাভাষী জাতির মধ্যে স্থাপিত হলো। কালে সাম্রাজ্যের দুই অংশ যেমন টুকরো হয়ে গেল, খৃষ্টান ধর্মেও ভেদ সৃষ্টি হলো; সে আলোচনা আসবে ক্রু-জেদ কাহিনী বলার সময়ে।

য়ুরেশিয়া মহাদেশে মানুষের মধ্যে যে নড়াচড়া চলেছে তার ঢেউ এসে ইতালির উপর পড়লো! নানা উপজাতি ঢুকছে দলের পর দলে। এই বর্বরদের হাত থেকে মানুষের ধন প্রাণ, রোমীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি রক্ষা বুঝি আর হয় না—সে রামও নেই, অযোধ্যাও নেই—ফলে পূর্বের রোমনরা নেই, রোমও নেই—আছে আধমরা মানুষ ও ধ্বসে-পড়া ইঁট পাথরের ইমারত পূর্ণ মহানগরী! রোমান সাম্রাজ্যের নয়া রাজধানী কন্স্টাণ্টিনোপল হয়ে উঠছে প্রধান; সেখানকার সম্রাটরা বুঝে নিয়েছেন যে, উত্তরের লোকেদের হামলা থেকে ইতালিকে রক্ষা করা যাবে না; রোমের গৌরবের দিন ফুরিয়ে আসছে। বৈজয়ন্তীয়মে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার (৩৩০ অব্দ) আশি বৎসরের মধ্যে রোমও লুঠ করলে বর্বরেরা (৪১০)। টাইবার নদীরতীরে সাত পাহাড়ের উপর বারোশ' বৎসর পূর্বে যে ছোট একটা বসতি হয়েছিল—এখন যা বহু ক্রোশ জুড়ে অসংখ্য সৌধঅট্টালিকা পূর্ণ, সেই মহানগরীর পতন হলো বর্বরদের হাতে। এসব কথা আমরা পরে আলোচনা করবো। এইসব দুঃসময়ের দিনে রোমের খ্রীষ্টীয় সঙ্ঘের পোপ নগর ত্যাগ করে যায় নি।

সমকালীন এশিয়া

রোমান রিপাবলিক ও সাম্রাজ্যর গৌরবময় যুগের সমকালীন হচ্ছে পারস্যের পহ্লব বা পারদ বংশ (খ্রী পূ ২৪৮—খ্রী অ ২২৬) ভারতের মৌর্য থেকে অন্ধ্রভৃত্য বংশ (খ্রী. পূ. ৩২২ খ্রী. অ. ২২৫). ও চীনের হান বংশ (খ্রী. পূ. ২০২—খ্রী, অ. ২২১)। এখন থেকে দু'হাজার বৎসর পূর্বে পৃথিবীর মানচিত্রটা ছিল অনুরূপ। সেযুগের এইসব রাষ্ট্রের মধ্যে আজকের মতই রেশারেশি, ঠেলাঠেলি ছিল; আবার ব্যবসায় বাণিজ্যও চলতো সমস্ত রাজনৈতিক বাধা বিপত্তি এড়িয়ে।

ব্যবসায়ী ও বণিককে নিজ দেশের সীমার মধ্যে কোনোকালে আটকে রাখা যায় নি; অর্থরোজগারের শতেক পথ তারা খুঁজে বের করে। রোমানদের সাম্রাজ্য প্রসার ও বাণিজ্য বিস্তার চলেছিল সাথে সাথে। তবে খাস রোমনরা ব্যবসায় বাণিজ্য খুব-যে পটু ও হুঁশিয়ার ছিল তা বলা যায় না। সিনেট জানতো সাম্রাজের নানা অংশের লোকে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা পেলে, তার থেকে যেমুনাফা কামাবে, তার মোটা ভাগ রোম সরকার পাবে নানাভাবে। সেজন্য বাইরের বাণিজ্য বা ন বার দিকে রোমানদের দৃষ্টি ছিল গোড়া থেকেই। আজও প্রত্যেক দেশ থেকেই বিদেশে বাণিজ্য প্রসারের জন্য ট্রেড-মিশন যায় দুনিয়ার প্রায় সকল সভ্য, আধাসভ্য দেশে। কাঁচা মাল সুবিধা দরে পাবার সুযোগ খোঁজে, আবার নিজের শিল্পজাত মালপত্র চড়া দামে গছাবার চেষ্টায় থাকে। অন্য জাতি সেখানে সেই ধরণের মালপত্র নিয়ে এসে পড়লে প্রতিযোগিতামুলক দরে নামিয়ে আগন্তুকদের হটাতে চেষ্টা করে। মানুষের এই চেষ্টা কতকালের তা কেউ জানে না। আত্মরক্ষা করতে হলে অন্যকে বঞ্চিত করতে হবে—এ মত আজও প্রবল।

সে-যুগের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলতো রোম, চীন ও ভারতের মধ্যে। চীন ও ভারত ছিল রোমানদের বিলাস-ব্যসনের সামগ্রী সরবরাহের আকর; মসলিন বা সূক্ষ্ম সুতির বস্ত্র, মশলাপাতি মণিমুক্তা যেতো ভারতের নানা

বন্দর থেকে। চীন থেকে যেত রেশম,—পশ্চিম এশিয়ার হেলেনিক রাজা ও সম্ভ্রান্ত এবং পরে রোমান ধনীদের ব্যবহারের জন্য। সব দেশেই শিল্পীরা মাল প্রস্তুত করে—কিন্তু তার মধুটুকু পায় বণিকরা। শিল্পী জানেনা মাল কোথায় যায়—রোমানরাও জানে না মাল কোথা থেকে আসে। কারণ অনেক বণিক-জাতির হাত ঘুরতে ঘুরতে মাল আসছে আলেকজেন্দ্রিয়ার বন্দরে ও পরে রোমের বাজারে। আসলে মধ্যএশিয়ার বক্‌ত্রিয়ান বণিকরা মালপত্র আনে চীনের উপকণ্ঠ দেশ থেকে চীন থেকে নয়। তাদের হাত থেকে সেসব যায় ইরানী অথবা আরমিয়ান ব্যবসাদারদের হাতে। তারা পৌঁছিয়ে দেয় মধ্যধরণী সাগর তীরে—সেখান হতে জাহাজে মালপত্র চালান হয় রোমান বন্দরে। পহ্লবরা পারস্যে প্রতিষ্ঠিত হবার পর, বিদেশী বণিকদের আসা-যাওয়া সম্বন্ধে কড়াকড়ি সুরু হয়। কেন তারা এটা করেছিল তার কারণ খুব স্পষ্ট নয়।

মধ্যএশিয়ার বক্‌ত্রিয়া ছিল শিল্পবাণিজ্যের জন্য খ্যাত—শোনা যায় তিনশ' নগর ছিল সেদেশে। কালে সে-সব ধ্বংস পায় শক ইউচি প্রভৃতি অর্ধবর্বর মরুচর জাতির কবলে প'ড়ে। চীন থেকে আসা-যাওয়ার পথ গেল নষ্ট হয়ে। বিলাসের উপকরণ আর পৌঁছয় না পশ্চিম দেশে। অথচ অপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র যা একবার। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অভ্যাসের মধ্যে এসে যায়, তা না পেলে লোকের প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে,—বিশেষত যখন অর্থের অভাব নেই ক্রেতার তরফে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অসুবিধা দূর করবার জন্য মিশরের প্‌টলেমীয় রাজারা সমুদ্রপথে ভারতে আসবার কল্পনা করেন, কিন্তু সরাসরি যোগ স্থাপন করতে পারেন না। নানা সমুদ্রচর জাতির সাহায্যে তারা ভারতের শিল্পজাত সামগ্রী পেতে থাকলেন। লোহিত সাগর তীরবাসী আরবরা জাত-নাবিক, তারা ভারত ও পূর্বদ্বীপাবলি থেকে মাল নিয়ে লোহিত সাগরতীরে আসে—সেখান থেকে উটের পিঠে সেসব যায় মিশরে। সুয়েজ খাল কাটার পূর্ব পর্যন্ত এই পথ ছিল ভারত থেকে য়ুরোপে যাবার দ্রুত পথ।

মিশর রোমান সাম্রাজ্যভুক্ত হ'বার পর থেকে, সমুদ্রপথে ভারত ও দূরপ্রাচ্যের সঙ্গে রোমের সরাসরি সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা সুরু হলো। আমরা পূর্বে বলছি যে রোমানরা প্রাচ্য দেশের মশলাপাতি, মণিমুক্তা, সুতির

কাপড় ব্যবহার করে আসছে; এর জন্য রোমকে বহুলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা রপ্তানী করতে হয় বিদেশে। ভালো স্বর্ণমুদ্রা দুর্লভ ছিল বলে রোমান মুদ্রার চাহিদা ছিল খুব বেশি। পারসিকদের সময়ে উত্তর পশ্চিম ভারতের সোনার খনি প্রায় নিঃশেষিত হয়েছিল; অথচ তথাকথিত সভ্য মানুষ স্বর্ণলোভী।

রোমান সাম্রাজ্য থেকে কী পরিমাণ সোনার টাকা ভারতে আসতো, তার কিছুটা প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। সম্রাট অগষ্টাস ও টিবেরিয়াসের সময়ের অগনিত স্বর্ণমুদ্রা মাদ্রাজ অঞ্চলে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে পাওয়া গেছে! রোমের সঙ্গে আরব, ভারত ও চীনের যে বাণিজ্য চলতো তার আন্দাজী মূল্য হচ্ছে ১৪ কোটি টাকার উপর! সে যুগের ভৃগুকচ্ছ বর্তমান বোম্বাই রাজ্যের বরোচ ছিল পশ্চিমভারতের প্রধান বন্দর। উত্তরভারত থেকে বন্দরে পৌছবার রাজপথ ছিল ভিলসা, উজ্জয়িনীর মধ্যে দিয়ে। আর একটা পথ ছিল কাঠিয়াবাড়ের জুনাগড়ের পাহাড়ের পাশ দিয়ে; সেটা পৌছতো দ্বারকা বন্দরে। এপথ খুব প্রাচীন; মহারাজ অশোকের অনুশাসন আছে জুনাগড়ের পাহাড়ে। তারপর রুদ্রদামনও সেখানে শিলালেখ উৎকীর্ণ করেন। এসব ছাড়া মাদ্রাজের দক্ষিণ উপকূলেও কয়েকটা বন্দর ছিল।

অগস্টাস রোমের সম্রাট হলে, ভারতীয় অনেক রাজা তাঁর সঙ্গে মিত্রতা করেন। দক্ষিণ ভারতের পাণ্ড্য বা পৌরব নামে কোন এক সম্রাট দূত পাঠান রোমে অগস্টাসের দরবারে। উপঢৌকনের মধ্যে ছিল বাঘ, তোতাপাখী অজগর সাপ, প্রকাণ্ড কচ্ছপ; আর ছিল একটা নুলো ছেলে,—সে তীর ছুড়তো পা দিয়ে।

ভারত ও পশ্চিমএশিয়ার মধ্যে সমুদ্রপথে যে জাহাজ বা ডিঙ্গী নৌকার চলাচল ছিল সেগুলো বহুকাল যেতো উপকূলের কাছ ঘেঁসে। খ্রীষ্টীয় ৪৫ অব্দে হিপোলাস নামে এক নাবিক সমুদ্রের মৌসুমী বায়ুর (Etesian wind) গতি ও মতি জানতে পারেন। তখন হতে অনুকূল বায়ুর সাহায্যে লোহিত সাগরের মিশরী বন্দর থেকে পাল তুলে জাহাজ বের হয়ে সোজা ভারতে আসতে সুরু করে। এর ফলে মিশরের ভিতর দিয়ে আলেকজেন্দ্রিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধটা বাড়তে থাকে।

প্রথম শতকের শেষভাগে এক নাম-না জানা গ্রীক নাবিকের ভ্রমণকাহিনী

(পেরিপ্লাস) পাওয়া গেছে ; তার থেকে লোহিতসাগর তীরের অনেকগুলি বন্দরের নাম পাই। দ্বিতীয় শতাব্দীতে পারস্য সাগর থেকে রোমান জাহাজ পূব সাগরে যাত্রা ক'রে চীন পর্যন্ত গিয়ে পৌছয়। সে যুগের নাবিক, বণিক ও পরিব্রাজকদের বর্ণনা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্‌টলেমি নাম এক জ্যোতিষী পণ্ডিত ভারত মহাসাগর তীরের দেশ সমূহের কথা দিয়ে এক বই লেখেন ; তাঁর এই অমূল্য গ্রন্থ থেকে অনেক খবর জানতে পারা গিয়েছে।

রোমানরা ২য় শতকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত এসে পৌচেছিল, কিন্তু সেখানে বেশি কাল প্রভুত্ব করতে তারা পারেনি। তার কারণ আমরা আলোচনা করেছি।

চীনের কথা

আমরা মাঝে মাঝে চীনদেশের রেশমের কথা, ভারতের বাজারে চীনাংশুক আমদানীর কথা বলেছি, কিন্তু দুই দেশের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি অনেক কাল। আমরা শিহুয়াংতি (খ্রীঃ পূঃ ২৪৬-২০৯)-র দুর্দান্ত প্রতাপ দেখেছি। তিনি একছত্র শাসন পাকা করবার জন্য যে-পথ ধরেন, তা আজকালকার উৎকট ডিকটেটরী শাসনের পথ। তাঁর ধারনা জন্মে যে চীনের মহাত্মা সাধক-দার্শনিক কুংফুৎসুর বই প'ড়ে চীনাদের বুদ্ধি গেছে ভোঁতা হয়ে, নূতন কিছু গ্রহণ করবার শক্তি তারা হারিয়েছে। তাই সম্রাটের হুকুম হয় কুং-এর পুঁথিপত্র নষ্ট করে দেবার জন্য। আমাদের যুগে জারমেনিতে এই কাণ্ড করেছিলেন হিটলার; তিনি ধ্বংস করেছিলেন লাখে লাখে বই, জারমান ছেলেমেয়েদের নিষেধ করে দেন সেসব বই পড়তে, লাইব্রেরী থেকে সেসব বই টেনে এনে পোড়ানো হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এধরণের উৎপাত টেঁকে না। হুয়াং-তির মৃত্যুর পর সবই ফিরে এলো—পুঁথিপত্র লোকে টেনে আনলো লুকনো জায়গা থেকে, পণ্ডিতরা ফিরে পেলেন তাদের পুরাণো অধিকার। মানুষের মন পরিবর্তন না হলে যে, মত পরিবর্তন হয় না এই সহজে কথাটা জবরদস্ত শাসকরা ভুলে যান। তাছাড়া ধর্মের সঙ্গে অর্থ আছে জট পাকিয়ে—স্বার্থ আছে জড়িয়ে—সুতরাং হুকুমের টানে তার জড় বা শিকড় উপড়ানো খুব সহজ নয়।

সম্রাট হুয়াং ভেবেছিলেন চীনের ভিতরে মানুষের মনকে ও মতকে নিষেধের বেড়া দিয়ে খেয়াল-খুশি মতো চালাবেন। আর ভেবেছিলেন চীনের বাইরের মরুচর ক্ষুধার্ত মানুষগুলোকে দেশের সীমান্তে পাথরের পাঁচিল তুলে আটকাবেন; কোনোটাই রোখা গেল না। কুংফুৎসুর বই-ও লোকে পড়লো, চীনের দুর্লঙ্ঘ্য পাঁচিল এড়িয়ে হুনরাও দেশে ঢুকলো। চীনের উত্তরের আধা-যাযাবর মানুষরা চাচ্ছিল চাষবাসের জমি-জমা, ক্ষেত-খামার গড়বে তারা। তা ছাড়া তাদের চীনের মধ্যে প্রবেশ চেষ্টায়

কারণ ছিল গুরুতর। পিছন থেকে চাপ আসছে আর্যভাষীদের দুরন্তর জ্ঞাতি শক ও তুখারদের কাছ থেকে। এরা ঘুরতে ঘুরতে সিংকিয়াং প্রদেশের উত্তর দিয়ে আধুনিক কান্‌সু প্রদেশে ঢুকে হুনদের উপর হামলা সুরু করে দিয়েছে। তাদের ঠেলা সামলাতে না পেরে হুনরা ঢুকে পড়ছে চীনের মধ্যে,—তাদের রুখবার জন্য চীনের প্রাচীর গাঁথা। হুয়াং-তির সময় সেটা অনেক দূর গাঁথা হয়। হুনরা চীনাদের কাছ থেকে বাধা পেয়ে চললো পশ্চিম দিকে; পথে পড়লো ইউ-চি নামে আর একটা উপজাতি। হুনদের ঠেলা খেয়ে এই ইউ-চিরা হলো ঠাঁই-নাড়া। তারা পড়লো গিয়ে মধ্যএশিয়ার বাহ্লিক দেশে—যেখানে গ্রীক্‌-বক্‌ত্রিয়ানদের সমৃদ্ধ নগরগুলি জ্বল জ্বল করছে। ইউ-চিদের চাপে বক্‌ত্রিয়ানদের রাজ্য গেল, সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হলো। কালে ইউ-চিরা মিশে গেল বক্‌ত্রিয়ানদের সঙ্গে। এই ইউ-চিদের একটা উপশাখা কুষাণ নামে ভারত ইতিহাসে খ্যাত হয় কিছুকাল পরে। এসব কথা পূর্বে আমরা সংক্ষেপে বলেছি একবার।

হুনদের তাড়িয়ে চীন নিশ্চিন্ত। এখন সেখানে নূতন রাজবংশের অভ্যুদয় হয়েছে—তাদের নাম হান্‌। হান্‌ বংশীয় সম্রাট বু (খ্রীঃ পূঃ ১৪০-৮৬) হুয়াং-তির মতোই বিখ্যাত। বু-তির সময় চীন বৃহত্তর আন্তর্জাতিক জগতে প্রবেশ করলো।

চীনের জনসংখ্যা বাড়ছে—নূতন নূতন ডাঙা জমি ভেঙে চাষীর দল আগিয়ে চলেছে পশ্চিম দিকে। চীনের চির-উপদ্রবকারী হুনরা মধ্যএশিয়ার পার-পামীর সমতলের কোনো দেশে আস্তানা গেড়েছে বলে চীনারা শুনেছে। কিন্তু কোথায় যে তারা আশ্রয় নিয়েছে তার ধারণা তাদের কাছে স্পষ্ট নয়—কারণ সেসব দেশ তাদের ভৌগোলিক জ্ঞানের বাইরে। হুনদের নিশ্চিহ্ন করতে হবে—এই মতলবে চীনা সম্রাট দূত পাঠালেন পশ্চিমে—যেখানে পারদ বা পহ্লবরা ইরানদেশে একছত্র সম্রাট। চীন দূতের উস্‌কনিতে পারদরা হুনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রাজী হবে কেন? যাই হোক, চীনা দূতরা নানা দেশ দেখে, নানা জাতের লোকের সম্বন্ধে অনেক তথ্য জেনে বহুকাল পরে রাজধানী লোয়াঙ্‌ এলো ফিরে। এই দূতের দল চলতে চলতে কাস্পিয়ন হ্রদ বা পারস্য উপসাগর পর্যন্ত যায় বলে মনে হয় (৯৭ খ্রীঃ অঃ)। ঘুরতে ঘুরতে তারা ভারতীয় ও রোমানদের সম্বন্ধে অনেক খবরাখবর সংগ্রহ করে। সেসব তথ্য চীনাদের খুবই কাজে লাগে। ব্যবসায় বাণিজ্য খোলবার পথের

সন্ধান দেন পরিব্রাজক ও পর্যটকরা; সেই পথ ধ'রে চলে বণিকের সার্থবহ দল, তার পরে চলে রাজাদের দিগ্বিজয়ী সৈন্য।

চীনদেশের রেশম বিখ্যাত। প্রচুর রেশম সুতা ও কাপড় তৈয়ারী হয়। ফালতু মাল রপ্তানীর বাজার দরকার। বহুকাল থেকে চীনের রেশমী মালের ব্যাপারীরা ছিল মধ্যএশিয়ার লোক। রোম ও হেলেনিক জগত চীনের রেশমী কাপড় পাচ্ছে বটে, কিন্তু কারিগরদের দেশে পৌঁছতে পাচ্ছে না—পথ অজ্ঞাত। রোমানদের চেষ্টা চলছে চীনে পৌঁছবার জন্য; ঠিক যেমন মধ্যযুগে স্পেনীশ ও পোর্তুগীজরা ভারতে আসবার জন্য চেষ্টা করছিল সমুদ্রপথে। উদ্দেশ্যে একই—ভারতের ও প্রাচ্যের শিল্পজাত সামগ্রী ও মশলাপাতি সংগ্রহ। রোমনরাও পারস্য উপসাগর থেকে জাহাজ পাঠিয়েছিল দুইবার—১৬৬ ও ২৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। রোমান নাবিকরা যখন ভারত মহাসাগর ঘুরে দ্বিতীয়বার দক্ষিণ চীনের বন্দরে পৌঁছিল, তখন চীনের হান্‌বংশের রাজারা গদিচ্যুত হয়েছেন; দক্ষিণচীনে বু (Wu) বংশ (২২২ খ্রী. অ) নান-কিং (দক্ষিণ নগর)-এ রাজধানী পত্তন করেছেন। রোমান বণিকরা চীনে বিশেষ কিছু সুবিধা করতে পারলে না। সরাসরি রোমের সঙ্গে সম্বন্ধের অবসান ঘটলো। চীনের সঙ্গে সম্বন্ধ হলো না বটে, তবে দক্ষিণ ভারতে রোমানদের প্রতিষ্ঠা ভালরূপেই হ'লো, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

হান্‌বংশের রাজত্বকালে চীনের ইতিহাস রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাস থেকে কম গৌরবের নয়। এইপর্বে সাহিত্যে, শিল্পকলায় চীনারা অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেয়। রোমের প্রভাব মধ্যধরণী সাগর তীরে যতখানি স্থানে ব্যাপ্ত হয়েছিল, এশিয়ায় চীন সাম্রাজ্যর আয়তন তার থেকে অনেক বেশি বড় চীনের সাংস্কৃতিক প্রভাব পূর্বএশিয়ায় বহুগুণ গভীর ও বহুদূর বিস্তারিত। বু-তি র (খ্রী. পূ. ১৪০-৮৬) সাম্রাজ্য আনাম থেকে কোরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইতিহাসের পাতা থেকে রোমান সাম্রাজ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—চীনের সাম্রাজ্য ও সংস্কৃতি, তার ভাষা ও সভ্যতা এখনো অম্লান রয়েছে। চীনের মধ্যে সভ্য-জীবনের আলোক দেখা দিচ্ছে নানাভাবে—ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প ও কলা চর্চায়।

হান্‌দের রাজত্বকালে চীনাদের মধ্যে সবপ্রথম পুঁথি ছাপাবার শিল্প চালু হয়। তবে সে ছাপার কাজ ও আজকালকার ছাপাখানার কাজের মধ্যে অনেক

তফাৎ। কাঠের পাটায় উলটা-হরফ খোদাই ক'রে যেমন নামাবলী বা ছাপার কাপড় তৈরী হয়—তেমনভাবে আদিযুগের চীনা লেখা ছাপা হতো। বই ছাপা চালু হলে তার সঙ্গে অনেকগুলি শিল্পের আবির্ভাব হয়, যেমন—কাগজ ও কালি তৈরীর শিল্প। আমাদের দেশে ভূর্জপত্র বা তালপত্রে পুঁথি লেখা হতো ব'লে, এখনো 'পাতা বা পত্র শব্দ ব্যবহৃত হয়—ইংরেজিতেও leaf বলে এই জন্যেই। চীনদেশেই সব প্রথম লোকে কাগজ তৈরী করার বিদ্যা আয়ত্ত করে। রেশম-পচা মণ্ড থেকে কাগজ হতো—সে কাগজ যেমন মজবুত, তেমন পাতলা। চীনাদের কাছ থেকে কাগজ করার বিদ্যাটা আরবরা মধ্যএশিয়ায় আসার পর আয়ত্ত করে নেয়; এবং তাদের কাছ এই থেকে শিল্পটা য়ুরোপে ছড়িয়ে পড়ে—তবে তা অনেক পরে। 'কাগজ' শব্দটা আরবী বলেই লোকে জানে কিন্তু আসলে সেটা চীনা শব্দ 'কোকৃৎসু' শব্দেরই রূপান্তর।

হান্‌বংশের পতনের পর চীনের রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক উলটপালট হয়ে গেল—সাম্রাজ্য হলো তিন টুকরো। উত্তর থেকে এলো তাতারের দল—চীনের প্রাচীর রুখতে পারলেন না মানুষের স্রোতকে। খাস চীনের রাজারা আশ্রয় নিলেন দক্ষিণে; এরা ইতিহাসে 'বু' (Wu) নামে পরিচিত। এঁদেরই সময় রোমানদের জাহাজ এসেছিল দক্ষিনের বন্দরে। তবে ভারতীয়দের বাণিজ্য জাহাজ প্রায়ই আসতো-যেতো। এই পথ দিয়ে বৌদ্ধরা সিংহল ও ভারত থেকে দক্ষিণচীনে আসতো—তাঁদের সঙ্গে থাকতো বৌদ্ধ পুঁথি—সংস্কৃত ও পালিতে লেখা। আবার মধ্য এশিয়ার দুর্গম পথধরেও উত্তর চীনে পৌঁছয় বৌদ্ধদের বহু ধারা।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে রোমান সাম্রাজ্য-মধ্যে পূবে থেকে এসেছিল যীশু-খ্রীষ্টের নয়া ধর্ম;—ঠিক প্রায় সেই সময়েই ভগবান বুদ্ধের ধর্ম। চীনের মধ্যে প্রবেশ করলো পশ্চিম থেকে য়ুরোপে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারলাভ করলো নবাগত উত্তরের মানুষদের মধ্যে অর্থাৎ টিউটন, গথ প্রভৃতি অর্ধসভ্য মানুষদের মধ্যে। পুরাতন দেশ তারা ছেড়ে এসেছে, পুরাণো জড়ধর্ম ত্যাগ ক'রে খৃষ্টধর্ম গ্রহণে তাদের বাধা নেই। চীনদেশে যেসব মানুষ উত্তর থেকে এসেছে——তারা তাতার মহাজাতির নানা শাখায় বিভক্ত—বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণে তাদেরই উৎসাহটা বেশি। চীনাভাষা, চীনা আচার সবই তারা গ্রহণ করে পুরাপুরি 'চীনা'

হয়ে গেল। কিন্তু চীনের পুরাতন ধর্ম ও নীতির সঙ্গে তাদের পরম্পরাগত সম্বন্ধ ছিল না বলে. বুদ্ধের সদ্ ধর্ম গ্রহণে তাদের আপত্তি নেই। কিন্তু খাস চীনা:দের মনের উপর বহু শতাব্দীর সংস্কারের ও বিশ্বাসের বোঝা চেপে আছে—যেসব ত্যাগ করা বড়ই কঠিন।

কুংফুৎস্যুর ধর্মনীতি অনুসারে প্রত্যেক চীনার কর্তব্য পিতা, পরিবার পরিজন, সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবা ; প্রত্যেক চীনার পক্ষে এসব দাবী মানাই আসল ধর্ম। অথচ বৌদ্ধ পরিবার ও আদর্শ সংসার গড়বার দিকে নয়—ভাঙবার দিকে। দুঃখময় সংসার ত্যাগ করে, বিবাহ না করে ভিক্ষু হওয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। অথচ সেটা চীনা আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত।

•

তাতারদের পক্ষে কুংফুৎসীয় ধর্মনীতি মানবার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, তারা তো খাস্ চীনা নয়। তাই তারা মধ্যএশিয়ায় দূত পাঠিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ডেকে আনে। গল্প আছে যে শাদা ঘোড়ার পিঠে পেঁটরা বোঝাই করে বৌদ্ধ গ্রন্থ নিয়ে আসেন দুই ভিক্ষু। তাই প্রথম বৌদ্ধ বিহারের নাম হয় 'শ্বেতঅশ্ব' বিহার। সম্রাটদের অনুগ্রহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় সে সবের অনুবাদ হলো চীনা ভাষায়। এই ধারা চলেছিল প্রায় হাজার বৎসর। নূতন তাতারদের শাসন ব্যবস্থায় চীনা বৌদ্ধদের পক্ষে বিহার স্থাপন ক'রে ভিক্ষু হওয়ার রাষ্ট্রীয় বাধা দূর হলো। কিন্তু বৌদ্ধ বিহার কিভাবে চলে, সে সম্বন্ধে কারও কোনো ধারণা নেই। প্রথম শতক থেকে চতুর্থ শতক পর্যন্ত অনেক বৌদ্ধ সংস্কৃত পুথির তর্জমা হয়েছিল বটে, তবে মূল সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করতে পারে এমন লোক তখন খুবই কম। বুদ্ধের দেশে বৌদ্ধরা কিভাবে বিহারের কাজকর্ম পরিচালনা করেন তা দেখবার জন্য ও সংস্কৃত ভাষা ভালো করে শেখবার জন্য চীনা যুবকরা চললেন ভারতে। মধ্যএশিয়ার ভিতর দিয়ে রেশম সড়ক ধরে শেষ পর্যন্ত ফা-হিয়েন এলেন ভারতে (৩৯৯—৪১৬)। তখন গুপ্ত রাজবংশ উত্তর ভারতে খুবই খ্যাত। ফা-হিয়েন সতেরো বৎসর ভারতে কাটিয়ে সিংহল, যবদ্বীপ ঘুরে চীনে ফিরেছিলেন।

ফা-হিয়েন যে-পথ খুলে দিলেন, তা ধরে দলে দলে চীনা এলো ভারতে এইসব পরিব্রাজকদের মধ্যে হুয়েনসাঙ, ইৎসিঙের নাম ভারত ইতিহাসে সুপরিচিত। এদের ভ্রমণকাহিনী থেকে ৭-৮ শতকের অনেক ইতিহাস জানা যায়।

মধ্য এশিয়ার কথা

এশিয়ার পূর্ব থেকে পশ্চিমে বা পশ্চিম থেকে পূর্বে যেতে হলে লোকদের পার হতে হতো মধ্যএশিয়ার অনির্দিষ্ট ভূ-ভাগ। এখন সে স্থান সোভিয়েত রুশের অন্তর্গত—তুর্কোমানিস্তান, কাজাকস্তান, উজবেকিস্তান প্রভৃতি রাজ্য; রুশীয়দের চেষ্টায় নানা রকম ঐশ্বর্যে পূর্ণ হয়ে উঠছে দেশগুলি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সঙ্গে এসব দেশের কোনো মিলই এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রাচীনকালে এরা ছিল বৌদ্ধ, মানিকিয়ান—মধ্য যুগে হয় মুসলমান; এখন তারা মুসলমানও বটে, কম্যুনিস্টও বটে। এটা হলো মধ্য এশিয়ার পশ্চিমাংশ—প্রায় সমতল দেশ—কাস্পিয়ান ও আরল হ্রদ পর্যন্ত বিস্তৃত; এই সমতলের মধ্য দিয়ে সিরদরিয়া ও আমুদরিয়া নদী দুইটি প্রবাহিত; এর উত্তরে সাইবেরিয়ার বিশাল সমতল, দক্ষিণে হিন্দুকুশ পর্বত ও পূর্বে পামীরের মালভূমি।

সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার পূর্বে রয়েছে চীন 'জনরাজ'-তন্ত্রের সিং-কিয়াং প্রদেশ—একেও মধ্যএশিয়া বলা হয়। এখানকার ভূ-প্রকৃতি পশ্চিমাংশ থেকে সম্পূর্ণ অন্য রকমের—কিউন-লুন ও থিএন শান্ পর্বতমালার দ্বারা বেষ্টিত; মধ্যে তাকলামাকান মরুভূমি আর আছে তারিম নদী। কিউন-লুন ও থিএন শান পর্বতের তুষার-গলা জল এসে পড়ছে তারিমে। কিন্তু এ-নদী সাগরে পড়েনি—মরুভূমির মধ্যে যেতে যেতে প্রায় শুকিয়ে যায়—ক্ষীণধারা পৌঁছয় লবনর বা লবন হ্রদে। এই অংশকে বলা হতো পূর্ব মধ্যএশিয়া।

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে, পশ্চিম মধ্যএশিয়া যা এখন সোবিয়েত রুশের অংশ, যেখানে তুর্কীভাষী মুসলমানরা প্রবল—সেখানে আর্যভাষাভাষী নানা উপজাতির বাস ছিল—যেমন পারদ, শক প্রভৃতি। শকদের দক্ষিণে আমুদরিয়া ও হিন্দুকুশের মাঝের সমতলে বাস করতো বাহ্লিকরা যারা গ্রীক ইতিহাসে পরে বক্‌ত্রিয়ান নামে খ্যাত।

পশ্চিম-মধ্যএশিয়া ও পারস্য থেকে নানা আর্যভাষী উপজাতি পামীরের

দুর্গম গিরিপথগুলি পেরিয়ে বর্তমান সিং-কিয়াং-এর দক্ষিণাংশে উপস্থিত হয়। সেই পথ ধরে আসে হিন্দু, পারশিক ও শাকদ্বীপী বণিকরা—ব্যবসায়ের আড়ত গড়ে পথের ধারে। এখনো গ্রাম অঞ্চলে দেখা যায় শহর থেকে দূরে লোকে ধানের আড়ত খোলে; কিছুকাল পরে দেখা যায় আরও একটু আগে আর একজন এসে আড়ত খুললো। সেই সব আড়তের পাশে ধীরে ধীরে জমে ওঠে বাজার, বসতি; গড়ে ওঠে গ্রাম—কালে হয় শহর, নগর। নগর হয়ে ওঠে রাষ্ট্রের কেন্দ্র। কিউন-লুন পর্বতমালার উত্তর-ঢালুর পাদদেশে মরূদ্যানে গড়ে উঠলো ইয়ারখন্দ, নিয়া (Niya), খোটান, দান্দান-উইলিক প্রভৃতি শহর।

তুষার-ঢাকা থি-এন-শানের দক্ষিণ পাদদেশ দিয়ে, মরুদ্যান ঘেঁসে ঘেঁসে—স্থাপিত হয়েছে ভুরুক, কিজিল, কুচি, তুরফান, ইদিকুচারি প্রভৃতি নগর। এই পথে যারা এলো, তারা ইরানীয় আর্য নয়—এরা আর্যদের একটা খুব আদিম উপজাতি—ইতালীয়-কেল্‌টিকদের শাখা;—কোথায় কোথায় এতকাল ঘুরেছে সে সব তথ্য জানা যায় না। নানা জাতের ঠেলা খেতে খেতে একেবারে এসে পড়লো চীনের সীমান্তে। এদের চেহারা অন্যরকমের—কটা চুল, নীল চোখ, গৌর বর্ণ। এই উপজাতির লোকেরাও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র গড়তে গড়তে চীনা সীমান্তে যেখানে দক্ষিণীপথ এসে মিশেছে—সেই তুন্‌হুআংএ পৌঁছল। তাকলামাকান মরুভূমির উত্তর ও দক্ষিণের দুটো পথে নানা মানুষের ধারা চলেছে চীনের দিকে। মধ্য এশিয়ার এই নানা জাতির লোকে চলেছে চীনের দিকে রেশম সংগ্রহ করবার জন্য—হেলেনিক ও রোমান রাজ্যে রেশমী বস্ত্রের বড়ই চাহিদা। দেখতে দেখতে দক্ষিণের পথে খোটান ও উত্তরের পথে কুচা অতিসমৃদ্ধ জনপদ হয়ে উঠলো।

মানুষ দেশ ছেড়ে যেভাবে যেখানেই যাক,—তা সে দাসত্বের শিকল গলায় পরেই যাক,—আর ব্যবসায়ের সাজ-সরঞ্জাম নিয়েই যাক,—নিজ নিজ ধর্মকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে কেউ ভোলে না। পশ্চিম-মধ্যএশিয়া ও বর্তমান আফগানিস্তান এককালে ছিল, বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত—অর্থাৎ ধর্মে ও সংস্কৃতিতে তারা হিন্দু-ভারতের অঙ্গ। উদ্যান, গান্ধার প্রভৃতি প্রাচীন দেশগুলি বর্তমান আফগানিস্তানের অংশ ছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা

এইসব দেশের শ্রেষ্ঠিদের কাছে বুদ্ধের বাণী প্রচার করতে করতে চলেন মধ্য এশিয়ার পানে। উদ্যানের শ্রেষ্ঠিরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করে ধনকুবের হন। তারপর ধর্মে দেন মন, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে নির্মাণ করান বিহার, সঙ্ঘারাম, স্তূপ। কারুকরদের ডেকে এনে পাহাড় কেটে বুদ্ধের বিশাল মূর্তি খোদাই করান। আফগানিস্তানের মধ্যে বামিয়ানে সেই বিশাল আকার বুদ্ধমূর্তি এখনো দেখা যায়; সেগুলো ৯০ থেকে ১৫০ ফুট উঁচু। এছাড়া এ ছাড়া অনেক গুহামন্দির আছে—তার মধ্যে প্রাচীর-চিত্র বা ফ্রেস্‌কোর যেসব নমুনা পাওয়া যায়, তা ভারতীয় শিল্প-ধারারই অনুসরণ। সেগুলি দেখলে অজণ্টা গুহার ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়। তবে এগুলি বৌদ্ধধর্ম প্রসারের আদিযুগে অঙ্কিত হয় নি; আন্দাজ খ্রীষ্টীয় ৫-৬ শতকের কাজ। এ যুগটা হচ্ছে, বৌদ্ধ জগতে গুহা-নির্মাণের পর্ব—স্তূপাদি নির্মাণ পর্বের পরে সুরু হয়েছে। তাই ভারতে অজণ্টা, বাগ, রামগড়, মধ্য-এশিয়ায় কুচা ও তুন্‌হুয়াং-এর 'হাজার গুহার' একই চিত্রন-পদ্ধতি দেখা যায়—যার পটভূমে আছে বৌদ্ধ ভারতের প্রেরণা। প্রায় যুগপত ভারতে ব্রহ্মণ্যধর্মের পাণ্ডারাও রাজাদের বা শ্রেষ্ঠিদের ধ'রে গুহা-মন্দির বানিয়ে নেন—বেদ-ব্রাহ্মণদ্রোহী বৌদ্ধরা বানাতে পারে—আর হিন্দুরা বানাবে না? গুহার দখল নিয়ে ঝগড়া ঝাঁটিও হয়। বৌদ্ধরা যেখানে হেরে যায় সেখানে বুদ্ধের মূর্তি শিবে পরিণত হয়। বুদ্ধগয়ায় এক জায়গায় বুদ্ধমূর্তি হয়েছে পঞ্চপাণ্ডব—নালন্দায় এক বুদ্ধমূর্তি হয়েছেন 'তেলিয়া বাবা'।

বামিয়ান থেকে নানা গিরিপথ দিয়ে হিন্দুকুশ পেরিয়ে পৌঁছানো যায় বাহ্লিক দেশ; এদেশ গ্রীকদের বাক্‌ত্রা (Bactra) বা বাকত্রিয়া। বহু-কাল এদেশে গ্রীকদের অধিকারে ছিল; পরে কুষাণদের দখলে আসে খ্রীষ্ট-পূর্ব দুই শতকে। আদিম বাসিন্দারা ছিল ইরানীর শাখা, তার সঙ্গে মিশেছিল গ্রীক ও শক-কুষাণরা। তারপর যখন কুষাণ সম্রাটরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন, তখন বাহ্লিক হলো বৌদ্ধদের একটা বড় কেন্দ্র! খুবই স্বাভাবিক এটা। লোকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করে ধনী হয়েছে—একটা ধর্ম চাই তাদের। ৭ম শতকে চীনা পরিব্রাজক হুয়েনৎসাঙ বাহ্লিকদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি বলেছেন যে রাজধানীর নাম লোকে রেখেছিল 'রাজগৃহপুর'; সেখানে শতাধিক বৌদ্ধ বিহার—তিন হাজারের উপর ভিক্ষু সেগুলিতে বাস করে। এতগুলি বেকার লোককে পোষণ করতে হ'লে বহুলক্ষ ভক্তের

প্রয়োজন। সেখানকার 'নব সঙ্ঘারামে' ৩০০ কুঠরি ছিল। এই বিহারের ভিক্ষুদের পোষণের জন্য প্রায় আটশ' বর্গমাইল স্থান দেবত্র ছিল। আরবরা এসব ধ্বংস করে ৭ম শতকের শেষভাগে—মুক্তি পেয়ে গেল লোকে ধার্মিকতার জুলুম থেকে। তবে এক বন্ধন খুললো, অন্য বন্ধন পড়লো—মানুষের মনের সত্যকার মুক্তি বুঝি স্বপ্ন মাত্র!

বৌদ্ধভিক্ষুরা চলেছেন একদেশ থেকে আর এক দেশে; অক্‌সাস বা অক্ষু নদী—বর্তমানে যার নাম আমুদরিয়া—পার হয়ে তুখার বা তোখরি ভাষীদের দেশ; তারপর সুগ্‌দ বা শকদ্বীপ (সগ্‌দিয়ান)—ভারতীয়, চীনা, ও তিব্বতীদের মধ্যে এদেশের নাম ছিল শুলিক। এরা ইরানীয় উপজাতি, বোধহয় জরদউষ্ট্রের ধর্ম ছিল গোড়ায়—তারপর তারাও বৌদ্ধ হয়ে যায়। তাদের 'সগ্‌দিয়ানা' (Sogdian) ভাষায় তর্জমা করা বৌদ্ধবই পাওয়া গিয়েছে। শুলিকদের দেশের উত্তরে তুর্কজাতির বাস; তাদের মধ্যে উইগুর উপজাতির সর্দার বা ইয়াবগু কাগান (বা খান্‌খানান—যার থেকে খাঁ শব্দ এসেছে আমাদের ভাষায় পর্যন্ত) বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করলেন সপ্তম শতকে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত প্রভাকরমিত্র তাদের দেশের ভিতর দিয়ে চলেছিলেন চীনদেশে জন দশ শিষ্য সঙ্গে নিয়ে। তুর্কী খাগান তাঁদের আটকালেন—তাঁদের কাছ থেকে বুদ্ধের ধর্ম বুঝে নেবার জন্য। এরপরই উইগুররা বৌদ্ধ-শাস্ত্র তর্জমা করে তাদের নিজ ভাষায়, অবশ্য সংস্কৃত থেকে সিধে এসব তর্জমা হয় নি—মধ্য-এশিয়ার অন্য ভাষায় অনূদিত গ্রন্থের অনুবাদ।

পামীর মালভূমি পার হতে পারলেই সিংকিয়াং বা পূর্ব-মধ্যএশিয়ার তারিম উপত্যকা ও তাকলামাকান মরুভূমি। পামীর উৎরিয়ে আসলেই কাশগড় শহর (Kashgarh) পড়ে সব প্রথম। এর আসল নাম খসগড় অর্থাৎ 'খস' জাতের নগর। 'খস' নামে উপজাতি উত্তর-ভারতে এককালে ব্যাপ্ত ছিল; কাশ্মীরের আদি বাসিন্দারা 'খস'—সেদেশের নাম 'খসমীর'। ভারতের পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থে খস ও দরদ-দের নাম পাওয়া যায়; দরদিস্তান তো এখনো আছে কাশ্মীরের উত্তরে দুর্গম দেশ। কাস্‌পিয়ান হ্রদের সঙ্গে খসদের যোগ ছিল মনে হয়!

খশগড় থেকে দক্ষিণপূর্বে কিউনলুম পর্বতের শাখাপর্বত; এই পর্বত-মালার পাদদেশ দিয়ে যেতে যেতে প্রথম পড়ে ইয়ার-কন্দ; খ্রীষ্টীয় ২ শতক থেকেই বোধহয় এখানে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪ শতকে মহাযান বৌদ্ধমত প্রচারিত হয়েছিল। এখানকার লিপি 'ব্রাহ্মী', খোটানেও এককালে চালু ছিল এই লিপি। কালে খোটান মধ্য-এশিয়ার সুবৃহৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে ওঠে। চীনের রেশম সংগ্রহ করার জন্য নানা জাতের লোক সেখানে জমায়েত হয়। খোটানের লৌকিক ভাষা ছিল 'প্রাকৃত'—অর্থাৎ ভারতের তখনকার দিনের চলতি ভাষা। কিন্তু প্রাকৃত ভাষাটা লেখা হতো খরোষ্ঠী লিপিতে। সে-লিপি উর্দু, পার্সি-আরবীর মতো ডান দিক থেকে বাঁ দিকে লেখা হতো, এই লিপিতে-খোদাই অশোকের দু'টো শিলালেখ পাওয়া গেছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে—যা এখন পাকিস্তানের অন্তর্গত। খরোষ্টি লিপি ও প্রাকৃত ভাষায় লিখিত বহু দলিল, দরখাস্ত, ব্যবসায়ের ছাড়পত্র, অভিযোগ প্রভৃতি পাওয়া গেছে খোটান ও তার কাছাকাছি স্থানে। বুদ্ধের ধর্ম মনেহয় তখনো সেখানে তেমনভাবে প্রচার লাভ করেনি। 'ধম্মপদ' নামে বিখ্যাত পালি গ্রন্থের 'প্রাকৃত' ভাষায় লেখা পুঁথি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় নি। মাটির তলায় ছেঁড়া-ছেঁড়া পাতা জোড়া দিয়ে বইটার খানিকটা উদ্ধার করেছেন য়ুরোপের পণ্ডিতরা। সংস্কৃতে উদানবর্গের সঙ্গে এই প্রাকৃত পুঁথির মিল বেশি—পালি ধম্মপদ থেকে অনেক বড়; চীনা ও তিব্বতী ভাষায় এর তর্জমা আছে।

অশোকের ছয়-সাত শত বৎসর পর খোটান ও তার কাছাকাছি দেশগুলির ইতিহাস যখন জানা গেল, তখন সেখানে অনেক উলোট-পালোট হয়ে গিয়েছে, খরোষ্ঠী লিপি ও প্রাকৃত ভাষার বদলে ব্রাহ্মী-লিপি ও স্থানীয় ভাষার চল হয়েছে দেখা যায়; লোকেও মহাযান বৌদ্ধধর্মী হয়েছে। বেশ একটা বিপ্লব না-হলে এমনটি সম্ভব হতো না। আরও দেখা গেল সব রাজাদের নামের গোড়ায় 'বিজয়' শব্দ জোড়া। এই বংশের বিজয়জয় নামে একরাজা চীন দেশের এক রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। চীনকন্যা তাঁর নূতন দেশ খোটানে রেশম-শিল্প চালু করেন। এতকাল খোটানীরা চীনা-রেশম আমদানী ক'রে এসেছে, খোটানের শিল্পীরা রেশমের বস্ত্র বুনে পশ্চিমে রপ্তানি করেছে। এবার খোটানেই

রেশম গুটির চাষ হলো—রেশম-সুতা তৈয়ারী শিল্পের কাজ সুরু হলো। ব্যাপারটি ছোট হলেও আন্তর্জাতিক ইতিহাসে ঘটনাটি ছোট নয়—কারণ চীনের একচেটিয়া রেশম কারবারের প্রতিদ্বন্দ্বী হোল খোটান। এক-চেটিয়া শিল্পের ভারকেন্দ্র সরে সরে যাবার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে অনেক,—এ ধরণের ঘটনার সঙ্গে আমাদের বারে বারে দেখা হবে।

খোটানের বৌদ্ধ বিহারগুলি মহাযান বৌদ্ধধর্মের বড় শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে উঠলো। অনেক বৌদ্ধসংস্কৃত পুঁথি এখানে এসেছিল। চীনদেশ থেকে বৌদ্ধশাস্ত্রের পুঁথি ও বৌদ্ধ পণ্ডিতের খোঁজে লোক আসতো; এখান থেকে পণ্ডিতরা চীনে গিয়ে তর্জমার কাজে সহায়তা করেন। সে ছিল আর-একটা যুগ, আর-একটা জগত—যার ছবি মনে আনা আজ খুবই কঠিন। সেসব জায়গার লোকে এসব কথা ভুলে গেছে।

খোটান থেকে চীনে যাবার পথ মরুভূমির মধ্য দিয়ে গয়েছে; পথের'পরে মরূদ্যানে গড়ে ওঠে অনেকগুলি শহর; কিন্তু সেসব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সমস্তই চাপা পড়ে তাকলামাকানের উড়ন্ত বালুতে; খোটানও চাপা পড়ে বালুতে; খুঁড়ে বের করতে হয়েছে সে-নগর। এই পথ গিয়ে মিশেছে তুন-হুআঙে—উত্তরের পথের সঙ্গে—যে পথ ভুরুক, কুচা, তুরফান, কারাশর হয়ে আসছে। তুন-হুআং চীনের সীমান্তে অবস্থিত—মধ্য-এশিয়ার দুটো পথ এখানে কেবল মেশেনি, তিব্বত থেকেও একটা পথ এসে এখানে মিশেছে। তাই কালে তুন-হুআং হয়ে ওঠে বিশাল বাণিজ্য-কেন্দ্র এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্মকেন্দ্র।

তুন-হুআং-এর কথা বলবার আগে যে উত্তরবাহী পথের ধারে কুচা প্রভৃতি নগর ছিল তার কথাটা বলা দরকার—তা না হলে তুন-হুআঙের গুরুত্বটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম হবে না।

মধ্য-এশিয়া থেকে যে-পথ উত্তরবাহী হয়ে তুন-হুআং এসেছে—তার উপর অবস্থিত বহুজনপদের মধ্যে নামকরা নগর ছিল ভুরুক, কুচা ও অগ্নিদেশ বা কারাসার অর্থাৎ কালোশহর। এর মধ্যে কুচা বিখ্যাত—প্রায় হাজার

বছরের উপর ধরে মধ্য-এশিয়ার ইতিহাসে অমর স্থান দখল করেছিল। কুচিয়ানরা কোথা থেকে এসেছিল, কিরকম তারা দেখতে, তাদের ভাষা কেমন—সেসব কথা আমরা পূর্বে বলেছি। সংস্কৃতে কুশদ্বীপের কুশিক জাতির উল্লেখ আছে—হয়তো এই কুচার কথাই হবে। যাই হোক কুচাবাসীরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ও সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করেছিল। মাটি খুঁড়ে পাওয়া ছেঁড়া পুঁথির পাতায় কয়েকজন রাজার নাম পাওয়া গিয়েছে—যেমন স্বর্ণতে (স্বর্ণদেব), অরতে (হরদেব), সুবর্ণপুষ্প, হরিপুষ্প প্রভৃতি ; ভারতীয় ধর্মও সংস্কৃতি পেয়ে স্বভাবতই লোকে ভারতীয় নাম নিতো। দেখা যায়, মনিপুর, আহোম, ত্রিপুরার রাজারা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করবার পর ভারতীয় নাম গ্রহণ করেছিলেন ; হিন্দুরা মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করে আরবী—পারসি নাম নেয়, খ্রীষ্টান হয়ে বিলাতী নাম চায় ; কুচার রাজাদের ভারতীয় নাম গ্রহণের কারণও অনুরূপ, কারণ এরা সম্পূর্ণ একটা নূতন উপজাতি যাদের কুটুম্বিতা ছিল ইতালীয় কেলটিক কোনো বিস্মৃত জাতির সঙ্গে।

কুচার নাম বিখ্যাত হয়েছে কুমারজীব থেকে। কুমারজীবের পিতা কুমারায়ণ ছিলেন ভারতীয়। দেশ ছেড়ে তিনি বণিকদের সঙ্গে চলে যান কুচা দেশে ; সেখানে রাজভগ্নী জীবা তরুণ ভারতীয়কে দেখে মুগ্ধ হয়ে বিবাহ করেন ; তাঁদের সন্তান কুমারজীব। জীবা ভিক্ষুণী হয়ে পুত্রকে নিয়ে কাশ্মীরে যান—ছেলেকে ভাল করে সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্র পড়াবার জন্য। চতুর্থ শতকে কাশ্মীরের বৌদ্ধ পণ্ডিতদের নাম ডাক ছিল সারা বৌদ্ধ জগতে। কুমারজীব কাশ্মীরে অধ্যয়ন শেষ করে মধ্য-এশিয়ার পথে কুচায় ফেরবার সময়ে ইয়ারকন্দে থাকেন। সেদেশের দুই রাজপুত্র—সূর্যভদ্র ও সূর্যসোমকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করলেন।

কুচার সর্বাপেক্ষা বড়ো বিহারে কুমারজীব অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কাজ করলেন বহু বৎসর ধরে। তারপর কুচার রাজার সঙ্গে চীনাদের সঙ্গে বাধলো লড়াই ;—কুমারজীব বন্দী হলেন চীনাদের হাতে। চীন সম্রাট কুমারজীবের খোঁজ পেয়ে আহ্বান করে নিয়ে গেলেন রাজধানীতে। ত্রিশ বৎসর কাটলো তাঁর চীনদেশে। এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কুমারজীব বহু-বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করলেন। চীনা অত্যন্ত কঠিন ভাষা, কিন্তু কুমারজীবের যেমন দখল ছিল সংস্কৃতে, তেমনি কুচিয়ান ভাষায় ; তেমনি দখল হয়ে

উঠেছিল চীনা ভাষায়। কুমারজীব যথার্থই আন্তর্জাতিক মানুষ—তাঁর পিতা ভারতীয়, মাতা কুচিয়ান এবং তাঁর জীবন কাটে চীনদেশে বুদ্ধের ধর্ম ব্যাখ্যানে। একেই বলে ধর্ম বিজয়।

মধ্য-এশিয়ার নানা পথের সন্ধিস্থলে তুন-হুআং চীনের সীমান্তে অবস্থিত ; প্রাচীনকাল থেকে এখানে একটি পল্লী ও মালপত্র বিনিময়ের কেন্দ্র গড়ে ওঠে। যেখানে পণ্য ব্যবসায়ী বণিক ধনিক হয়ে ধনতান্ত্রিক সমাজ গড়ে, সেইখানেই ধর্মধ্বজীদের ভীড় জমে। বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের সঙ্গে তাই এখানেও বৌদ্ধ-বিহার নির্মিত হতে থাকে। এখানকার নামকরা এক বৌদ্ধপণ্ডিত খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে চীনে গিয়ে বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থ তর্জমা করেন বলেও জানা যায়?

তুন-হুআঙের পাশে ছোট এক নদীর ধারে অনুচ্চ এক পর্বতমালা ; পাহাড়ে অনেক গুহা ; বৌদ্ধ সাধকরা একান্তে থাকবার জন্য গুহাগুলি বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু ধার্মিক লোকদের নিশ্চিন্ত মনে থাকতে দেয়না বিষয়ী লোকেরা, তারা ধর্মজীবন যাপন করার চেয়ে, ধর্মের জন্য দান করাকে বেশি পুণ্যের কাজ বলে মনে করে। তাই দেখতে দেখতে গুহাগুলি মূর্তিতে, প্রাচীর চিত্রে সুশোভিত হয়ে উঠলো। একহাজার বৌদ্ধমূর্তি ছিল—গুহার সংখ্যা প্রায় ৫০০ হবে। তার মধ্যে ৩০০ গুহা ছবি ও মূর্তিতে শোভিত। এগুলি মন্দির এবং অধ্যয়ন ও ধ্যানাদির জন্য ব্যবহৃত হতো, অন্যগুলিতে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বাস করতেন। মনেহয় একহাজার ভিক্ষু এখানে থাকতেন—প্রায় নালন্দার মতোই। এদের খাওয়া-পরার ব্যয় বহন করতো বণিকরা নিশ্চয়ই। তারপর দিনবদলের হাওয়া উঠলো মধ্য-এশিয়ায়। সেই ঝড়ো হাওয়ায় বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি দেখতে দেখতে ভেঙে পড়তে লাগলো দুর্জয় আরবদের ধর্ম চেতনার সম্মুখে। এই বৈদেশিক উপদ্রব চীনের সীমান্তে আরম্ভ হলে, চারিদিক থেকে বৌদ্ধরা প্রাচীন পুঁথিপত্র রক্ষা করবার জন্য সেগুলিকে এনে তুন-হুআঙের একটা গুহার মধ্যে রেখে দিয়ে, তার দ্বার দিল বন্ধ করে। তারপর লোকে চীনদেশে পালিয়ে আশ্রয় নিল।

প্রায় হাজার বৎসর পর য়ুরোপের পণ্ডিতরা দৈবক্রমে এই ভাণ্ডাগার আবিষ্কার করেন। সে ইতিহাস উপন্যাসের মতো বিস্ময়কর। পুঁথির সংখ্যা ২০,০০০ প্রায় এর উপর। তার অনেকগুলি প্যারিসের ও অবশিষ্টগুলি পেকিং-এর সরকারী সংগ্রহালয়ে রক্ষিত হয়েছে।

তুন-হুআঙে-প্রাপ্ত পুঁথির বেশির ভাগ হচ্ছে বৌদ্ধশাস্ত্র—তার মধ্যে চীনা তর্জমা বেশি ; তবে সেগুলির অধিকাংশ চীন দেশেই লুপ্ত। এ ছাড়া প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা সংস্কৃত-পুঁথি, সুগদীয়, কুচীয়, তিব্বতীয়, তুর্কি প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত পুঁথিও কিছু কম পাওয়া যায়নি ; আর্টের ইতিহাসে তুন-হুআঙের একটা বিশেষ স্থান আছে ; গুহাগুলির প্রাচীরচিত্রে ভারতীয় পারসিক ও হেলেনিক আর্টের প্রভাব ধরা পড়ে।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে মধ্যএশিয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত কোনো জাতি বা রাজ্য ছিল না। ভারতের শ্রেষ্ঠি ও সার্থবহের দল, আর বৌদ্ধ ভিক্ষুদের যাওয়া-আসা থেকে মধ্য-এশিয়ায় সভ্যতার সূত্রপাত। অবশ্য পূর্ব দিক থেকে চীনের ও পশ্চিম থেকে পারস্যের সংস্কৃতির ধারাও আসছিল তাদের মধ্যে। হাজার বৎসর তারা ভারতের লিপি, ভারতের ভাষা, ভারতের ধর্ম, ভারতীয় নাম গ্রহণ করে চলেছিল। তারপর নূতন ধর্ম আনলে নূতন জাতি ; পুরাতন ধ্বংস হলো। তারপর হাজার বৎসর কেটে গেল—য়ুরোপ থেকে পণ্ডিতেরা এলেন দলে দলে, বালি খুঁড়ে উদ্ধার করলেন লুপ্ত শহর, বিহার, স্তূপ, গ্রন্থাগার। বহু যত্নে পাঠোদ্ধার হলো লুপ্ত-লিপির ; অর্থ করা হলো মৃত ভাষার লেখমালার। তারপর গত পঞ্চাশ বৎসরে পণ্ডিতরা প্রকাশ করেছেন অনেক গ্রন্থ। আমরা মধ্য এশিয়ার যা-কিছু সংবাদ জানতে পারি, তা য়ুরোপীয় ও জাপানী পণ্ডিতদের গবেষণা থাকে। তুন-হুআঙে এ প্রাপ্ত চীনা গ্রন্থাদি টোকিও থেকে প্রকাশিত চীনা ত্রিপিটকের পরিশিষ্ট খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে।

রোম যখন য়ুরোপ ও পশ্চিম-এশিয়ায় প্রবল—প্রায় সেই সময়েই মধ্য এশিয়ার আর্ধ যাযাবর উপজাতির দলে ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে থিতিয়ে বসেছে। চতুর্থ শতকে রোমান সাম্রাজ্য খ্রীষ্টিয় ধর্ম রাজধর্মরূপে স্বীকৃত হয়ে প্রচারিত হতে সুরু করে, মধ্যএশিয়াতেও বুদ্ধের ধর্ম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদের অনুগ্রহে প্রতিষ্ঠিত হয়। উভয় ধর্মের বাণী মৈত্রী, করুণা, অহিংসা। উভয় ধর্মে পূজা ও ভক্তির কেন্দ্র হলো মানুষ—নাজারিন যীশু ও সিদ্ধার্থ গৌতম ; কালে তাঁরা দেবতার স্থান পেলেন—একজন হলেন ঈশ্বরপুত্র খৃষ্ট, মানবদুঃখের পরিত্রাতা। অপরজন হলেন ভগবান বুদ্ধ, সকলের উদ্ধারের জন্য তথাগত।

পশ্চিম-এশিয়া ও উত্তর-আফ্রিকায় গ্রীকোরামান বা হেলেনেস্টিক সভ্যতা ও খৃষ্টান ধর্ম ছয়শ' বৎসর মহা সমারোহে প্রভুত্ব করেছিল, তারপর আরব ইসলামের আবির্ভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সমস্ত সংস্কৃতি কয়েক বৎসরের মধ্যে। গ্রীকভাষার স্থানে আরবীভাষা, খৃষ্টধর্মের জায়গায় এলো ইসলাম। অনুরূপ ঘটনা ঘটলো মধ্যএশিয়ায় ও আফগানিস্তানে। সেখানকার হাজার বৎসরের ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৌদ্ধধর্ম লোপ পেলো ইসলামের স্পর্শে। সে ইসলাম খাস আরবদের কাছ থেকে এলো না— আসলো তুর্কীদের মাধ্যমে ; আরবীভাষা লোকভাষা হলো না—পারসি ভাষা হলো ভদ্রদের ভাষা, রাষ্ট্রভাষা। এই তুর্কী-পারসিক সংস্কৃতি ভারতে এলো মুসলমানের বিজয়ের সঙ্গে।

ভারত কথা

ভারতের ইতিহাস পড়তে গিয়ে আমরা মনে করি 'বৌদ্ধযুগ' বলে একটা পর্ব ছিল; কথাটা ঠিক নয়। মহাদেশের মতো সুবৃহৎ ভারতবর্ষের সর্বত্র লোকে একই রকমের শাসন-পদ্ধতি মানবে ও একই ধর্মমত পোষণ করবে তা কখনো আশা করা যায় না। অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে তার প্রচার করেন দেশ-বিদেশে; কিন্তু তাঁর মৃত্যুর কয়েক বৎসর মধ্যে তাঁর রাজধানী পাটলিপুত্রতে ব্রাহ্মণ রাজা এসে অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন আসল কথা বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম সে যুগে পাশাপাশি ছিল। বৌদ্ধধর্ম লোপ পায় ধীরে-ধীরে—একাদশ শতকের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয় এদেশ থেকে।

চতুর্থ শতকে উত্তরভারতে গুপ্তবংশের রাজারা হলেন রাজচক্রবর্তী—চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি অনেক নামকরা রাজার নাম পাওয়া যায়। শিলালেখ, মুদ্রা ও সংস্কৃত বই থেকে টুকরো টুকরো সংবাদ সংগ্রহ করে এঁদের সম্বন্ধে ইতিহাস খাড়া করে তুলেছেন আধুনিক কালের পণ্ডিতরা। তাঁদের সময়ে প্রাকৃতভাষার হলো সংস্কার—তাই সে ভাষার নাম হলো সংস্কৃত বা দেবভাষা! রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি লেখা হয় এই সংস্কৃত ভাষায়—এতদিন সেসব ছিল প্রাকৃত ভাষায়—লোকের মুখে-মুখে চলতো। সাধারণ লোকের মধ্যে সেসব ধর্মকথা চলিত্ ছিল, যে-সব দেবদেবীর পূজা হতো, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা তাদের শোধন করে 'জাতে' তুলে নিলেন—নিজেদের দেবতা-গোষ্ঠির মধ্যে। বৈদিক ঋষিরা যেসব দেবদেবীর নামও শোনেননি, তাঁদের নামে মন্দির উঠলো, সংস্কৃতভাষায় পুরাণকাহিনী লেখা হলো; ব্রাহ্মণরা মন্ত্র বানালেন এইসব গ্রাম্য-দেবতার উদ্দেশ্যে। এযুগের হিন্দুরাও ভুলে গেল বৈদিকযুগের দেবতাদের নাম—এখনকার দেবতাদের উদ্দেশ্যে পূজাটাই আসল, যজ্ঞটা আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান মাত্র। আসলে দেবতাকে 'পূজা' করতো দ্রাবিড়রা—সেটাই আর্যরা গ্রহণ করে এমনভাবে মিশিয়ে নিল সবের সঙ্গে যে

উত্তরের আর্য ও দক্ষিণের দ্রাবিড়ের ভেদটা গেল ঘুচে। প্রাক-আর্যযুগে উত্তর-ভারতে 'তন্ত্র' সাধনা ছিল একশ্রেণীর মধ্যে—এই ধর্মও মিশে গেল আর্য-দ্রাবিড় ধর্মের সঙ্গে; এই মিশ্রিত ধর্মের নাম হিন্দুধর্ম।

গুপ্ত সম্রাটদের শাসনকালটাকে ভারতের স্বর্ণময় যুগ বলা হয়। পণ্ডিতরা বলেন কবি কালিদাস এই সময়ে জন্মেছিলেন—প্রাচীন জগতে অতবড় কবি ও নাট্যকার আর কোথাও ছিল না। প্রসঙ্গত বলি গ্রীক নাট্যকার বহু নাটক লিখেছিলেন কালিদাসের প্রায় ৭।৮ শত বৎসর পূর্বে।

গুপ্তদের সময় চীন থেকে আসেন ফা-হিয়ান নামে পরিব্রাজক; সিংহল থেকে রাজা মেঘবর্মনের দরবার থেকে দূত আসে গুপ্ত-সম্রাটের কাছে—বুদ্ধগয়ায় সিংহলী ভিক্ষুদের জন্য বিহার নির্মাণের অনুমতি নিতে। সে-বিহারের ভগ্নচিহ্ন এখনো সেখানে দেখা যায়।

চীনারা বৌদ্ধধর্ম পেয়েছিল মধ্যএশিয়া থেকে; খাস ভারতের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় হয় ফা-হিয়েনকে দিয়ে (৩৯৯-৪১৪)। সমস্ত মধ্যএশিয়া অতিক্রম করে উত্তরভারত ঘুরে তিনি আসেন বাংলা দেশে; তাম্রলিপ্তি বা তমলুকে ছিল বহু বৌদ্ধ-বিহার ও মন্দির; সেখানে কিছুকাল পড়াশুনা করে বন্দর থেকে জাহাজ চড়ে গেলেন সিংহলে। সিংহলীরা প্রায় ৬০০ বৎসর বৌদ্ধ হয়েছে।—কিম্বদন্তী অশোকের সময় সেখানে যেসব ভিক্ষুভিক্ষুণীরা সদ্ধর্ম প্রচারের জন্য গিয়েছিলেন—তাঁদের মধ্যে ছিলেন অশোকের ভাই মহেন্দ্র ও বোন সঙ্ঘমিত্রা। তবে এটা কিম্বদন্তী মাত্র। সিংহলের বৌদ্ধরা প্রাচীন বা স্থবিরদের মতটি আগুলে ধরে আছেন—তাঁরা বলেন বুদ্ধের ধর্মমত তাদের দেশেই পবিত্রতম ভাবে টিকে আছে। তাঁদের মতকে বলে স্থবিরবাদ বা থেরোবাদ। যাই হোক সিংহলে কিছুকাল বাস করে বহু পুঁথিপত্র সংগ্রহ করে ফা-হিয়ান জাহাজে চড়ে চললেন যবদ্বীপে। বণিকরা নিয়মিত সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও মশলাদ্বীপে যাওয়া-আসা করে। যবদ্বীপে (ইন্দোনেশিয়া) তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রবল। কলিঙ্গ, তামিল প্রভৃতি দেশ থেকে শ্রেষ্ঠিরা যায় বাণিজ্য করতে। যব থেকে হিন্দুদের জাহাজে করে ফা-হিয়ান চললেন চীনদেশের দিকে। পথে চীনসাগরে উঠলো তাইফুন ঝড়,—হিন্দু নাবিকরা বললে জাহাজে নাস্তিক বৌদ্ধ আছে বলে ঝড় থামছে না,

দাও ওর পুঁথিপত্র ফেলে। অনেক কষ্টে সেসব রক্ষা পায়—ফা-হিয়ান বলেন অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধের কৃপায়।

এইভাবে গুপ্তযুগে ভারতের ভিতরে ও বাহিরে অনেককিছু ঘটনা ঘটে—যার তুলনা সমসাময়িক পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও দেখা যায় না। সাহিত্যে, দর্শনে, শিল্পে, বাণিজ্যে যেমন ভারতীয়দের প্রতিভা—বিজ্ঞান চর্চায় তাদের তেমনি প্রতিভা ফুটে উঠেছে। আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রী. অ.) বরাহমিহির (৫০৫—৮৭), ব্রহ্মগুপ্ত (৫৯৮) প্রভৃতির নাম বিজ্ঞানের ইতিহাসে অমর স্থান পেয়েছে। হেলেনিকরা ভারত সীমান্তে থাকার ফলে গ্রীকবিজ্ঞানের প্রভাব এসে পড়েছিল ভারতের বিজ্ঞানের উপর। গুপ্তযুগের বিজ্ঞানীরা গ্রীকদের তত্ত্ব জানতেন এবং অনেক কিছুই গ্রহণ করে নূতনভাবে রূপ দিয়েছিলেন। গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবে জীবন চালিত হয়, এ-ধারণা প্রাচীন ভারতে বৈদিককালে, এমনকি মহাভারতীয় যুগে অজ্ঞাত ছিল। এটা ভারতীয়রা পায় গ্রীকদের কাছ থেকে; গ্রীকরা পশ্চিমএশিয়ার মিশরীয় ও বাবিলনীয় জ্যোতির্বিদদের কাছ থেকে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের সঙ্গে গ্রহের সুনজর ও কুনজর সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করে। এই হোরাবিজ্ঞান ভারতীয় হিন্দুরা গ্রীকদের কাছ থেকে পায়। প্রাচীনের সঙ্গে বড় একটা ভেদ এসে গেল—পুরুষাকারের থেকে দৈবের উপর বিশ্বাস বাড়লো হিন্দুর। সেদিন থেকে গ্রহবিপ্ররা ও পঞ্জিকা হলো নিয়ন্ত্রা। জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিল এই গ্রহের প্রতি বিশ্বাস।

নানা জাতির চলা-ফেরা

গুপ্তবংশের রাজত্বের শেষ দিকে ভারতের পশ্চিমে দেখা দিল হুন নামে এক উপজাতীয় দল। এরা কারা, কোথা থেকে এলো—তারা গেল কোথায় —এ প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। হুনরা দেখা দিয়েছিল চীনের ইতিহাসে বহু শতাব্দী পূর্বে—সেকথা আমরা একবার বলেছি। চীন থেকে তাড়া খেয়ে তারা চলতে আরম্ভ করে পশ্চিমে, অনির্দিষ্ট মধ্যএশিয়ায় দিকে। হুনরা চায় শক, পারদদেরই মতো সভ্যভাবে কৃষি, গোপালন, শিল্পকলা নিয়ে বাস করতে; কিন্তু স্থান কোথায়? অক্ষুনদী পার হয়ে যারা সেখানে কিছুকাল বাস করে—তারা ইতিহাসে শ্বেত হুন (Epthalitis) নামে পরিচিত। তারা চলে যায় পশ্চিমে য়ুরোপের দিকে—তাদের কথায় আমরা একটু পরে ফিরে আসবো। আর যে হুনরা মধ্যএশিয়ায় পড়ে থাকলো, তারা পারস্যে ও ভারতে ঢুকেপড়ে যথেষ্ট উৎপাত সৃষ্টি করে। পারস্যের সাসনীয় বংশের শাহনশাহ ফিরোজ হুনদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারাই পড়লেন (৪৮৪)। দেখতে দেখতে পারস্য সীমান্ত থেকে উত্তরভারত ও মধ্যএশিয়ার খোটান পর্যন্ত ভূভাগ হুন সাম্রাজ্যভুক্ত হলো--যেমনটি ঘটেছিল হাজার বছর পরে মুসলমান তুর্কদের সময়ে। চল্লিশটা প্রদেশে হুনদের সাম্রাজ্য বিভক্ত, উত্তর-পশ্চিম ভারত তার একটা। এদের রাজধানী বা শিবির পত্তন হয়েছিল বামিয়ানের নিকট; বামিয়ান ছিল বৌদ্ধ সংস্কৃতির এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের বড় কেন্দ্র; সাম্রাজ্যের মাঝখানটায় এই নগর। এই উপত্যকার কাছে বামিয়ানে পাহাড় কেটে বৌদ্ধরা যে বিশাল বুদ্ধমূর্তি খোদাই করেছিল তার কথা আমরা পূর্বে বলেছি। বোধহয় হুনদের দৌরাত্ম্যে এঅঞ্চলের বৌদ্ধরা লোপ পায়।

ভারত ইতিহাসে হুন সর্দার তোরমন ও মিহিরকুলের নাম সুপরিচিত। কিন্তু দীর্ঘকাল তারা ভারতে নিশ্চিন্ত মনে রাজত্ব ও লুটতরাজ করতে পারলে না; কোথা থেকে যশোধর্মন নামে এক রাজা ধূমকেতুর মতো উঠে হুনদের দিলেন হারিয়ে। এমনভাবে তারা হারালো যে ইতিহাস থেকে হুনদের

নাম ধাম গেল মুছে; হিন্দু-সমাজের অদ্ভুত শক্তি বলে হুনরা যে কোন্ ক্ষত্রিয় কুলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, তা আর জানা যায় না। এর আগে শক ও পারদরা হিন্দুসমাজের মধ্যে মিশে গিয়ে ক্ষত্রিয় বনে গিয়েছিল; হুনদেরও সেই দশা হয়ে থাকবে—তাদের চেনা যায় না পৃথক করে; তাই কবি গেয়েছিলেন—'শক হুন দল মোগল পাঠান এক দেহে হলো লীন।'

চীনের মধ্যে প্রবেশ করে হুনদের সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করার বাসনা ব্যর্থ করে দেন চীনের সম্রাটরা, দেড়হাজার মাইল লম্বা পাঁচিল তুলে। চীনের উত্তরপশ্চিম সীমান্তের কান্সু প্রদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে বহুকাল হুনরা মধ্যএশিয়ায় বাস্ করলো—যাযাবরী জীবনের বড় বিশেষ পরিবর্তন হলো না। কালে সেখান থেকেও তারা সরতে সুরু করে; তাদের যে একটা শাখা ভারতে প্রবেশ করেছিল তাদের কথা তো পূর্বেই বলা হয়েছে। সংখ্যায় ভারি দলটা যাত্রা করেছিলো পশ্চিমদিকে। কালে য়ুরেশিয়ার বাধাহীন প্রান্তর পার হয়ে তারা ভল্‌গা নদী অতিক্রম করে (অ. অ. ৩৭৪)। এই দুর্ধর্ষ,—ঘোড়শোয়ারী যাযাবরদের পশুপাল, তাঁবু ডেরাদাণ্ডা নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখে পূর্বয়ুরোপের অর্ধসভ্য উপজাতিরা প্রাণভয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে সুরু করলো। পরস্পরকে পিষে, ঠেলে, মেরে তারা চললো পশ্চিমে? কোথায় যাবে? কোথায় আশ্রয় পাবে? রোমানরা রাইন নদী ও দানিয়ুব নদীর তীরে দুর্গ বানিয়ে, সৈন্য মোতায়ন রেখেছে; সেসব ভেদ ক'রে রোমান সাম্রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করা প্রায় অসম্ভব। রোমান সীমান্তের বাইরেই আছে গথ্ নামে আর্যদের এক উপজাতি; কৃষ্ণসাগর থেকে বাল্টিকসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে এরা বাস করে আস্‌ছে। আজকাল সেদেশকে হাংগেরি বলে, সেই সমতল ভূমের গথ্‌রা খ্রীষ্টান ধর্মের ছোঁয়াচ পেয়েছিল; উলফিল (Ulphilas—৩১১—৩৮১ খ্রীষ্টাব্দ) নামে এক সাধুর চেষ্টায় এটি ঘটে। সাধু উলফিল গথিক ভাষায় বাইবেলের এক তর্জমা করেন; সেটার মূল ছিল গ্রীক সেপতুয়াজেণ্ট। সেপতুয়াজেণ্ট হচ্ছে হীব্রু বাইবেলের গ্রীক তর্জমা। মোটকথা গথ্‌রা নিতান্ত বর্বর ছিল না। তবে তারা যে একটা অখণ্ড জাত তা ভাববার কারণ নেই, তারাও বহু উপজাতিতে বিভক্ত। খ্রীষ্টে ভক্তি তাদের যথেষ্ট—কিন্তু রাষ্ট্র গড়ার শক্তি তাদের খুবই ক্ষীণ।

এখন এই গথদের উপর এসে পড়েছে হুনরা। তখন গথ্‌রা দানিয়ুব

নদী পার হয়ে নিরাপদ রাজ্যে প্রবেশের জন্য রোমান প্রদেশপালদের অনুমতি চাইলো। তখন রোমান সম্রাট থাকেন কনস্টান্টিনোপলে। সম্রাট অনেক কড়াকড়ি করে অনুমতি দিলেন বটে, কিন্তু সর্তগুলি উদ্‌বাস্তু গথ্‌দের পক্ষে খুবই অপমানকর। রোমানদের রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করে গথ্‌রা শোধ তুললো সম্রাটকে একটি যুদ্ধে হত্যা করে। হাজারে হাজারে উদ্‌বাস্তু রাজ্যের মধ্যে এসে পড়াতে, সাম্রাজ্যের শাসন শৃঙ্খলা গেল ভেঙে। গথ্‌রা প্রবল থেকে প্রবলতর হতে হতে আদ্রিয়াতিক তীর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো—এবং সেখান থেকে কয়েকটা দল সহজেই সাগর পার হয়ে প্রবেশ করলো ইতালির মধ্যে। সম্রাট থিওদোসিয়াস (৩৭৯—৩৯৫) বেগতিক দেখে গথ্‌দের সঙ্গে মিত্রের মতো ব্যবহার করবার চেষ্টা করলেন, পুনর্বাসনের জন্য জায়গা বন্দবস্ত করে দিলেন। এই সম্রাট সম্বন্ধে একটা কথা বলা দরকার; ইনি ছিলেন গোঁড়া খ্রীষ্টবাদী. একটি কালো পাহাড় তাঁর হুকুমে গ্রীক ও রোমানদের পুরাতন দেবদেবীর মন্দির ভেঙে ফেলা হয়—দেবদেবীর পূজা নিষিদ্ধ হয়; এমনকি যারা গোঁড়া খ্রীষ্টবাদী নয় তাদের উপর উৎপীড়নও করেন। যাক্ সে কথা।

গথদের রোখা যাচ্ছে না। আলারিখ নামে এক গথ-সর্দার রোমান সৈন্য বিভাগে কাজ পেয়েছিল, কিন্তু তাতে সে সন্তুষ্ট নয়। গথদের নিয়ে চললো সে ইতালি। ইতালি বা পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য রক্ষার ভার ছিল স্টিলিকোর উপর; এই লোকটি রোমান নয়, ইতালীয়ও নয়—সে হচ্ছে ভানডাল নামে এক উপজাতির লোক—রোমে চাকুরী নিয়েছে, ইমান রেখে কাজ করে। এখন আর ইতালীতে খাস্ রোমানদের যুদ্ধাদি কাজে পাওয়া যাওনা; সৈন্যদলে ভরতি হয়ে বিদেশীরা। ভানডাল্ স্টিলিকোর কাছে গথ আলারিখ পরাজিত হয়ে ফিরে এলো বলকানে। এই ঘটনাকে মনে রাখবার জন্য সম্রাটদের আদেশে রোমনগরীতে এক তোরণ নির্মিত হলো—সে-তোরণ এখনো আছে। রোমান সম্রাট কিন্তু রোমবাসী নন, তিনি থাকেন পূর্ব সাম্রাজ্যে কনষ্টাণ্টিনোপলে।

আলারিখের দৃষ্টি কিন্তু পড়ে আছে ইতালির উপর—কী সুন্দর দেশ দেখে এসেছে—সেখানে যেতেই হবে। এদিকে গোঁয়ার স্টিলিকোর বোকামির জন্য এবং ততোধিক বোকা সম্রাটের গোঁয়ার্তুমির জন্য স্টিলিকো পদচ্যুত ও নিহত হলেন। এখন ইতালি রক্ষা করবে কে? বর্বরদের আক্রমণে রোম যায় যায়, ইতালি তো তাদের দখলে প্রায় এসে গিয়েছে। চারদিক

থেকে সৈন্যদের রোমে ফিরে আস্‌বার জন্য হুকুম গেল ; গল্‌ থেকে, ব্রিটেন থেকে সৈন্যের দল ফিরে এলো ইতালিতে। রোমানদের শাসনে আরামে বাস ক'রে ব্রিটেনরা এমন 'সভ্য' হয়ে উঠেছে যে, নিজেদের দেশ কিভাবে রক্ষা করতে পারা যায়, তা ভেবেই পাচ্ছেনা! হাজার হাজার লোক দরখাস্তে বা টিপ সহি দিয়ে রোমে আবেদন পাঠিয়ে দিল—'তোমরা আমাদের অসহায় ভাবে ফেলে যেয়ো না' (Groans of Britain)। কিন্তু রোমানরা তখন ঘর সামলাবে, না, সাম্রাজ্য সামলাবে। ব্রিটনদের আর্তনাদে তারা কর্ণপাত করবে কি—আলারিখ তো রোমের দ্বারে এসে গেছে!

আলারিখের গথ সৈন্যরা রোম দখল করে তিন দিন ধরে মনের সুখে লুটতরাজ করলো (৪১০ খ্রী অ) তারপর আলারিখের মৃত্যু হলে গথ্‌রা গল্‌ (ফ্রান্স) ধ্বংস করে স্পেনে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করলে।

এই বিশ্বব্যাপী চলা-ফেরার ফলে মধ্যয়ুরোপের সমস্ত জাতি ঘরনাড়া হলো। হুনরা এখনো পিছন থেকে ঠেলা দিয়ে এগিয়ে আসছে। জারমেনির উত্তরাংশের সমতলে বাস করে টিউটনদের নানা উপজাতি—তাদের নামের লম্বা ফিরিস্তি দেবার দরকার নেই। তাদের মধ্য থেকে স্যাক্সন, এংগেলস, জুট নামে কয়েকটা উপজাতির লোক সাগর পার হয়ে ব্রিটনে গিয়ে উঠলো, কেউ তাদের রুখলো না,—রোমান সৈন্য তো এখন আর নেই সেখানে মোতায়ন। এই টিউটনিক উপজাতিরা উপনিবেশ গড়লো ব্রিটেনের নানা স্থানে। এংগেলস-লান্‌ড থেকে হলো 'ইংল্যনড' শব্দটা। স্যাকসনদের অনেক শাখা জারমেনিতে থেকে গেল—স্যাক্সনি নামে দেশ সেখানে এখনও আছে। ব্রিটেনে স্যাকসনরা পশ্চিমে, পূর্বে, দক্ষিণে, মধ্যস্থলের নানা জায়গায় বসত্‌ সুরু করে—সেই পুরাকালের নামে এখনো ইংল্যনডের কয়েকটা কাউন্টি বা জেলা পরিচিত, যেমন পশ্চিমা বা ওয়েস্ট-স্যাকসন থেকে হয়েছে ওয়েসেকস, পূর্বী বা ঈস্ট-স্যাকসন থেকে এসেক্‌স, দক্ষিণী বা সাউথ-স্যাকসন থেকে সাসেকস ইত্যাদি। এইভাবে টিউটনিক বা জারমান উপজাতিরা ব্রিটেন দখল করে বস্‌লো,—সেখানকার ভাষার নাম হলো এংলো-স্যাকসন, দেশের নাম হলো ইংল্যনড; প্রাচীন ব্রিটনরা ঠেলা খেয়ে ওয়েলসের পার্বত্য দেশে আশ্রয় নিলো। তারা বজায় রাখলো পুরাণো ভাষা, আচার-ব্যবহার—তাদের দশা হলো

আজকালকার দক্ষিণ-আফ্রিকার আদিম বাসিন্দাদের মতো নিজ বাসভূমে পরবাসী।

জারমেনির ভিতর রাইননদের পূর্বে বাস করতো ফ্রাংক নামে টিউটনদের আর একটা উপজাতি; তাদের পিছনে চাপ পড়ছে। গথ্‌রা ঠেলছে তখন বেগতিক বুঝে ফ্রাংকরা রাইন নদের রোমান দুর্গ ও সৈন্য ছাউনি এড়িয়ে ঢুকে পড়লো গালিয়া দেশে। সাইন নদীর তীরে তারা বসত্‌ গাড়লো। কালে তারা মিশে গেল গল্‌দের সঙ্গে। গালিয়ার লাতিনী মেশা দেশী ভাষা তারা শিখে নিলো, জারমেনিক ভাষা তারা চালু করতে পারলো না—যেমন তাদের জবরদস্ত দূর আত্মীয় এংগেলসরা করেছে ব্রিটেনে। এর কারণ চারশ' বৎসর রোমানদের অধীন থেকে গল্‌রা সত্য সত্যই লাতিন ভাষা ও সংস্কৃতিকে আপনার করে নিয়েছিল। রোম থেকে দূরত্বের জন্য ব্রিটেনে অতটা হয়ে উঠেনি; ফ্রাংকদের থেকে কালে গালিয়ার নূতন নাম হলো ফ্রান্স, আর অধিবাসী ফ্রেন্‌চ।

জারমেনির মধ্যে মেইন (Maine) নদী-তীরে বাস করতো আলেমান ও বারগনডিয়ান উপজাতির দল; তারা গালিয়ার দক্ষিণে রোন নদীর ধারে এসে উপনিবেশ স্থাপন করলো। ফরাসী ভাষায় জারমানদের এখনো বলে 'আলেমা'। এই দক্ষিণী-জারমানরা দীর্ঘকাল ফ্রাংকদের প্রভুত্ব মেনে নেয় নি। এদের ভাষাটাও থেকে গেল আধা-জারমান; সে-ভাষাকে বলা হয় 'প্রভেন্সাল।' ভাল সাহিত্য এ-ভাষায় লেখা হয়েছে।—একজন উঁচুদরের লেখক (Spitler) একবার নোবেল পুরস্কার পর্যন্ত পেয়েছিলেন এই প্রভেন্সাল ভাষায় কাব্য লিখে। এই তো গেল রোমান সাম্রাজ্যে রাইন সীমান্তের খবর। দানিয়ুব নদীর কড়া পাহাড়া ভেঙে পড়েছে। কিভাবে গথ্‌রা রোমান সাম্রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করেছে সেকথা ইতিপূর্বে বলেছি। গথদের পরেই নদী পার হয়ে এবার এলো ভান্‌ডালদের দল,—এরা যেমন সাহসী, তেমনি নিষ্ঠুর। তারা রোমান সাম্রাজ্যর মধ্যে ঢুকে প্রথমে স্পেন ও পরে উত্তর-আফ্রিকায় উপস্থিত হয়। কার্থেজকে করলো তাদের ঘাঁটি—তাদের

বোম্বেটেগিরির কেন্দ্র। তাদের উৎপাতে সমস্ত মধ্যধরণী সাগর আতঙ্কিত,
—বাধা দিতে পারে এমন শক্তি কোথাও নেই আর তখন!

ইতিমধ্যে যে হুনদের তাড়া খেয়ে গথ্, টিউটন, ভানডালরা ঘরছাড়া হয়ে ছিল, সেই হুনরাই য়ুরোপ তছনছ করতে করতে গালিয়ায় এসে হাজির! হুনদের সর্দার আটিলা,—'বিধাতার অভিশাপ' এই নাম নিয়ে গর্ব করতেন। দুর্ধর্ষ সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু অকারণ নিষ্ঠুরতা করতে তাকে কখনো কেউ দেখেনি। আটিলার হুন ঘোড়সোয়ারী সৈন্য পঙ্গপালের মতো গালিয়ায় (ফ্রান্স) প্রবেশ করলো (৪৫১ অব্দ); রোমান সৈন্যরা তাদের বাধা দিল সাঁলনে, (Chalons) মার্ন (Marne) নদীতীরে। জায়গাটা বড় সাংঘাতিক—এখানে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জারমানরা বাধা পেয়ে হটতে সুরু করে। রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধে হুন সর্দার জিতলেন বটে কিন্তু সেখানে আর বিশেষ সুবিধা হবে না বুঝে গালিয়া ত্যাগ করে ইতালির দিকে ধাওয়া করলেন। রোমের কাছাকাছি এলে—পোপ বাবাজি আটিলাকে বলে পাঠালেন যে এই নগরী পবিত্র স্থান—একে স্পর্শ করলে তার মঙ্গল হবে না। ধর্মের নামে ভয় পেয়েই হউক, বা অন্য কি ভেবে আটিলা রোম লুঠ না করেই সরে গেলেন। রোম সে যাত্রার মতো রক্ষা পেলো। কিন্তু তার দিন ঘনিয়ে আসছে। চার বৎসর যেতে-না-যেতে ভানডালদের সর্দার জেনেসারিক কার্থেজ থেকে সমুদ্র পার হয়ে রোম ঘেরোয়া করলেন। এবার রোম শক্ত হাতে পড়েছে, রোমের সর্বস্ব লুঠ হলো—মহানগর প্রায় ধ্বংস হলো এই বর্বরদের হাতে; চৌদ্দদিন এই লুঠতরাজ চলেছিল; জাহাজ বোঝাই করে অসংখ্য মূর্তি, তৈজসপত্র, ধনদৌলত তারা কার্থেজে নিয়ে গেল। সমস্ত ন্যায়ধর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে যে-কার্থেজকে রোমানরা এককালে নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস করেছিল, আজ সেই কার্থেজ থেকে প্রতিহিংসা রাক্ষসীর বেশে এসে রোমকে ধূলিসাৎ করলো! একেই বলে দৈবের পরিহাস! রাজনীতির ইতিহাস থেকে রোম মুছে গেল। চোদ্দশ' বৎসর পরে রোম ইতালি রাজ্যের রাজধানী হলো বটে, (১৮৭০)। কিন্তু সে চিরদিন খ্রীষ্ট ধর্মরাজ্যের মহানগরী হয়ে আছে। খ্রীষ্টীয় জগতের মোহান্ত পোপ বাবাজীর অতুল প্রতাপ। রোমান সাম্রাজ্য থেকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম সমাজ অনেক বড়, ভক্তদের স্বেচ্ছায় প্রদত্ত ধন দৌলতে পোপের নগরী গড়ে ওঠেছে। শাশ্বত রোম।

পশ্চিম-রোমান সাম্রাজ্যে অথবা লাতিন-য়ুরোপে—ব্রিটেন, গালিয়া,

হিস্‌পেনিয়াতে যেমন প্রবেশ করছে টিউটন জাতির নানা শাখা,—পূর্ব স্পেন রোমান সাম্রাজ্যে বা হেলেনিক (গ্রীক্‌) য়ুরোপ অর্থাৎ বলকান ও দক্ষিণ-পূর্ব য়ুরোপের মধ্যে আস্‌ছে স্লাভ নামে আর একটা মহাজাতির নানা শাখা-উপশাখা। স্লাভদের বাস ছিল বর্তমান পোলনডের পূর্বাঞ্চলে অনির্দিষ্ট সমতলভূমে। টিউটন সর্দারেরা স্লাভদের উপর হামলা করে বন্দী করে আনতো। এই বন্দী স্লাভদের থেকে 'দাস'-এর সাধারণ নাম হয়ে দাঁড়ায় 'স্লেভ'। তবে স্লাভ শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে; রুশ পণ্ডিতরা এই উৎপত্তি মানতে রাজী নন।

গথ্‌রা তাদের দেশ ছেড়ে রোমান সাম্রাজ্য মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে, স্লাভরা গথদের সেই পরিত্যক্ত জনপদে আশ্রয় পেলো; শূন্যস্থান পূর্ণ হলো একটা নূতন জাত দিয়ে। স্লাভদেব বসতির দক্ষিণে বৈজয়ন্তীয়ম্‌ সাম্রাজ্য; কী তার ঐশ্বর্য, কী তার সৌন্দর্য! স্লাভরা দলে দলে আসে কাজের সন্ধানে, আশ্রয়ের আশায়। সে-স্রোত বন্ধ করবে কে? পেটের দায় বড় দায়—সেই পোড়া-পেটের জ্বালায় স্লাভরা আসে। এদিকে বৈজয়ন্তীয়ম সাম্রাজ্য মধ্যে সত্যই চাহিদা রয়েছে সুস্থ সবল জন-মজুরের। পুরাণো জাতের মধ্যে মেহনতী মানুষ কম। এই মেহনতী মানুষের চাহিদার ফলে ধীরে ধীরে বলকান উপদ্বীপের নানা স্থানে স্লাভদের জনপদ গড়ে উঠলো। স্লাভদের মধ্যে কেউ কেউ গ্রীক শিখে আপনাদের স্লাভত্ব হারালো; কিন্তু অধিকাংশই বজায় রাখলো নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি। এরা এখন ইতিহাসে দক্ষিণী স্লাভ্‌ বা 'যুগোস্লাভ' নামে পরিচিত।

মানুষের চলাফেরার শেষ নেই যেন; এশিয়ার মধ্য থেকে মংগোলদের একটা দূর-কুটুম্ব শাখা ছট্‌কে এসে পড়লো য়ুরোপের মধ্যে; বলকানে তারা বুলগার নামে পরিচিত। কালে, বুলগাররা মংগোল ভাষা গেল ভুলে, স্লাভদের একটা উপভাষা হলো তাদের আপন ভাষা।

ইতালির উপরেও হানাদারদের হামলার শেষ নেই। কত বন্দর থেকে কত জারমেনিক উপজাতি ঢুকেছে ইতালির শ্যামল দেশ লুঠ করবার জন্য বা বসবাসের জন্য। শেষকালে এলো লম্বার্ড নামে আর একটা জারমেনিক জাত; তারা উত্তর ইতালিতে আস্তানা গাড়লো। তাদের উৎপাতে অনেক ইতালীয় পালিয়ে গিয়ে পো-নদীর মুখে জলাভূমিতে ঘরবাড়ি বানালো—

সেটা কালে ভেনিস নামে খ্যাত হয়। ইতালির উত্তরের একটা অংশকে এখনো বলে লম্বার্ডি।

এতক্ষণ আমরা যেসব জাতির চলা-ফেরার কথা বললাম, তারা সকলেই প্রায় রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে আশ্রয় পেয়েছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যের মধ্যে যারা আশ্রয় পেলো না—তাদের সংখ্যা ও প্রতাপ কিছু কম নয়। টিউটন বা জারমেনিক জাতিদের উত্তরে (নর্থে) যারা বাস করে তাদের লোকে বলে নর্থম্যান বা নর্স। দক্ষিণ দিকের অনুকূল দেশে আশ্রয় পাবার সুবিধা না পেয়ে, চললো তারা আরও উত্তরে—পৌছলো স্কান্দানেবিয়ার উপদ্বীপে। কিন্তু সেই পাহাড়ী দেশে যেমন শীত, তেমনই চাষবাসের জমিজমার অনটন। তাই তারা চললো সমুদ্র পেরিয়ে নূতন দেশের সন্ধানে। এই লোকদের বলতো ভাইকিং। এরা ডেনমার্ক নরওয়ের সমুদ্র ধারে বহুপুরুষ বাস করতে করতে সমুদ্রে চলাফেরার ভয়ডর হারিয়েছিল। শেষকালে নর্থ-সী পার হয়ে ডেন্ বা নর্সরা একদিন ব্রিটেনে বা ইংল্যানডে গিয়ে চড়াও করলো। ইংল্যানডের প্রথম নামকরা রাজা আল্‌ফ্রেডকে অনেক দুঃখ দেয়—রাজ্য পর্যন্ত ভাগ করে দখল করে বসে। এমনকি কিছুকাল পরে, কান্যুট ডেনমার্ক ও ইংল্যানডের জোড়া দেশের একছত্র রাজা হয়েছিলেন। এই কান্যুট কিন্তু খ্রীষ্টান ছিলেন না। এই নর্সদের একটা শাখা আইসল্যানড বা বরফের দ্বীপে উপনিবেশ গড়ে। এমনকি একদল সাহসিক নর্স ডিঙি নৌকায় অতলান্তিক মহাসাগর পার হয়ে আমেরিকা আবিষ্কার করেছিল; সে দলের নেতার নাম লীফ এরিকসন, (১000 খ্রী অ)।

এই উত্তরের মানুষদের একটা দল ফ্রান্সের উত্তরে এসে আশ্রয় নিল (৯১১)। সে দেশে থাক্‌তে-থাকতে তারা নর্স ভাষা ভুলে গেল—ফরাসী ভাষা হলো মাতৃভাষা; তাদের দেশের নাম কিন্তু হলো নর্মানডি—অর্থাৎ নর্থম্যান ডিহি বা দেশ। এই নর্মানডির লোকে একদিন ইংল্যানড জয় করে (১০৬৬); ইংল্যানডের যথার্থ ইতিহাসের সূত্রপাত হলো এরপর থেকে—কারণ এংলোস্তাক্সন ভাষার সঙ্গে মিশলো নরমানদের আনা ফরাসী ভাষা। এংলো-স্যাকসন ভাষা বদলে হলো ইংরেজি ভাষা। এসব কথায় যথাস্থানে আবার আসবে।

এই নর্মানদের একটা শাখা সমুদ্র দিয়ে সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালিতে এসে পৌঁছয় ; কালে সে অঞ্চলের ইতিহাসের সঙ্গে তারা মিশে গেল।

পূর্ব য়ুরোপেও নূতন নূতন মানুষ আসছে। আজ সে দেশ সোবিয়েত রুশ নামে সুপরিচিত। নবম শতকে গথ্‌দের এক শাখা রুশিয়ার মধ্য দিয়ে নদী ধরে চলে-চলে কাস্পিয়ান সাগরতীর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। আবার নর্স বা সুইডদের রুশ্‌ নামে উপজাতি পূর্ব-রুশিয়ার নবগোরড্‌ (Novogorod) বা নবগড়ে উপবেশন স্থাপন করে। সে-শহরের নাম এখন গর্কি। রুশের উৎপত্তি হলো এই উত্তরের মানুষ থেকে (৮৫০) ; পরে এরা স্লাভদের সঙ্গে মিশে যায় এবং বিশাল স্লাভ সভ্যতা ও শক্তির পত্তন করে।

•

আর্য ভাষাভাষী নর্ডিক বা উত্তরের মানুষরাই যে কেবল য়ুরোপের মধ্যে এই ভীষণ চলাফেরার তাণ্ডবে যোগ দিয়েছে তা নয়। এশিয়া থেকে হুনরা এসেছিল, কোথায় যে তারা লুপ্ত হয়েছে—তা আর জানা যায় না। মংগোল জাতীয় বুলগারেরা এসে স্লাভ ভাষা শিখে নূতন মানুষ বনে গিয়েছে। কিন্তু তুর্কদের অতিদূরের এক প্রজাতি—যাদের সাধারণত হাংগেরিয়ান বলা হয় ইতিহাসে—সেই ম্যাজিয়াররা এসে দানিয়ুব নদের অববাহিকায় উপনিবেশ গেড়ে একদিন বসলো। নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে তারা আজও য়ুরোপে সুপ্রতিষ্ঠ। তারা নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি কিছুই ছাড়ে নি ; খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল বটে, কিন্তু রোমের পোপের তাঁবেদার হয়নি। এরা ইতিহাসে হাংগেরিয়ান বা ম্যাজিয়ার নামে পরিচিত।

খাজার নামে আর একটা তুর্কী উপজাতি জুদিয়া থেকে বিতাড়িত ইহুদীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে পোল্যানডে এসে উপনিবেশ করে ; সেইজন্য য়ুরোপে সকল দেশ থেকে পোল্যানডে ইহুদীদের সংখ্যা বেশি। এছাড়া ফিন্‌ নামে আরও একটা এশিয়ান উপজাতি কোথাও স্থান না পেয়ে য়ুরোপের উত্তরে গিয়ে বাসা বাঁধলো ; তাদের রাজ্য আজ ফিনল্যান্‌ড নামে খ্যাত।

এইভাবে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সময় থেকে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সমস্ত য়ুরোপের জনসমাজের ভিতর এমন সব পরিবর্তন হয়ে গেল যে বলা যেতে পারে যুগান্তর। নূতন য়ুরোপের জন্ম হলো এই নূতন মানুষের অভ্যুদয় থেকে। মাঝে কয়েক শতাব্দী কেটে যায় এই আলো-আঁধারের মধ্যে—ইতিহাসে তাকে বলা হয় 'অন্ধকার' যুগ ; সমস্ত মহাসৃষ্টির পূর্বে এই রকম একটা পর্ব থাকে।

পারস্যের কথা

রোমানরা বিশ্বজয়ী হয়, কিন্তু তাদের হার মানতে হয় এশিয়ায় পারদদের কাছে। পারদরা প্রায় চারশো বৎসর পারস্যে রাজত্ব করে। তারপর সেখানে সাসনীয় বংশের (২২১-৬৫১ খ্রী অ) আবির্ভাব হয়। সাসনীয়দের রাজত্বকালে রোমের গৌরব অস্তোন্মুখ—এখন কনস্টান্টিনোপল হচ্ছে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের বা বৈজয়ন্তীয়ম রাজ্যের রাজধানী; এদের সঙ্গে পারস্যের সাসনীয় শাহনশাহদের যুদ্ধ চলে তিনশ' বছরের উপর, যার ফলে বাঘ ও সিংহ দুই-ই ঘায়েল হয় একদিন। এই আত্মঘাতী সংগ্রামের সুযোগ নিলো আরবের নূতন ধর্ম ইসলাম। কিন্তু আর্সিকি, পারদ বা সাসনীয়দের রাজত্বকালে পারস্যের মালভূমি ভেদ করে কী রোমানদের, কী বৈজয়ন্তীয়ম গ্রীকদের, কী আরবদের পূর্ব দিকে যেতে হয় নি;—ফলে ভারত ছিল নিরাপদ—হেলেনিক, রোমান, এমন কি আরবদের আক্রমণ থেকে।

পারস্যের সাসনীয়রা নূতন শক্তি নিয়ে ইতিহাসের আঙিনায় নামে। নূতনভাবে জাতীয় জীবন গড়বার দিকে সম্রাটদের মন গিয়েছিল সুরু হতেই। কারণ পারদরা ঠিক কুলীন পারসিক ছিলনা, পারসিক ধর্মকর্মর প্রতিও তাদের খুব মনোযোগ ছিল বলেও মনে হয় না। যাই হোক সাসনীয় সম্রাটগণ সাম্রাজ্যকে এককেন্দ্রিক করবার জন্য প্রথমেই জরদউষ্ট্রের ধর্মকে ঘোষণা করলেন রাজধর্ম বলে। হ্খামনীয় শাহনশাহদের সময় অহুরমজদীয় বিশুদ্ধ ধর্মমত প্রচারিত হয়েছিল; তারপর প্রায় হাজার বৎসর কেটে গেছে; পারস্যে কত জাত প্রবেশ করেছে—কত রকম তাদের ধর্মমত।

বিশুদ্ধ ধর্মমত কোথায় তলিয়ে গেছে। সাধারণ লোকের মন জ্ঞানীর ব্রহ্মবাদে তুষ্ট হয় না; তারা চায় ধর্মের সঙ্গে উৎসব, আমোদ, হৈ-হুল্লোড, রং-তামাসাও খানিকটা। সাসনীয় সম্রাট আর্দশির বুদ্ধিমান লোক—তিনি জানতেন ধর্মে জৌলস না দিলে লোককে ভোলানো যায় না। তাই তিনি জরদউষ্ট্রর ধর্মের সঙ্গে মগ (Maga) পুরোহিতদের যাগযজ্ঞাদি মেশানো একটা খিচুড়ি ধর্ম খাড়া করবার জন্য উৎসাহিত করলেন। সেই ধর্ম পেয়ে লোকে খুব

খুসি। আর্দশির রাজশক্তিকে একছত্র করবার জন্য একধর্মমন্ত্রে সকলকে বাঁধতে চান। প্রায় এই সময়েই রোমান সম্রাটরা নিজেদের নামে মন্দির বানিয়ে, রাজপূজার মধ্য দিয়ে রোমানদের এক-করবার চেষ্টা চালাচ্ছেন। ভারতে গুপ্ত সম্রাটদের আবির্ভাবে পৌরাণিক ধর্ম—হিন্দুধর্ম রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে।

আর্দশির ধর্ম-সমন্বয়ের কথা ভাবছেন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার জন্য—একছত্র শাসন যেন বাধা বন্ধহীন হয়। তাঁর রাজত্বকালে 'মনি' নামে এক সাধু-পুরুষ আধ্যাত্মিক দিক হতেই ধর্ম-সমন্বয়ে মন দেন বাবিলন তাঁর জন্মস্থান। তখন পশ্চিমএশিয়ায় যীশুখৃষ্টের প্রেমধর্ম প্রচারিত হচ্ছে। মিত্রধর্মেরও খুব পসার—বৃষবলি নিয়ে লোকে খুব মাতামাতি করে। মগ পুরোহিতরা বহু আড়ম্বরে পূজা-পার্বণ দিয়ে জরদউষ্ট্রের ধর্মকে ঘুলিয়ে তুলেছে। শক স্থানে বৌদ্ধ বিহারে সঙ্ঘারামে উপাসকদের বেশ ভিড় জমে। মধ্যএশিয়ার নানা স্থানে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সদ্ধর্ম প্রচারে ব্যস্ত। ইহুদীরাও আছে এখানে সেখানে আপন ধর্ম নিয়ে। মোটকথা, সকলেই নিজ নিজ ধর্ম—অন্য সকল ধর্ম থেকে সেরা—এইটাই প্রমাণ করবার জন্য যত প্রকার আড়ম্বর করা সম্ভব—তা করছেন। ধর্মের নামে বিরোধিতা ও বৈরিতা করা হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন মানুষের ধর্ম! এই অবস্থা দূর করবার জন্য মণি এক নূতন ধর্ম প্রচার করলেন; জরদ্উষ্ট্র, বুদ্ধ ও খৃষ্টের মহৎ বাণী তাঁর নূতন ধর্মে স্থান পেলো। কিন্তু খাঁটিসোনা কাজে লাগেনা, খাদ মিশালেই শক্ত হয়। গভীর আধ্যাত্মিক কথার সঙ্গে লোক-ভোলানো মতামত মিশাল না দিলে লোকপ্রিয় হওয়া যায় না। ধর্ম গুরুরা সেটা সর্বকালে, সর্ব দেশেই জানেন। মান ও বহু অবস্তির অদ্ভুত কথায় ভরিয়ে তোলেন তাঁর ধর্মমত। যাই হোক, আর্দশির নূতন সাধুটিকে ভালো চোখেই দেখতেন। কিন্তু তারপরে বাহ্রাম শাহনশাহ হয়ে সাম্রাজ্যের মধ্যে একমাত্র অহুরমজদীয় ধর্মমতকে প্রাধান্য দেবার জন্য পণ করলেন। রাজ-স্বৈরাচারের বাধা হলো মনি। তাই মনিকে তিনি হত্যা করলেন (২৭৩ খ্রী. অ.)। মনির শিষ্যরাও তাঁর নিষ্ঠুরতা থেকে রেহাই পেলো না।

মনির পরে আসেন মজদক। তিনি ধর্ম-সমন্বয়ে গেলেন না; তিনি

সমাজ জীবনে যে ভীষণ শ্রেণীসংঘাত দেখা দিয়েছে, তা দূর করবার জন্য সাম্য ও সমন্বয়ের বাণী প্রচার করলেন। সাম্যবাদ প্রচার করতে গেলে ভগবানের দোহাই পাড়লে কাজটা এগোয় ভালো। তাই মজদক ঈশ্বরকে বাদ দেননি তাঁর মতবাদ থেকে। মজদক সমাজতন্ত্রীদের অগ্রদূত তিনি ভেবেছিলেন, সমস্ত সম্পত্তি, স্থাবর-অস্থাবর, নারী, শিশু, সমানভাবে ভাগ করে ভোগ করবার অধিকার সকলেরই আছে। এই মত প্রচারিত হলে সমাজে বিপ্লব অনিবার্য; ধনতান্ত্রিক সমাজে এধরণের দৌরাত্ম্য বেশি দিন শাসক-শোষক সহ্য করেনা। তাই মজদক্‌কে তাঁর মতের জন্য মস্তকটি দিতে হলো—সাম্য সমন্বয়ের কণ্ঠ বন্ধ হলো পারস্যে।

পারস্যে সাসনীয় বংশ কায়েম হবার শতেক খানি বৎসরের মধ্যে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের কনস্টান্টিনোপলের পত্তন হয় খ্রীষ্টধর্মকে কেন্দ্র করে (৩৩০)। খ্রীষ্টান সম্রাটরা ধর্ম গ্রহণ করার পর রোমের পোপকে সমস্ত খ্রীষ্টানদের গুরু বলে মানবার নির্দেশ দিলেন। পোপকে যারা গুরু বলে মানতে রাজি হলো না—তারা হলো পাষণ্ড ধর্মদ্রোহী (Hevetic)। তবে শুধু যীশু খৃষ্টকে মানলে চলবে না—সঙ্গে জুটেছে নানা রকমের বিশ্বাস, সেগুলো খৃষ্টধর্মের অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে সকলকে মানতে হবে। এদিকে রোমান সম্রাটরা খৃষ্ট ধর্মকে সাম্রাজ্যবাদের একটা যন্ত্ররূপে ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছেন। রোমান সাম্রাজ্যের গোড়ার দিকে রাজাপূজা প্রবর্তন করে তাঁরা সাম্রাজ্যের মধ্যে ঐক্য বন্ধন আনতে চেয়েছিলেন কিন্তু খৃষ্টধর্ম গ্রহণের পর আর তো খৃষ্ট ছাড়া অন্য মানুষকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করা যায় না! তাই সম্রাটের পূজার বদলে পোপকে খৃষ্টীয় জগতের একমাত্র ধর্মগুরু খাড়া করবার কথা ভাবছেন খৃষ্টান সম্রাটরা। তাঁদের ধারণা সাম্রাজ্যের বাঁধন শক্ত হবে পোপকে সবার উপর পূজার আসনে বসালে। কী পারসিক শাহনশাহ, কী বৈজয়ন্তীয়মের আধা-গ্রীক রোমান সম্রাট—সকলেরই এক উদ্দেশ্য এক ধর্মপাশে ছিন্ন ভিন্ন সাম্রাজ্যকে বাঁধবেন। দুই প্রবল প্রতিবেশীর উদ্দেশ্য যদি এক হয়, তবে সংঘাত অনিবার্য। রোমান ও পারসিক সম্রাটদের একই উদ্দেশ্য—ধর্মের নামে মানুষদের এককাট্টা করে শক্তি জাগানো ও রাজ্য বাড়ানো। উভয়েরই চোখ পড়ে আছে শস্যশ্যামলা য়ুফ্রাতিস-তাইগ্রিস দোয়াবের উপর। ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হলো। চললো যুদ্ধ বহুকাল ধরে; হারজিতের নাগরদোলায় কখনো রোমানরা, কখনো পারসিকরা মেসোপটেমিয়া

দখল করে। রাজায়-রাজায় লড়াই হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়—যে-দেশের জন্য লড়াই—সে-দেশবাসীর প্রাণ যায় দুই মত্তহস্তীর তাল ঠোকাঠুকিতে। একবার এক রোমান সম্রাট পারসিকদের হাতে বন্দী হলেন; শেষদিকে কনস্টান্টিনোপল থেকে রাজধানী সরিয়ে কার্থেজে নিয়ে যাবার কল্পনাও হয়েছিল।

সম্রাট হেরাক্লিস জারমান ও স্লাভদেশের সৈন্য এনে পারসিকদের আক্রমণ করলেন। এদিকে যুদ্ধ করে করে পারসিকদের শিরদাঁড়া এসেছে ভেঙে; ফলে রোমের সঙ্গে সন্ধি করতে হলো। পারসিকদের হাত থেকে সিরীয়া রাজ্য উদ্ধার করে হেরাক্লিস যখন সে-সব সামলাচ্ছেন, তখন তিনি এক বিদেশী দূতের মারফত এক বার্তা পেলেন; তাতে লেখা আছে—'এক-ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ করো'; লেখকের নাম হজরত মহম্মদ। হেরাক্লিস ও রোমানরা বিস্মিত হয়ে ভাবে কে এ ব্যক্তি!

এই ঘটনার কিছুকাল পরে শেষ পারসিক শাহনশাহ য়েজদিগার্দ আরব সেনাপতি খলিদের নিকট পরাভূত হয়ে চীনদেশে পলায়ন করলেন (৬৪১)। সকলের মুখে বিস্ময়ের প্রশ্ন এরা কারা! এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে আরবদেশের মরুস্থানের মধ্যে যে একটা ভীষণ বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে তার সংবাদ এখনো রাষ্ট্র হয়নি; কিন্তু অচিরকালের মধ্যে দুনিয়ার লোক জানতে পারলে ইসলাম পৃথিবীতে নূতন শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে।

পূর্ব এশিয়া ও চীন

পশ্চিমএশিয়ার আরাবিয়ায় যখন হজরত মহম্মদ ইসলামের সাম্য মৈত্রীর নয়া ধর্মমত প্রচার করছেন (৬২২-৩২), পশ্চিমএশিয়ার অন্যত্র রোমান সম্রাট হেরাক্লিস (৬১০-৪১) ও পারসিক শাহনশাহ খসরু (৫৯৬-৬২৮)-র মধ্যে বিবাদ চলছে—সেই সময়ে পূর্ব এশিয়া ও ভারতের ইতিহাসের নূতন পরিচ্ছেদ লেখা হচ্ছে। চীনে তাং বংশেরা তাই-ৎ-সুং (৬২৭-৪৯), উত্তর ভারতে হর্ষবর্ধন (৬০৬-৪৭), দক্ষিণ ভারতে পুলকেশীন (৬০৮-৪২) এবং তিব্বতের স্রংসংগাম্‌পো (৬৫০) রাজত্ব করছেন।

চীন ও ভারতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, পৃথিবীর সর্বত্র যখন সম্রাট বা ধর্মগুরুরা নিজ নিজ ধর্মকে অন্যদের ধর্ম থেকে সেরা প্রমাণ করবার জন্য মানুষের উপর জুলুম করছেন—চীনে তাই-ৎ-সুং ও ভারতে হর্ষবর্ধন ঠিক সেই সময়ে নিজ নিজ রাজ্য মধ্যে সকল ধর্মকে সমানভাবে সম্মান দেখাচ্ছেন। চীনের সভ্যতা ধর্মকেন্দ্রিক নয়—নীতিকেন্দ্রিক। ধর্মসম্বন্ধে চীনারা চিরকালই উদার বা উদাসীন; কে কি ধর্মমত পোষণ করে, অথবা কে কি পোষাক পরিচ্ছদ পরে তা দিয়ে কারো মানব-পরিচয় যে হয় না—একথা তারা ভাল করে জানতো। কুংফুৎসুর সমাজনীতি ও ব্যবহারনীতি মেনে লোকে পরস্পরের কল্যানরত কিনা—এইটাই বিচারের বিষয়।

ভারত ধর্ম ও মোক্ষলাভ সম্বন্ধে আদৌ উদাসীন নয়, বরং বিশেষ ধর্ম-মত ও সাম্প্রদায়িক আচারাদি নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হচ্ছে কিনা, তা নিয়ে সমাজপতি ও ধর্মধ্বজীদের দুর্ভাবনা। ঋষিরা বলে আসছেন, সব নদীই সাগরে পৌছবে, কালো ধলা, সব গরুরই দুধ শাদা। কার কি মত তা নিয়ে জুলুম জবরদস্তির প্রয়োজন নেই। হর্ষবর্ধন পূর্বযুগের কণিষ্কের মতো—ও পরের যুগের আকবর শাহের মতো—সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি ব্রাহ্মণ সাধুসন্ন্যাসী ও বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের সমান চোখে দেখতেন। এসব রাজাদের ধর্মগত বিশ্বাস, না রাজনীতির চাল—তা বলা যায় না। অশোক বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করেও ব্রাহ্মণ যতি, জৈন আজীবকদের সকলকেই খুশি রেখেছিলেন।

চীনদেশে প্রায় ছয় শ' বৎসর হলো বৌদ্ধধর্ম এসেছে। হান্ রাজবংশের অবসানে উত্তরচীন পড়ে তাতার নামে মরুচর জাতির কবলে। সেখানে তিনটা রাজ্য গড়ে ওঠে। আমরা পূর্বে বলেছি এই তাতাররা চীনা ভাষা, চীনা আচার-ব্যবহার সবই গ্রহণ করে। কিন্তু চীনাদের পরম্পরাগত কুংফুৎসু বা লাওৎসুর ধর্মনীতিকে একমাত্র মুক্তির পথ বলে মেনে নেয়নি। কারণ পুরাতন যুগের সঙ্গে তাদের কোনো নাড়ীর যোগ তো নাই; তাই বৌদ্ধধর্মকে রাজধর্ম ব'লে মেনে নিতে তাদের কোনোই বাধা হয় না। বুদ্ধের ধর্ম প্রচারেও তাদের উৎসাহ কিছু কম দেখা যায় না। এমনকি চীন সমাজের মূলগত ভাবের বিরোধী মত—সংসার সমাজের প্রতি কর্তব্য-বিমুখীন হয়ে বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশেরও অনুমতি লোক পায়। নয়া ফত্তোয়া পেয়ে লোকে সংসারের কাজকর্ম ছেড়ে বৌদ্ধবিহারে ভিক্ষু-উপাসক সেজে ঢুকে পড়ে, ভক্তরা সেই অসংখ্য অলসদের আহারের রসদ জোগায়—পূণ্য সঞ্চয়ের লোভে।

কিন্তু তাং বংশের আরম্ভ হতে (৬১৮) সম্রাটগণ চীনা সাধারণ লোককে দেশরক্ষা ও দেশশাসন প্রভৃতি কাজের দিকে মনযোগ দিতো বললেন। কিন্তু উপদেশে বিশেষ কাজ হলো না, বিহারের অলস জীবন ছেড়ে কে আর কাজে আসতে চায়!

তাং বংশীয় সম্রাট তাইৎসুং (৬২৭-৬৪৯) সমগ্র চীনকে একছত্র তলে আনলেন; সিংকিয়াং ও মংগোলিয়া প্রভৃতি দেশ চীন সাম্রাজ্যের মধ্যে আসলো। ধর্ম সম্বন্ধে তাইৎসুং ছিলেন উদাসীন বা উদার; তাই বৌদ্ধ-ধর্ম যেমন তাঁর সময় প্রশ্রয় পেলো, অন্যান্য ধর্মও আশ্রয় লাভ করলো।

খ্রীষ্টানদের এক সম্প্রদায় গোঁড়া পোপদের চোখে পাষণ্ড বলে সাব্যস্ত হওয়ায় (৪৩১) তারা চীনে আশ্রয় নিল তাঁর রাজত্বকালে (৬৩৫)। এর নেসটোরিয়ান খৃষ্টান। পেকিং নগরে নেসেটোরিয়ানদের শিলালেখ এখনো আছে। নেসটোরিয়াস নামে এক মহাপণ্ডিত কনস্টাণ্টিনোপলের পাত্রিআর্ক বা মহাপুরোহিত ছিলেন। তাঁর ধর্মমতের সঙ্গে গোঁড়াদের অমিল হওয়ায় তাঁকে আফ্রিকার লিবিয়ার মরুভূমিতে দেশান্তরিত করা হয়। সেই নেসটোরিয়াসের শিষ্যরা এশিয়ার নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েন। নেসটোরিয়ান বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আমাদের পরে সাক্ষাৎ হবে।

ইসলামধর্মও তাংবংশের শাসনকালে সর্বপ্রথম চীনে প্রবেশ করে।

কিম্বদন্তী দক্ষিণচীনে কান্‌টন শহরে আরব বণিকরা মস্‌জিদ নির্মাণ করবার অনুমতি পেয়েছিল (৬২৮),—তখনতো হজরত মহম্মদ জীবিত। কিন্তু ইসলামধর্ম প্রচার ও প্রসার লাভ করে চীনের পশ্চিম থেকে; সেখানে তারা যোদ্ধার বেশেই প্রবেশ করে—বণিক বেশে নয়। চীনা বন্দীরা মধ্যএশিয়ার নয়া আরবরাজ্যে আরবদের কাগজ তৈরীর বিদ্যাটা শিখিয়ে দেয়। কাগজ শব্দটা আসলে ছিল চীনা 'ককৃৎসে'। চীনারা রেশম, কাগজ, বারুদ, মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি অনেক কিছুরই আবিষ্কর্তা। এইভাবে আরবে-চীনায় চেনা-পরিচয় সুরু হলো মধ্যএশিয়ায়। এককালে বৌদ্ধধর্ম ছিল সেখানে এখন সেখানকার লোকে গ্রহণ করলো পৃথিবীর নবীনতম ধর্ম—ইসলাম।

নূতন ধর্মকে লোকে কেন আগ্রহের সঙ্গে মেনে নিল—তার নিশ্চয়ই গূঢ় কারণ আছে। বৌদ্ধধর্মের শেষ অবস্থায় ধর্মের নামে এত অপধর্ম এসে জুটেছিল যে, বুদ্ধের সদ্ধর্মকে আর ধর্ম বলেই চেনা যায়না। অসংখ্য আচার অনুষ্ঠান নিয়ে লোকের মন সদাই ব্যস্ত; ধর্মের আবর্জনার পূতিগন্ধে মানুষের নিশ্বাস বন্ধ—রাতদিন পূজা, স্তব, প্রদীপে ঘৃত ঢালা, বাতি জ্বালা, ব্রত, উপবাস অসংখ্য দেবদেবীর পূজা আরতি! বুদ্ধের নামে যত বিশেষণ ভক্ত ও কবিরা দেন, শিল্পীরা ততরকম মূর্তি বানায়, সেইসব মূর্তি আচ্ছন্ন করে ফেললো বুদ্ধকে—তিব্বতী কতকগুলি দেবতার মূর্তি দেখলে লজ্জায় মুখ ঢাকতে হয়। সেই অবস্থায় আরবরা আনলো অতি সহজ ধর্মমত; সহজকথা বুঝতে সময় লাগে কম—লোকে ধর্মের নামে আবর্জনার বোঝা ফেলে দিয়ে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো; মুক্তি পেল আচার ধর্মের অত্যাচার থেকে। মধ্যএশিয়ার সমস্ত লোকই মুসলমান হয়ে গেল—এমনকি চীনের মধ্যেও তাদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে হয় প্রায় দু'কোটি। মহাযান বৌদ্ধধর্ম-যেখানে যেখানে প্রবল ছিল, ইসলাম সেখানে আসন পেয়েছে ভালভাবেই।

চীনদেশে তাং বংশ প্রায় তিনশ' বৎসর রাজত্ব করে (৬১৮-৯০৫ !) এই দীর্ঘকালের মধ্যে সব সম্রাটই যে একই রকমের ছিলেন, তা আশা করা যায় না; বৌদ্ধধর্মের প্রতি সকলের মনোভাব যে অনুকূল ছিল তাও নয়। তবে এই সময়ে ভারতের সঙ্গে চীনের আসা-যাওয়ার মধ্যদিয়ে

গভীর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল। এ-সম্বন্ধ রাজা-উজীয়ের রাজনীতির চালবাজির সম্বন্ধ নয়, এ ধর্মের সম্বন্ধ। চীনদেশ থেকে চীনা ভিক্ষুরা এসেছেন ভারতে বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ পড়তে, বৌদ্ধপুঁথি, পাততাড়ি সংগ্রহ করতে। আবার অনেক ভক্ত আসেন বুদ্ধের নামের সঙ্গে যুক্ত তীর্থস্থানগুলি দেখতে। এঁদের মধ্যে দু'জনের নাম ভারতের ইতিহাসে সুপরিচিত—হুয়েনৎসাঙ ও ইৎসিঙ; ফা-হিয়েন এসেছিলেন প্রায় আড়াইশ বৎসর আগে—তাঁর কথা পূর্বে বলেছি। হুয়েনৎসাঙ এসেছিলেন হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে; তিনি পনেরো বৎসর ভারতে বাস করেন।

হুয়েনৎসাঙকে আসতে হয় মধ্যএশিয়ার পথ দিয়ে; সেপথে মরুভূমি, জলাভূমি, তুষারঢাকা পর্বত পড়ে; অসংখ্য শত্রু মিত্রের শহর বসতির ভিতর দিয়ে পথ। পথেই কাটে বৎসর দুই। তিনি যখন ভারতে এলেন তখন হর্ষবর্ধন সম্রাট। তাঁর রাজ্যের বর্ণনা পাই এই চীনা পরিব্রাজকের ভ্রমণ কাহিনী থেকে। হুয়েনৎসাঙ ছয় বৎসর নালন্দা বিহারে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

আজকালও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। তবে এখন নানা দেশের ছাত্র অধ্যাপক উচ্চতর বিদ্যাশিক্ষার জন্য য়ুরোপ ও আমেরিকায় যান—অধিকাংশের উদ্দেশ্য বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বা প্রয়োগশিল্পের ব্যবহারিক বিদ্যা আয়ত্ত করা। খ্রীষ্টীয় ৬-৭ শতকে নালন্দার বিহারে ভারতের নানা স্থানের এবং পূর্ব ও মধ্যএশিয়ার নানা দেশ থেকে জ্ঞানপিপাসু বিদ্যার্থীরা আসতেন ধর্মশিক্ষার জন্য। নালন্দা ছিল বৌদ্ধ নানাশাস্ত্র ও দর্শনাদি অধ্যয়ন অধ্যাপনার কেন্দ্র—অনেকটা আজকালকার বিশ্ববিদ্যা-লয়ের মতো।

হুয়েনৎসাঙ যখন নালন্দায় এলেন তখন সেখানে শীলভদ্র অধ্যক্ষ; তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের আকর্ষণে দেশ-বিদেশ থেকে ছাত্রের ভিড় হয়। এঁর কাছে হুয়েনৎসাঙ বৌদ্ধ-শাস্ত্র অধ্যায়ন করেন। পনের বৎসর পরে হুয়েনৎসাঙ দেশে ফিরলেন মধ্যএশিয়ার পথ দিয়েই। বৌদ্ধ পুঁথিপত্র, বুদ্ধের চিহ্ন ও মূর্তি আরও কত কি সংগ্রহ করে যে আঠারোটা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দেশে নিয়ে যান। কয়েক বৎসর পরে শীলভদ্র দেহরক্ষা করেন, সে-সংবাদ চীনে বসে হুয়েনৎসাঙ পান; কী সুন্দর একখানি পত্র লিখে পাঠান নালন্দা অধ্যক্ষর কাছে—পড়লে বুঝতে পারি চীন-ভারতের মৈত্রী বন্ধন কী দৃঢ় হয়েছিল আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে।

চীন-সম্রাট বৌদ্ধ ছিলেন না। কিন্তু বুদ্ধিমান ছিলেন বলে হুয়েনৎসাঙকে

প্রথমে বড় রাজপদ দিতে চাইলেন; ভাবলেন মধ্যএশিয়া ও ভারতে হুয়েনৎসাঙের এত বৎসরে অভিজ্ঞতা ব্যর্থ যাবে কেন। সম্রাট রাজনৈতিক অভিপ্রায়ে এই মহাপণ্ডিতকে ব্যবহার করবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু হুয়েনৎসাঙ রাজসরকারে চাকরী নিতে রাজি হলেন না। তখন তাঁর জন্যে বড় একটা সাততলা বাড়ি নির্মাণ করে দিলেন সম্রাট্ —সেটা হলো বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থরাজি চীনাভাষায় তর্জমার দপ্তরখানা। ভারত থেকে কী সব জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ এসেছে, সে-সবের কথা চীনারা জানতে পারবে কেমন করে যদি না চীনা ভাষায় অনুদিত না হয়। চীনা অনুবাদ অত্যন্ত বৈজ্ঞানিকভাবে করা হতো; কয়েকজনে মিলে অনুবাদ করতেন—একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বসতেন সংস্কৃতপুঁথির পাতা নিয়ে, একজন দোভাষী চীনাভাষায় প্রথম খসড়া অনুবাদ করতেন। তারপর অনুবাদের কাজ হয়ে গেলে একজন বিষয় বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ বৌদ্ধদর্শনের পণ্ডিত বিষয়টা ঠিকমতো-বুঝে অনুবাদ করা হয়েছে কিনা বিচার করতেন; সবশেষে চীনা সাহিত্যিক অনুবাদটা পড়ে যদি খুসি হতেন, তবেই সেই পাঠ গ্রন্থভুক্ত হতো। হুয়েনৎসাঙের এই পদ্ধতিতে ভাষান্তর হওয়ায় বৌদ্ধগ্রন্থ চীনাদেশের ট্রর পণ্ডিত মহলে সমাদৃত। হুয়েনৎসাঙের সঙ্গে বহুলোক এই কাজে নিযুক্ত হলেন। হুয়েনৎসাঙের সেই গ্রন্থালয় ও কর্মশালা ভেঙে গিয়েছিল, । নয়া চীনাসরকার সেটা মেরামত করিয়েছেন। এখন সে-সব পুঁথি আছে চীনাঅনুবাদে—মূল সংস্কৃত পুঁথি গেছে নষ্ট হয়ে। প্রায় পনেরো শ' বৎসর পর আবার এখন পণ্ডিতরা চীনাভাষা পড়ে সেইসব বইএর তর্জমা করেছেন সংস্কৃতে বা য়ুরোপীয় ভাষায়।

চীনে নূতন যুগ সুরু হলো হুয়েনৎসাঙ-এর ভ্রমণ-কথা শুনে ও তাঁর গ্রন্থ হয়তো বা পড়ে, দলে দলে বৌদ্ধ চীনা ভিক্ষুরা ভারতাভিমুখে যাত্রা করলেন। কত লোক পথ থেকে ফিরলো, কত লোক পথেই পড়লো মারা। কিন্তু ভারতে এসেও উপস্থিত হয়েছিল বহুশত। তাদের অনেকেই নালন্দা বিহারে পড়াশুনা করেন পুঁথি সংগ্রহ করেন; বুদ্ধের অস্থি বলে ঠগে তাদের যা-তা গছিয়ে দেয়—গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে সে-সব দেশে নিয়ে যান। এখনো বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুমের একটি পড়া-পাতা পাবার জন্য তীর্থযাত্রীদের কী তীব্র আকাঙ্ক্ষা। তারা ভাবে মহামুনি শাক্যসিংহ এই বৃক্ষতলে বসে 'বুদ্ধ' হয়েছিলেন।

ইৎসিং নামে ভিক্ষু এসেছিলেন সমুদ্র-পথে—মধ্যএশিয়ার পথ তখন

আরব মুসলমানরা এসে পড়েছে বলে দুর্গম। সে-সময়ে ভারতের দ্বীপাবলীতে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি চালু ছিল; সে-ইতিহাস আমরা একটু পরে আলোচনা করবো।

চীন দেশীয় বৌদ্ধরা ভারতে আসা-যাওয়া করলেও, কালান্তরে চীনা-শাসক শ্রেণী বৌদ্ধধর্মকে আর প্রীতির চোখে দেখতে পারছেন না। তার কারণ কিছুটা রাজনৈতিক, কিছুটা অর্থনৈতিকও বটে। রাজ্যরক্ষা বা রাজ্যজয় —দুই-ই করতে লোকবলের দরকার। অথচ হাজার হাজার জোয়ান লোকে বৌদ্ধমঠে আশ্রয় নিচ্ছে ভিক্ষু হয়ে—শান্তিবাদের অছিলায় রাষ্ট্র-কর্তব্য এড়ায়। বলা বাহুল্য এ-শ্রেণীর শৈথিল্য কোনো রাষ্ট্রচালক-ই নীরবে সহ্য করতে পারে না। এ ছাড়া ধর্মের নামে বিকৃতিও ঢুকেছে বিস্তর। ভারত থেকে ফিরে চীনারা বলে তারা বুদ্ধের অস্থি এনেছে! লোকে তার পূজা সুরু করে। এই সব মূঢ় অনাচার চীনা পণ্ডিতদের পক্ষে চুপ করে সহ্য করা কঠিন। কালে এদিকে জীবন যাপনের লোভে সেনাপতিরা যুদ্ধে ছাড়লেন, মন্ত্রীরা রাজসভা ত্যাগ করলেন, ব্যবসায়ীরা ব্যবসা গোটালেন। রাজ্যসংস্থা অচল হয়ে উঠলো। শেষকালে সম্রাট বু-ৎসুঙ (৮৪৫ অব্দ) মঠ ভাঙবার হুকুম দিলেন। চার হাজার ছয় শো মঠ ধ্বংস হলো—দু'লক্ষ ষাটহাজার পরোপজীবী অলস ভিক্ষু-ভিক্ষুণীকে জোর করে গৃহস্থধর্মে ফিরে পাঠানো হলো। চীনা সম্রাট জুলুম করলেন বটে; তবে এটা ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ নয়— —রাষ্ট্রকর্তব্য বিমুখ ফাঁকিবাজদের বিরুদ্ধে এ অভিযান। ধর্ম নিয়ে চীনারা কখনো বাড়াবাড়ি করে না—সেটা তাদের জাতিগত প্রতিভার বিরোধী। ভারতবর্ষ মুখে বলে থাকে 'যত মত তত পথ; কিন্তু ধর্মমত নিয়ে বিবাদ কিছু কম করেনি; 'গঙ্গাস্নানের' সময়ে বিশেষ পবিত্র মুহূর্তে স্নান করা নিয়ে সাধু লোকের মধ্যে রক্তারক্তি হয়ে গেছে ঘাটের উপর। তবে এ দৃষ্টান্ত খুব বেশি নয়। চীনে ধর্মসম্বন্ধে নিরপেক্ষতা তারা সমাজ-জীবনেও পালন করে; একই বাড়ীতে কেউ বৌদ্ধ, কেউ কুংফুৎসুবাদী, কেউ লাওৎসুর সাধনাপন্থী, কেউবা খ্রীষ্টান। কে কি টুপি মাথায় দেবে তা নিয়ে যেমন কেউ মাথা ফাটাফাটি করে না, কে কি ধর্ম মানবে তা নিয়ে কারো মাথা ঘামানি নেই। কেবল যারা মুসলমান হয়েছে তাদের মধ্যে ধর্মের গোঁড়ামি

প্রায় অন্যদেশের মুসলমানদেরই মতো তীব্র ; তবে চীনের জাতীয় জীবনে তারা কাঁটা হয়ে ওঠেনি, যেমন তারা হয়েছিল ভারতের রাষ্ট্রসাধনায়।

আমরা চীনের যে-পর্বের কথা আলোচনা করছি, সেই তাং বংশের শাসনকালটাকে বলা হয় চীনের স্বর্ণময় যুগ। ধর্মে, জ্ঞানে, সাহিত্যে, শিল্পে, চিত্রকলায় চীনারা যে উৎকর্ষ দেখিয়েছিল, তা সমসাময়িক পৃথিবীর কোনো দেশেই দেখা যায় না। সাহিত্যে লিপো ও তু-ফু অমরস্থান জুড়ে রয়েছেন চীনাদের চিত্তে। ১৮শতকে মানচু সম্রাটদের আদেশে তাং যুগের কাব্য সংগ্রহ করে প্রকাশিত হয় ; ত্রিশ খণ্ড গ্রন্থে ২,৩০০ কবির ৪৮,৯০০ কবিতা সম্পাদিত হয়। পৃথিবীর সাহিত্য ইতিহাসে এর জুড়ি মেলে না।

চীনা চিত্রশিল্পীর তুলির টান দেখলে এখনো দর্শকের বিস্ময় লাগে। নবম শতকের এক চীনা লেখক ৩২০ জন চিত্রকরের কথা বর্ণনা করে গেছেন। য়ুরোপে তখন সাহিত্যে, চিত্রভাস্কর্য মধ্যে কোনো নামকরা লোক পাওয়া যায় না।

পৃথিবীর ইতিহাস দিক থেকে চীনে বুদ্ধের ধর্ম প্রচার ও ভারতীয় সংস্কৃত গ্রন্থের চীনা অনুবাদ—বিশেষ ঘটনা বলে স্মরণীয়। ৮ম শতকের মধ্যে বুদ্ধের ধর্ম ভারত থেকে প্রায় লুপ্ত হয়। বুদ্ধ আশ্রয় পলেন, চীন, মংগোলিয়া, তিব্বত, কোরিয়া ও জাপানে—এরা মহাযানী বৌদ্ধ। আর হীনযানী বৌদ্ধরা আশ্রয় পায় সিংহল, বর্মা, সিয়াম কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে ; বুদ্ধ নিজ বাসভূমে পরবাসী হলেন।

চীনারা বৌদ্ধ হয়ে বুদ্ধের বাণী প্রচার করলো কোরিয়া ও জাপানে। বুদ্ধের ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সেসব দেশে এলো চীনা সভ্যতা ও সংস্কৃতি যার কিছুটা ভারত থেকে আমদানী বুদ্ধের ধর্ম পাবার পর থেকেই কোরিয়া ও জাপান সভ্য সমাজে প্রবেশ করবার অধিকার লাভ করে। এসব প্রচার কার্য করেছিলেন চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষুরা—যারা ভারতকে চোখেও হয়তো দেখেনি। ভারতীয়রা নেতৃত্ব গ্রহণ করে কোনো স্থায়ী সম্বন্ধ বহির্জগতের সঙ্গে গড়ে তুলতে পারেনি।

তাং বংশের গৌরব-সূর্য অস্ত গেল দশম শতকের গোড়ায় (৯০৭)।

সুঙ সম্রাটদের সময়ে (৯৬০-১১২৭) চীনের উত্তরের যাযাবররা আবার হামলা সুরু করলো—চীনের উঁচু প্রাচীর তারা এখন সহজেই ভেদ করতে পারে। এবার যারা আসছে তাদের বলে কিন্ তাতার। মংগোলদের কতকগুলো উপজাতির উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার জন্য চীনের সম্রাট এদের ডেকে আনেন। তিনি ভেবেছিলন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবেন। কিন্ তাতাররা মংগোল উপজাতিদের দূর করলো বটে, কিন্তু আর চীনদেশ ছেড়ে নড়লো না অনেকটা ভারতে মুঘল সর্দার বাবরের ইতিহাসের মতো ঘটনা। উত্তর চীন দখল করে, তাতাররা শক্ত হয়ে বসলো সেখানে। সুঙ্ সম্রাটরা বেগতিক দেখে উত্তরদেশ ছেড়ে দক্ষিণ চীনে আশ্রয় নিলেন,—সেখানে নানকিং বা দক্ষিণী শহরে রাজধানী পত্তন করলেন—পরে হাং-চৌতে আস্তানা গাড়েন। উত্তরে কিন্‌রা রাজ্য গড়লো বটে—কিন্তু চীনা পাঁচিলের বাইরে মংগোলরা আছে ওৎ পেতে সুযোগের অপেক্ষায়—সুবিধা হলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে চীনের উপর।

তিব্বত

তিব্বত এখন চীন জনরাজ-তন্ত্রের অন্তর্গত দেশ—অনেক ঝামেলা, রক্তারক্তি অশান্তির পর চীন-জনরাজ্যের অংশ বলে সাব্যস্ত হলেও, ধর্মের মহাগুরু দালাই লামা ও তাঁর দলের লোক চীনের আধিপত্য স্বীকার করে নিতে পারছেন না। এখন থেকে প্রায় তেরো শ' বৎসর পূর্বে—এই তিব্বত ছিল বুনো যাযাবরদের বাসভূমি—য়াক-চামরী গাই ও ভেড়া চরিয়ে লোকেদের দিন যেতো। দেশটার অবস্থানও এমন যে, হঠাৎ কেউ সে-দেশে ঢুকতে পারেনা। দক্ষিণে-হিমালয়ের দুর্ভেদ্য পাহাড়—উত্তরে তাকলামাকান মরুভূমি,—মাঝখানে উচ্চ মালভূমি—তুষার-মরুর দেশ তিব্বত। মধ্যএশিয়া ও চীনের সঙ্গে যোগ তার দুর্গম পথের মধ্য দিয়ে। বহুকাল থেকে পশম নিয়ে তারা যাওয়া-আসা করে আসছে ঐসব দেশে।

এই আধা-যাযাবর মানুষদের ধর্মও ছিল অদ্ভুত। তারা ভূত-প্রেত পূজক, ধর্মের নামে বোঙ (Bon)। আমাদের দেশে শিবঠাকুরের সঙ্গী হচ্ছেন 'ভূত'; শিবকে ভূতনাথ বলা হয়—কথাটা আসলে 'ভোট; তিব্বত শব্দের যে রূপটা আমরা পাই সেটা ইংরেজি; আসলে ইদী বোদ য়ুল অর্থাৎ The Bod Country; বোদ্ শব্দ থেকে বোদ-আন বা ভুটান হয়েছে। তিব্বতীরা মধ্যএশিয়ার একটা অদ্ভুত জাতি। তিব্বতের ভাষার সঙ্গে কোনো ভাষা বর্গের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তাদের আকৃতি প্রকৃতির জুড়িদার নেই; তাই বলছিলাম এরা একটা অদ্ভুত জাতি, চীনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক কোন সম্বন্ধ নেই—ধর্মেরও কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই ভূতপূজক, মেষপালক ভোটদের মধ্যে সভ্যতার আলো এলো চীন ও ভারত থেকে—রাজা রংসানগামপোর সময়। ইনি চীনের তাং বংশীয় তাই-ৎসুং ও ভারতে হর্ষবর্ধনের প্রায় সমসাময়িক অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকের লোক; ঠিক এই সময়ে আরবদের মধ্যে নূতন প্রাণের ডাক এসেছে; হজরত মহম্মদের বাণী শুনে। তুষারমরুবাসী অর্ধ যাযাবর ভোট ও বালুমরুবাসী পুরো

যাযাবর বেদুইন আরব যুগপত জাগলো—এক দলরা নিলো ভারতের বুদ্ধের বিশ্বধর্মকে,—আর একদল সৃষ্টি করলো নূতন বিশ্বধর্ম। একদলরা আটকা পড়ে থাকলো 'নিষিদ্ধ দেশে', আর একদল দুনিয়াটা দেখবার জন্য ও মনের সাধে পৃথিবীর রূপরস সম্ভোগ করবার জন্য বেরিয়ে পড়লো।

তিব্বতের নূতন জন্ম হলো রং-সান-গামপোর সময় থেকে। মেষপালকের জাতকে করে তুললেন যোদ্ধা। রাজধানীর নাম হলো 'দেবভূমি' অর্থাৎ ল্‌হা-সা (Lhassa)। রাজা বিয়ে করলেন উত্তরভারতের এক রাজকন্যা ও চীনদেশের এক রাজকুমারী ; রাজনৈতিক দিক থেকে বিবাহ দুটোই খুব কাজের হয়েছিল। নূতন বঁধুদের সঙ্গে এলো দু'দেশের পণ্ডিত, কারিগরের দল।

এই অর্ধ-যাযাবর, অর্ধসভ্য ভোটদের না ছিল ভাষালেখবার লিপি, না ছিল বড় আদর্শের ধর্ম। রাজা রঙ-সান গোমপো লোক পাঠালেন মধ্যএশিয়ায় ও ভারতে ; থোন্-মি নামে মেধাবী ভোট যুবক খোটানে গিয়ে ভারতীয় ব্রাহ্মীলিপি, সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখলেন। খোটান তখন বৌদ্ধ সংস্কৃতির কেন্দ্র। থোন্-মি ভোট-ভাষার উপযোগী লিপি উদভাবন করলেন ও ভোটভাষাকে বাঁধবার জন্য ব্যাকরণ লিখলেন। এই নূতন লিপির সাহায্যে বৌদ্ধগ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় তর্জমা সুরু হলো। এসব কাজে সাহায্য করবার জন্য লোক আনা হলো মধ্যএশিয়া ও চীন থেকে। কিন্তু এতো সব পরিবর্তন সামাজিক উলোট-পালট বরদাস্ত করতে পারছে না পুরাতনপন্থীরা। দেশের আদিম বৌদ্ধধর্মের পুরুতরা দেখে মূঢ় লোকের উপর তাদের প্রভুত্ব যাচ্ছে চলে ; তাই তারা ভিতরে-ভিতরে গুমরাচ্ছে। শেষকালে একদিন বিপ্লব এলো,—বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতিকে দূর করে দিল দেশ থেকে ; জাতীয় ভূতপূজার ধর্ম ও মূঢ়তাকে কায়েম করে না রাখতে পারলে চলবে কি করে ?

অষ্টম শতকের শেষ দিকে রাজা রলপাচেন-এর সময় বৌদ্ধদের আবার সুদিন ফিরলো। ভারত থেকে অনেক পণ্ডিতকে ডেকে আনা হলো বৌদ্ধ-সংস্কৃত পুঁথি পড়ে তর্জমা করবার জন্য। ভারতে বৌদ্ধশাস্ত্রের আদর নেই ; সেখানে নয়া হিন্দুধর্ম জাগছে। শঙ্করাচার্য নামে এক অসামান্য প্রতিভাবান যুবক বুদ্ধধর্মের অনেক-কিছুই আত্মসাৎ করে, বেদ-বেদান্তের নূতন ব্যাখ্যা দিয়ে হিন্দুদের জাগিয়ে তুলেছেন। আর অন্যদিকে বৌদ্ধরাও বুদ্ধপূজা থেকে সরে এসে এখন অসংখ্য কল্পিত দেবদেবীর পূজায় দিয়েছে

মন। বড় বড় বিহারে তারা অলসভাবে থাকে—সাধারণ লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়েছে বিচ্ছিন্ন। আরও নানা কারণে ভারতে তারা মান হারিয়েছে। তাই দেশে মান এখন খুইয়ে বিদেশের আহ্বান পেয়ে তারা দলে দলে চললো তিব্বতে ও চীনে। প্রায় চারশ' বৎসর চলেছিল এই আনা-গোনা—তিব্বত থেকে আসতো বিদ্যার্থীর দল, ভারত থেকে যেতো পণ্ডিতদের দল। সেসব পণ্ডিতদের ও তাদের সহায়কারী লোৎসব (Lotsava)-এর তর্জমা করা বইগুলির নাম করতে গেলেই একটা বই হবে। বাংলা দেশ থেকে নামজাদা পাণ্ডত অতীশ দীপঙ্কর (১০৪২-১১০২) গিয়েছিলেন সেখানে, পেয়েছিলেন দেবতার মতো পূজা তিব্বতীদের মন্দিরে।

তিব্বতী ভাষায় প্রায় তিন হাজার সংস্কৃত পুঁথির তর্জমা হয়েছিল। এই বিরাট সাহিত্যকে বলে তেংগুর (২২৫ খণ্ড), ও কেংগ্যুর (১০৮ খণ্ড)। তিব্বতীরা চীনাদের নিকট থেকে কাগজ বানাতে ও বই-ছাপাতে শেখে; অবশ্য বই-ছাপানো আজকালকার মতো হতো না। কাঠের পাটায় একটা পুরা পাতা উল্টো হরপে খোদাই করা হয়; তারপর কাগজের উপর চেপে ছাপা হয়। একে বলে জাইলোগ্রাফ। এখনো কয়েকটা বিহারে সে-সব পাটাগুলি আছে—দরকার মতো ছাপা হয়। তবে বর্তমানে পাশ্চাত্য মুদ্রাযন্ত্র চালু হয়েছে।

তিব্বতীদের গত ছয়শ' বৎসরের মধ্যে অনেক বদল হয়ে গেছে—তারা এখন বৌদ্ধধর্ম প্রচার করছে মংগোলদের মধ্যে। চীনের নূতন মংগোল সম্রাট কুবলাই খান তিব্বতী লামাদের গুরুবরণ করলেন। তিব্বতী তেংগুর (Bstangyur) ও কেংগ্যুর মংগোল ভাষায় তর্জমা করালেন। মধ্যএশিয়ার এক অংশে বৌদ্ধরা হারিয়েছে মুসলমানদের কাছে; এবার এশিয়ার আর-এক-অংশ আসলো বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রভাবমধ্যে। মংগোলরা অন্তরে-বাইরে পুরাপুরি বৌদ্ধ হয়ে উঠলো। চীনের উত্তরে বৌদ্ধ বিহার সঙ্ঘারাম তারা গড়ে তুললো, বড় বড় বিদ্যার কেন্দ্র স্থাপন করলো। এসব বিদ্যাকেন্দ্র ও বিহার স্থাপনায় ভারতীয় বৌদ্ধদের আর কোনো কৃতিত্ব নেই, তাদের কাজ করছে—সেই তিব্বতী লামা বা পণ্ডিতরা যারা সদ্ধর্ম পেয়েছিল, ভারতীয়দের কাছ থেকে। এখনো মংগোলিয়ায় বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করবার বিখ্যাত বিহার আছে—সেখানে মহাজ্ঞানী বৌদ্ধ-শাস্ত্রীরা আনেন; জারমেনী থেকে পণ্ডিত ওবরমিলর গিয়ে সেখানকার মঠে বাস করে বৌদ্ধ দর্শন-শাস্ত্র পড়েছিলেন ব'লে আমরা জানি।

কোরিয়া ও জাপানের কথা

বড় নদীর দুই ধারের জমি অনেক দূর পর্যন্ত সেঁতিয়ে উঠে উর্বর হয়; বড় বড় সভ্য দেশের সংস্কৃতিরও ছোঁয়াচ লাগে আশেপাশে অনেকদূর পর্যন্ত—এটা প্রকৃতির নিয়ম। চীনের ন্যায় সভ্য ও প্রাচীন দেশের কাছেই আছে কোরিয়া ও জাপান। কোরিয়া কয়েক বৎসর আগে দুনিয়ার লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। শান্তি ও স্বস্তির নামে সংযুক্ত পরিষদের সৈন্যবাহিনী সেখানে নিদারুণ গুণ্ডামি করে ভদ্রসমাজের কাছে হাস্যাস্পদ হয়েছিলেন; এখনো দেশটা দুটো টুক্‌রো হয়ে আছে—উত্তরটা সোবিয়েত রুশ ও কম্যুনিষ্ট চীনের আওতায় 'স্বাধীন' দেশ; দক্ষিণটা আমেরিকার মিলিটারী ঘাঁটি হয়ে—মার্কিনী টাকা ও রসদপত্র পেয়ে 'স্বাধীন রাজ্য'। কিন্তু প্রাচীন কালের ইতিহাসটা কি ছিল সেটাই এখন বলা যাক্।

কোরিয়ার উত্তর ও দক্ষিণের অধিবাসীদের মধ্যে নানা দিক থেকেই একটা পার্থক্য ছিল, আদিকাল থেকে—যেমনটি দেখা যায় ভারতের ও চীনের মধ্যে। কোরিয়া উপদ্বীপের লোকে আকাশ, বাতাস, নদীস্রোত, পাহাড়, বনকে পূজা করতো—যেমন সব দেশেই দেখা যায় সভ্যতার আদিযুগে, সব মানুষেরই মধ্যে। ছোট ছোট রাজ্যও ছিল অনেকগুলি—বিবাদে লড়াই-এ দিন যেতো অন্যদেরই মতো।

প্রবাদগত ইতিহাস বা পুরাণ মতে চীন থেকে এক নির্বাসিত সর্দার শ'পাঁচ সঙ্গী নিয়ে কোরিয়ায় উপনিবেশ গাড়েন; তাদের সঙ্গে ছিল চীনা শিল্পী, কারিগর, কৃষক। এরাই রেশমের চাষ প্রবর্তন করলো নয়া উপনিবেশে।

বহু রাজ্যে টুক্‌রো দেশের মধ্যে রাজায় রাজায় লড়াই তো লেগেই থাকে। এক রাজ্যের সর্দার প্রতিপক্ষকে জব্দ করবার জন্য ডাক দিয়ে আনলো চীনা ফৌজ। প্রতিপক্ষ তো জব্দ হলো; কিন্তু চীনারা আর দেশ ছেড়ে নড়ে না; কোরিয়া চীনের শাসনে এলো। কালে চীনারা আনলো বুদ্ধের ধর্ম, কুংফুৎসুর দর্শন, লাওৎসুর তন্ত্র, চীনা ভাষা ও চীনা লিপি।

চীনাদের অনেককিছু গ্রহণ করেও, লোকে তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য

পুরাপুরি বজায় রাখলো। নিজেদের ভাসা লেখবার জন্য তারা নূতন হরপ তৈরী করলো—চীনা ভাষা তারা শিখলো, কিন্তু তাদের হরপ নিলো না। কোরিয়ার লিপিমালায় আছে—১৪টি ব্যঞ্জনবর্ণ, ১১টি স্বরবর্ণ ও ১২টি মাঝারি ডিপথঙ্‌। পণ্ডিতরা মনে করেন ভারত থেকে তারা পেয়েছিলেন এর সূত্রটা। অভিজাত কোরিয়ানরা ও ঔপনিবেশিক চীনারা এই ভাষা ও লিপিকে অবজ্ঞা করতো; কিন্তু এখন সেই লিপিতেই সব-কিছু লেখা হচ্ছে।

১৪ শতক পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম কোরিয়ায় প্রবল ছিল; যুবকরা চীনে যেতো পড়তে—এমনকি কয়েকজন ভারতেও এসেছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা গেল বিশ্বধর্ম থেকে জাতীয় ধর্মের প্রতিই লোকের টানটা বেশি; তারা দেখলো কুংফুৎসুর নীতিকথা কাজের মতো বটে। যাই হোক, বৌদ্ধ কোরিয়ানরাই জাপানে বুদ্ধের কথা সবপ্রথম নিয়ে যায়।

১৩ শতকে চীনদেশ পড়লো মংগোলদের কবলে—কুবলাই খান সম্রাট হয়ে পেকিঙে (উত্তরপুর) রাজধানী করলেন। মংগোলরা সভ্য চীনাদের সংস্পর্শে এসে বৌদ্ধধর্ম নিলো, চীনাভাষা শিখলো, কিন্তু যাযাবরের লুঠতরাজী স্বভাবটা একেবারে বিসর্জন দিতে পারলেনা—মংগোলিয়া থেকে বর্মা পর্যন্ত দেশে তারা ছড়িয়ে পড়লো। কোরিয়াও তারা দখল করলো। শুধু দখল নয়—কোরিয়াকে করলো জাপান আক্রমণের ঘাঁটি। মরুভূমির মংগোলরা জাহাজী কাজের জটিলতা জানেনা: কোরিয়ানরা দিল জাহাজ, লোক-লস্কর। কোরিয়ানদের সাহায্য পাওয়াতেই কুবলাই এর পক্ষে জাপান আক্রমণ করা সম্ভব হয়েছিল; কিন্তু দু' দুবার চেষ্টা করেও পারেননি কিছু করতে। অতীত যুগে পারস্যের শাহনশাহ জারক্সেসের যে-দশা হয়েছিল আথেন্স আক্রমণ করতে গিয়ে কুবলাই-এর তাই হলো, মানে-মানে প্রাণ নিয়ে ফিরে এলেন জাপান থেকে।

একশ' বৎসর পরে (১৩৮২) কোরিয়ানরা মংগোলদের বিদায় করে দিয়ে স্বাধীন রাজ্য গড়লো। কিন্তু দু'শ বৎসর যেতে না যেতে, জাপান হামলা সুরু করলো; কিন্তু দেশ জয় করতে সেবার পারলো না। কারণ দেশটা চীনা সম্রাটের নামে-মাত্র-অধীন। জাপান কিভাবে ১৯১০ সালে কোরিয়া দখল করে ও কিভাবে ১৯৪৫ সালে সে-দেশ থেকে তারা দূর হয়, এবং তারপর সে-দেশকে নিয়ে মার্কিনী যুদ্ধকামীর দল সংযুক্ত

পরিষদকে শিখণ্ডি খাড়া করে কী অনাচারটা দেশের উপর চালায়—সে-সব কথা পরে আসবে।

কোরিয়া বুদ্ধের বিশ্বধর্ম ও চীনের ভাষা আর সংস্কৃতি পেয়ে সভ্য হয়ে উঠেছে; এখন সে-ই 'মিশনারী' বা প্রচারক হয়ে উঠলো। সমুদ্রের অপর পারে জাপান—সেখানে তারা নিয়ে চললো এই দুই সম্পদ। জাপান বলতে বুঝায় অনেকগুলি দ্বীপ—তারমধ্যে একটা খুব বড়। যাই হোক এই দ্বীপে আদিযুগ থেকে বাস করে আসছে 'আইনু' নামে একটা জাত। এখন তারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়—আমেরিকার রেডইণ্ডিয়ানদের দশা—কোন রকমে টিঁকে আছে। এরাই এককালে ছিল দ্বীপের মালিক। পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে আইনুরা পশ্চিমএশিয়া থেকে এসেছিল কোন্ এক আদিকালে। আমুর নদীতীরে শেষকালে তাদের দেখা যায়—তারপর আসে জাপানে। আর একদল লোক আসে বোধহয় দক্ষিণএশিয়ার মালয় অঞ্চল থেকে। এছাড়া কোরিয়া থেকেও এসেছিল আরও কয়েকটা দল। এইসব বিচিত্র জাতির মানুষ মিশিয়ে তৈরী হয়েছে জাপানীরা। তাদের ভাষা, তাদের ধর্ম-আচার-ব্যবহার—সবই মহাদেশীয় এশিয়া থেকে এতো তফাৎ যে কী তা ভাল করে তাদের না-জানলে বোঝা যায় না। কোরিয়া থেকে যারা এসেছিল তারা চীনা উপনিবেশিকদের বংশধর—মাতুলকুলে তারা খাস কোরিয়ান। এরাই জাপানে আনে চীনভাষা ও সংস্কৃতি—চীনা হরপ, চীনা ধর্ম। খাস জাপানের ধর্ম শিন্তো অর্থাৎ দেবতার পথ; আসলে এইটাই ছিল আইনুদের আদিধর্ম—কালে সেটাই হয়ে দাঁড়ায় জাপানের জাতীয় ধর্ম। জাপানের প্রাকৃতিক শোভা মানুষের মন ভোলায়—সুতরাং সেই প্রকৃতির পূজা স্বভাবতই এসে পড়ে মানুষের প্রাণে। তাই এখনো 'সকুরা' ফুল যেদিন বাগান আলো করে ফুটে ওঠে—জাপানীরা একমনে তা দেখতে থাকে বাগানে বসে। জাপানীরা বলে মানুষের যা-কিছু জ্ঞানবিদ্যা সেতো তার পূর্বপুরুষ থেকে পাওয়া; পূর্বপুরুষ না থাকলে—সে আজ দুনিয়ায় আস্তো কেমন করে। তাই সে ভক্তিভরে পূজা করে পূর্বপুরুষকে। শিন্তো ধর্ম হচ্ছে প্রধানত প্রকৃতির ও পূর্বপুরুষের পূজা—বর্তমানের শোভা ও অতীতের স্মৃতি।

এই পরিবেশের মধ্যে এলো বুদ্ধের বিশ্বধর্ম (৫৫২ অব্দ)—তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশের প্রায় একশ' বৎসর আগে। কিন্তু প্রসার লাভ করে কিছুকাল পরে শোতোকু তাইশি-র সময়ে (৫৯৩-৬২১)। জাপানের ইতিহাস সুরু হলো এই বৌদ্ধ সংস্কৃতির ছোঁয়াচে। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গেই আসে কুংফুৎসুর নীতিধর্ম, চীনাভাষা, সাহিত্য শিল্পকলা। এ সবই জাপানীরা সাগ্রহে গ্রহণ করলো—কিন্তু নিজেদের জাতীয় জারক-রসে সব কিছুকে নূতন ভাবে চোলাই করে নিলো।

চীনের ন্যায় জাপানে সম্রাট ছিলেন—এখনো আছেন। এই সম্রাট তাদের মতে সূর্যবংশীয়—দেবতা এসে জন্ম নিলেন রাজা হয়ে। তবে রাজা বা মিকাদো ছিলেন পূজোর প্রতিমা বা পুতুল—কেউ তাঁকে দেখতে, ছুঁতে পেতো না সহজে—দেববংশে জন্ম তার সেই গৌরবে। সম্রাটরা রাজত্ব করতেন কিন্তু শাসন করতেন না। 'দেশের শাসন ও শোষণ করতেন সর্দার বা শোগানরা— সম্রাট ঠুঁটো জগন্নাথের মতো পূজা পেয়েই খুসি। এই শোগানদের শাসন দৌরাত্ম্য চলে ১৯ শতকের মাঝ পর্যন্ত।

এই ছোট ছোট জমিদার-শোগানদের রাজ্যগুলি হয়ে ওঠে বুদ্ধধর্মের কেন্দ্র। বুদ্ধের অবির্ভাবের হাজার বৎসর পরে জাপানে যে-বৌদ্ধধর্ম পৌঁছলো, তার অনেক বদল হয়ে গিয়েছিল। জাপানেও তার বদল কিছু কম হলো না। সেখানে বুদ্ধের নামে যত সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে,—এতো আর কোন দেশেই হয়নি। কত মঠ, মূর্তি যে আছে—তার ঠিক নেই; পৃথিবীর মধ্যে বুদ্ধের সবথেকে বড় ধাতুমূর্তি জাপানেই আছে। বৌদ্ধ সংস্কৃতের সব থেকে পুরাতন পুঁথি এখনো রয়েছে জাপানের মঠে—জাপানের ইয়োকোহামা শহর থেকে মাইল দশ দূরে কামাকুরা নামে এক গ্রামে—যা এককালে রাজধানী ছিল—সেখানে 'দাই বুদ্সু' নামে বুদ্ধের বিরাট ব্রোঞ্জের মূর্তি আছে—ত্রিশ হাত খাড়াই। ভারতেও এতো প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায় নি। জাপানে বৌদ্ধধর্ম এখন জীবন্তভাবে কর্মশীল। চীনা ত্রিপিটকও সেখানে মুদ্রিত হয়েছে—জাপানী ভাষায় সমুদয় ত্রিপিটকের অনুবাদও বহু খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

জাপানী ভাষা ও লিপির বৈশিষ্ট্য আছে—মূল দেশীয় ভাষার সঙ্গে মিশে গেছে অসংখ্য চীনা শব্দ—যেমন ভারতে দেশীয় ভাষার মধ্যে এসেছে পারসি. আরবীক, ইংরেজি শব্দ। কিন্তু জাপানে চীনা হরপগুলো ব্যবহৃত হয়ে আসছে চীনা শব্দের সঙ্গে—যদিও তার উচ্চারণ

বদলে গেছে অনেক। জাপানের খাস লিপি—কাতাকিনা ও হিরাকিনার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানামুনি নানা মত ; তবে একদল জাপানী পণ্ডিতের মত যে সেটা এসেছিল ভারত থেকে ; দক্ষিণ ভারতের কোনো ভিক্ষু সেটা প্রবর্তন করেন বলে কিম্বদন্তী আছে তাদের মধ্যে।

জাপানের স্থানীয় ইতিহাস আমাদের আলোচনার বিষয় হবে না। জাপান বহু শতাব্দী ধরে আপনার দ্বীপের মধ্যে কূপমণ্ডুকের জীবন যাপন করে, কেবল আনাগোনা চলতো চীনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ব্যাপারে। রাজনৈতিক দিক থেকে একবার চীনের মংগোল সম্রাট কুবলাই খান জাপান জয়ের চেষ্টা করেন ; বার দুই আক্রমণ করে পরাস্ত হন সেকথা পূর্বেই বলেছি। তারপর জাপান সম্বন্ধে বাইরের লোক আর বড় খবর পায়না ; আধুনিক যুগে জাপানের সঙ্গে আবার দেখা হবে।

বৃহত্তর ভারত ও পূর্ব দ্বীপালি

মানুষের চোখে যে দিকচক্রবাল দেখা যায়, তার পরিধি মাত্র তিন মাইল ; তার চোখের বাইরে কি আছে তা জানবার জন্য তার কুতুহলী মন চিরকালই উৎসুক। মানুষ স্থল, জল, আকাশ জয় করে, এখন পার-আকাশের ঊর্ধে সে ঘুরছে, মধ্যাকর্ষণের জবর টান এড়িয়ে সে চলছে—এমনকি চন্দ্রলোকের জমির ভাগ-বাঁটয়ার কথাও শোনা যাচ্ছে।

ভারতীয়রা সমতল দেশ, পার্বত্য ভূমি, নদী পার হয়ে একদিন এসে পৌছালো সমুদ্রের তীরে। সমুদ্রের অশান্ত ঢেউ উঠ্‌ছে পড়ছে—মানুষের মনে হয় সমুদ্র যেন তাকে ডাকছে। সে ভাবে এই সীমাহীন জলরাশির কি শেষ আছে ? ওপারে কী আছে জানতে হবে তো।

পূর্বভারতে অতি আদিম যুগ থেকে সমুদ্রতীরবাসীরা ডিঙি নৌকা করে কূলে কূলে ঘুরছে অসংখ্য ; লোকের জল-কবর হয়েছে, অন্যরা দাঁড়িয়ে দেখেছে—তলিয়ে গেল তাদেরই গাঁয়ের জোয়ান ছেলেরা মাঝ-দরিয়ায়। তবু ভয় পেলো না কেউ—আবার চললো নৌকার দড়াদড়ি ঠিক করে নিয়ে।

এইভাবে ভারতীয়রা পৌছাঁলো বর্মা, আরকান, মালয় উপকূলে। এইসব দেশের লোকও আসতো পূর্বভারতের উপকূলে রূপা, রঙ্গ (রাঙ্‌তা) প্রভৃতি ধাতু নিয়ে। সুরু হ'লো আসা-যাওয়া, কেনা-কাটার বিনিময়। সকলেই নিজের নিজের ফালতু মালপত্র বিনিময় করে—কেউ চায় খাদ্য, প্রত্যহ যার প্রয়োজন—শীত গ্রীষ্ম থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য কেউ চায় বসন, কেউ বা চায় ঘর-দোর বানাবার উপকরণ।

ঐতিহাসিক যুগে এসে আমরা দেখতে পাই ভারতের লোকেরা পূর্ব সাগরের তীর থেকে বঙ্গ-সাগরে পাড়ি নিয়ে সিংহল, বর্মা, হিন্দুচীন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে পৌছে গেছে। খ্রীষ্ট প্রথম শতক থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত হিন্দু-ভারতের সঙ্গে বৃহত্তর ভারতের সম্বন্ধ ছিল নিবিড়—যাওয়া-আসা চলতো। এই বৃহত্তর ভারত বলতে বুঝায় বর্মা, সিয়াম বা প্রদেশথাই,

কম্বোজ, ভিয়েৎনাম, মালয় উপদ্বীপ ও ইন্দোনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ—এমন কি ফিলিপাইন, বোর্নিও দ্বীপগুলিও।

বৃহত্তর ভারত বিশাল ভূ-খণ্ড, বিচিত্র দেশের সমাবেশ; বহু ভাষাভাষী জাতি উপজাতির বাসভূমি—সকল জাতির ইতিহাসই পৃথক। আদিবাসীরা বহু উপজাতির সংমিশ্রনে গঠিত। পণ্ডিতরা বলেন, মন্‌খেমর (Mon-Khmer) নামে যে আদিম উপজাতির নানা শাখা ভারতে ও ভারতের সীমান্ত দেশে ছড়িয়ে আছে—খাসিয়াদের দূর আত্মীয় ভারতের মুন্ডা,—তারই হয়তো ভারত থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগে পূবদেশের দিকে চলে গিয়েছিল। অন্যেরা বলেন, উল্‌টা পথেও এরা ভারতে প্রবেশ করতে পারে তো। মন্‌খমের জাতি ছাড়া আর এক দল লোক বৃহত্তর ভারতে এসেছিল নৌকা করে অস্‌ট্রেলিয়া, নিউগিনী প্রভৃতি দ্বীপ থেকে। তৃতীয় ধারা আসে দক্ষিণবাহী নদীপথ ধরে চীন-তিব্বতের পাহাড়ী অঞ্চল থেকে। আদিম জাতিদের সম্বন্ধে আমাদের অদ্ভুত ধারণা। আদিম ও বর্বর শব্দ প্রায় আমরা প্রতিশব্দবাচক করে ফেলেছি। কিন্তু এইসব আদিম জাত যারা এই বৃহত্তর ভারতে এসে উপনিবেশ গড়ে, তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব সংস্কৃতি ছিল। এর পরে সেখানে এলো ভারতীয়রা—তারাও বিচিত্রজাতির লোক—বাঙালি, ওড়িয়া, অন্ধ্র, তামিল; এদের প্রত্যেকেরই ভাষা সংস্কৃতি পৃথক—ধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন মত তারা পোষণ করে। কেউ বিষ্ণুউপাসক, কেউ শৈব, কেউ বুদ্ধভক্ত। ভারতের বাঙালি, ওড়িয়া, অন্ধ্র, তামিলদের সংস্কৃতি ও ধর্ম মিশলো বৃহত্তর ভারতের বিচিত্র জাতি-উপজাতির স[illegible]তির সঙ্গে; ফলে [illegible] সভ্যতার বহু কেন্দ্র গড়ে উঠে। [illegible] দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বলতে কোনো একক রূপ ফুটে ওঠে না।

খ্রী.পূ. প্রথম শতকে দক্ষিণভারতে পল্লব নামে এক জাতির অভ্যুদয় হয়; এরাই বঙ্গসাগর পার হয়ে সর্বপ্রথম উপনিবেশ গড়ে মালয় উপদ্বীপে ও তার আশে-পাশে। উপনিবেশ বলতে বুঝায় বণিকদের কুঠি বা আড়ত—যেমন আধুনিক যুগে য়ুরোপীয় বানিয়ারা এসে ভারতের নানা জায়গায় কুঠি বানিয়েছিল—এগুলিও সেই ধরণের ব্যবসায়ের বা বিনিময়ের কেন্দ্র। তারপর একদিন সেই প্রাচীন যুগেও বণিকের মানদণ্ড রাত পোহালে রাজদণ্ড রূপেই দেখা দিয়েছিল। বানিয়ারা বা চেটিয়াররা (শ্রেষ্ঠিরা) জায়গা জমি দখল করে 'রাজা' হয়ে বসে। বানিয়াদের মধ্যে মধ্যে নানা

ধর্মের লোক—কেউ বৌদ্ধ, কেউ হিন্দু। তবে বৌদ্ধ বা হিন্দু বললেই তো একটা সম্প্রদায় বোঝায় না। তাদের মধ্যে নানা মত। এইসব মতামত তারা নিজেদের দেশ থেকে নূতন দেশে আমদানী করে। হিন্দুদের মধ্যে বেশির ভাগ ছিল শিবঠাকুরের চেলা, তবে বিষ্ণুভক্তেরও অভাব ছিল না। বলা বাহুল্য সে-যুগে সমুদ্র পেরিয়ে একবার বিদেশে গিয়ে পৌছলে, সহজে দেশে ফেরা সম্ভব হতো না। যান-বাহনের তেমন সুযোগ না থাকায় লোকেরা সেইসব দেশের মেয়েদের বিবাহ করে ঘর-সংসার পাতে। এই সংকরবর্ণ হিন্দুরাই বৃহত্তর ভারতের হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতি কায়েম করে। মধ্যযুগে ঠিক এইভাবে আরব ও তুর্কীরা রাজ্যবিস্তার ও বংশবিস্তার করেছিল—পিতৃধর্ম ও মাতৃভাষাও চালু হয় স্বাভাবিক ভাবেই! বৃহত্তর ভারতে সংস্কৃতভাষা, পালিভাষা গৃহীত হলো ধর্মের ভাষারূপে ; ভারতীয় লিপিও প্রচারিত হলো। ভারতীয় ভাষাগুলি লোক-ভাষা হয়নি ; তাই বৃহত্তর ভারতের আদিম জাতিদের নানা ভাষা ভারতীয় লিপি পেয়ে সমৃদ্ধ হতে আরম্ভ করে। ভারতীয় লিপির বহু পরিবর্তন হয়ে কালে বর্মী, সিয়ামী, কম্বোজীয় প্রভৃতি লিপির জন্ম হয়। প্রসঙ্গত বলি, ভারতেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে—একই ব্রাহ্মলিপির বিচিত্র বিবর্তনে, বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া, তামিল, তেলেগু, মাড়োয়াড়ি প্রভৃতি রূপ গ্রহণ করে।

ভারতের উপকূলস্থ রাজ্যগুলির সঙ্গে গ্রীক ও রোমীয় বণিকদের যোগাযোগের কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। খ্রীষ্টিয় প্রথম শতক থেকে প্রায় দুইশ' বৎসর এদের আনা-গোনা চলে। প্রথম শতকের অজ্ঞাতনামা নাবিকদের কড়চা (Periplus) থেকে এশিয়া ও ভারতের বহু বন্দরের নাম পাই ; কিসব মালপত্র আমদানী-রপ্তানী হতো, তার কিছুটা আভাস আমরা জানতে পারি। বঙ্গোপসাগরের তীরে তখন অনেকগুলি বন্দর। গ্রীক ভৌগোলিক টলেমি (Ptolemy) বন্দরগুলির অবস্থান সম্বন্ধে অনেক তথ্য রেখে গেছেন।

সাগরের পরপারে ছিল সুবর্ণ ভূমি (chryse)। সত্যই সুবর্ণভূমি কোন দেশের নাম ছিল না ; স্বর্ণলঙ্কাও তো লোকে বলতো। আমরাও তো বলি সোনার বাংলা, সোনার দেশ। গ্রীকরা 'সোনার লোম' (Golden Fleece) সন্ধানে যেতো। El Darando-র কল্পনা ছিল মধ্যযুগে। প্রাচীন কালে এই পার-সমুদ্র দেশ থেকে ধনৈশ্বর্য আসতো বলে লোকে নাম দেয় 'সুবর্ণভূমি'

আসল কথা পেরিপ্লাস, টলেমির ভূগোল ও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে আমরা অতি স্পষ্ট করেই জানতে পারি যে, দ্বিতীয় শতকে পূব-সাগরে হিন্দুদের বাণিজ্য ব্যবসায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

ভারতীয় সাহিত্য সদাগর পুত্রদের ধনরত্নের সন্ধানে সুবর্ণভূমি বা বিদেশে যাত্রার কতো কাহিনী আছে। অনেক সময়ে রাজপুত্ররা, স্থানীয় ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়বার ভয়ে দেশ ত্যাগ করতেন। মালয়, কম্বোজ, চম্পা, যবদ্বীপে স্থানীয় ইতিহাসের সহিত ভারতীয় রাজপুত্রদের অনেক অলীক কাহিনী জড়িয়ে আছে। দুঃসাহসিক যুবকরা বোধহয় গাইতো—

যাবই আমি যাবই ওগো, বাণিজ্যেতে যাবই।
সাজিয়ে নিয়ে জাহাজখানি, বসিয়ে হাজার দাঁড়ি
কোন্ পুরীতে যাব দিয়ে কোন সাগরে পাড়ি।

বাংলা মঙ্গল সাহিত্য সমুদ্রপাড়ির কত সুন্দর বর্ণনা আছে।

মানচিত্রের উপর চোখ বুলালেই বোঝা যাবে যে ভারতের পূর্ব-তীর থেকে সমুদ্রপাড়ি দিলেই সামনে পড়ে বর্মা ও মালয়। বোধহয় মালয় উপদ্বীপই হিন্দুদের সর্বপ্রথম উপনিবেশ। * মালয়ের উপকূলে নেমে, কিছু রয়ে যেত সেখানে—অবশিষ্টরা পাড়ি দিত সিয়াম কম্বোজের দিকে। সেখানে মেকং সালবিন নদীর মুখে তারা প্রথম ঘরদোর বানায়—তারপর নদী বেয়ে চলে ধনদৌলতের খোঁজে। এই মালয় থেকে সমুদ্রপথে সিঙাপুর (তখন হয়নি অবশ্য) ঘুরে তারা পূর্বতীরেও ব সত সুরু করে।

* পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার অধিবাসীদিগকে 'মালয়' বলা হয়, তাহাদের দেশ মালয়াশিয়া ভাষা মালায়া নামে পরিচিত। এই মালয় জাতি ভারতের আদিবাসিন্দাদের অন্যতম। মল্ল নামে জাতির নাম কাব্যপুরাণে সুপরিচিত, 'মালবগণ' ভারত ইতিহাসের সমস্যা। মল্লোই (Malloi) জাতির বীরত্বের কথা আলেকজেন্দার কর্তৃক স্বীকৃত হয়। এই মল্লজাতি মালব, মালয়, মাল্লারালি নামে পশ্চিমভারতে, ও পঞ্জাব হইতে কুমারিকা পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। পূর্বভারতে ও বিহার-বঙ্গে মল্ল বা মাল নামে উপজাতির বাস আছে; মাল-পাহাড়ী, মাল, মালো নামে উপজাতি বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে সুপরিচিত। এই মল্ল জাতির নানা শাখা-উপশাখা যেমন ভারতের নানাস্থানে নানা নামে পরিব্যাপ্ত হয়—ভারতের বাহিরেও তাহারা গিয়া বাস করে—এ অনুমান করা যেতে পারে। ইন্দোনেশিয়া বা পূর্ব দ্বীপালিতে তাহারা যায় বোধহয় মালায়ালাম হইতে এবং নূতন দেশে আপনাদের পুরাতন নাম বহন করে নিয়ে যায়। স্থানীয় আদিমবাসিন্দা, অষ্ট্রেলীয় মঙ্গলীয় প্রভৃতি নানা জাতির সহিত সংমিশ্রিত হয়ে তারা নূতন একটি সভ্যতা সৃষ্টি করে। ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি এরা গ্রহণ করে প্রথম শতকে, পঞ্চদশ শতকে গ্রহণ করে আরবীয় সংস্কৃতি ও ইসলাম ধর্ম।

ডাঙা পথে যাওয়া অসম্ভব। প্রথমত পাহাড়ি চড়াই-উৎরাই পথ, আর দ্বিতীয়ত দুর্ভেদ্য জঙ্গল। তাই তারা সাগর ঘুরেই পূর্ব উপকূলে পৌঁছায়। বৃহত্তর ভারতের হিন্দু সভ্যতার এইসব কথা ও ইতিহাস আমাদের কাছে সম্পূর্ণই অজানা ছিল কয়েক বৎসর পূর্বেও। য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের—বিশেষ করে ওলন্দাজ ও ফরাসীদের চেষ্টায় সেখানকার বহু সহস্র শিলালেখ ও তাম্রলেখের পাঠোদ্ধার হওয়ায় বৃহত্তর ভারতকে চিনতে ও জানতে পেরেছি।

আমরা পূর্বেই বলেছি সুবর্ণদ্বীপ একটা সাধারণ সংজ্ঞা মাত্র—ঠিক এ নামে কোনো বিশেষ দেশ ছিল না। এই সোনারদেশে হিন্দু ও বৌদ্ধ বণিকরা উপনিবেশ করে। বণিকদের সঙ্গে যায় ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা ও বৌদ্ধ ভিক্ষুরা। চতুর্থ শতকে চীনদেশের বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়ান এই পথ দিয়ে ভারত সফর করে ফিরেছিলেন। তাঁর চীনা বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে বাংলাদেশের তাম্রলিপ্তি (বর্তমান তমলুকের নিকট) বন্দর থেকে সিংহল পর্যন্ত সমুদ্রপথে জাহাজ যেতো। সেখান থেকে হিন্দু বণিকদের জাহাজে করে ফা-হিয়ান গিয়েছিলেন যবদ্বীপে।

হিন্দু বণিকরা বোর্ণিও দ্বীপে উপনিবেশ পত্তন করে। চতুর্থ শতকের কোনো সময়ে মূলবর্মণ নামে এক রাজা সেখানে 'বহুসুবর্ণ' নামে এক যজ্ঞ করেন, ব্রাহ্মণদের স্বর্ণদান ছিল উদ্দে । এই খবর পাই আমরা সংস্কৃত শিলালেখ থেকে। আরও জানা যায় যে, এই রাজাই বপ্রকেশ্বর নামক পুণ্যক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের বিশ হাজার গোদান করেন। কথাটা একটু বাড়াবাড়ি মনে হয়। বিশ হাজার গোরু নেবার মতো ব্রাহ্মণের বাস তো সোজা ব্যাপার নয়! শিলালেখটাকে স্তাবক কবির রাজপ্রশস্তি বলে সংখ্যাটাকে ক'ম করে নেওয়াই ভালো।

এই অনির্দিষ্ট সুবর্ণদ্বীপের নানা দেশে হিন্দু দেবদেবীর অসংখ্য মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, গণেশ, দুর্গা প্রভৃতি সকলেরই ভক্ত ছিল। এইসব স্থাপত্যে গুপ্তযুগের শিল্পকলার ছাপ খুব স্পষ্ট। মালয় উপদ্বীপে প্রাচীন হিন্দুদের নিদর্শন প্রায় সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তবে কেদা নামে জায়গায় একটা হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখানো দেখা যায়। দেশটা সম্পূর্ণ মুসলমানী এখন, অবশ্য

ভারতীয় হিন্দু, চীনা, বৌদ্ধ ও য়ুরোপীয় খৃষ্টানরা আছে নিজ নিজ ধর্ম মেনে কিন্তু মূল মালয়রা মুসলমান।

বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী—অর্থাৎ বণিকরাই হয় ধনপতি। ধন সকল শক্তির উৎস ধনপতিরা প্রথমে ভূপতি ও পরে নরপতি হন। সাম্রাজ্য পত্তন হয় এই ধনবল থেকেই। এই স্বাভাবিক নিয়মানুসারে শৈলেন্দ্র বংশের উদ্‌ভব হয় অষ্টম শতকে। সুমাত্রা, যবদ্বীপ ছিল শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য ভুক্ত। রাজধানী ছিল সুমাত্রার শ্রীবিজয়নগর। সেস্থানের দেশী নাম এখন পালেমবঙ! এই নগরীতে চীনাবৌদ্ধ পরিব্রাজক ইৎসিঙ বহুকাল কাটিয়ে দেন—তিনি যে-সব সংস্কৃত পুঁথি ভারত থেকে সংগ্রহ করেছিলেন তার অনেকগুলো এখানে বাসকালে তিনি পড়েন ও চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সাহায্যে। অর্থাৎ চীনা পণ্ডিত ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দুইই ছিল সুমাত্রায়। বাংলাদেশের সঙ্গে শৈলেন্দ্র রাজাদের যোগাযোগ হয়, তাম্রলিপ্তি বন্দর থেকে জাহাজ আসাযাওয়া করে। বাংলার পালরাজা দেবপালের সময় (৮০৭) সুবর্ণদ্বীপের রাজা বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করিয়ে দেন। পালরাজা ঐ বিহারের খরচ চালাবার জন্য পাঁচখানা গ্রাম 'দেবত্র' করে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশে থেকে বৌদ্ধ সাধু কুমারঘোষ শৈলেন্দ্র রাজ্যে গিয়ে রাজগুরুর পদ পান; এরই নির্দেশে নাকি তারাদেবীর এক সুন্দর মন্দির নির্মিত হয়। আরও প্রায় দুইশ' বৎসর পরে শৈলেন্দ্রবংশীয় আর একজন রাজা মাদ্রাজের নাগার্জুন নামক স্থানে একটি বৌদ্ধ বিহার তৈয়ার করে দেন। তখনকার দিনের আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ ছিল ধর্মকে কেন্দ্র ক'রে।

শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজারা সুবর্ণদ্বীপে প্রায় চার শ' বৎসর অক্ষুণ্ণ প্রতাপে রাজত্ব করেছিলেন। লোকপ্রবাদ এই রাজাদের পূর্বপুরুষরা কলিঙ্গবাসী। ওড়িশার শৈলোদ্ভব ও গঙ্গবংশীয় রাজাদের সঙ্গে এদের কুটুম্বিতা ছিল কিনা বলা যায় না। এই শৈলেন্দ্র রাজারা যবদ্বীপে বহুকাল আধিপত্য করেন; এদের সময় যবদ্বীপের বিখ্যাত মন্দির বরবুদর নির্মিত হয়েছিল। যবদ্বীপের কথায় আমরা পরে আসব।

একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণভারতের চোল রাজগণ সমুদ্রে শৈলেন্দ্র রাজাদের

প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন। চোলরা প্রাচীন জাতি,—অশোকের শিলালিপিতে পাণ্ড্য ও চের বা কেরলদের সঙ্গে চোল (চোড়)-দের নাম পাওয়া যায়। এই তিনটি রাজ্যের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ, মৈত্রী সন্ধির কথা—আমরা আলোচনা করবো না—সে-সব ঘরোয়া ইতিহাস। কিন্তু এদের মধ্যে পল্লব নামে জাতির আবির্ভাব দক্ষিণভারতের ইতিহাসে একটা বড় ঘটনা বলে, ভারতের বাহিরের দেশের সঙ্গে এদের সংযোগ ও সংঘাত দুইই চলে দীর্ঘকাল ধরে। কিন্তু উত্তরভারতের প্রবল রাজাদের দিগ্‌বিজয়ের চাপে উত্যক্ত হয়ে ওঠে লোকে। এছাড়া দেশের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা বাড়ছে পার-সমুদ্র-দেশে নূতন উপনিবেশ পত্তনের দিকে মন দিতে হয়। এই পল্লবদের সময়ে তামিলরা হিন্দুচীনে, হিন্দুএশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে

পল্লবশক্তির অবসান ঘটে চোলদের নয়া জাগরণের ফলে। সমুদ্র পার হয়ে বাণিজ্য ও রাজ্যবিস্তার করতে গিয়ে চোলদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধলো শৈলেন্দ্র রাজাদের—একই সাগরে দুই বণিক-জাতির আধিপত্য চলতে পারে না। রাজেন্দ্রচোল (১০১৮—৪৩) বিরাট নৌবাহিনী নিয়ে পূর্বসাগর জয় করতে বাহির হলেন; মালয় উপদ্বীপ ও সুমাত্রার কিছুটা অংশ অধিকারও করলেন, এমনকি চীনদেশে দূত পাঠালেন। চীনের সঙ্গে শৈলেন্দ্ররাজাদের সম্বন্ধটা মোটামুটি ভালই ছিল,—সেইটা বানচাল করার মতলবে বোধহয় দূত যায়। সমস্ত একাদশ শতকটা চললো চোল ও শৈলেন্দ্রদের লড়াই। নানা কারণে চোলরা ভারতে দুর্বল হয়ে পড়ছে। সেই সুযোগে শৈলেন্দ্ররাজারা তাঁদের হৃতরাজ্য উদ্ধার করলেন বটে, কিন্তু আর পুরাতন শক্তি ফিরে পেলেন না, প্রাচীন গৌরবও প্রতিষ্ঠিত হলো না। এর উপর দুর্বুদ্ধি চাপলো রাজা চন্দ্রবাহুর—তিনি নৌবাহিনী নিয়ে সিংহল জয় করতে গেলেন; পারলেন না কিছু করতে, অনেক জাহাজ নষ্ট করে ফিরলেন। স্থলসৈন্য ধ্বংস হলে, নূতন সৈন্যদল শিখিয়ে নিতে খুব দীর্ঘ সময় লাগে না; কিন্তু নৌবাহিনী ডুবলে যুদ্ধের জাহাজ তৈরীকরা তাড়াতাড়িতে সম্ভব হয় না, আর নাবিকসৈন্য মারা পড়লে, তার স্থান সহজে পুরন করা যায় না। ফলে শৈলেন্দ্র বংশীয়দের দ্রুত পতন সুরু হলো; অল্পকালের মধ্যে যবানীরা প্রবল হয়ে উঠে এদের ধ্বংস করে দিল।

শৈলেন্দ্ররাজারা ধর্মে ছিলেন মহাযান বৌদ্ধ—তাই তাঁদের সখ্যতা

ছিল বাংলার পালদের সঙ্গে ও চীন সম্রাটদের সাথে, এবং বিবাদ ছিল দক্ষিণ ভারতের হিন্দু ও সিংহলের স্থবিরবাদী বৌদ্ধদের সঙ্গে।

রোম ইতালির গণ্ডী পেরিয়ে এশিয়া ও আফ্রিকায় তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রচার ক'রে সাম্রাজ্য গড়েছিল; শাসনদণ্ড ছিল রোমের সিনেটরদের হাতে। ভারতীয় বণিক, ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষুরা ভারতের বাহিরে সভ্যতা প্রচার করে, রাজ্য বা সাম্রাজ্য গড়ে—সে-সবের সঙ্গে ভারতের কোনো কেন্দ্রীয় শাসকের সম্বন্ধ ছিল না; সবই স্থানিক প্রচেষ্টায় সিদ্ধ হয়েছিল। তবে সেসব দেশে ধর্ম ও নীতি বিষয়ে নিয়ম-নিষেধ, আচার-বিচার ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্র মতেই মানতে হতো। ভারতের সঙ্গে বৃহত্তর ভারতের উপনিবেশিক সম্বন্ধ ছিল না যেটা ছিল গ্রীক ও রোমান সমাজে ও রাষ্ট্রে।

বৃহত্তর ভারতে প্রায় দেড় হাজার বৎসর হিন্দু বৌদ্ধ সভ্যতা টি'কে ছিল। এইসব দেশের মধ্যে যবদ্বীপের ইতিহাস সব থেকে জানবার মতো, বলবার মতো। পশ্চিমএশিয়ায় গ্রীক প্রভাবে যে সভ্যতা উদ্ভূত হয়—যাকে হেলেনিস্টিক বলা হয়ে থাকে—তার থেকে বৃহত্তর ভারতের ইতিহাস কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রাচীন গ্রীক, রোমানদের সমস্ত চিহ্ন প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে—ভারতের জীবনে অতবড় দুর্ভাগ্য ঘটেনি।

যবদ্বীপের কিম্বদন্তীমূলক ইতিহাস আমরা বাদ দিতে পারি; রামায়ণ মহাভারতে যবদ্বীপের যে উল্লেখ আছে তা পরবত যুগের প্রক্ষিপ্তশ্লোক। খ্রী. ২য় শতকের গ্রীক ভৌগোলিক প্টলেমি তাঁর গ্রন্থে যবদ্বীপের উল্লেখ করেছেন। চীনদেশের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে ২য় শতকে যবান রাজা দেববর্মা চীনে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন। ৪ শতকের প্রথম দিকে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়ান সমুদ্রপথে দেশে ফেরবার সময়ে যবদ্বীপে কিছুকাল থাকতে বাধ্য হন—জাহাজের অপেক্ষায়। তখন সেখানে হিন্দুদের সংখ্যাই বেশি, বৌদ্ধরা ছিল নগণ্য। প্রায় এই সময়ের এক শিলালিপিতে পূর্ণবর্মা নামে এক রাজার নাম পাওয়া যায়। এই ধরণের টুক্‌রো টুক্‌রো ঘটনা জানা গেছে মাটি খুঁড়ে পাওয়া শিলালেখ থেকে। তারপর ৮ম-৯ম শতকে যবদ্বীপ ও তার আশে-পাশের দ্বীপগুলি শৈলেন্দ্র রাজাদের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল, সেকথা আমরা পূর্বে বলেছি। এই শৈলেন্দ্রদের সময় বরবুদুর ও অন্যান্য অনেক মন্দির নির্মিত হয়; তখন থেকে বৌদ্ধদের প্রভাব দেখা দেয় যবদ্বীপে।

দুইশ' বৎসরের মধ্যে যবানীয়া শৈলেন্দ্র রাজাদের অনেক বিত্তা আয়ত্ব করে নেয় ও বাণিজ্যে তারা সুমাত্রা শ্রীবিজয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে।

যবদ্বীপের আভ্যন্তরীণ ইতিহাস আমরা আলোচনা করবো না। সংক্ষেপে বলতে পারি পূর্ব-যবদ্বীপের সিংগোসিরি নগরীর রাজশক্তি বাড়তে বাড়তে কালে ছোটখাটো একটা সাম্রাজ্য হয়ে ওঠে। সমগ্র যবদ্বীপ ও পাশের মদুরা প্রভৃতি দ্বীপগুলি অধিকার করে বিষ্ণুবর্ধন প্রভৃতি রাজারা খুব যশস্বী হয়ে ওঠেন। এদের মধ্যে রাজা কৃতনাগরের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়; ধনে মানে পূর্বসাগরে তিনি বেশ সুপরিচিত হন। তিনি হিন্দু হলেও বৌদ্ধ ভিক্ষু, শ্রমনগণকে নিজ রাজ্য মধ্যে আহ্বান করে আনেন। রাজার নিজের বেশির ভাগ সময়ংকাটতো স্তান ও ধর্ম আলোচনায়।

রাজধর্ম অবহেলা করলে যা হয়, তাই ঘটলো কৃতনাগরের ভাগ্যে। রাজার অবিশ্বাসী মন্ত্রী, সেনাপতি এমনকি জামাতা পর্যন্ত এক গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। রাজার অনুমতি না নিয়ে তারা মধ্যপহিত নামে একটা জায়গায় নূতন এক নগরী পত্তন করলো। জামাতা রাজনরাজা সেখানে কর্তা হয়ে বসলেন। সিংগোসিরির দরবার ওদের ব্যাপার দেখে তো অবাক্। কিন্তু বিপদ যখন আসে, তখন তারা ভিড় করেই আসে। ঠিক এই সময়ে চীনের সম্রাট কুবলাই খান যবদ্বীপ আক্রমণ করলেন। যবানদের অপরাধ —চীনা দূতকে তারা রাজদরবার থেকে অপমান করে ফেরত দিয়েছিল। মধ্যপহিতের রাজা রাজনরাজা চীনা সম্রাটকে বলে পাঠালেন যে তারা তো অপমান করেন নি, অপমান করেছে সিংগোসিরির রাজা অর্থাৎ তাঁর শ্বশুর-মশায়। মধ্যপহিতের সেনাবাহিনী ও কুবলাই-এর চীনা সেনানীরা মিলে সিংগোসিরি আক্রমণ করে রাজা রাজপুত্রদের হত্যা করলো। রাজনরাজা খুব ধূর্ত—কৌশলে তিনি চীনা সৈন্যদলকে তিনটে ভাগে পৃথক করে দিয়ে একের পর একটা দলের উপর আক্রমণ সুরু করে দিলেন। চীনারা দেখে এই অতিবৃষ্টির দেশে লড়াই করায় নানা অসুবিধা। বেগতিক বুঝে চীনারা কিছু বন্দী, কিছু ধনরত্ন নিয়ে দেশে ফিরে গেল। এই ঘটনা যখন পূবসাগরে ঘটছে তখন ভেনিশীয় মার্কোপোলো কুবলাই-এর দরবারে চাকুরী করছেন, আর ভারতে তুর্কী-মুসলীমদের প্রায় একশ' বৎসর রাজত্ব হয়েছে।

চীনাদের কাছ থেকে মধ্যপহিতের রাজা একটা মারাত্মক অস্ত্র যোগাড়

করেছিলেন—সেটা হচ্ছে কামান ও বারুদ। যবানীরা শিখে নিল তার ব্যবহার এবং তারপর তারা বীরবিক্রমে দিগ্‌বিজয়ে বের হলো। সুমাত্রার শ্রীবিজয়ের শৈলেন্দ্র রাজাদের ধ্বংস করা ও যবদ্বীপের গৌরব বৃদ্ধি করাই হলো একমাত্র তাঁর লক্ষ্য। দেখতে দেখতে সুনডা, শেলিবিস, মলাক্কা প্রভৃতি অধিকাংশ দেশ মধ্যপহিত রাজা দখল করলেন—তাদের কামানের তোপের কাছে কেউ দাঁড়াতে পারলে না। ১৩৩৫ থেকে ১৩৮০ হচ্ছে মধ্যপহিতের স্বর্ণযুগ। ভারত, কাম্বোজ, সিয়াম প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য ও রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হলো। শ্রীবিজয় ধ্বংস হলো ১৩৭৭ অব্দে; তখন ভারতের দিল্লীর সিংহাসনে সুলতান হচ্ছেন ফীরুজ তুঘলক।

কিন্তু মধ্যাহ্ন সূর্যও অস্তমিত হয়। যবান শাসন ব্যবস্থার মধ্যে নানা পাপ ঢুকেছে সাম্রাজ্যের নানা অংশ পৃথক হয়ে গেল। চীনের সহিত আর একবার যুদ্ধ হলো, তাতে যবানীরা চরম হার হারলো। দুর্ভিক্ষ দেখা দিল দেশ মধ্যে। ইতিমধ্যে দেশে ইসলামের অভ্যুদয় হলো, লোকে হঃ মহম্মদের ধর্মকে মেনে নিল।

ভারত ইসলামকে পেয়েছিল তুর্কী মুসলমানের কাছ থেকে; তুর্কীরা পারসিক ভাষা ও সভ্যতার বাহন হয়ে এসেছিল। ইন্দোনেশিয়ায় খাশ আরবরাই ইসলাম আনলো। তবে এ আরবরা যোদ্ধা নয়, ১৪ শতকের বহু পূর্বে আরব ইতিহাসের উপর যবনিকা পড়ে গেছে। এই আরবরা এসেছে বণিকের বেশে। কিন্তু প্রত্যেক মুসলমানই প্রচারক; তাই তাদের স্পর্শে এসে সমস্ত দক্ষিণ প্রাচ্য দ্বীপালি ও উপদ্বীপ ইসলাম গ্রহণ করে।

আরবরা জাত ব্যবসায়ী ও বণিক। হঃ মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই তারা সমুদ্রে টহল দিয়ে বাণিজ্য করে বেড়াতো। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও তারা সাগরে-সাগরে বাণিজ্য চালিয়ে আসছে। পূর্বদ্বীপালির সুমাত্রাদ্বীপে ১৩ শতকে এই আরব বণিক ও মোল্লাদের সহায়তায় কিছু কিছু লোক মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিল, মার্কোপোলো সেটা লক্ষ্য করেছিলেন। সুমাত্রা থেকে মালাক্কায় ইসলাম সহজে প্রচার লাভ করে। তার কারণ ছিল। বৌদ্ধ-সিয়াম বা থাই রাজারা এবং হিন্দু যবান রাজারা মালাক্কার উপর জুলুম জবরদস্তি চালাতেন সুবিধা পেলেই। চীনারা মালাক্কায় নূতন ধর্ম প্রচারে সহায়তা করলো; কারণ মালয় উপদ্বীপের লোকে ইসলাম

গ্রহণ করলে সঙ্ঘবদ্ধ হবে এবং তারপর সিয়াম ও যবদ্বীপকে সহজেই বাধাদান করতে পারবে। সুতরাং পুরাতন ধর্ম ত্যাগ ও নূতন ধর্ম গ্রহণ ব্যাপারের মধ্যে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অভিসন্ধিও কাজ করছে, তা চীনাদের ব্যবহারেই জানা গেল।

মাল্লাক্কা থেকে একদিন যবদ্বীপে ইসলাম পৌঁছিল। ১৫ শতকের মধ্যে দ্বীপের নানা স্থানে ইসলামের বিশ্বাসী জুটে গেল। মালিক ইব্রাহিম নামে এক পারসিক সাধু এখানে এসে ইসলাম প্রচার করতে আরম্ভ করেন; তাঁর কবর (মৃ. ১৪১৯) এখনো পীরস্থান বলে পূজা পায়। ১৪৭৮ অব্দের মধ্যে মধ্যপহিতের লোকেও ইসলাম গ্রহণ করলো।

ইন্দোনেশিয়া বা হিন্দুএশিয়ার যবানীরা নিষ্ঠাবান ও সুমাত্রাদি দ্বীপের লোকে গোঁড়া মুসলমান। ইসলাম এখানে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেনি, এবং তুর্কদের ন্যায় অর্ধসভ্য মুসলমানরা ইসলামের বাহক হয়নি বলে, ইন্দোনেশিয়ায় প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতি নিশ্চিহ্ন হয়নি। যবানীদের নামের মধ্যে অর্ধেক ভারতীয়, অর্ধেক মুসলমানী। রামায়ণ মহাভারতের আখ্যান তারা অভিনয় করে, অন-ইসলামিক সাহিত্য বলে সে-সবকে দূরে রাখে না।

ইসলাম গ্রহণের অল্পকালের মধ্যে পোর্তুগীজরা এই অঞ্চলে এসে উপস্থিত হলো (১৫০৯) এবং এর কয়েক বৎসর পরে পূর্বদিক থেকে সাগর পথে এলো ম্যাজিলোনের স্পেনীশ জাহাজ বাহিনী। সুরু হলো মালয় ও পূর্ব সাগরে স্পেনীশ ও পোর্তুগীজদের মধ্যে রেশারেশি। কে প্রভুত্ব করবে এই মশলাপাতির দ্বীপপুঞ্জের উপর। এ ইতিহাস আমরা পরে আলোচনা করবো।

প্রাচীন ভারতের গৌরবস্থল ছিল যবদ্বীপ। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে দূর আফ্রিকা, এশিয়ায় গড়ে উঠেছিল বিশিষ্ট স্থাপত্যরীতি। দাক্ষিণপূর্ব এশিয়া বা ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয়দের উপনিবেশ সমূহে যে স্থাপত্যকলা গড়ে ওঠে, যেমন—বরবুদুর বা অঙ্কোরবাট, এদের সমপর্যায় স্থাপত্য ভারতেও দেখা যায় না।

শৈলেন্দ্র রাজাদের গৌরবময় যুগে এই বিশাল মন্দির নির্মিত হয়; বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব প্রতি প্রস্তর খণ্ড বহন করছে। সংস্কৃতকাব্য ললিতবিস্তার, দিব্যাবদান, প্রভৃতি গ্রন্থে বুদ্ধদেবের যে অলৌকিক জীবনকথা বলা হয়েছে, তাহাই খোদাই রয়েছে বরবুদুরের পাথরে পাথরে। কত লোক, কত কাল ধরে এই কাজে নিযুক্ত ছিল! বহুলোকের দ্বারা নির্মিত হলেও কোনো একজন মহাশিল্পী পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপটির পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর নাম তিনি কোথাও রেখে যান নি। অনুচ্চ পাহাড়ের ওপর অবস্থিত এই বিশাল মন্দিরের চতুষ্কোন তলদেশ ২০৪০ ফুট প্রতি পাশে; নয়টি থাকে নির্মিত, প্রত্যেকটির ওপর প্রশান্ত চত্বর। একেবারে ওপরে ঘণ্টার আকারে তৈরী এক স্তূপ। কোন কোন পণ্ডিতে বলেন বাংলাদেশের পাহাড়পুরের (পূঃ পাক: রাজশাহী) স্তূপমন্দিরের আদর্শে নাকি বরবুদুর পরিকল্পিত হয়।

যবদ্বীপের লেখ্যভাষার নাম 'কবি'। এই ভাষা মালয়মূলক হলেও এর মধ্যে অসংখ্য সংস্কৃত বা প্রাকৃত শব্দ আছে—পরে আরবী শব্দও প্রবেশ করেছে অনেক। যবানী প্রাচীন সাহিত্য অধিকাংশই হ'চ্ছে সংস্কৃত গ্রন্থাদির পদ্য অনুবাদ; কখনো বা ভারতীয় আখ্যায়িকা অবলম্বন করে নূতনভাবে লেখা। যবানী ভাষায় প্রাচীনতম গ্রন্থ 'তন্তু পংগেলয়ং'—হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্ব ও দেশীয় আচার বিশ্বাস নিয়ে লেখা। নবম শতকে রাজা এরলংগ ও জয়বয়-এর সময়ে যবানী ভাষায় বই লেখা সুরু হয়। 'অর্জ্জুন বিবাহ' নামক বইখানা রাজা এরলংগকে উৎসর্গ করা। মহাভারত থেকে ভেঙে 'ভারতযুদ্ধ' নামে লেখা কাব্যের সংগে রাজা জয়বয়-এর নাম জড়িত। এযুগে রামায়ণও কবিভাষায় লিখিত হয়েছিল; 'বৃত্ত সঞ্চয়' কাব্যও এযুগের রচনা। এছাড়া বহু গ্রন্থ আছে।

যবানী লিপিকে 'অক্ষর' বলে; অনেকগুলি বর্ণ সংস্কৃত থেকে নেওয়া। অমরকোষ গ্রন্থের অনুকরণে 'দাসনাম' নামে কোষগ্রন্থ সম্পাদিত হয়েছিল বিদ্যার্থীদের সংস্কৃত শিক্ষার সাহায্যের জন্য। ভারতের সঙ্গে পূর্বদক্ষিণ এশিয়ার কী নিবিড় সম্বন্ধ ছিল, তার বিস্তারিত বর্ণনা করা এ গ্রন্থে আর সম্ভব নয়।

যবদ্বীপবাসীরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেও প্রাচীন ভারতের এসব সম্পদকে ত্যাগ করেনি। তবে যবদ্বীপের পাশেই বালি দ্বীপ কি করে

যে ইসলামের প্রচারকদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল তা বলা যায় না। সেখানে এখনো হিন্দুধর্ম চলিত আছে। এই দ্বীপের ভাষা মালয়মূলক হলেও যবানী হতে পৃথক। বালিনীদের ব্যবহার বা সামাজিক নিয়ম-কানুন আচার-অনুষ্ঠান, পঞ্জিকা বিচার সমস্তই প্রাচীন। বালিনীদের মধ্যে দুটো ভাগ—বালি অগ্র বা বালিদ্বীপের অগ্রবাসী বা আদিমলোক ও বঙমধ্যপহিত; মধ্যপহিত বা যবদ্বীপ ইসলাম গ্রহণ করলে এই সব লোক দ্বীপ ত্যাগ করে বালিদ্বীপে এসে বসবাস করে।

বালিদ্বীপে অনেক হিন্দুমন্দির আছে, তবে সেগুলি খুব প্রাচীন নয়—তার অর্থ ধর্মটা এখনো চালু আছে বলে লোকে মন্দির নির্মাণ করে। প্রাচীন না হলেও পুরাতন বা সনাতনী পদ্ধতিতে সেগুলো নির্মিত। মন্দিরগুলিকে দেখলেই দক্ষিণভারতের গোপুরম বেষ্টিত মন্দিরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, জ্ঞাতিত্বের আভাস পাওয়া যায়। বালিনীদের মধ্যে মৃতদাহ একটা বিরাট ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জাভাযাত্রীর পত্রে' এই অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। বালিদ্বীপে ধর্ম খুবই বিকৃত হয়ে গেছে, তবুও সেটা যে হিন্দুদের ধর্ম সে বিষয়ে কোনো ভুল হবেনা। এ বিষয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'দ্বীপময় ভারত' গ্রন্থখানিতে বহু তথ্য আছে।

দ্বীপময় ভারতের উত্তরে যে ভূ-খণ্ড ভারতের সঙ্গে সংলগ্ন, সেই বর্মা সিয়াম, ইন্দোচীন বা ভিয়েৎনাম প্রভৃতি দেশে ভারতের সভ্যতা এখনো জীবন্ত বৌদ্ধধর্মরূপে। আমরা পূর্বেই বলেছি এসব দেশের ধর্মের ভাষা 'পালি'—বর্মা, লাওস, কম্বোডিয়া, সিয়াম বা প্রদেশ থাই, ভিয়েৎনাম—সর্বত্রই হীনযান বৌদ্ধদের মন্দির দেখা যায়। প্রায় সকল দেশ থেকেই বৌদ্ধ পালি ত্রিপিটক নিজ নিজ দেশের লিপিতে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়েছে। বিশাল বৌদ্ধ সংগীতি বা সম্মেলন এখনো আহূত হয়; তথাকার বৌদ্ধ শ্রমণ ভিক্ষুরা তথাগত বুদ্ধের সময়ের ভিক্ষুদেরই ন্যায় পরিচ্ছদ পরেন—সেইভাবে বিহারে বাস করেন। সেইজন্য বলেছিলাম বৃহত্তর ভারতের এই অংশে ভারতীয় সংস্কৃতি এখনো জীবন্ত রয়েছে।

বৃহত্তর ভারতের মানচিত্রের দিকে চোখ ফেরালেই বুঝা যাবে যে এই ভূ-খণ্ডের উত্তর-পূর্ব কোণে চীন সাম্রাজ্য, পশ্চিম-দিকে ভারতের আসাম ও

বঙ্গদেশ, (পূর্ব পাকিস্তান,) দক্ষিণে দ্বীপময় ভারত। সুতরাং এই ভূ-ভাগের সভ্যতা গড়ে উঠেছে এই তিনটি সভ্যতার প্রভাবে। স্থলপথে এই অঞ্চলের যোগ ছিল ভারত ও চীনের সঙ্গে, আর জলপথে ছিল দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে; সমুদ্রপথে চীনের সঙ্গেও আসা-যাওয়া ছিল।

রাজনৈতিক দিক থেকে আজকাল এখানে অনেকগুলি রাষ্ট্র বা ষ্টেট—বর্মা, সিয়াম বা প্রদেশ-থাই, লাওস, কাম্বোডিয়া, ও ভিয়েৎনাম—তার আবার দুটো ভাগ। এই বৃহত্তর ভারতে ইরাবতী অপবাহিকায় গড়ে ওঠে বর্মার বিচিত্র সভ্যতা, মেকং * (মা-গংগ) নদীর ধারে প্রতিপত্তি হলো কাম্বোজদের; আর উভয়ের মাঝে মেনাং নদীর অপবাহিকায় থাই সভ্যতা নানারূপে প্রকাশ পেলো। এইসব নদী উপত্যকার উত্তরাঞ্চল পার্বত্যদেশ—বহু উপজাতির বাসভূমি; নদীপথ ধরে যুগে-যুগে তারা নেমে এসেছে সমতল-ভূমে, মিশে গেছে স্থানীয় জনতার সঙ্গে। সভ্য ও সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের জন্য দাসশ্রম জুগিয়েছে এরা।

বৃহত্তর ভারতের কাম্বোডিয়ায় কোন্ সময়ে যে ভারতীয়রা এসে উপনিবেশ পত্তন করেছিল তা সঠিক বলা যায় না। সমুদ্রপথে এসে তারা মেকং নদীর মোহনায় ব্যবসায়ের কেন্দ্র স্থাপন করেছিল। প্রবাদঃ মতে কৌন্ডিণ্য নামে এক ব্রাহ্মণ খ্রীষ্টীয় ১ম শতকে 'ফুনান' নামে দেশ থেকে এসে স্থানীয় রাজকন্যাকে বিবাহ করেন; তাঁরই বংশধররা হলেন কম্বোজের প্রথম হিন্দু রাজা। 'ফুনান' কোথায়? এটাতো চীনা নাম। কম্বোজ নাম চল্‌তি হবার পূর্বে এই দেশের নাম ছিল ফুনান—অর্থাৎ ডাঙাজমি। কালে মেকং উপত্যকায় হিন্দুবণিকরা এসে এ ঘরদোর বানাতে আরম্ভ করে; রাজ্যও পত্তন করে। কালে কিন্তু ফুনানের আধিপত্য মানলে না এরা। তারপর খ্রী. ৬শতকে কম্বোজের সর্দার চিত্রসেন মহেন্দ্র-বর্মণ ফুনান জয় করে যশস্বী হলেন। এই মহেন্দ্র বর্মনের সংস্কৃত শিলালেখ ৬০৪ অব্দে খোদিত। এই সময়ে ভারতে থানেশ্বর প্রবল হয়ে উঠছে, মৌখরি প্রভৃতিদের যশ-গৌরব বহুদূর ছড়িয়ে গেছে।

৭ম শতক থেকে ১৩ শতকের সুরু পর্যন্ত হিন্দু রাজারা অব্যাহত ভাবে

* সিংহলী বা এলুভাষার নদীকে গংগ বলে।

কম্বোজ শাসন করেন। এই সাতশ' বৎসরের ইতিহাস হচ্ছে কম্বোজের গৌরব যুগের ইতিহাস। এই পর্বে কম্বোজে হিন্দু সংস্কৃতি, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন যে কী পরিমাণ হতো তার প্রমাণ পাওয়া যায় অসংখ্য শিলালেখ ও লেখ তাম্রলিপি থেকে। রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতির আখ্যায়িকা অবলম্বন করে মন্দিরে কত ছবি খোদাই হয়েছিল একদিন!

কম্বোজ রাজাদের অতুল-কীর্তি অংকোর নগরী; সেখানকার রাজবাড়ি, মন্দির প্রভৃতি পূর্বজগতের বিস্ময়কর সৃষ্টি। অংকোরের পূর্বনাম যশোধরপুর;—প্রায় নয় মাইল জুড়ে ছিল এই নগর; চারদিকে প্রাকার; পাঁচটা দরজা দিয়ে নগরে প্রবেশ পথ। রাজবাড়ির সামনে 'বায়ন' দেবমন্দির—অসংখ্য পৌরাণিক আখ্যায়িকা খোদিত—যেমন দেখা যায় দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে। এই বিশাল নগরীর বর্ণনা সংক্ষেপে দেওয়াও কঠিন।

কিন্তু একদিন এই বিরাট পুরী জনশূন্য হয়ে গেল; বাইরে থেকে শত্রু আক্রমণ করলে তাকে লড়াই করে তাড়ানো যায়; কিন্তু প্রকৃতি দেবী বাম হলেই মুস্কিল। সেযুগে মানুষের হাতে বিজ্ঞানের চাবিকাঠি বেশী তো আসেনি; তাই পদে পদে প্রকৃতির উপদ্রব তাকে সহ্য করতে হতো। ১৩ শতকের গোড়ার দিকে মেকং নদীর মোহনায় পলি পড়তে পড়তে এমন হলো যে, শেষকালে নদীর বানের জল আর নিকাশ হলো না—মহানগরী বন্যার জলে ডুবতে সুরু করলো। তখন লোকে নগর ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়ে নমপেন (pnompenh) নামে নূতন নগরী পত্তন করলে। কালে যশোধরপুরের কথা লোকে ভুলে গেল—জঙ্গলে সমস্ত নগর ঢাকা পড়লো। প্রায় পাঁচশ' বৎসর পর ১৯ শতকে ফরাসীরা সেইস্থান আবিষ্কার করে, তারপর তাদের চেষ্টায় পুরাতন মন্দিরাদির জীর্ণোদ্ধার হয়েছে—সেখানে যাবার রাস্তাঘাট নির্মিত হয়েছে—ভ্রমণ বিলাসীরা দলে দলে সেই অতুল কীর্তি দেখবার জন্য আসছে।

১৩ শতক থেকে কম্বোজের পতন সব দিক হতেই সুরু হয়। কম্বোজ আর মাথা তুলতে পারলে না; কখনো আনাম (পরে ভিয়েৎনাম), কখনো সিয়াম (পরে প্রদেশ থাই) এদেশের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করে। তারপর ১৯ শতকে কী ভাবে তারা ফরাসীদের অধীন হয়েছিল এবং বিংশ

শতকের মাঝামাঝি সময়ে আবার স্বাধীন হয়ে নূতনভাবে রাষ্ট্র গড়ছে, সে কথা আমরা অন্য পরিচ্ছেদে আলোচনা করবো।

কম্বোজের পূর্বদিকে আনাম, যার বর্তমান নাম ভিয়েৎনাম। এইখানে ছিল চম্পা হিন্দুরাজ্য। ২য় কি ৩য় শতকে এই রাজ্য স্থাপিত হয়; রাজাদের নাম শেষে 'বর্মণ' আছে। এরা প্রায় বারোশ' বৎসর রাজত্ব করে। আনামে আবিষ্কৃত শিলালেখ থেকে জানা যায় এখানে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ছিল। শিব, উমা, স্কন্দ, গণেশের বহুমূর্তি পাওয়া গেছে; বিষ্ণু, লক্ষ্মী ও ব্রহ্মার মূর্তিও কিছু কম পাওয়া যায় নি। বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয় ভারতীয় ও অভারতীয় ভিক্ষু শ্রমণদের চেষ্টায়।

চম্পায় বরবুদুর বা অংকোরের ন্যায় স্থাপত্য নিদর্শন নেই। যে সবমন্দির পাওয়া গেছে, তাতে হরিবংশ, ও পুরাণাদিতে বর্ণিত কৃষ্ণ ও বলরামের গল্পগুলি খোদাই করা।

চম্পার প্রাচীন রাজধানী দুটো—অমরাবতী ও পাণ্ডুরঙ্গ। কলিঙ্গ দেশের অমরাবতী বিখ্যাত নগরী—চম্পা রাজ্যের রাজধানীও সেই নামে স্থাপিত হয়েছিল।

এখনও চাম নামে জাতি আছে—তারা মুষ্টিমেয়; এদের পুরোহিতরা মুখলিঙ্গ পূজা করে—পূজায় বসবার আগে নূতন কাপড় পরে, হাত-পা ধোয়—আচার ব্যবহার এখনো হিন্দুর মতো কিছুটা আছে। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই ভুলে গেছে যে তাদের সংস্কৃতি ছিল হিন্দু। কোচীন-চীনের চামরা মুসলমান হয়ে এসেছে, তবে তাতেও নিষ্ঠাবান নয়। হিন্দু ভাবাপন্ন চামদের এরা বলে 'কফির' (কাফের)। চামদের ভাষার মধ্যে ভারতীয় ভাষার প্রভাব এখনো স্পষ্ট।

এই বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ কালে অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এলো—আজ সকল রাষ্ট্র থেকে ভারতীয়দের বিদায় করে দেওয়া হচ্ছে—প্রাচীনকালের সম্বন্ধ বোধ এখন বিস্মৃত কাহিনী হয়ে গেছে।

প্রাচীন যুগের অবসান হলো ইসলামের আবির্ভাব হতে। ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল সপ্তম শতকে সত্য কিন্তু তার বিস্তারের ও বৈভবের ইতিহাস থেকে মধ্যযুগের আরম্ভ এবং আমরা ইসলামের জয়যাত্রার কথা দিয়ে পরবর্তী অধ্যায় আরম্ভ করবো।

মধ্যযুগ

ইসলাম কাহিনী

সূচনা

ইতিহাস—'ইতি-হ-আস'—এইরূপ ছিল—গল্প বলতে বলতে 'ইতিহাস'—রামায়ণ মহাভারত রচিত হয়ে উঠলো। পুরাকালে শোনা কথা ও কাহিনী লিপিবদ্ধ হলো পুরাণে—একখানা, দুখানা, করে আঠারো খানা লেখা হলো। পুরাণো কথা বলা তখনো নিঃশেষিত হয়নি তাই সুরু হলো উপপুরাণ তাও হলো আঠারো খানা।

আমরা যাকে ইতিহাস বা হিস্ট্রি বলি তা লেখা সুরু হয় চীনদেশে অতি প্রাচীন কাল থেকেই। গ্রীক ঐতিহাসক অনেক—তবে থ্যুকিডাইডিসের মত বিজ্ঞানী মেজাজ নিয়ে ইতিহাস লিখতে কেউ পারেননি। হেরো-ডোটাসকে ইতিহাস-লেখকের জনক বলা হয়; তবে তাঁর গ্রন্থ সুখপাঠ্য হলেও ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে তেমন মান পায় নি। রোমানদের মধ্যে লিভি, জুলিয়াস সিজার সমকালীন ইতিহাস লিখে গেছেন। ছোটখাটো আরও অনেক নামকরা লেখক আছেন—বিশেষত পুরাতন খৃস্টান লেখকদের মধ্যে—তবে তাঁদের রচনায় পুরাণ কথাই বেশি 'ইতিহাস' কম।

আমরা যেখান থেকে এই গ্রন্থখণ্ড আরম্ভ করছি অর্থাৎ মুসলীম সভ্যতা' সেই পর্বের ইতিহাস পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়ঃ কারণ আরবরা বিজ্ঞানীর মন ও মেজাজ নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতো এবং কেউ কেউ দার্শনিকের মন নিয়ে ঐতিহাসিক তথা সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বও ব্যাখ্যান করে গেছেন। খুব সংক্ষেপে বলছি ইবনে খালদুন ছিলেন এই শ্রেণীর দার্শনিক ঐতিহাসিক।

ইসলামের ইতিহাস খনি থেকে তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছেন আধুনিক ঐতি-হাসিকরা;—ইংরেজ ফরাসী জারমান ভাষায় অগনিত গ্রন্থ লিখেছেন তাঁরা। মধ্যযুগের ইতিহাস ইসলামের ইতিহাস—আমরা সেই পর্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো।

ভক্তেরা বলেন মানুষ ধর্ম পেয়েছে ভগবানের কাছ থেকে,—পাষণ্ডে বলে ধর্ম মানুষের মনগড়া সৃষ্টি। এ তর্ক চলছে অনাদি কাল থেকে—যতোদিন মানুষ ভগবানকে সৃষ্টি করেছে। কিন্তু দেখা গেল অধিকাংশ মানুষ একটা ধর্ম খাড়া ক'রে তার ছায়াশীতল আশ্রয়ে বাস করে ও খুসিও থাকে। মানুষ যে-কয়টা ধর্ম ঐতিহাসিক যুগে সৃষ্টি করেছে বা পেয়েছে বলে দাবী করে, তার মধ্যে বুদ্ধকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছে বৌদ্ধধর্ম,—যীশুখ্রীষ্টকে অবতার ব'লে মেনে নিয়ে খাড়া হয়েছে খ্রীষ্টান ধর্ম। সব শেষে এলো ইসলাম, হজরত মহম্মদকে নবী বা রসুল স্বীকার ক'রে সেই ধর্মের হলো আবির্ভাব। ইহুদী ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, জাপানের শিণ্টো ধর্ম এবং আরো অসংখ্য আদিম উপজাতিদের ধর্ম বিশেষ কোনো ব্যক্তিকে কেন্দ্র ক'রে সৃষ্ট হয়নি—তারা জাতির ইতিহাসের সঙ্গে মিশিয়ে আছে আদিকাল থেকে। তাদের এইজন্যে বলা হয় সনাতন ধর্ম।

এশিয়া সকল ধর্মের জন্মভূমি—ভারতে হিন্দু ও বৌদ্ধ, পশ্চিমএশিয়ায় ইহুদী ধর্ম, পারসিক বা জরথুষ্ট্রীয় ধর্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম ও ইসলাম। এই সকল ধর্মের মধ্যে বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও ইসলাম প্রচারধর্মী বা বিশ্বধর্মী অর্থাৎ যে-কোনো লোক পৃথিবীর যে কোনো স্থানে, যে-কোনো কুলে জন্মগ্রহণ করুক-না-কেন, এইসব ধর্ম গ্রহণে তাদের বাধা নেই। এই প্রচারধর্মী ধর্মের শেষটি হজরত মহম্মদের ইসলাম—শান্তিবাদের ধর্ম।

ইসলামের উদ্ভব হয় আরাবিয়ার মরূদ্যানে খ্রীষ্ট জন্মগ্রহণের ছয়শত বৎসর পর, মরুভূমিতে বাস করে বেদুইন যাযাবররা। তা ছাড়াও আছে বহু উপজাতি! তাদের মধ্যে কয়েকটা শাখা উট নিয়ে দেশবিদেশে ঘোরাঘুরি করে ব্যবসায়ের জন্য। আবার উট নিয়ে চাষ করে মরূদ্যানের আশপাশে এমন লোকও আছে। আর সমুদ্রের কাছাকাছি যারা বাস করে তারা সমুদ্রমন্থন করে বেড়ায়—পাকা নাবিক ও হুঁশিয়ার বণিক তারা। মরূদ্যানে যেসব বসতি গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে মক্কাই প্রধান। উত্তর থেকে উটের সারি দক্ষিণে সমুদ্রতীরের বন্দরে যাওয়া-আসার পথে মক্কা তীর্থে থেমে যায়। এই বণিকদের মধ্যে ইহুদী ও খ্রীষ্টান ছিল।

হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বে বহু বৎসর কেটে যায় এই

ভাবে—নানা সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছোঁয়াচ আরবদের গায়ে ও মনে লাগে। বুদ্ধের ধর্ম যেমন আকস্মিক ঘটনা নয়, খ্রীষ্টের ধর্ম যেমন ঐতিহাসিক অনিবার্য ঘটনাসম্ভূত—আরাবিয়ার মধ্যে হজরত মহম্মদের আবির্ভাবও তেমনি সমকালীন সামাজিক পরিবেশের ও অর্থনৈতিক সংকটের ফল। একটা যুগের চাপা জমাট-বাঁধা দুঃখ ও দৈন্য থেকে মুক্তি পাবার আকুতি মুক্তি পায় বিশেষ এক মানুষের মধ্য দিয়ে। সমস্ত মানুষের মন সমদরদী নয়,—দুই একজনের মনে দুনিয়ার দুঃখে কেঁদে ওঠে; তারা বিশ্বের দুঃখীজনের চাপা কান্না শুনতে পেয়ে নিজেরা জেগে ওঠে এবং পাশের সমদরদী হৃদয়ে তা জাগিয়ে তোলে। দুনিয়ার সর্বহারাদের কানে আজানের ডাক পৌঁছায়—বিপ্লব আনে সমাজে।

আরাবিয়ার লোকে বহু উপজাতিতে বিভক্ত, সকলেই নিজ নিজ দেবতা পূজা করে। সেইসব দেবতার সংখ্যা প্রায় তিন শ'র উপর। মক্কা উত্তর-দক্ষিণে চলাফেরার পথের 'পরে অবস্থিত ব্যবসায়ের মোকাম ও ধর্মের বাজার। বৎসরের মধ্যে একবার করে আরবরা জমায়েত হয় মক্কায়। ব্যবসায়ে যেমন বুদ্ধিমান লোকরা ছোটো ব্যবসায়ীদের কোণঠাসা ক'রে একচেটিয়া কর্তৃত্ব পায়—মক্কায় ধর্মবিষয়ে তেমনি কয়েকটি পরিবারের হাতে ধর্মস্থানের কাজকর্ম হেপাজতের ভার গিয়ে পড়ে, অনেকটা আমাদের দেশে কালীঘাটের কালীমন্দিরের সেবাইতদের মতন। মক্কায় কোরেশী পরিবার হয়ে ওঠে সেখানকার ধর্মবিষয়ে সর্বময় কর্তা, মোহান্তদের মতো। মক্কা ধর্ম ও ব্যবসায়ের বাজার হলেও মদিনাই শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অগ্রসর। সেখানে হজরত মহম্মদের সময়ে খ্রীষ্টানদের সঙ্ঘ ও বহু ইহুদী পণ্ডিতের বাস ছিল। খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের প্রভাবে ইতিমধ্যেই কয়েকজন আরব পৌত্তলিকতা ত্যাগ করেছিলেন। দক্ষিণে সমুদ্রের অপর পারে ইথিওপীয়দের বাস, তারাও ধর্মে খ্রীষ্টান। এই ইথিওপীয়দের সঙ্গে ব্যবসায়ের খাতিরে আরবদের যাওয়া-আসা চলে। এই মেলামেশার ফলে খ্রীষ্টান-ইথিওপীয়দের প্রভাব আরবদের উপর নিশ্চয়ই পড়ে।

এদিকে উপজাতিদের মধ্যে সদাই লড়াই চলে, যুদ্ধের ছুতো খুঁজতে বেশি সময় লাগেনা। আরবদের মধ্যে যাযাবর, কর্ষণজীবী ও ব্যবসায়ীরা নানা অর্থনীতিক স্তরে বিভক্ত; একদল ঘুরে ঘুরে অন্ন বা খাদ্য সংগ্রহ করে, আর একদল চাষ করে খাদ্য উৎপন্ন করে, আর অন্য একদল খাদ্য ক্রয়-বিক্রয়ে বা বিনিময়ে সংগ্রহ করে জীবনের অন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

এই তিন শ্রেণীতে আরবরা বিভক্ত। এই ছিন্নভিন্ন বিক্ষিপ্ত আরবদের এক ধর্মরাজ্যে বাঁধলেন মহাপুরুষ হজরত মহম্মদ। ধর্মপ্রচারের প্রেরণা তিনি পান চল্লিশবৎসর বয়সে। পারিপার্শ্বিক আব-হাওয়া থেকে তিনি অনেক তত্ত্ব ও তথ্য জানতে পারেন; ইহুদী ধর্ম ও পুরাণ সম্বন্ধে বহু কথা ও উপকথা আরবদের জানা। কিন্তু হজরত মহম্মদ গ্রহণ করলেন ইহুদী ধর্মের একেশ্বরবাদটুকু। তবে প্রকৃতিতে চোলাই করা নির্যাসটুকুই শুধু পাওয়া যায় না, তাই আনুষঙ্গিক অনেক-কিছুই এসে পড়ে ইসলামের মধ্যে। ইহুদীদের প্রফেট বা ঋষিরা তাঁদের বক্তব্য বিষয় ঈশ্বরের আদেশ ব'লে প্রচার করতেন—হজরত মহম্মদও বললেন ঈশ্বর বা আল্লা তাঁরই মধ্য দিয়ে কথা বলছেন। সেইসব বাণী কালে সংগৃহীত হয় কোরাণ কিতাবে। এর পূর্বে আরবদের কোনো ধর্মগ্রন্থ ছিল না। তবে কোরাণের মধ্যে প্রাচীন মহাপুরুষদের অনেক কথা আছে, তাঁদের কেউ কেউ ইহুদী ধর্মপুস্তকের মানুষ। তবে তাঁদের সম্বন্ধে কাহিনীর অনেক অদল-বদল দেখা যায়। ইহুদীদের নানা রকমের আচার-ব্যবহারও আরবদের মধ্যে পূর্ব থেকেই চলিত ছিল! সেইগুলোর কিছু-কিছু পরিবর্তন হলেও কাঠামোটা ঠিকই থাকলো। ইসলামের আদিযুগে হঃ মহম্মদের অনুচর ও তাঁর মতাবলম্বীরা জেরুসালেমের দিকে মুখ ফিরিয়ে নমাজ বা ঈশ্বরের উদ্দেশে নমস্কার করতেন। ধর্ম বিশ্বাসীদের নমাজে বা উপাসনায় ডাকা হতো ঘণ্টা বাজিয়ে; ইহুদীশাস্ত্র মতে শনিবার ছিল জমায়েতের দিন। তার পরে যখন মহম্মদ দেখলেন যে ইহুদীরা তাঁকে নবী বা ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ বলে মানছে না ও তাঁর সাম্যবাদের কথা শুনছে না, এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাচ্ছে, তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'মক্কার দিকে মুখ ফিরিয়ে নমাজ করো,—আর জেরুসালেম নয়।' আর শুক্রবার সভ্য-নমাজে যোগদানের জন্য বিশ্বাসীদের 'আজান' দিয়ে ডাক দিলেন। সকলে মিলে ঈশ্বরকে ডাকবার জন্য ইহুদীদের দিন ছিল শনিবার; খৃষ্টানদের ছিল রবিবার। এবার মুসলমানদের হলো শুক্রবার।

মক্কায় 'কাবা' নামে এক কালো পাথর প্রাক্-মহম্মদ যুগ থেকে আরবদের ভক্তি-শ্রদ্ধা পেয়ে আসছে। হজরত আর সব পুজা-পাওয়া পাথরগুলো দূর করে দিলেন, কেবল এইটাকে রেখে দিলেন সমস্ত আরব

জাতির মিলনের প্রতীক রূপে। মক্কার তীর্থে লোকে এই কাবা দেখতে যায়। প্রাক্-ইসলাম যুগে এই কাবায় এসে তীর্থযাত্রীরা নানাভাবে পূজা করতো; কোরেশীয় পরিবার এই দেবত্রের মালিক। ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রাক্-ইসলামী যুগের অনেক-কিছু বিশ্বাস ও সংস্কার রয়ে গেল তার মধ্যে। পরযুগে বিশুদ্ধ ইসলামবাদীরা এসবের বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ জানান। কিন্তু সংস্কারের পাকারঙে মন একবার রঙীন হয়ে গেলে তাকে সাফাই করা খুব কঠিন। লক্ষ লক্ষ মুসলমান পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে প্রতি বৎসর এখানে 'হজ' করতে আসে;—সউদি আরাবিয়ায় তেলের খনি আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে আরবদের মোটা আয় ছিল হজ যাত্রীদের কাছ থেকে।

হজরত মহম্মদ গরীবের ছেলে। ধনীর অমিতাচার ও ধনের অপব্যবহার তাঁকে বড়ই দুঃখ দিত। ক্ষুধার কষ্ট যে কী তা বুঝবার জন্যে মুসলমানদের পক্ষে রোমজানের উপবাস ব্যবস্থা দিলেন—একমাস দিনের বেলায় জলস্পর্শ করা নিষেধ। এমন করে সকলকে ভাই বলে ডেকে ধন ও অন্ন ভাগ করে ভোগ করবার কথা বহুকাল কেউ বলেনি। হজরত যে সাম্যের কথা প্রচার করলেন সেই ধরণের চিন্তা তখনকার পৃথিবীতে অজ্ঞাত। হজরত মহম্মদকে দুনিয়ার সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রবাদী বললে বোধহয় ভুল হবে না। ইসলামে নর-নারীর সমান অধিকার বা সমাজে সংসারে পুরুষের সমকক্ষ—এ তত্ত্ব স্বীকৃত না হলেও, ইসলামে নারী সম্পত্তির অধিকারিণী হলো। এ সম্মান সে বহুকাল সমাজে পায় নি।

হজরত বললেন, 'ঈশ্বরে বিশ্বাসী হও'। ইসলাম শব্দের অর্থ হচ্ছে 'বিশ্বাসী'। সেজন্যে ঈশ্বরের ধ্যান সর্বদা করতে হবে—প্রতিদিন অন্ততঃ পাঁচ 'ওয়াকত' সময় নমাজ করা চাই-ই। কিন্তু আপন মনে ঈশ্বরের ধ্যান করাও যেমন দরকার, বিশ্বাসীদের সঙ্গে একত্রে নমাজ করাও তেমনি প্রয়োজন। শুক্রবারে মসজিদের নমাজে গ্রামের ও পাড়ার সকল বিশ্বাসীরা একত্রে মিলিত হবে; আবার বৎসরে দুইবার একটা অঞ্চলের সকল বিশ্বাসী ঈদ্‌গার মাঠে জমায়েৎ হবে, আর জীবনে একবার যদি মক্কা-শরীফে হজ করে আসতে পারে, তবে পুণ্যের পসরা পূর্ণ হবে।

ধর্মের সঙ্গে নীতির যোগ অচ্ছেদ্য। হজরত মহম্মদ অনেক নিয়ম করে দেন লোক ব্যবহারের; পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে কিভাবে আদব

করতে হবে, নারীর প্রতি কি আচরণ কর্তব্য, বিষয়সম্পত্তি কিভাবে ভাগ ও ভোগ করতে হবে ইত্যাদি। আর বললেন, মুসলমানদের পক্ষে টাকা ধার দিয়ে সুদ নেওয়া গোনা বা পাপ। গৃহস্থের পক্ষে সমাজ-সেবার জন্য 'জাকাৎ' বা কিছু টাকা দান করা আবশ্যিক ধর্ম। কোরবানীর গোস্ বা মাংস গ্রামের গরীব মুসলমানের মধ্যে বিলিয়ে দেবে—সকলের পক্ষে তো কোরবানীর ব্যয় বহন করা সম্ভব নয়। এইভাবে সাম্যবাদের উপর ইসলামের বনিয়াদ খাড়া হল।

ইসলামের ধর্মমত খুবই সহজ ও সরল—ঈশ্বর বা অল্লা এক—এক-মেবাদ্বৈতম্—সর্বমানব আত্মীয়, বসুধৈব কুটুম্বকম্, হজরত মহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত নবী। ইসলাম ধর্মের আর সব হচ্ছে ঐতিহাসিক, অর্থাৎ আরব জাতির সমাজ ও আরাবিয়ার ইতিহাসের সঙ্গে জড়ানো। ইসলাম কোরাণকে অভ্রান্ত ও দৈব বলে স্বীকার করলেও তার অছিত্বের অধিকার কোনো বিশেষ 'জাত' বা দলের উপর ন্যস্ত হয়নি। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, পারসিকদের মধ্যে মগ পুরোহিত, ইহুদীদের মধ্যে জেন্‌টাইল, খৃষ্টানদের মধ্যে পাদরী বিশপের দল সাধারণের উপর মাতব্বরি করেন। সে-শ্রেণীর লোক ইসলামে নেই। তবে হজরত মহম্মদের পর তাঁর প্রতিনিধি হয়ে যাঁরা ইসলাম সেবা করবেন, তাঁরা কোরেশী বংশের, না অন্য বংশের বা ভিন্‌দেশের লোক হবেন তা' নিয়ে মওলানাদের মধ্যে অনেক লেখালেখি ও মতভেদ হয়েছে; সে-কথাতে আমরা পরে আসবো। ইসলামের সব থেকে বড় কথা—জাতিভেদ তাদের মধ্যে অজ্ঞাত; মরোকো থেকে যবদ্বীপ পর্য্যন্ত সকল মুসলমান ধর্ম বা সমাজ বিষয়ে সমান। আহার বিহারে, নিকা বা বিবাহে কোনো বাধা নেই—রক্তের সঙ্গে রক্তের মিশ্রণে তাদের জাত যাবার ভয় নেই, রক্তের সঙ্গে রক্তের মিশ্রণে বাধা নেই বলে মুসলমানরা এক জাতিত্ব, সকল মুসলমানের সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব অনুভব করে।

আরাবিয়ার বহু উপজাতিকে ইসলাম 'এক ধর্মরাজ্য পাশে' বাঁধলো—কিন্তু সে-কাজ সহজে নিষ্পন্ন হয়নি। প্রাক্-মহম্মদ যুগের লোকে কী মূঢ় ছিল, সেকথা পূর্বেই আমরা বলেছি। হজরত মহম্মদ যখন মক্কাবাসীদের পুরাতন দেবতা ও পাথরের স্তূপ দূর করে বিশুদ্ধ অমূর্ত পরমাত্মার ধ্যান করতে বললেন,—লোকে তো তাঁর উপর খড়্গহস্ত। তাঁকে ধর্মনেতা

বলে স্বীকার করা তো দূরের কথা, ধর্মের শত্রু বলে তাঁকে হত্যা করবার আয়োজন করলো। মক্কা থেকে পালিয়ে মদিনায় গিয়ে তিনি প্রাণ বাঁচান। মদিনার লোকে মহম্মদকে মহাসমাদরে আশ্রয় দেয়। তার কারণ মক্কা ও মদিনার মধ্যে রেশারেশি বহুকালের; এবার মদিনা তার সুযোগ নিল। এমনকি মদিনাবাসীরা মক্কা আক্রমণ করতেও দ্বিধা করলে না।

হজরত মহম্মদের মদিনা প্রবেশ থেকে ইসলামের জয় যাত্রার সূত্রপাত। ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই থেকে মুসলমান পঞ্জিকার আরম্ভ। সেই সনকে বলা হয় হিজিরা। মুসলমানদের বৎসরের হিসাব হয় চান্দ্রমাস দিয়ে—এ গণনায় বৎসর ৩৬৫ দিনে হয় না—এগারো-বারো দিন কম হয়; এবং সেজন্য মুসলমানদের ঈদ্ প্রভৃতি উৎসব হিন্দুদের মতো একই তিথিতে পড়ে না। রমজান বা মহরম কখনো পড়ে শীতকালে, কখনো বা দারুণ গ্রীষ্মে। বাংলাদেশে যে সন ব্যবহৃত হয়, তা হিজরী থেকে হিসাব করে আকবরশাহ্ প্রবর্তন করেন।

হজরত মহম্মদের মৃত্যু হয় ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে। মদিনা তখন ইসলামের কেন্দ্র। তাঁর মৃত্যুর পর ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে যার উপর ধর্ম ও কর্ম দুটোরই ভার পড়ে তাঁকে বলে 'খলিফা'। হজরত মহম্মদ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলেন যে খ্রীষ্টানদের মধ্যে রোমের পোপ ও কনস্টান্টিনোপলের গ্রীক সম্রাটদের মধ্যে মনের ও মতের মিল নেই; জনতার উপর খবরদারি করবার অধিকার কার বেশি পোপের না সম্রাটের—তাই নিয়েই বিরোধ ও রেশারেশি চলে আসছে। বোধহয় সেইজন্যেই হজরত মহম্মদ ধর্ম ও রাষ্ট্রকে বেঁধে দিলেন এক খলিফার হাতে। আসলে আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে যে একটা ভীষণ ভেদ সৃষ্টি করা হয়—তা মহম্মদ মানতেন না, তিনি সমগ্রভাবে আদর্শকে ও বাস্তবকে মিলিয়ে সংসারকে দেখতেন।

* মহম্মদের মৃত্যুর পর আবুবকর (৫৭৩-৬৩৪) মুসলীম সমাজের গুরু বা খলিফা হলেন; ইনি হজরত মহম্মদের শ্বশুর, ফতিমা বিবির পিতা। তাঁর মতো পূত-চরিত্রের আদর্শবাদী কর্মী দুর্লভ।

ইসলাম পশ্চিমএশিয়ায় নয়া সাম্যবাদ আনছে। আরাবিয়ার চারিদিকেই

বুনিয়াদী সম্রাটদের রাজ্য—উত্তরে গ্রীক সাম্রাজ্য, পূর্বে পারসিক। সেসব দেশের সম্রাট থেকে সামন্তরা পর্যন্ত সবাই আতঙ্কিত এই সাম্যবাদের বাণীতে। আবুবকর বুঝলেন—এই সাম্রাজ্যবাদীরা এদের পিষে মারবে—যুদ্ধ বিনা শান্তি আসবে না।

আবুবকরের আদেশে সেনাপতি খলিদ আল্লার নামে রোমানদের রাজ্য সিরীয়া আক্রমণ ও অধিকার করলেন (৬৩৫)। এই দেশটা রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস অনেক রক্তারক্তির পর পারস্য শাহনশাহ খশরুর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন—এবার সেটা তাদের হাতছাড়া হয়ে গেল। সিরীয়ার সভ্যতার কথা আমরা পূর্বে বলেছি; সেখানে অনেকগুলি বড় বড় নগর ছিল,—গ্রীকোরোমান বা হেলেনেস্টিক সংস্কৃতির কেন্দ্র; তার মধ্যে সেরা শহর দামাস্কাস—আরবদের আয়ত্তে এলো।

ইহুদীদের দেশ এই সিরীয়ার সংলগ্ন—সেটাও রোমানদের অধীন। ইহুদীরা তো হজরত মহম্মদকে নবী বলে মানেনি—হোক্ না তারা একেশ্বরবাদী—তারা জাত-বেনে, সুদখোর—ইসলামের শরিয়াৎ অনুসারে সুদ তো হারাম। তাদের দেশ ও রাজধানী জেরুসালেম আরবরা দখল করলো। আসলে কিন্তু পরাজয়টা হলো বৈজয়ন্তয়মের খ্রীষ্টান সম্রাটের—এসব দেশ তো তাঁরই অধীন ছিল। সম্রাট হেরাক্লিয়াস প্রমাদ গণলেন।

আরবরা দেখে সাম্যবাদ কেউ সহজে মানতে চায় না; অথচ না মানালেও উপায় নেই। দুনিয়ার দুঃখীদের দিকে তাকিয়ে ইসলামের আদর্শবাদ জোর করে প্রচার ও প্রয়োজন হলে অস্ত্র প্রয়োগ করতে হবে; মিথ্যা ধর্মকে আদর করে পুষে রাখা অধর্মকেই তোয়াজ করার সামিল। তাই আরবদের বিজয় বাহিনী চলে দেশ থেকে দেশান্তরে—রসুলের বাণী নিয়ে। সিরীয়া ও ফিলিস্তানের সংলগ্ন মিশরদেশঃ প্রায় হাজার বছর গ্রীক ও রোমানদের অধীন থেকে প্রাচীন মিশরের অস্তিত্ব লোপ; পেয়েছে, তাদের না আছে শৌর্য, না আছে বীর্য। মিশর জয় করতে আরবদের বেশি বেগ পেতে হয়নি। মিশরের বিরাট নৌ-বাহিনী আরবদের হাতে এসে গেল। এই জলযানের মালিক হয়ে মধ্যধরণীসাগরের দ্বীপগুলি আরবদের পক্ষে জয় করা খুবই সহজ হয়—এর ফলে পূর্ব মধ্যধরণীসাগরের বাণিজ্যও আরবদের হাতের মধ্যে এসে যায়। আরাবিয়ার যে লোকেরা সমুদ্রের ধারে বাস করে, তারা বহুশতাব্দী ধরে নাবিক ও

বণিক নামে সুপরিচিত; এতোদিন তারা এশিয়ার সাগরে যাওয়া-আসা করে এসেছে—এবার মধ্যধরণীসাগরে স্থান পেলো।

ধর্মের নামে মানুষকে দিয়ে সব কাজ করানো যায়—প্রাণ নিতে ও প্রাণ দিতে কোনো দ্বিধা হয় না ধর্মোন্মত্ত লোকের। অবিশ্বাসীকে মারলে সে 'শহীদ' হবে—পুণ্য অর্জন করতে গিয়ে যদি তার জান্ যায়, তবে সে বেহেস্তে স্থান পাবে। একি কম আশার বাণী! সেই স্বর্গে সকল সুখ তার জন্যে অপেক্ষা করছে! এই দুনিয়ার কতো দুঃখ, এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, অন্নবস্ত্রের জন্য হাহাকার—তার থেকে শহীদ হয়ে স্বর্গে গেলে চিরকাল সুখে থাকবে। মহা-আনন্দে মহা-উৎসাহে বিশ্বাসীর দল চলে পশ্চিমদিকে আফ্রিকার কূল ধরে সমস্ত দেশ জয় করে, ইসলাম ধর্ম প্রচার করে আরব সেনাপতি উপস্থিত হলেন অতলান্তিক মহাসমুদ্র তীরে। সেখানে এসে সেনাপতি নাকি বলেছিলেন—সম্মুখে মহাসাগর, আর আমি কোথায় যাবো।

উত্তরআফ্রিকার হাজার বছরের পুরোনো গ্রীকোরোমান সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তার জায়গা দখল করে আরব-ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি। ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদ শুরু হলো সেদিন।

বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের ইমারত থেকে এক-একখানা ইট খসে পড়ছে—দেশের পর দেশ জয় করে চলেছে আরব সেনাপতিরা। পশ্চিম এশিয়ায় বৈজয়ন্তীয়াম গ্রীকদের জুড়িদার শক্তি পারসিকরা। এবার তাদের উপর আরবদের হামলা শুরু হয়েছে।। মেসোপটেমিয়া বা য়ুফ্রাতিস তাইগ্রীসের উর্বর দোয়াবের মালিকানা নিয়ে গ্রীক ও পারসিকদের মধ্যে বহুকালের বিবাদ। পশ্চিমএশিয়ার খাদ্যভাণ্ডার যার দখলে আসে সেই-ই এশিয়ার এই অঞ্চলের উপর প্রভুত্ব করতে পারে। এই দোয়াব দখল নিয়ে হেরাক্লিয়াস ও খসরু—উভয়েই বহুকাল ধরে লড়তে লড়তে এমন রক্তশূন্য নির্বীর্য হয়ে পড়ে যে, আরবদের পক্ষে দোয়াব এমন কি পারস্য জয় করাও খুব কঠিন হলো না! ইরানের মালভূমি আরবদের অধিকারে এলে শাহনশাহ পুত্রপৌত্রাদি নিয়ে আশ্রয়ের জন্য ছুটলেন চীনদেশে।

পারস্য থেকে সাসনীয় বংশ লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার জরথুষ্ট্রীয় ধর্মও লোপ পেলো। মগ পুরোহিতদের অতি-ধার্মিকতার আড়ম্বরে আসল সত্য ধর্ম লোপ পেয়ে গেছে—আচারের অত্যাচারে সত্যধর্মকে আর দেখাই যায় না। ইসলামের সরল ধর্মমত ও সহজ সাম্যবাদ

অধিকাংশ লোককে টানছে তার পানে। তবে মুষ্টিমেয় সনাতনীর দল আঁকড়ে থাকে প্রাচীন ধর্মকে; তাদের কিছু-কিছু লোক দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। বোম্বাই মহানগরী ও গুজরাটের নানা স্থানে তারা আজও 'পার্সি' নামে পরিচিত। এখন তারা পুরোপুরি ভারতীয়। বিখ্যাত শিল্পপতি টাটা ও বিজ্ঞানী ভাবা পার্শি সমাজের লোক।

আরবরা পারস্য জয় করলো বটে কিন্তু মিশরীয়দের মতো এদের সর্বস্ব জয় করতে পারলো না; অর্থাৎ পারসিকরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো, কিন্তু পারসিক ভাষা, আচার-ব্যবহার, নাম প্রভৃতি কিছুই সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করলো না—যেমন করেছিলো মিশর প্রভৃতি দেশের লোক। আরবরা বোগদাদে রাজধানী উঠিয়ে আনার পর তাদের অবস্থা হলো গ্রীকদের জয় করে রোমানদের যে দশা হয়েছিল অনেকটা সেই রকমের সেকথা একটু পরে বলবো।

মরুচর লোকের পক্ষে সমতলভূমি জয় করা যতো সহজ, মালভূমি অঞ্চলে অভিযান চালনা তেমন সুবিধাজনক হয় না। পূর্বদিকে ইরান মালভূমি ভেদ করে আরবরা অগ্রসর হতে পারছে না। আর উত্তরে এশিয়া মাইনর বা আনাতোলিয়ার (বর্তমান তুর্কী) গ্রীকরাজ্য মধ্যে প্রবেশ করাও সম্ভব হয় না ভৌগোলিক কারণে। উট আরবদের বাহন। উট পাথুরে পথে চলতে নারাজ, শীতের মধ্যে পাহাড়েও চড়তে অপারক। সমতল থেকে হঠাৎ উঠে-যাওয়া আনাতোলিয়ার পার্বত্য দেশ—তুষার ঢাকা পাহাড়ী গিরিপথ দিয়ে যাওয়াআসা স্বভাবতই কঠিন। তাই এ-অঞ্চল কোনোদিন মেসোপটেমিয়ার বাবিলনীয়, আসুরীয় ও মিতানিদের অথবা ইহুদী ও মিশরীয় ফারোদের অধীন হয় নি। ঠিক সেই কারণেই ঐ অঞ্চল আরবের খলিফাদের তাঁবে আসে নি। তবে বৈজয়ন্তীয়মের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল দখল করবার চেষ্টা আরবরা করে সমুদ্র পথে মিশরের নৌবাহিনী নিয়ে। কিন্তু তা ব্যর্থ হয় (৭১৮)। এই ঘটনার সাত শত বৎসর পরে এই মহানগরী ও গ্রীকদের সাম্রাজ্য ইসলামের করায়ত্ত হয়েছিল বটে—তবে তা আরবরা করেনি সেটা করেছিল নয়া মুসলমান তুর্কীদের একটা উপজাতি। আরবরা তখন ইতিহাস থেকে লুপ্ত।

য়ুরোপের দক্ষিণপূর্বে বৈজয়ন্তীয়ম সাম্রাজ্য দখল করা হলো না বটে, তবে য়ুরোপের দক্ষিণপশ্চিমে স্পেনের মধ্যে আরবদের নূতন রাজ্য পত্তন ও ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (৭১১)। স্পেন এখন পশ্চিমা গথ (Visigoth)দের দেশ, এরা জারমেনিক এক উপজাতি। তাদের নিজস্ব জারমেনিক ভাষা লাতিনী-ইতালীয় ভাষার সঙ্গে মিশে নূতন উপভাষায় রূপ নিয়েছিল সেটা স্পেনীশ ভাষা। স্পেনের লোকেরা এতকাল বিচ্ছিন্নভাবে বহু সর্দারের শাসন মেনে আসছে, নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিবাদ লেগেই আছে, কখনো স্পেনে একরাজ্য গড়ে ওঠেনি। সেই গৃহবিবাদের সুযোগ নেয় মুক্তদাস তারিক। আফ্রিকার মুর ও বার্বারদের ইসলামে দীক্ষিত করে ও তারপর তাদের মধ্য থেকে সৈন্যসংগ্রহ ক'রে, যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়ে নিয়ে, জিবার উল্ তারিক বা জিবরলটার (তারিক-এর পাহাড়) প্রণালী পার হয়ে স্পেনে হাজির হলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে স্পেনের অধিকাংশই আরব মুসলমানদের দখলে এলো। স্থানীয় রাজারা পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে গেলেন, আরবরা স্পেনে রাজ্য গড়লো; কিন্তু আটাশ বৎসর রাজত্ব করেও স্থানীয় লোকের ধর্ম ও ভাষা সমূলে উৎপাটন করতে পারলে না। কালে দেশীয় ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি একজোটে স্পেনের আরব ইসলামী সাম্রাজ্যকে কিভাবে গ্রাস করে ও ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে সে-ইতিহাস যথাস্থানে হবে।

ইসলাম যেদেশে একবার প্রবেশ করে, সেখানে সে কায়েম হয়েই বসে—আর তাকে নড়ানো যায় না, বংশবৃদ্ধি করতে করতে তারা বিপুল হয়ে ওঠে। একমাত্র স্পেনদেশেই আটশ' বছর রাজত্ব করার পর ইসলাম সংস্কৃতি এমন ভাবে লোপ পায় যে, তার স্থাপত্য ছাড়া আজ সেখানে কিছুই অবশিষ্ট নেই। য়ুরোপের দক্ষিণপশ্চিম কোণ বা আইবেরীয় উপদ্বীপ থেকে ইসলাম বিদূরিত হয় ১৫।১৬ শতকে; অনুরূপ ঘটনা ঘটে আমাদের বিংশ শতকের সভ্যযুগে য়ুরোপের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে

য়া বলকান উপদ্বীপে। উভয়ত্র ইসলামকে সরে আসতে হয় স্থানীয় ন্যাশনালিজম বা জাতীয়তার কাছে হার মেনে।

জয় করবার নেশায় উন্মত্ত আরব-মুর সৈন্য ও সেনাপতিরা পিরীনিজ পাহাড় পার হয়ে আক্রমণ করে ফ্রান্স দেশ। ফ্রান্স দেশে প্রায় তিনশ' বছর হলো ফ্রাংক নামে এক জারমেনিক উপজাতি এসে রাজ্যপত্তন করেছে সাইন নদীর ধারে। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ফ্রাংকরা রোমানদের গালিয়া (Gaulia) প্রদেশের কথ্য-লাতিনী ইতালীয় ভাষা শিখে নিয়েছে, নিজেদের জারমেনিক ভাষা প্রায় ভুলেছে। সেই ফ্রাংক উপজাতি থেকে কালে সমস্ত দেশের নাম হয় 'ফ্রান্স'—যেমন গল্‌দের বাসভূমি বলে সেই দেশকে রোমানদের সময় বলা হতো 'গালিয়া'। • এই সময়ে ফ্রান্সের চার্লস নামে এক সর্দার রাজার কাজকর্ম দেখতেন। এই চার্লস এর কাছে আরব মুররা হারলো তুরের যুদ্ধে (৭৩২)। এই চার্লসকে লোকে বলতো গদাধর চার্লস (Charles Martel) এই যুদ্ধের পর আরব সৈন্য ফ্রান্স ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। চার্লস মার্তেল আরবদের রুখতে না পারলে হয়তো ফ্রান্সেও স্পেনের ন্যায় আরবরা সাতশ' বছর রাজত্ব করতো। আরবদের মতলব ছিল ফ্রান্স জয় করার পর মধ্যয়ুরোপ পার হয়ে বৈজয়ন্তীয়ম গ্রীকসাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের দ্বারে গিয়ে উঠবে! ইতিপূর্বে সমুদ্রপথে সে নগর নেবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। তাই ডাঙাপথে নগর অধিকারের মতলব ছিল। এবার তাও ব্যর্থ হলো! ফ্রাংকরা রক্ষা করলো য়ুরোপকে।

আরব সাম্রাজ্যের পশ্চিমসীমান্ত স্পেন; পূর্বদিকের চরম সীমান্ত ভারতের সিন্ধুদেশ (বর্তমান পাকিস্তান)। এই সিন্ধুদেশ জয় করেন মহম্মদ বিন্ কাসেম নামে এক সেনাপতি। মুষ্টিমেয় আরব সৈন্য এসে সিন্ধুরাজ দাহিরকে কী সহজে হারিয়ে দিল ও দেশটা অধিকার করলো—ভাবলেও অবাক হতে হয়। কিন্তু অবাক হবার কারণ কিছুই নেই। সিন্ধুদেশের জনতা ছিল ব্রাহ্মণরাজার বিরোধী; ব্রাহ্মণ রাজার অত্যাচারে সাধারণ লোক খুবই বিরক্ত, তাই বিদেশী শত্রু আক্রমণ করতে এলে ব্রাহ্মণরাজা দাহির জনতার আন্তরিক সহযোগিতা ও সহায়তা আকর্ষণ করতে পারলেন না। দাহিরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো প্রাণ দিয়ে ও রাজ্য দিয়ে—আর দেশের লোককে বিসর্জন দিতে হল ধর্ম স্বাধীনতা, ভাষা ও সংস্কৃতি।

হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর সওয়া শ' বৎসরের মধ্যে (৬৩২—৭৫০) চীন সাম্রাজ্যের মধ্য-এশিয়ান সীমান্ত থেকে সাহারা মরুভূমি পর্যন্ত এবং পিরীনিজ পর্বত থেকে সিন্ধুদেশ পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ড আরব খলিফাদের ধর্মরাজ্যের অন্তর্গত হয়েছিল—পৃথিবীর ইতিহাসে ইতিপূর্বে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত কখনো হয়নি। এই বিরাট সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রিত হতো বোগদাদ থেকে।

আরবরা সাম্রাজ্য বিস্তারের সময় বাধা পায় মাত্র তিনটি দেশে। কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট তৃতীয় লিও বাধা দেন সমুদ্রে,—ফ্রান্সের গদাধর চার্লস এদের রোখেন তুরের রণক্ষেত্রে ; আর ভারতে সিন্ধুদেশ জয় করেই বুঝে নিল ভারত জয় করা সহজে হবে না—যেমন হাজার বছর আগে পঞ্জাব জয় করেই বুঝে নিয়েছিলো মকিদানের রাজা আলেকজাণ্ডার। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক—এই চারশ বছর মধ্যএশিয়া;থেকে তুর্কী-মুসলমানদের নানা উপজাতি লুটেরার মতো লড়াই চালিয়ে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত পঞ্জাব দখল করে ; কিন্তু ভারতীয়দের হালচাল মিশরীর, পারসিকদের মতো বানচাল করতে পারেনি। ভারতে এসে হিন্দুদের সঙ্গে বনিবনতাই করেই বাস করতে হয়েছিল। ধর্মের নামে অনেক অধর্ম করেও তারা মুসলমান ধর্মের মধ্যে সমস্ত মানুষকে টানতে পারেনি—চিরদিনই তারা হিন্দুদের কাছে বাধা পেয়ে এসেছে।

আরবদের বাহিরের জয়যাত্রার ইতিহাস গৌরবময়। কিন্তু তাহার আভ্যন্তরীণ ইতিহাস আদৌ সুখেরও নয়, শান্তিরও নয়। তবে সে সব ঘটনা আরবদের ঘরোয়া ইতিহাস বলে পৃথিবীর ইতিহাসে তার আলোচনার স্থান খুবই সংকীর্ণ।

হজরত মহম্মদের তিরোভাবের পর বৃদ্ধ আবুবকর মাত্র দুই বৎসর মদিনায় খলিফত্ব করেন। তারপরে হজরত ওমর (৬৩৪-৪৪) হন খলিফা। তিনি যেমন ধীর তেমন বীর। কিন্তু তাঁর জীবিতকালেই আরবদের মজ্জাগত ধন উপজাতীয় বিরোধ ও বিদ্বেষ এখানে-সেখানে দেখা গেল। তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমানের সময় (৬৪৪—৫৬) পারিবারিক কলহ প্রকাশ্য বৈরীতার রূপ নিল। ওসমান স্বজাতি ও স্বধর্মীদের হাতে প্রাণ তো দিলেনই আর এখন থেকেই খলিফা নির্বাচন নিয়ে মদিনায় নানা ধরণের ষড়যন্ত্র ও অশান্তির সূত্রপাত হলো। দেখা গেল ইসলাম বা শান্তির ধর্ম থেকে উপজাতীয় বা পারিবারিক দলাদলিতেই লোকের বেশি উৎসাহ।

হজরত মহম্মদের জামাতা হজরত আলীকে খলিফা করা হলো, কিন্তু তাঁরও প্রাণ গেল আততায়ীর হাতে। মহম্মদের স্বপ্ন—সকল মানুষ এক ঈশ্বরের নামে একজাতি হবে—এক কোরাণকে ঈশ্বরের বাণী বলে মেনে নিয়ে শান্তিতে বাস করবে—ব্যর্থ হলো আদর্শবাদীর স্বপ্ন। আলীর পুত্র হাসানকে খলিফা করা হলো বটে, তিনি টিঁকতে পারলেন না—তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মোয়াবিয়া দলে ভারি। হজরত মহম্মদের অনুরক্ত ভক্তের দল এখন বাক্যহীন, তারা শাস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করে—রাজনীতির ব্যাপারে তাদের কেউ আমল দেয় না।

মোয়াবিয়া শক্তিবলে খলিফা হলেন,—আর জনতার ভক্তির উপর নির্ভর নয়। তিনি যোদ্ধা, সেনাপতি, হুকুম তামিল করবার জন্য সৈন্যরা হাজির। অন্যের দেশ জয় করতে পারলে লুটের ভাগ সবাই পায়; তাই সৈন্যেরা মোয়াবিয়ার অতি অনুরক্ত। হজরত মহম্মদ বলেছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর চল্লিশ বৎসর পরে খলিফা পদের অন্তর্ধান হবে। সেখানে আসবে প্রতাপ। হলোও তাই, মক্কা ও মদিনার মধ্যে রেশারেশি তিনি দেখে গিয়েছিলেন—ঘরের মধ্যেও অশান্তির আশংকা করে থাকবেন।

মোয়াবিয়া হচ্ছেন আজ-কালকার ভাষায় যাকে বলে 'ডিক্‌টেটর'; ডিক্‌টেটর বলে কোনো পদ নেই কোনো শাসনসরকারে; কিন্তু ফৌজী ও বে-ফৌজী ক্ষমতা যখন কোনোরকমে একজন লোকের হাতে এসে পড়ে, তখন তিনি হন সর্বময় কর্তা—তাঁর আসল সহায় তাঁর অনুগত সৈন্যবাহিনী।

মোয়াবিয়া আরব সাম্রাজ্য সীমানা বাড়িয়ে চলেছেন। তাই মদিনা থেকে আরও কেন্দ্রীয় জায়গায় রাজধানী স্থানান্তরিত করাই ঠিক করলেন। তা ছাড়া মদিনার রাজনীতি ও মওলানাদের অতি ধার্মিকতা খলিফার সমস্ত গৌরবকে ম্লান করে দিচ্ছে। এর থেকে মুক্তি পাবার জন্য মোয়াবিয়া দামাস্কাসে রাজধানী উঠিয়ে নিয়ে গেলেন (৬৬১) এবং তাঁর পুত্র য়েজিদকে ভাবী খলিফা বলে ঘোষণা করলেন। মনে পড়ছে রোমান ইতিহাসে একদিন সৈন্যাধ্যক্ষ বা ইমপিরেটর এমনিভাবে বংশ পরম্পরায় 'এম্‌পরার' হয়ে বসেছিলেন।

এদিকে মদিনার রাজনীতিকের দল ও হজরত মহম্মদের অনুরাগীরা হজরত আলীর পুত্র—হজরতের দৌহিত্র হোসেনকে খলিফা করবার জন্য

বদ্ধপরিকর—তারা দামাস্কাসের কর্তৃত্ব মানবে না। ইরাকের আরবরা হোসেনকে খলিফা করবার পক্ষপাতী জানা গেল। তারা হোসেনকে আহ্বান করে ইরাকে নিয়েও গেল, কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা পেছিয়ে গেল। হোসেনকে য়েজিদের সৈন্যদল কারবালার মাঠে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলো (৬৮০)। আজও মুসলমানরা হাসান-হোসেনের মৃত্যুর কথা স্মরণ করে মহরমের সময় বুক চাপড়ে বলে 'হাসান-হোসেন কারবালা,' এই ঘটনার পটভূমে বাংলার সাহিত্যিক মসরফ হোসেন 'বিষাদসিন্ধু' নামে উপন্যাস লেখেন।

য়েজিদকে খলিফা স্বীকার করবে না বলে মক্কা ও মদিনাবাসীদের পণ! —তখন য়েজিদের সৈন্য ইসলামের সংহতি রক্ষার অজুহাতে মদিনাবাসীদিকে যুদ্ধে হারিয়ে দেয়। তারপর মক্কা আক্রমণ করতে পিছ্‌পা হলো না। ধর্মের মুখোশ পরে শক্তিমানের খেলা শুরু হয়েছে। য়েজিদ মাত্র তিন বৎসর খলিফত্ব করেন (৬৮০-৬৮৩) কিন্তু তার মধ্যেই খলিফার পদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন সৈন্যদলের সাহায্যে। ইসলামের নিষিদ্ধ অনেক কিছুই তিনি করতেন—তবুও উপযুক্ত পার্ষদ পেয়েছিলেন বলে বর্ধিষ্ণু সাম্রাজ্যের অর্থনীতিটাকে নয়া পথে চালিত করতে সক্ষম হন। এছাড়াও তাঁর সময়ে আভ্যন্তরীণ উন্নতি কিছু-কিছু হয়। সর্বকালে সর্বদেশে টাইরেণ্ট বা ডিকটেটররা প্রজার হিতকর অনেক কাজ ক'রে তাদের মন হরণ করে আনেন। কিন্তু অতিলোভের ফলে শাসনপর্বের প্রথম দিকে অনেকেই শেষ সামলাতে পারেন না— জনতার হাতেই তারা মরেন।

প্রথম চারজন খলিফাকে বলা হয় 'খলিফা রসেদ্দীন' অর্থাৎ খাঁটি খলিফা। তারপর মোয়াবিয়া থেকে খলিফা হলো বংশ পরম্পরাগত। ইতিহাসে এরা উম্মীয় বা উমায়িদ নামে পরিচিত (৬৮১-৭৫০)। কোরেশীয় পরিবার—যাঁরা ছিলেন মক্কা শরীফের আদি মোতালিব— তাঁরা ইতিহাস থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন।

দামাস্কাসের উম্মীয় খলিফাকে মানলে না ইরাক ও পারস্যের মুসলমানরা; তাদের দেশে হোসেন শহীদ হয়েছেন কারবালার মাঠে, হজরত মহম্মদের দৌহিত্র তিনি, নবীর রক্ত তাঁর দেহে ছিল,—সেই দেহের রক্তপাত করেছে যারা তাদের খলিফা বলে মানা যায় না। পূর্বদিকের আরবরা ও পারসিকরা হোসেনকে 'ইমাম' বলে স্বীকার করলো এবং তাঁর ধারার

ইমামত্ব চলে আসছে। এই শাখা মুসলমানদের মধ্যে 'শিয়া' নামে পরিচিত।

শিয়া মত ছাড়া অন্য মতের উদ্ভব হয়। খারিজাসম্প্রদায়ের লোকে বললে মানুষের ধর্মজীবনের প্রকাশ তার ব্যবহারে। তাঁদের মতে যেকোনো যোগ্য লোকই খলিফা-পদ পেতে পারেন—এপদ কখনো পুত্রপৌত্রাদিক্রমে কায়েম হতে পারে না। উম্মীয় বংশীয় আবদল মালেক (৬৮৫-৭০৫) এইভাবেই খলিফা হয়েছেন, তাঁর পক্ষে এমত সহ্য করা সম্ভব নয়। তিনি খারিজাদের ধ্বংস করলেন পাষণ্ড আখ্যা দিয়ে। চারিদিকেই নানা মত জাগলেও কেন্দ্রীয় শক্তি বেশ পাকা বুনিয়াদ পেয়েছে—সৈন্যদলের সহায়তায়।

•

পূবের সূর্য পশ্চিমে একদিন অস্ত যায়। উম্মীয়দের পতন শুরু হয়েছে ভিতর থেকে—বাইরেও বিদ্রোহ দেখা দিচ্ছে নানা দিকে। আব্বাসী নামে নূতন দলের উদ্ভব হয়েছে সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে। দেখতে দেখতে সমগ্র পারস্যদেশ তাদের হেপাজতে এসে গেল, উম্মীয়রা সর্বত্রই হঠছে। প্রত্যেক প্রদেশেই উম্মীয় ও আব্বাসী দলের পৃষ্ঠপোষক দাঁড়িয়ে গেছে। অবশেষে উম্মীয়-খলিফাকে খলিফার তক্ত ছাড়তে হলো।

আব্বাসীরা উম্মীয়বংশ নির্বংশ করবার চেষ্টায় আছে। উম্মীয় বংশের আবদর রহমন নামে ব্যক্তি কোনো রকমে পালিয়ে বাঁচলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি শেষকালে আশ্রয় নিলেন সুদূর স্পেন দেশে। সেখানে মুসলমানরা একজন খানদানী বংশের লোককে পেয়ে—তাঁকেই সেখানের আমীর (৭৫৬) পদ দিল এবং কয়েক বৎসর পরে তাকে খলিফা বলে ঘোষণা করে। একথায় আমরা আবার ফিরে আসবো।

পূর্বাঞ্চলেই আব্বাসীরা দলে ভারি; তাই খলিফা অল্‌মনসুর (৭৫৪—৭৫) আব্বাসী বংশের প্রতিপত্তি কায়েম করে তাঁর রাজধানী দামাস্কাস থেকে সরিয়ে নিয়ে আসলেন বোগদাদে (৭৬২)। সিরীয়ার আরবরা বহুকাল থেকে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের প্রভাবে পড়ে বিশেষ একধরণের মানুষ হয়ে ওঠে। অপরদিকে মরুচর আরব যারা পূর্ব-অঞ্চলে দোয়াবে বাস করছে তাদের আদিম তেজটা এখনো নিবে যায়নি। পুরাতনপন্থী পশ্চিমী আরবদের

প্রতি ওদের অবজ্ঞাটা খুব স্পষ্ট, এমনকি তাদের বর্বর বলতেও এদের মুখে বাধতো না। পুরাতন আরাবিয়া, সিরীয়া প্রভৃতি দেশ এখন আরব সাম্রাজ্যের মফঃস্বলের মতো—খলিফাদের সকল বৈভব জমছে বোগদাদে—অর্থাৎ মেসোপটেমিয়ায় পারসিকদের আওতায় গড়ে উঠেছে নূতন সাম্রাজ্যবাদ—খলিফা রসোল্দীন থেকে এখনকার খলিফারা বহুদূরে সরে এসেছেন।

খলিফাদের রাজধানী বোগদাদে উঠে আসলে আব্বাসীদের দরবারী জীবনে নানা অদল-বদল দেখা দিল। মেসোপটেমিয়া ছিল পারসিক শাহন্‌শাহদের রাজ্যভুক্ত দেশ, ধনী সম্ভ্রান্ত পারসিকদের বাসভূমি, আভিজাত্যের পীঠস্থান। বহু শতাব্দী ধরে পারসিকরা রাজকার্য চালিয়ে আসছে বংশপরম্পরায়। বোগদাদের খলিফাদের বড় বড় চাকুরী তারাই দখল করে বসলো। তাদের চালচলন, আদব-কায়দা বুনিয়াদী ঢঙের; তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, খানাপিনা রাজসিক; তাদের ঘরবাড়ী, হামাম বা স্নানাগার, জেনানা বা অন্দর-মহলের নিয়ম-নিষেধ খানদানী আমলের। এসব দেখেশুনে আরবরা হকচকিয়ে যায়, তারা ভাবে এসব সভ্যতারই চিহ্ন। তাই পরাজিত পারসিকদের অনেক-কিছুই নূতন আরবরা গ্রহণ করে; রোমানরা যেমন বিজিত গ্রীকদের দ্বারা পরাভূত হয়েছিলো সংস্কৃতির ক্ষেত্রে—বোগদাদের আরবদেরও সেই দশা হলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, আরবদের মনও খুলে গেল বোগদাদে এসে। লোকে বলতো উম্মীয় খলিফারা আরবদের বাহিরের রাজ্য গড়ে, আর আব্বাসী খলিফাদের সময়ে আরবদের জ্ঞানরাজ্যের সীমানা বাড়ে।

নূতন নূতন দেশ জয় চলছে—নূতন নূতন জাতির সঙ্গে জানাশোনা হচ্ছে। পুরাতন জাতির জ্ঞান ভাণ্ডারের তত্ত্ব জানবার জন্য আরবদের কৌতূহল বাড়ছে। খলিফা মনসুর, হারুণ অল রসিদ, মামুনের সময়ে তখনকার দুনিয়ায় কত বই যে আরবী ভাষায় তর্জমা হয়েছিল, তার তালিকা খুবই দীর্ঘ। আব্বাসীদের শাসনকালের গোড়ার দিকটাকে বলা যায় আরবী ভাষা ও সাহিত্যের স্বর্ণযুগ।

সাহিত্য, শিল্পকলা ও সৌন্দর্যচর্চায় বোগদাদী আরবরা চরম উৎকর্ষ লাভ করলে বটে, কিন্তু রাজ্য পরিচালনায় আসল জিনিস শক্তিসাধনা—তাতেই দেখি তাদের অবহেলা। চারদিকের ধন-ঐশ্বর্য লুণ্ঠিত হয়ে একটা

বিশেষ দেশের মধ্যে এসে পড়লে, তার যা অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—তাই ঘটতে শুরু হয়েছে বোগদাদে। লোকে শ্রমবিমুখ ও বিলাসী হয়ে উঠেছে। বেতনভোগী বিদেশী কর্মচারী ও তুর্কী ক্রীতদাসের উপর রাজ্যের সমস্ত দায় ও দায়িত্ব তারা চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত—ঠিক যেমনটি হয়েছিল রোমান সাম্রাজ্যের চরম বৈভবের যুগে। খলিফা মুসাতাম্ (৮৩২-৪২) বাজারে-খরিদকরা তুর্ক দাস দিয়ে সৈন্যদল ভর্তি করলেন। কালে বোগদাদে পঞ্চাশ হাজার তুর্কী সৈন্য জমায়েৎ হলো এইভাবে। আরব সাম্রাজ্যের আর একটি জায়গায় আড়াই লক্ষ তুর্কীর ছাউনি গড়ে উঠে। কালে এই বিদেশী বর্বরের দল হলো আরব সাম্রাজ্যের কাল। তারাই হয়ে উঠলো রাজ্যের সর্বময় কর্তা। তাদের ইচ্ছায় খলিফার মরণ-বাঁচনের নির্ভর। এমন অবস্থায় সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরতে বাধ্য। ধর্মসংস্কারের নামে আব্বাসী খলিফাদের একছত্র কর্তৃত্বের ভিত নড়িয়ে দিল কারমেথীয় বিদ্রোহীরা।

আরব-ইসলামী সাম্রাজ্য অতলান্তিক মহাসাগর তীর থেকে সিন্ধুনদের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিশাল ভূখণ্ডকে বোগদাদে বসে শাসন করা কঠিন হয়ে উঠেছে;—জাতি, ভাষা, অর্থনৈতিক স্বার্থ, ধর্মমত নিয়ে কতরকমের ভেদবুদ্ধি মানুষের মনকে নাড়া দিচ্ছে। বোগদাদের খলিফাদের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে নানা প্রদেশে

সর্বপ্রথম বোগদাদের শাসন-শৃঙ্খলকে উপেক্ষা করলো স্পেন। উম্মীয় বংশীয় আবদর রহমন সেখানে আপনাকে খলিফা বলে ঘোষণা করেছিলেন (৭৫৫)। কিছুকাল পরে ইদরিশ নামে হজরত আলীর এক প্রপৌত্র সেখানে গিয়ে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন (৭৮৫)। বৎসর পনেরো পরে মিশরও আব্বাসী খলিফাদের বশ্যতা অস্বীকার করে (৮০০)। খোরাসানের তাহেরীয় বংশের সর্দাররা প্রায় স্বাধীনভাবে এতকাল রাজ্য চালিয়ে আসছিল (৮১৩-৭২), এখন আব্বাসীদের সঙ্গে সেই ক্ষীণ সম্বন্ধটুকুও ছিন্ন করলো (৯০২)। এমনকি খলিফার সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধিয়ে তাঁর রাজ্যের খানিকটা গ্রাস করতেও এখন আর ধর্মে বাঁধছেনা। মধ্যএশিয়ার বোখারার সামনীয় বংশীয় সর্দাররা (৮৭৪-৯৯৯) পারস্যের মধ্যে বিস্তার ও খোরাসান রাজ্য দখল করে এক বিশাল সাম্রাজ্য পত্তন করলো। সাম্রাজ্যবাদ কোনো যুগেই চিরস্থায়ী হয় না। খলিফাকে কেন্দ্র করে

মুসলমানরা ভেবেছিল যে আরব ধর্মসাম্রাজ্যের অটুট ও চিরস্থায়ী হবে। কিন্তু মহাকাল কিছুকেই চিরস্থায়ীত্ব দেন না।

এই সকল ছোটছোট ইসলামী রাজ্যগুলি মধ্যযুগের ইতিহাসে উপেক্ষণীয় নয়। রাজারা স্বাভাবিকভাবে যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি 'রাজজনোচিত' কাজে লিপ্ত থাকলেও নিজ নিজ রাজধানীকে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, স্থাপত্য-সৌন্দর্যে প্রতিবেশী রাজার রাজধানী থেকে আরও বড়ো করবার জন্য চেষ্টা করতেন। পিশাচস্বভাব যোদ্ধার মধ্যে আচারনিষ্ঠ ধার্মিকতা, বিলাস ব্যসনে নিমগ্ন সুলতানের মধ্যে সাহিত্য শিল্পকলার নিষ্ঠা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। দেবতা ও দানবের অংশ নিয়ে মানুষ সৃষ্ট বলেই, একই ব্যক্তির মধ্যে বিরুদ্ধ ভাবনা ফুটে উঠে। বহু সম্রাট, বহু যোদ্ধা, বহু খলিফার মধ্যে এই দেব-দানবকে দেখা যায়।

সহজ চোখে মুসলমান সমাজকে একটা অখণ্ড একক বলে মনে হয়; কিন্তু অরণ্যের মধ্যে ঢুকলেই দেখা যায় যে, গাছে-গাছে অনেকখানি ফাঁক। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যেই নানা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়—যেমনটি হয়েছিল বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর বৌদ্ধ জগতে, যীশুখ্রীষ্টের অন্তর্ধানের পর খৃষ্টান সমাজে। মুসলমানদের মধ্যে পারস্যের শিয়া সম্প্রদায়ই সব থেকে প্রবল। হজরত আলীর পুত্র হাসান-হোসেনের সময় থেকে ইসলামের মধ্যে যে গৃহচ্ছেদ দেখা যায় তার কথা পূর্বেই বলেছি। তারপর শিয়াদের মধ্যেও ভাঙন দেখা দিল। হাসান থেকে ষষ্ঠ ইমাম মগ্নপ স্বভাবের লোক; ভক্তেরা তাঁকে ইমাম স্বীকার করতে নারাজ। কিন্তু অতি গুরুগত-প্রাণ ভক্তদের চক্ষে তিনি মাতাল হলে কি হয়, হজরত মহম্মদের বংশধর তো বটে, তাঁরই রক্ত তো শিরায় বইছে, তাঁকে কি ত্যাগ করা যায়! একদল দাঁড়ালো ইসমাইলকেই ইমাম করবার পক্ষে এই দলকে বলে ইসমাইলি। একশত বৎসরের মধ্যে এই দলের ভক্ত সংখ্যা ও প্রতিপত্তি খুবই বাড়ে। এরা মিশরে ছড়িয়ে পড়ে এবং এদের চেষ্টায় ফতেমীয় বংশের খলিফারা সেখানে প্রতিষ্ঠিত হন—ইসমাইল তো ফতিমারই বংশধর।

এই ইসমাইলি সম্প্রদায়ের উপশাখা কার্মেথীয়রা করমৎ নামে গুরুর চেলা। এরা ধর্মের জিগির তুলেই আরবদের সর্বনাশ করবার জন্য বিদ্রোহী হয়;—

পারস্য উপসাগরের তীরে এরা রাজ্য স্থাপন করে এবং ভক্ত সৈন্যদল নিয়ে খলিফাকে যুদ্ধে পরাভূত করে। দামাস্কাস্ বসরা কুফা প্রভৃতি সমৃদ্ধ জনপদ লুণ্ঠন ক'রে। তাদের ধর্মোন্মত্ততার নিবৃত্তি হয় না,—মক্কা আক্রমণ করে ত্রিশহাজার আরব সধর্মীদের হত্যা করতেও এদের বিবেকে বাঁধলো না! পবিত্র কাবার ঐশ্বর্য লুটপাট ক'রে কালো পাথরটা পর্যন্ত অপহরণ করলো। এসব অপবিত্র কাজ যারা করেছিলো, তারা নিজেদিগকে মুসলমান-ই বলতো।

ইসলামের ভাগ্যবলে কারমেথীয়দের 'এই দৌরাত্ম্য বেশিদিন চলে নি। ইসমাইলীদের আরব-বিদ্বেষ ও রসেদ্দীন খলিফাদের ইসলামী ধর্ম সম্বন্ধে বিরূপতা কিছুমাত্র কমলো না। এদের মধ্যে একদল গুপ্ত সাধক ছিল—আমাদের দেশের তান্ত্রিকদের মতো—দুর্গম পাহাড়ে তারা থাকতেন। এরা শত্রুপক্ষীয় লোকদের গোপনে বিষ (আসিস্) * প্রয়োগ করতো; অনেকটা আমেরিকার কু-ক্লুস্ ক্লান্ (Ku-Klus Klan)-এর মতো—যারা গোপনে নিগ্রোদের হত্যা করে শ্বেতাঙ্গদের সমান অধিকার দাবী করে এই তাদের অপরাধ। এই ইসমাইলীদের খোজা শাখার গুরুকে বলে আগা খান; এই সম্প্রদায় ভারতে, পূর্ব আফ্রিকায় ও মিশরে ছড়িয়ে আছে। বৃদ্ধ আগা খানের মৃত্যুর পর তাঁর বাইশ বৎসর বয়সের পৌত্র হয়েছেন নূতন আগা খান। কিন্তু খোজা সম্প্রদায়ের নরনারীর কী ভক্তি তাদের গুরুর প্রতি! হজরত মহম্মদের বিশুদ্ধ ধর্মের কী পরিণতি হয়েছে! পুতুল পূজার জায়গায় মানুষ পূজা!

কিন্তু ইসলামের শাস্ত্রীয় আচার-বিচার, নিয়ম-নিষেধ বিশুদ্ধভাবে না-জেনেও যারা ইসলামের ধর্মসাধনায় অমর স্থান লাভ করেছে তারা মুসলমান সমাজের ব্রাত্য, তারা 'সুফী'—আমাদের দেশে আউল-বাউল, সহজিয়া সাধকদের মতো। ঈশ্বরের ধ্যান, ঈশ্বরের গুণগান ধর্মজীবনের প্রধান অঙ্গ। সুফী সাহিত্য অতি বিস্তৃত; ভারতে বহু সুফী সম্প্রদায় এককালে ছিল; হিন্দুধর্মের উপর এদের প্রভাব কিছু কম পড়েনি। সুফী সাধু ও সাধ্বীদের জীবনকথা তজকারত আউলিয়া নামে পার্সি গ্রন্থ আছে; বাংলায় 'তাপসমালা' নামে সে গ্রন্থের তর্জমা হয়েছে।

পাঠকদের মনে আছে ৭১১ অব্দে উত্তর আফ্রিকার আরব প্রদেশপালের

* ইংরেজি assassin শব্দের অর্থ হত্যাকারী; এইটি এসেছে আরবী আসিস্ শব্দ থেকে।

মুক্তদাস বার্বার বংশীয় সেনাপতি তারিক মাত্র সাত হাজার বার্বার আরব সৈন্য নিয়ে স্পেন দখল করেছিলেন। তারপর পিরীনিজ পাহাড় পার হয়ে মুসলমান সৈন্য ফ্রান্সে প্রবেশ করে; সেখানে তুরের যুদ্ধে তারা পরাভূত হয়। যুদ্ধে পরাজয়ের পরেও অনেক বৎসর তারা ফ্রান্সের মধ্যে ঘোরাঘুরি করে, যখন দেখলো সেখানে কিছু সুবিধা হবে না, তখন তারা স্পেনে ফিরে আসে।

তারপর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কেটে গেছে,—ইসলামের ইতিহাসে অনেক রদ-বদলও হয়েছে। উম্মীয়দের উচ্ছেদ করে আব্বাসীরা খলিফার পদ পেয়েছেন—উম্মীয় বংশের সকলেরই প্রাণ গেছে—কোনো রকমে বেঁচেছেন খলিফা হিসামের প্রপৌত্র আবদর রহমান! রহমান প্রাণ নিয়ে পালান দেশ ছেড়ে—বহু দেশ ঘুরে পৌঁছলেন স্পেনে। সেখানকার মুসলমানরা উম্মীয়দেরই চিনতো—আব্বাসীরা তো নূতন খলিফা। তারা উম্মীয়বংশের খলিফার প্রপৌত্রকে পেয়ে ভক্তিভরে তাঁকে কর্দোভার আমীর পদ দিল, এখন থেকে স্পেনের ইতিহাস নূতন পথে চললো।

স্পেনের বাইরে য়ুরোপে মুসলীম আক্রমণের ভয় দূর হয়েছে; কারণ মূল আরব শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াতে স্পেনে এখন বাইরের সাহায্য আসা বন্ধ। এ'ছাড়া নিজেদের মধ্যে হানাহানি তো লেগেই আছে; স্পেনের বাইরে অন্যদেশের উপর হানা দেবার শক্তি তাদের আর নেই। কিন্তু রাজনৈতিক ইতিহাসের বাইরে স্পেনে যে বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র গড়ে উঠলো, সে ইতিহাস তুলনাহীন য়ুরোপের কোনো দেশে তখন কর্দোভার মতো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। য়ুরোপের প্রায় সকল দেশ থেকে বিদ্যার্থীরা এখানে ভিড় করে—আরবী ভাষা শিখে নানা জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণ করবার জন্য। এখানকার বিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি পড়াবার জন্য ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের আহ্বান করা হয়। স্পেনের মুসলমানদের এবিষয়ে তেমন গোঁড়ামি ছিল না।

কর্দোভা ও গ্রানাডানার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শোভা এখনো স্পেনদেশের ভ্রমণকারীদের বিস্ময় উৎপাদন করে। আলহামব্রার সৌন্দর্য বোগদাদকে ম্লান করে দিয়েছে। বোগদাদের খলিফারা এখন তুর্কী দাসদের ক্রীড়নক—স্পেনের আমীর আবদর রহমান (৩য়) সময় বুঝে নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করলেন (৯২৯)। সংক্ষেপে বলা যায় ৮ শতক থেকে ১৫ শতক

পর্যন্ত সাতশ' বৎসর মুসলমানরা স্পেনে রাজত্ব করেছিল-অর্থাৎ ভারতে তুর্কী-পাঠান শাসনের সমকালীন পর্ব। দুই দেশের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে এই যে, ভারতে মুসলমানদের রাজ্য গেলেও তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি টিঁকে গেল, স্পেনে ইসলামের সবকিছু একেবারে নিশ্চিহ্ন হলো। স্পেনে খ্রীষ্টান শক্তি জেগে উঠে সাতশ' বৎসরের ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি দেশ থেকে এমনভাবে দূর করে দেয় যে সেযুগের স্থাপত্য ছাড়া অতীত গৌরব কাহিনী বলবার জন্যে এখন আর কিছুই নেই। কিন্তু মুসলীম-স্পেন এককালে যে বিদ্যার গৌরব করতো, তা খ্রীষ্টান স্পেন কোনোদিন আয়ত্ত করতে পারেনি। বরং স্পেন পিছিয়ে গেল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, মুসলীমদের যে বিরাট মানমন্দির ছিল, যার থেকে আকাশের গ্রহতারার গতিবিধি লক্ষ্য করা হতো—সেই তোরণকে স্পেনীশরা ঘণ্টাঘর করলো।

আরবদেশে হজরত মহম্মদের 'ইসলাম' এখন দেশের সীমানা ছাড়িয়ে তিন মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এখন আর ইসলামের অস্তিত্ব অধিকার আরব মুসলমানদের একচেটিয়া নয়। আরব খলিফাদের প্রভুত্বের অবসান হয়েছে—স্পেন, আফ্রিকা, মিশর প্রভৃতি দেশ বোগদাদের আব্বাসী খলিফাদের ইন্তেজারে যে আর নেই; তারা আরবী ভাষা, আরবী পোষাক, আরবী নাম—সবই গ্রহণ করেছে—কিন্তু আরবীয় খলিফাকে আর মানছে না—সর্বত্রই জাতীয় ভাব নূতন রূপ নিচ্ছে।

বোগদাদের খলিফা-সাম্রাজ্যের পূর্ব অঞ্চলে মধ্যএশিয়ার অনির্দিষ্ট সীমাহীন প্রান্তরে যেসব লোক বাস করতো—তাদের সাধারণ নাম দেওয়া হয়েছে 'তুর্ক' —এখনো সোভিয়েত তুর্কমানিস্তান নামে রাজ্য আছে। তবে বর্তমানে 'তুর্ক' ও তুর্কী বললে এশিয়ামাইনরের টার্কি নামে দেশ বুঝায়, তবে য়ুরোপের একটুকরো স্থান এখনো তাদের আছে। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করছি তখনও এঅঞ্চলে তুর্কদের আবির্ভাব হয়নি—সেদেশ গ্রীক বৈজয়ন্তীয়ম সাম্রাজ্যভুক্ত প্রদেশ।

'তুর্ক' নামে নানা উপজাতি খলিফাদের সাম্রাজ্যমধ্যে কীভাবে ঢুকে পড়েছে সেকথা পূর্বেই আমরা বলেছি। মধ্যএশিয়ায় খাদ্যাভাব, জলাভাব তো নিত্য সমস্যা—তার উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা। দু'মুঠো অন্নের জন্য

দিনমজুরী থেকে পেশাদারী সৈন্য-গিরি সব কাজই করতে তারা আসছে খলিফাদের রাজ্যে। পূর্বদিকে ভারতে ঢুকতে তারা পারেনি—কারণ কুভা বা কাবুলে আছে হিন্দু সাহী রাজারা।

মধ্যএশিয়া থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে যেমন আর্যদের নানা শাখা নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, এখনও ঠিক তেমনি ভাবেই তুর্কীদের উপজাতিগুলি ছড়িয়ে পড়েছে। আর্যদের মতো তুর্কদের নানাশাখা কাস্পিয়ান হ্রদের উত্তর দিয়ে য়ুরোপে প্রবেশ করে। পূর্ব য়ুরোপে এরা আবর (Avars), মাজিয়ার (Mazyars-হাংগেরিয়ান), বুলগার নামে পরিচিত ; উত্তরে ফিনরা তুর্কদেরই দূর-কুটুম্ব। বর্তমানে আবর জাতির পৃথক অস্তিত্ব নেই। তবে যে-কয়টি জাতি এখনো আছে তাদের মধ্যে বুলগেরিয়া নিজেদের ভাষা ভুলে স্লাভনিক ভাষা পেয়েছে—হাংগেরিয়ান ও ফিন্‌দের ভাষায় তুর্কী ছোপ স্পষ্ট রয়ে গেছে। এইভাবে য়ুরোপে কয়েকটা তুর্ক উপজাতি আশ্রয় পায়।

মধ্যএশিয়ার অন্যান্য তুর্ক উপজাতিরা কালে আরবদের মুসলমান রাজ্যে এবং ভারতের হিন্দুরাজ্যে প্রবেশ করে। আরব খলিফা-সাম্রাজ্যের মধ্যে তারা দাস শ্রমিক ও সৈনিকভাবে এসেছিল, সেকথা আমরা পূর্বেই বলেছি।

ইতিহাসে দেখা যায় দু'শ বৎসরের বেশি কোনো সাম্রাজ্য সগৌরবে টেঁকেনি, আব্বাসী খলিফাদেরও সেই দশা। কিভাবে নানা উপজাতি ইসলাম গ্রহণ করে, ধর্মবিষয়ে বোগদাদের খলিফাকে নম-নম ক'রে মেনে নিয়ে, স্বাধীনভাবে স্বরাজ্য গড়ে তোলে, তার আভাষ আমরা দিয়েছি। কোন কোন দেশে বোগদাদের খলিফাকে 'খলিফা' বলেই মানে না, তারা নিজেদের আমীরের নামে খুত্‌বা পড়ে। খিলাফতে ভাঙন শুরু হয় এইসব নয়া মুসলমানদের দিয়ে।

পারসিকদের মধ্যে নূতন প্রাণশক্তি দেখা দিল দশম শতকে—মধ্য এশিয়ার পার-অকসাস অঞ্চলে সামানিদ নামে সর্দাররা বেশ বড় একটা রাজ্য পত্তন করে। যদি কেবল রাজ্য এরা গড়তো, তবে হয়তো তাদের নাম পৃথিবীর ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য হতো না। এই রাজাদের পৃষ্ঠ-পোষকতায় পারসিকভাষা নূতন রূপ পায়। প্রাচীন পারসিক ভাষা গত দু'তিন শ' বছর আরবীর প্রভাবে বেশ প্রাণবন্ত ভাষা হয়ে উঠেছে। সেই পারসি ভাষায় কবিরা নিজেদের ভাবকে ব্যক্ত করলেন।

সামানিদ রাজাদের সময়ে পারসিকভাষা সাহিত্যের গৌরব পেলো ;

আরবীও চর্চাও যে সেদেশে কিছু কম হতো তা নয়। বিখ্যাত দার্শনিক বিজ্ঞানী আবিসেনা বা ইবন সিনা এদেশেরই লোক ছিলেন। যাই হোক—এদের সম্বন্ধে বেশি-কথা বলবার স্থান পৃথিবীর ইতিহাস খুবই সীমিত। একদিন আব্বাসী খলিফাদের ন্যায় সামানিদ আমীরদেরও তুর্কীদের চাকরী দিয়ে ফৌজে ভরতি করতে হয়। সামানিদদের এক তুর্কী দাস—আলপতাগীন নিজ বুদ্ধিবলে প্রথমে সেনাপতি ও পরে গজনী নামে একটি অখ্যাত স্থানের অধিপতি হন।

কাবুলে তখন হিন্দু সাহীরাজাদের বাস। এতকাল মধ্যএশিয়ার জনস্রোতকে তাঁরাই আটকে রেখেছে। কিন্তু আলপতগীনের সময় থেকে তাদের হঠতে হলো। হিন্দুদের সেই হঠার পালা অবসান কি হলো ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্থানের জন্ম হবার পর? আলপতগীনের ক্রীতদাস সবুক্তগীন আপনার বুদ্ধিবলে সেনাপতি ও পরে জামাতা ও শেষকালে গজনীর আমীর হন (৯৭৭—৯৯৭)। এই সবুক্তগীনই ভারতের পশ্চিম দরজায় প্রথম আঘাত দেন। হিন্দুরাজার কাছ থেকে ইনিই কাবুল অঞ্চল জয় করে নেন। তারপর তাঁর পুত্র বিখ্যাত সুলতান মামুদ ত্রিশ বৎসর ধরে প্রায় প্রতি বৎসর ভারতের উত্তরপশ্চিম দেশগুলি আক্রমণ করে ছারখারে দেন; কিন্তু এদেশে এসে রাজ্য স্থাপন করেননি। রাজ্য স্থাপন করতে তুর্কীদের আরো দু'শ বছর অপেক্ষা করতে হয়; সুলতান মামুদের কাছে বারবার ঘা খেয়েও হিন্দুদের চৈতন্য হয়নি। আঘাত পেয়ে, বারে বারে অপমানিত হয়েও কী করে দেশ বা ধর্মরক্ষা করা যায়—তা নিয়ে হিন্দুদের মধ্যে কোনো ভাবনা দেখা গেল না: বিপদ এসে পড়লে, চাণক্যের মন্ত্র তাঁরা জপেন—স্ত্রী পুত্র চুলোয় যাক্—আপন প্রাণ বাঁচা! কিন্তু আপন প্রাণ বাঁচাতে পারেনি, স্বাধীনতা, ও ধর্ম রক্ষাও করতে পারেনি।

তুর্কীরা ছিল এককালে যাযাবর অর্ধসভ্য মানুষ। ইসলাম গ্রহণ করার পর তারা পারসিক ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি আয়ত্ত ক'রে এমন পাকা মুসলমান হয়ে ওঠে যে তাদের ধর্মনিষ্ঠা—যার অপর নাম ধর্মান্ধতা, দেখে আরবদেরও বোধহয় লজ্জা হতো। আরবদের শাসনাধীন দেশে অন্যধর্মের লোকে আপনাদের বিশ্বাসমতো জীবন যাপন করতে পারতো। কিন্তু নয়া-মুসলমান তুর্কদের রাজ্যে অমুসলমান বা কাফেরের কোনো মান-মর্যাদা থাকলো না। পশ্চিমএশিয়ায় তুর্কদের সঙ্গে খ্রীষ্টানদের ধর্মস্থান জেরুসালেম নিয়ে

যে অশান্তির সৃষ্টি হয়—সে কথা আমরা অন্য পরিচ্ছেদে আলোচনা করবো। ভারতে প্রবেশ করেই তারা ইসলাম প্রচারে মন দিল; কারণ তারা জানে নিজেদের মতে যতো লোক আনতে পারবে—রাজনীতির দিক থেকে তারা ততই শক্তিশালী হবে। এক ধর্মপাশে বা এক ধর্মমতে মানুষের মন বাঁধতে পারলে রাষ্ট্র 'এক' হবে! কিন্তু তা হয় না—ইতিহাস সেই সায় দিয়ে আসছে।

মামুদ গজনীর রাজা হয়ে সামানিদদের সঙ্গে তাঁর পূর্ব পুরুষের যে সম্বন্ধ সূত্র ছিল সেটা দিলেন ছিন্ন করে, আর নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করলেন; সামানিদদের রাজ্যও তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হতে দেরী হলো না।

বোগদাদের খলিফা সীমান্তের এই দুর্দান্ত তুর্ক সর্দারকে 'সুলতান' উপাধি নিতে দেখে ভয়ে ভয়ে সেটা মেনে নিলেন ও নূতন খেতাব দিয়ে তার তোয়াজ করলেন। এর পর শুরু হলো ভারতের উপর তার ধারাবাহিক হামলা। সতেরো বার মামুদ হানা দেন, সে-ইতিহাস সকলের কাছে সুপরিচিত। হিন্দুরাজারা বিচ্ছিন্ন, তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে মামুদকে রুখতে পারলে না। পঞ্জাব, উত্তরভারতের খানিকটা অংশ এমনকি সুদূর গুজরাটের সমুদ্রতীরের সোমনাথের মন্দির পর্যন্ত তিনি লুঠ করলেন। প্রতি বৎসর হাজার হাজার দাসদাসী ও লক্ষ লক্ষ টাকার ধনরত্ন তিনি গজনীতে নিয়ে যান। চারিদিকে লুণ্ঠিত সামগ্রী দিয়ে গজনী হয়ে উঠলো বোগদাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মহানগরী অমরাবতী সদৃশ।

গজনী মহানগরীতে কত বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক আশ্রয় পায় —ঐতিহাসিক অল্‌বিরুণী ভারতে এসে দীর্ঘকাল বাস করেন। হিন্দুদের ধর্মকর্ম বোঝবার জন্যে সংস্কৃত ভাষা শেখেন। তাদের শাস্ত্র পড়ে সে-সম্বন্ধে এক বিরাট গ্রন্থ লেখেন। ঠিক এই ভাব থেকেই ১৮ শতক হতে য়ুরোপীয় খ্রীষ্টানরা ভারতের ভাষা, ধর্ম সম্বন্ধে গবেষণা শুরু করেন। অলবিরুণীর বই থেকে ১১ শতকের উত্তর ভারতের সামাজিক ও ধর্মীয় বহু তথ্য জানা যায়।

সুলতান মামুদের সময় ফিরদৌসী পারসি ভাষায় 'শাহনামা' নামে এক বিরাট মহাকাব্য লেখেন। এ কাব্য প্রাক্-মুসলমান যুগের পারসিক বীরদের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। পারসি কবিদের মধ্যে মুসলমানী-অমুসলমানী বিষয় বস্তু নিয়ে বাছবিচার তখনও দেখা দেয়নি। ফিরদৌসী

মহাকাব্য লিখলেন বটে, কিন্তু মামুদ কবিকে তাঁর প্রতিশ্রুত অর্থ দেন নি বলে সুলতানের অপবাদ আছে।

সুলতান মামুদের সময়ে পশ্চিমী তুর্কদের নানা শাখা কিভাবে ছোট ছোট রাজ্য উপরাজ্য গড়ছে সেকথা বলা দরকার। কারণ অচিরে তাদের কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক বিরাট সংগ্রাম সুরু হবে যাকে ইতিহাসে বলে ক্রুজেড। পশ্চিমঅঞ্চলের তুর্কদের বলতো সেলজুক—সুলতান মামুদ তাদের রীতিমতো ভয় করতেন।

সেলজুক তুর্করা খলিফার রাজ্য মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে; তুগরল বেগ (১০৩৮—৬৩) একটা দলের সর্দার—বোগদাদের খলিফার প্রতি খুবই ভক্তি তার। তাই তুগরলের দল যখন বোগদাদে পৌছয়, খলিফা তখন ভয়ে ভয়ে তাকে 'সুলতান' উপাধি দিয়ে সম্মান দেখান এবং শান্ত করেন।

সেলজুক সুলতানের মধ্যে আল্প আরসলন (১০৬৩-৭২) ও মালিক শাহ (১০৭২-৯২) ইসলাম ইতিহাসে খুবই প্রসিদ্ধ কারণ এঁদের সময় তুর্করা বৈজয়ন্তীয়ম গ্রীকদের কাছ থেকে আনাতোলিয়া বা এশিয়া মাইনর দখল করে নেয়, যা আরবরা ইতিপূর্বে পারেনি। বৈজয়ন্তীয়মের সম্রাট বহু লক্ষ সৈন্য নিয়ে আনাতোলিয়া এলেন। আল্প আরসলন স্বয়ং তুর্কী-সৈন্য নিয়ে গ্রীক সম্রাটকে মালাসগাদের Malazkirt (Manzikert, আর্মানিয়া দেশের গ্রাম, ভানহ্রদের নিকট) যুদ্ধে হারিয়ে দিলেন ও বন্দী করলেন (১২১৩); বহুলক্ষ টাকা দিয়ে বন্দিত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে গ্রীক সম্রাট কনস্টান্টিনোপলে ফিরে যেতে পান। এর পর থেকে 'রুমের বাদশাহ' কথার প্রচলন হলো মুসলীম জগতে। সে-যুগে রোমের বাদশাহ বলে নিজেকে ঘোষণা করার মধ্যে খুবই গৌরব ছিল।

আনাতোলিয়ার কিছুটা অংশ তুর্ক মুসলমানদের অধীন হলো। এখানে প্রায় দেড়হাজার বৎসর গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিরাজিত ছিল—সে-পর্বের অবসান হলেও গ্রীকদের সে দেশ ছেড়ে যেতে হয়নি; গ্রীকরা দেশ ছাড়া হলো বিংশ শতকে প্রথম মহাযুদ্ধের পর—কামালপাশা যখন নয়া তুর্কী গড়লেন। সেই সময়ে য়ুরোপের বলকান উপদ্বীপ থেকে তুর্ক বাসিন্দারা এবং আনাতোলিয়ার গ্রীকরা দেশ বদল করে নেয়।

তুর্কীদের হাতে আনাতোলিয়া আসাতে গ্রীকরা খুশীই হলো। পতনোন্মুখ বৈজয়ন্তীয়ম সাম্রাজ্যের অধীশ্বরদের অত্যাচারে অবিচারে লোকে অতিষ্ঠ ছিল। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে বুঝতে পারলো যে তারা তপ্ত কড়া থেকে জ্বলন্ত উনানে পড়েছে। ধর্ম নিয়ে গ্রীক সম্রাটরা বাড়াবাড়ি করতেন—সেটা সাধারণ লোকের সহ্য করা কঠিন ছিল; কিন্তু মুসলমান তুর্কদের ধর্ম নিয়ে অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠলো।

মালিক শাহকে সেযুগের পশ্চিমএশিয়ার শ্রেষ্ঠ নরপতি বলা যেতে পারে। খলিফার রাজ্যের তিনিই মালিক—যদিও নামমাত্র খলিফা বোগদাদে আছেন। সৌভাগ্যক্রমে নিজাম-উল-মুলক নামে এক অসাধারণ পুরুষকে তিনি পেয়েছিলেন উজীররূপে—চাণক্যের মতো তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাঁর। 'সিয়াসতনামা' বা শাসনপ্রকরণ নামে গ্রন্থ তাঁর লেখা। বোগদাদ ও বসরায় নিজামিয়া বিদ্যায়তন তিনি স্থাপন করেন। মুসলমানী পঞ্জিকা সংস্কার ও সংশোধন করার জন্য সেকালের শ্রেষ্ঠ গাণিতিক ওমর খায়েমকে নিযুক্ত করেন। বিজ্ঞানীদের কাছে খায়েমের খ্যাতি গাণিতিক বলে—আর সাহিত্যিকদের কাছে তাঁর পরিচয় তাঁর চৌপদীর জন্য। গাণিতিক খায়েম বেঁচে আছেন মুষ্টিমেয় পণ্ডিতদের পুঁথির মধ্যে, কিন্তু কবি ওমর অমরস্থান অধিকার করে আছেন সকল দেশের ভাবুক চিত্তে। বাংলা ভাষায় খায়েমের চৌপদীর অনেক তর্জমা আছে।

মালিক শাহর রাজত্বকালে ইসমাইলি ধর্ম সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়। এই সম্প্রদায়ের গুরু হাসান সব্বাহ ছিলেন নিজাম-উল-মুলকের সহপাঠী। সেই সহপাঠী বন্ধুর চেলাদের চক্রান্তেই নিজাম-উল-মুলকের প্রাণ যায় (১০৯২)। উজীরের মৃত্যুতে সেলজুকদের মহিমাও অস্তমিত হলো। সর্বত্র তুর্কী ছোট বড়ো সর্দাররা রাজা হয়ে বসলেন।

আনাতোলিয়ায় সুলেমান নামে প্রদেশপালকে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখে দলে দলে তুর্করা সেখানে গিয়ে উপনিবেশ গড়তে শুরু করে দিল। দোয়াবে নিত্য কলহ আরব, পারসিক, তুর্কদের মধ্যে—তার থেকে পার্বত্য আনাতোলিয়া অনেক ভালো ও নিরাপদ। তুর্কদের স্থায়ী রাজ্য সৃষ্ট হলো এই আনাতোলিয়ায়। গ্রীক ভাষার স্থলে ধীরে ধীরে তুর্কী ভাষা সেখানে চালু হলো—আর কোথাও তুর্কীদের নয়া রাজ্যে তুর্কী ভাষা চালু হয়নি—ভারতে তুর্কীরা পারসিভাষা নিয়ে প্রবেশ করে। কিন্তু সেখানে সে ভাষা

টেঁকতে পারে নি—হিন্দুদের ভাষার বুনিয়াদ তাদের গ্রহণ করতে হয়—সেই ভাষার নাম উর্দু—পারসি, আরবী, তুর্কী ও হিন্দী শব্দ দিয়ে গড়া সে ভাষা।

পশ্চিম এশিয়াতেও গ্রীক ভাষার বদলে আরবী ভাষা চালু হয়েছিল—আরবদের কাছ থেকে সে-অঞ্চল ছিনিয়ে নেবার পরেও তুর্কীরা আরবী ভাষাকে হঠাতে পারলে না। আনাতোলিয়া (টার্কি), পারস্য ও ভারত ছাড়া সর্ব্বত্র আরবী ভাষার জয় হয়েছিল। তবে কোরানের ভাষা আরবী বলে সর্ব্বত্রই ঐ-ভাষা সমাদৃত হয়ে আসছে।

সেলজুকদের বৎসর পঞ্চাশ-এর গৌরবময় ইতিহাসের অবসান হয়ে আসছে; খলিফার ধর্মসাম্রাজ্যের পশ্চিমদিকে নূতন উপদ্রব দেখা দিচ্ছে—খ্রীষ্টান য়ূরোপ থেকে। এই উপদ্রব ইতিহাসে ক্রুজেড্ নামে খ্যাত, সে ইতিহাস আমরা পরে বলবো। এখন পূর্বদিকে যে বিপ্লব সুরু হচ্ছে তার কথাই বলা যাক—কারণ তার সঙ্গে ভারতের ইতিহাস জড়িয়ে আছে।

গজনীর সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর সেলজুকরা সে-অঞ্চলে প্রভুত্ব করবার চেষ্টা করে; কিন্তু বেশিদিন তা কায়েম হতে পারেনি। কারণ ঘোর নামে দুর্গম পার্বত্য দেশে একদল দুর্ধর্ষ তুর্ক এসে বাস করছে; সেলজুকদের জবরদস্তি থেকে মুক্ত হয়ে তারা সেই পার্বত্য দেশে স্বাধীন রাজ্য গড়েছে।

উপজাতিদের মধ্যে কলহ ও যুদ্ধ নিত্যদিনের ঘটনা। কোনো একটা বিবাদকে কেন্দ্র করে গজনীর এক সুলতান ঘোরদের এক সর্দারকে হত্যা করেছিলেন। তারপর একদিন প্রতিশোধ নেবার শক্তি সঞ্চিত হলে ঘোরীরা গজনী আক্রমণ করলো। মহানগরী নিষ্ঠুরভাবে চুরমার করে দিলো। এই গজনী এককালে বোগদাদের সঙ্গে টেক্কা দিত, আজ সেখানে একমাত্র মামুদের কবর ছাড়া কোনো ইমারত আর থাকলো না। এই তুর্করা এমনই বর্বর যে প্রতিহিংসা নেবার জন্য প্রত্যেক সুলতানের কবর খুঁড়ে 'কফন্' তুলে সেগুলো পুড়িয়ে ফেলে। এতো বড়ো অন-ইসলামী কাজ করতে মুসলমান হয়েও তাদের বিবেকে বা বুদ্ধিতে বাধলো না। একেই বলে রাজনীতি!

যিনি এই কাণ্ডটা করলেন, সেই পাষণ্ডের দুই ভাগ্নে গিয়াসউদ্দীন ও মহম্মদ ঘোরী ভারত ইতিহাসে সুপরিচিত। সুলতান মামুদ ভারত লুণ্ঠন করেন, রাজ্য স্থাপন করতে পারেন নি। তার দুইশ' বৎসর পরে ঘোরীরা একধাপ এগিয়ে এলো—তারা ভারত জয় করলো। পঞ্জাবের অনেকখানি মামুদের বংশধরদের রাজ্যান্তর্গত ছিল—সেখানকার হিন্দুদের শিরদাঁড়া তারা ভেঙে দিয়েছিল। বাইরে থেকে আক্রমণ রুখবার শক্তি তাদের ছিলনা।

ঘোরীরা পঞ্চনদ পেরিয়ে এসে গঙ্গা-যমুনার দোয়াব আক্রমণ করলো। দিল্লীর সম্রাট পৃথ্বীরাজ ঘোরীদের সঙ্গে লড়াই করলেন বটে, কিন্তু পারলেন না—কারণ হিন্দু রাজারা তাঁকে তেমনভাবে সাহায্য করতে এলেন না। বরং কান্যকুব্জের রাজা জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজকে যুদ্ধে নিহত হতে দেখে খুসিই; কারণ তাঁর সঙ্গে ছিল পৃথ্বীরাজের বিবাদ। রাজধানীতে উৎসব হলো রাজার হুকুমে। কেবল মন্ত্রী তা'তে যোগ দিলেন না। তিনি জয়চন্দ্রকে বললেন সিংহদ্বারের অর্গল গেল ভেঙে—এবার দরজা খুলে পড়বে। স্বদেশ বলে কোনো বড়ো ভাবনা হিন্দু রাজাদের ছিল না, তাঁরা নিজের নিজের ছোট রাজ্য ছাড়া আর কিছুই বুঝতেন না। দিল্লীর রাজারা যমুনার তীরে বাইরের শত্রুদের আটকাতে পারতেন বলে তাঁরা চিরকাল সম্রাটের সম্মান পেয়ে এসেছেন। সে-পথ খুলে গেলে সমস্ত উত্তরভারত বা গঙ্গাযমুনার উপত্যকা অরক্ষিত হয়ে পড়ে। হিন্দুদের দেশের মাঝখানে প্রবেশ করে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র কাশী তুর্করা তছনছ করলো—বাধা পেলো না; অথচ তখন দেশে একজনও মুসলমান ছিল না। পাঁচ বৎসরের মধ্যে সমগ্র উত্তর ভারত এমনকি বাংলাদেশ পর্যন্ত ঘোরী তুর্কীদের পদানত হলো (১১৯২-৯৭)। গল্পে আছে বাংলার রাজা লক্ষ্মণসেন তুর্ক ঘোড়-সোয়ারদের দেখে খিড়কি দিয়ে পালিয়ে যান পূর্ব্ববঙ্গে।

চাণক্যনীতি অনুসরণ করলেন সবাই—আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি—অর্থাৎ স্ত্রী, ধনরত্নাদি ত্যাগ করেও নিজেকে বাঁচাও। এই নীতি দেশের রাজনীতি বা সমাজনীতি।

একটা মহাদেশতুল্য দেশের নৈতিক চরিত্রের কতটা অবনতি হলে, এমনভাবে মুষ্টিমেয় বিদেশীর হাতে লোকে নিজের দেশ তুলে দিতে পারে, তা' ভাবলে অবাক হতে হয়।

ইস্‌লামিক সভ্যতা

পশ্চিম এশিয়ায় ইহুদী, খ্রীষ্টান ও ইসলাম এই তিনটি ধর্মের জন্মস্থান। এদের মধ্যে ইহুদীরা আপনাদের দেশ থেকে বহুকাল ছত্রভঙ্গ হয়ে নানা স্থানে বাস করছিল—তাদের সংহতি এশিয়ার মধ্যে প্রায় লুপ্ত। খ্রীষ্টের ধর্ম ছড়িয়ে পড়ে গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্য মধ্যে—সেখানে খ্রীষ্টানরা গ্রীক ও লাতিন ভাষাভাষী দুই জগতে বিভক্ত। যীশুখ্রীষ্ট ইহুদীকুলে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর বাণী প্রচারিত হয়েছিল গ্রীক ভাষার মাধ্যমে এবং পরে আশ্রয় পেয়েছিলো রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী রোমে, সেখানকার রাজভাষা লাতিন হলো খ্রীষ্টীয় জগতের ধর্মের ভাষা! মূল বাইবেল গ্রীক ভাষায় লেখা হলেও, তার বদলে খ্রীষ্টান জগতে লাতিন হয় চার্চের ভাষা। কিন্তু তারপরে লাতিনের স্থলে দেশীয় ভাষায় বাইবেলের তর্জমা পড়া প্রটেষ্টাণ্ট দেশগুলিতে চালু হয়। দেশীয় ভাষায় খৃষ্টানী গান ও স্তব গাওয়া হয়। ইসলামের ইতিহাস এই দুই ধর্ম থেকে একটু পৃথক। এদের ধর্মের ভাষা আরবী, সকলের পক্ষে এই ভাষায় কোরান পড়া এবং সঠিক উচ্চারণ করা একান্ত আবশ্যিক। এ সম্বন্ধে নিয়মও খুব কড়াকড়ি। মুসলমানদের মসজিদে আরবী কোরান ছাড়া অন্য ভাষায় তর্জমা পড়া হয় না। এর ফলে মুসলমান ধর্মসাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত আরবী ভাষার চর্চা প্রায় আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়। এর জন্যে আরবী লিপিও চালু হয় সর্বত্র—ভারতের উর্দু, সিন্ধী, কাশ্মিরী লিপি আরবী লিপির একটু নড়চড় মাত্র। ইতিপূর্বে পারস্যের পুরাণো লিপি লুপ্ত হয়েছিল, মিশরের লিপিও লোকে ভুলে গিয়েছিল—সর্বত্রই চালু হয় আরবী লিপি ও আরবী ভাষা। এর জন্য আরবী ভাষার ব্যাকরণ, অভিধান যে কত লেখা হয়েছে তা বলা যায় না।

আরবী ভাষা খুব নিয়ম-বেঁধে তৈয়ারী, হজরত মহম্মদের আগেও সে-ভাষায় অনেক কবি তাদের মনের কথা গেয়ে গিয়েছিলেন। তার কিছু-কিছু সংগৃহীত হয়েছে। হজরত মহম্মদ যেসব বাণী বা উপদেশ শিষ্যদের শোনাতেন, তা ভক্তেরা হাড়ের উপর, চামড়ার উপর, তালের বেগলোর উপর টুকে টুকে রাখতেন—কাগজ তখনো আবিষ্কৃত হয়নি। হজরত মহম্মদ জ্ঞানপিপাসু ছিলেন, তাই শিষ্যদের জ্ঞান আহরণ

করবার জন্যে তাগিদ করতেন। বলতেন জ্ঞানের জন্য চীন সীমান্ত যেতে হলেও যাবে।

আরবরা যখন দিগ্‌বিজয়ে বের হলো তখন তাদের জ্ঞান বিদ্যা খুবই সীমিত—তাদের একদল যাযাবর, একদল বণিক আর একদল চাষী। দিগ্‌বিজয়ে বের হয়ে নূতন নূতন সভ্য দেশের মানুষের সান্নিধ্যে আসায়, তাদের মন ও চোখ যায় খুলে।

ধর্মপ্রচার ও রাজ্যজয় করতে করতে আরবরা ইরানী, হিন্দু ও গ্রীকদের সাক্ষাৎ পেলো। ইহুদীদের সঙ্গে তাদের পরিচয়টা বহুকালের সেকথা আমরা পূর্বেই বলেছি; গ্রীকদের সঙ্গে আরবদের খাড়া সম্বন্ধ হয় অনেক পরে; কারণ হেলেনিক গ্রীকরা বাস করতো এশিয়ামাইনর বা আনাতোলিয়ায়; সে-দেশ আরবরা জয় করতে পারেনি। কিন্তু সিরীয়ায় যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল, তা গ্রীকদেরই দান; তবে সিরিয়াক্ ভাষা চালু ছিল বলে সে দেশে ঐ ভাষাতেই বই কিতাব লেখা হতো বেশী। কনস্টান্টিনোপল ছিল গোঁড়া খ্রীষ্টানদের কেন্দ্র; সেখানে নেসতোরীয় নামে একটা সম্প্রদায়কে তারা পাষণ্ড বলে ঘোষণা করে। সেই নেসতোরীয় খ্রীষ্টানরা আশ্রয় পায় সিরীয়ায় ও পারস্যে সাসানীয় শাহানশাহের দরবারে; এমনকি চীনেও পরে একদল চলে যায়। আরবদের আদিযুগের জ্ঞান-অন্বেষণে নেসটোরিয়ান ও সিরীয়ানরা ছিল প্রধান সহায়।

আরব খলিফারা নেস্‌টোরিয়ান পণ্ডিতদের সাহায্যে অনেক গ্রীক বই-এর তর্জমা করিয়েছিলেন। খৃষ্টানদের সাহায্য নেওয়া হতো বলে গোঁড়া মুসলমানরা খুঁৎ খুঁৎ করতেন, তবে খলিফারা তাতে কান দিতেন না। আধা-বর্বর তুর্কীদের আক্রমণ পর্যন্ত নেসতোরীয় পণ্ডিতরা ইরান ও ইরাকে বাস করেছিলেন।

ইরান জয়ের পর আরবদের জীবনে যে পরিবর্তন হয়ে যায়, তার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে—ধর্মে শিয়া সম্প্রদায় সেখানে প্রবল। ইরানের চতুর শিক্ষিত লোকে আরবের ধর্ম নিল, কিন্তু নিজেদের ভাষা মুছে ফেলেনি। আরবীভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বা জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করলে না—তবে আরবীর সংস্পর্শে পারসি ভাষা নতুন প্রাণ পেলো; বহু কবি ঐতিহাসিক, দার্শনিক পারসি ভাষায় নতুন কথা বললেন। ফিরদৌসী সেই নয়া পারসি ভাষায় তাঁর মহাকাব্য 'শাহনামা' লিখেছিলেন।

পারস্যের সাসনীয় সম্রাটরা রাজ্য চালনা বিষয়ে শেষদিকে একেবারে অকর্মণ্য হয়ে পড়েছিলেন। নইলে এতো সহজে আরবদের কাছে তাদের হার মানতে হতোনা। কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ে তারা আরবদের থেকে অনেক অগ্রসর ছিলো। শাহানশাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় জুনদে-শাহপুর নামে একটা স্থানে নেসটোরিয়ান খৃষ্টানদের দ্বারা পরিচালিত একটা খুব বড় বিদ্যায়তন গড়ে উঠেছিল। সেখানে গ্রীক বিজ্ঞান ও বিশেষ করে চিকিৎসা শাস্ত্রের গভীর আলোচনা হতো।

দামাস্কাসে খলিফাদের রাজধানী স্থাপিত হলে জুনদে-শাহপুর থেকে অনেক চিকিৎসক সেখানে এসে বাস করতে থাকেন। উম্মীয় খলিফাদের মধ্যে অনেকেই ধর্মচিন্তা ও জ্ঞানালোচনা প্রভৃতি থেকে অনেক দূরে বাস করতেন, তাদের দিন কাটতো রাজ্য জয়ে ও শেষকালে বিলাস ব্যসনে। বোগদাদে রাজধানী উঠে আসলে আব্বাসী খলিফাগণ সভ্য পারসিক অভিজাত সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসেন এবং এর পরই যথার্থভাবে আরবদের মন খুলে গেল জ্ঞানের আলোকে।

খলিফা অল মনসুর, হারুন অল রসিদ, অল মামুন-এর সময়ে আরবদের বাহির থেকে জ্ঞান-আহরণ পর্ব। এই পর্বে পারসি, সিরিয়াক, গ্রীক, হীব্রু, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা থেকে নানা বিষয়ের বহু শত গ্রন্থ তর্জমা হয়েছিল আরবী ভাষায়। বোগদাদের দরবার নানা দেশের পণ্ডিতদের মিলনকেন্দ্র হয়ে উঠলো; এককালে আথেন্স ছিল বিদ্যার কেন্দ্র—তারপর সেখান থেকে জ্ঞানের ভারকেন্দ্র সরে গিয়েছিল আলেকজান্দ্রিয়া ও তারপর রোম হয়েছিল জ্ঞানের কেন্দ্র। কিন্তু ইসলামের পশ্চিমে স্পেনের কর্দোভা ও পূর্বে ইরাকের বোগদাদ হলো সুধীসমাজের জমায়েৎ হবার স্থান। জ্ঞানাহরণের জন্য খলিফাদের কী উৎসাহ। তাঁরা পুরাতন গ্রীক পুঁথি খুঁজবার জন্য লোক পাঠান আথেন্সে, আলেকজান্দ্রিয়ায়, কনস্টান্টিনোপলে। সাম্রাজ্য-বিলাসী জাতির পক্ষে সবথেকে বড়ো প্রয়োজন চিকিৎসকের—আহতের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা ও ধনীদের সুখ সম্ভোগের জন্য নানা রকম দাওয়াই-এর-ব্যবস্থা। 'বিমারীস্থান' নামে হাসপাতাল খোলা হলে নানা ভেষজ ও খনিজ নিয়ে পরীক্ষা চললো নূতন নূতন ঔষধ আবিষ্কারের জন্য।

এইসব প্রয়োজনীয় পুঁথির সঙ্গে এলো আরিস্তোতলের নানা শ্রেণীর গ্রন্থ। এই সব গ্রীক পুঁথি বিদেশী পণ্ডিতদের সাহায্য তর্জমা করানো হলো।

সংস্কৃত গ্রন্থ 'সূর্যসিদ্ধান্ত' কঙ্ক (?) নামে কোনো ভারতীয়ের সহায়তায় অনূদিত হয়েছিল বলে শোনা যায়।

হিন্দুদের নিকট থেকে জ্যোতিষ, বীজগণিত ও সংখ্যাতত্ত্ব আরবরা শিক্ষা নিল। য়ুরোপে রোমানরা গাণিতিক সংখ্যা লিখত আঙুল দেখিয়ে I, II, III, IIII, V ইত্যাদিভাবে। শূন্যর মূল্য তারা জানতো না। আরবরা ভারতে ব্যবসায় করতে এসে ১, ২, ৩,...০ প্রভৃতি লিখতে শেখে এবং একের পর শূন্য দিলে দশ হয়, দু'টি শূন্য দিলে একশ' হয় এসব জানতে পারে। আবার শূন্যটা বামদিকে বসালে দশ ভাগের একভাগ হয়ে যায়—এ তত্ত্বও তারা হিন্দুদের কাছ থেকে শিখেছিল। য়ুরোপীয়রা আরবদের কাছ থেকে গণিতের এইসংখ্যাতত্ত্ব পেয়েছিল বলে সংখ্যাকে তারা বলে Arabic numerals—আসলে এটা হিন্দুদের দান। আফ্রিকা থেকে সিসিলি দ্বীপ হয়ে এই গণিত-সংকেত ইতালিতে পৌঁছল—তারপর সারা য়ুরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এখন থেকে গণিতের ধারা পালটে গেল সেখানে—অঙ্কশাস্ত্রের নূতন জন্ম হলো।

বাইরে থেকে জ্ঞান-আহরণ করতে করতে আরবদের মনও গেল খুলে; তখন দর্শন, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি নানাবিষয়ের প্রশ্ন, সন্দেহ ও সমস্যা দেখা দিল তাদের মধ্যে। আরিস্তোতলের বই তর্জমা করে তারা ক্ষান্ত হয়নি, তার ভাষ্য করতেও তারা মন দিয়েছিল। খৃষ্টান-য়ুরোপ গ্রীকদের সাহিত্য, দর্শনকে পৌত্তলিকদের কথা ব'লে প্রায় ভুলতে বসেছে—আরবরাই তাদের গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই য়ুরোপীয় বিদ্যার্থীরা অনেক সময়ে গ্রীক গ্রন্থের আরবী তর্জমা থেকে লাতিনে-ভাষান্তরিত-করা-বই পড়ে জানতে পারে পুরাতন দর্শন বিজ্ঞানের কথা। কর্দোভার বিশাল বিদ্যায়তনে য়ুরোপের নানাস্থান থেকে যুবকরা আসে—আরবী শিখে জ্ঞান আহরণ করতে হয় তাদের। আমরা বেদ উপনিষদের ইংরেজি অনুবাদের বাংলা তর্জমা পড়ে পণ্ডিতি করি—শাস্ত্রের সমঝদারিত্ব দেখাই—য়ুরোপীয়দের তখন সেই দশা। 'সাত নকলে আসল খাস্তা' একথাটা বুঝতে আমাদের সময় লেগেছিল—য়ুরোপীয়দেরও তাই হয়েছিল। রেনেসাঁসের যুগে তাদের চোখ খোলে।

মুসলমানদের ছেলেমেয়ে ধনীদরিদ্র সকলের পক্ষে পড়াশুনা করাটা ধর্মের অঙ্গ। হিন্দুরা ধর্মকথা শুনতো, তাদের ধর্মগ্রন্থকে বলে 'শ্রুতি'; গুরু কানে মন্ত্র দেন, লিখতে-পড়তে না জানলেও ক্ষতি নেই—মন্ত্র জপলে পুণ্য

হয়। কিন্তু মুসলমানদের ধর্মকথা তাদের ধর্মগ্রন্থে লেখা সেটা পড়তে হয়। তাই প্রত্যেক মসজিদের সঙ্গে মকতব থাকে। হিন্দুদের মন্দিরের সঙ্গে বিদ্যাদানের ব্যবস্থা নেই; সেটা আছে বৌদ্ধমন্দিরের সঙ্গে। মুসলমানরা যেখানে তাদের ধর্মসাম্রাজ্য স্থাপন করে, সেখানেই বিদ্যার কেন্দ্র গড়ে তোলে; ইরাক, ইরান, সিরীয়া, মিশর, মরাক্কেশ, স্পেন—প্রত্যেক স্থানেই বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

জ্ঞান বিদ্যা লেখাপড়া চর্চার ফলে অনেকগুলি শিল্প জেগে ওঠে। শহরে শহরে আরবী গ্রন্থ নকল করবার জন্য বহু লোক কাজ পায়। অষ্টম শতকে আরবরা চীনের কাছ থেকে কাগজ তৈরী করার বিদ্যা শিখে নেয়; কাগজ শব্দটি মূলত চৈনিক। প্রায় প্রত্যেক শহরে কাগজ তৈরীর কারখানা গড়ে ওঠে। কাগজে লেখা রেওয়াজ হবার আগে তারা 'পুস্ত' বা চামড়ার ওপর লিখত—পুস্তক শব্দ এসেছে 'পুস্ত' বা চামড়া থেকে। হিন্দুরা 'পুস্ত' পেয়েছিলো মধ্যএশিয়ার লোকদের কাছ থেকে। ভারতে কাগজ আনে তুর্কী মুসলমানরা। ভালো করে কিতাব লেখা একটা কলাবিদ্যা। আরবী ও পারসি পুঁথির লেখনপদ্ধতির সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্য অতুলনীয়।

সাম্রাজ্যশাসন, জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা করা, স্থাপত্যশিল্প গড়া বা ইমারত নির্মাণ প্রভৃতি কাজে দরকার টাকার বা অর্থের। অর্থ আসে দু'ভাবে এক আসে বিদেশ থেকে লুট-পাট করে, আর আসে ব্যবসায় বাণিজ্য করে। তবে ব্যবসায় বাণিজ্য বিনা মূলধনে হয় না। দেশজয়ের ফলে আরবদের ধর্মরাজ্যে ধন সম্পদ প্রচুর পরিমাণে জড় হয়েছে—যেমনটি হয়েছিলো রোমানদের দেশে, যেমনটি পরবর্তী যুগে হয়েছিলো স্পেনে ও ব্রিটেনে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দুনিয়ার সোনা গিয়ে জমে মার্কিনী শিল্পপতিদের সিন্দুকে। সেই সোনার টাকা ছড়িয়ে পৃথিবীকে সে বশে রাখতে চাইছে।

মধ্যযুগে বিশ্বজয়ী আরবদের বাণিজ্য তরণী ঘুরছে ভারত মহাসাগরের তীরে বন্দর থেকে বন্দরে; সুদূর চীন দেশেও তারা যায় ...নে—ফিরতি পথে মশলাপাতি সংগ্রহ করে দ্বীপময় ভারত থেকে। মধ্যধরণীসাগরেও তারা প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বীহীন হয়ে ওঠে কারণ উত্তর আফ্রিকা তো বহুকাল বিজিত হয়েছে সিসিলি দ্বীপও তারা অধিকার করেছে। সেই দ্বীপ হলো তাদের বড়

রকম আস্তানা—সেখান থেকে ব্যবসায়ও চলে ইতালীও লুটপাট হয়। সিসিলি দ্বীপ প্রায় চারশত বৎসর মুসলমানী দ্বীপ হয়ে ছিলো।

ইতিমধ্যে চীনাদের দেশে জলপথে যাওয়া-আসা করতে-করতে আরবরা চীনাদের কাছ থেকে দিকদর্শনী যন্ত্র বা কম্পাসের রহস্য জেনে নিয়েছে। সমুদ্রে চলাফেরা করবার সময়ে সমুদ্র বায়ুর নিয়ম তারা বুঝতে পারে এবং সেই মৈসুমবায়ুর প্রবাহ ধরে মাঝদরিয়ায় পাল তুলে চলা সহজ হয়—তার পূর্বে উপকূলকে চোখে চোখে রেখে জাহাজ চালাতে হতো। দিকনির্ণয় যন্ত্র আবিষ্কার ও মৈসুমবায়ুর গতিবিধি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ থেকে সামুদ্রবাণিজ্যে এলো যুগান্তর। য়ুরোপীয়রা আরবদের কাছ থেকেই দিকনির্ণয় যন্ত্রের কথা জানতে পারে, সমুদ্রের হাওয়া-বাতাসের রহস্য বুঝতে পারে। অবশ্য মধ্যধরণীসাগরের মধ্যে সমুদ্রবায়ুর এ-রহস্য গ্রীকরাই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করে।

সমুদ্রপথ ছাড়া ডাঙাপথেও আরব বণিকরা উটের সারি নিয়ে দূর দূরান্ত দেশে যায়; মধ্যএশিয়ার ভূগোল, তার মানচিত্র, বড় বড় শহরের অবস্থান বা দ্রাঘিমা-লঘিমা প্রভৃতি তারা তন্ন তন্ন করে প্রস্তুত করে। এসব করতে জ্যোতিষ ও ত্রিকোণমিতির চর্চা করতে হয় ভালো করে। দেশজয় ও দেশ শাসনের জন্য ভূগোল বিদ্যার চর্চা খুবই দরকার; আর বণিকদের বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে যাওয়া-আসার জন্যও পথঘাট সম্বন্ধে ভালো রকম ওয়াকিবহাল হওয়া আবশ্যক। আফ্রিকার উত্তর দিয়ে সৈন্য গিয়েছিলো দেশজয় করতে। মরক্কো পর্যন্ত ভালো সড়ক বানানো হয় ব্যবসায়ের জন্য। পথে পড়ে ভূমধ্যসাগর তীরের অনেক বন্দর। সেইসব বন্দর থেকে স্পেন, ফ্রান্স, ইতালী, সিসিলি প্রভৃতি দেশে আরবদের বাণিজ্য তরণী যায়। আফ্রিকার সঙ্গে য়ুরোপের বাণিজ্য পথ খুলে গেল। আফ্রিকার উত্তর উপকূল ছিল রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এখন সে ভূভাগ এসে গেছে আরবদের ধর্মসাম্রাজ্যর মধ্যে।

আরব সাম্রাজ্যে বহু শিল্পকেন্দ্র হয়েছে—মসালের সূক্ষ্মবস্ত্র মসলিন, দামাস্কাসের তীক্ষ্ণধার অস্ত্র, বোগদাদের সুগন্ধি নির্যাস প্রভৃতি বিবিধ সম্ভার নিয়ে সওদাগরের দল চলে দেশে-বিদেশে। মধ্যধরণীসাগরের জেনোয়া ও ভেনিসের ব্যবসায়ীরা আরবদের সওদা কিনে নিয়ে চালান দেয় ডাঙাপথে উত্তর য়ুরোপে; সেখানে হান্‌সা (Hansa) লীগ বা জারমেনীর শিল্পনগরীগুলি জোট পাকিয়ে এইসব সামগ্রী খরিদ করে ও য়ুরোপের নানা দেশে চালান দেয়। বিরাট আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলে এশিয়া আফ্রিকা য়ুরোপের মধ্যে।

ইসলামিক সংস্কৃতি

পৃথিবীর ইতিহাসে আরবজাতির অভ্যুদয় একটা বিস্ময়কর ঘটনা; এবং তার থেকেও বিস্ময়কর এই অর্ধ-যাযাবর, অর্ধ-সভ্য মরুর মানুষদের জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্তের পিপাসা। পশ্চিম এসিয়ায় আরবদের অভ্যুদয়ের পূর্বে য়ুরোপ জারমেনিক নানা উপজাতির দ্বারা অধিকৃত হয়েছিল। কিন্তু সে নূতন জাতির মানুষদের মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের জন্য কোনো তৃষ্ণা ছিল না,—বরং রোমান সভ্যতা ও লাতিন সংস্কৃতি তাদের কড়া হাতের চাপে চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

হজরত মহম্মদের কর্ম ও ধর্মজীবনের মেয়াদকাল তো মাত্র সতেরো বৎসর (৬২২—৬৩৯ খৃ:)। তারপর শতাধিক-কয়েক বৎসরের মধ্যে আরবরা এশিয়া, আফ্রিকা ও য়ুরোপের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রশক্তি হয়ে ওঠে কোন্ মন্ত্রবলে! কিন্তু সাম্রাজ্য সৃষ্টি আরবদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি নয়; কারণ আরব সাম্রাজ্য তো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে কত কাল পূর্বে, কিন্তু ইসলাম তার পূর্ণ তেজে বিদ্যমান! এক ধর্মবিশ্বাস, এক ধর্মগ্রন্থ, এক নবী, এক ভাষা, এক বেশ, এক তীর্থ, এক কানুন—বহুবিস্তৃত ভূখণ্ডের বিচিত্র জাতিকে এক ভ্রাতৃত্ববন্ধনে টেনে রেখেছে; এ-অনুভূতি অন্যধর্মে অজ্ঞাত।

ইসলামের ধর্মজয়ের ফলে আরব সংস্কৃতি আরাবিয়া উপদ্বীপের মধ্যে সীমিত থাকেনি। কালে আরাবিয়ার বাইরের লোক যারা ইসলাম গ্রহণ করে, তারাই এই ইসলামী সংস্কৃতি প্রসার ও প্রচারের পাণ্ডা হয়ে ওঠে।

আরবদের অভ্যুদয়কালে প্রাচীন জগতের দু'টি সভ্যতা আরাবিয়ার দুইদিকে প্রবল ছিল—একটি বৈজয়ন্তীয়মের গ্রীক, অপরটি পারসিক। আর একটি দুর্বল জাতি ছিল ইহুদীরা।

আমরা পূর্বে বলেছি যে গ্রীক সেল্যুকিদ বংশীয়দের সময় থেকে পশ্চিম-এশিয়ার সিরীয়া গ্রীক সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে ওঠে। সিরীয়ানরা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে নিজেদের ভাষায় ধর্মগ্রন্থ তর্জমা করা ছাড়া, গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানের বহু গ্রন্থ অনুবাদ ক'রে ভাষাকে পুষ্ট করে তোলে। আরবরা নূতন জেগে উঠেছে; তাদের নেতারা জনতাকে জ্ঞানের আলোকে প্রবুদ্ধ করতে চায়। কিন্তু আরবদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহিত্য কোথায়? এই অভাবের প্রতি দৃষ্টি গেল বোগদাদের খলিফাদের। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় পারসিক, ইহুদী, নেসতোরীয় খৃষ্টান পণ্ডিতগণ গ্রীক, সিরীয়াক, পারসি এমনকি সংস্কৃত

থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুঁথি তর্জমায় মন দেন। বিশ্ব জয় করছেন সেনাপতিরা বিশ্বজ্ঞান আহরণ করছেন পণ্ডিতরা। "কেবল তরবারির জোরে আরবদের বিশ্বপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, শুধু আরব সৈন্যের ভয়ে স্পেন হইতে ভারতবর্ষ পর্যন্ত প্রসারিত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের বীরজাতিরা আরবদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, এরূপ মনে করিবার মত ভুল আর কিছু হইতে পারে না।" (বিজ্ঞানের ইতিহাস ২-১১১)। তরবারির সাহায্যে দেশ জয় করা যায়, দেশের মানুষের মন জয় করা যায় না; মানুষের মন জয় করেছিল হজরতের সাম্যবাদী, সুফি ও মস্তদের প্রেমপূর্ণ লোক-ব্যবহার।

আরাবিয়ার উত্তরে ও পূর্বে গ্রীক রোমক সিরীয়াক ও পারসিক এবং হিন্দুর বাস। এইসব দেশের জ্ঞানপূর্ণ গ্রন্থের অনুবাদ থেকে আরবীয়দের প্রথম জ্ঞানোন্মেষ হয়। বোগদাদের নিকট নেসতোরীয় খৃষ্টানদের বিদ্যাশ্রম জুনদে শাহপুর ও পারসিকদের জ্ঞানকেন্দ্র মার্ভ দূরে নয়। এই দুইটি স্থান বহুকাল থেকে গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা কেন্দ্র আছে। প্রসঙ্গত বলি খৃষ্টান-গ্রীসে প্রাচীন গ্রীকদের গ্রন্থ চর্চা প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল।

অনুবাদের আদিপর্বে ভারতীয় বিজ্ঞানী ব্রহ্মগুপ্তর 'সূর্য সিদ্ধান্ত' আরবী ভাষায় অনূদিত হয় বলে জানা যায়। সেটি হয়েছিল আব্বাসী খলিফা অল্ মনসুরের সময়ে। মনসুরের খলিফত্বকালে বহু গ্রীক বিজ্ঞানী গ্রন্থরও-তর্জমা হয়। হুনায়েন ইবন্ ইশাক ('৯ শতক) একজন নামকরা অনুবাদক-খলিফা মামুনের সমসাময়িক। গ্রীক, আরামিক বা সিরীয়াক ও পারসি—এই তিনটি ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত। মামুন-এর 'দার-অল্-হিল্মা বা ভারতীভবনে হুনায়েন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এই জ্ঞানতপস্বী তাঁর পদের মর্যাদা রক্ষা করে গ্রীক বিজ্ঞানী গ্যালেন, হিপোক্রিটাস, প্টলেমি, ইউক্লিড, আরিস্তোতল প্রভৃতি নামকরা লেখকদের বহু গ্রন্থ সিরীয়াক ও আরবী ভাষায় তর্জমা করেন। এইসব চিন্তার খোরাক পেয়ে শিক্ষিত যুবকদের মনে নানা প্রশ্ন জাগে—অন্তরে সন্দেহ, শাস্ত্রে অবিশ্বাস।

প্রাচীন অনুবাদকদের মধ্যে থাবিত্ ইবন্ কুরা (মৃ '৯০১) নাম করা ভাষাবিদ। তর্কশাস্ত্র, জ্যোতিষ ও চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ক দেড়শ (১৫০) গ্রন্থ তিনি নাকি আরবীতে ও পনেরোটি (১৫) বই সিরীয়াকে লেখেন।

আব্বাসী খলিফাদের সমসাময়িক স্পেনের উম্মীয় বংশের খলিফাদের কর্দোভা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশিষ্ট কেন্দ্র হয়ে ওঠে। স্পেনীশ-আরব পণ্ডিতরা

গ্রীক বিজ্ঞানের পরিচয় পেয়েছিলেন। কর্দোভায় গ্রীক ভাষা শিখবার যথেষ্ট চাহিদা ছিল বিদ্যার্থীদের মধ্যে। শোনা যায় কর্দোভায় যে কিতাবমহল বা লাইব্রেরী ছিল, সেখানে ছয়লক্ষ বই ছিল! আর সারা স্পেনে ছোট-বড়ো ৭০টি গ্রন্থাগার ছিল। সেযুগের পক্ষে এটি অভাবনীয় ঘটনা। ভারতে প্রাক্ ইসলাম যুগে চতুষ্পাঠিতে, পণ্ডিতদের ঘরে, বৌদ্ধ বিহারে, জৈন ভাণ্ডাগারে রাজাদের গ্রন্থশালায় কত সহস্র পুঁথি ছিল, তার হিসাব করা যায় না।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুবাদ-গ্রন্থ পড়তে-পড়তে একদিন আরবদের বিজ্ঞানী মেজাজ পেয়ে বসলো। ইউক্লিড, পটলেমির গণিত ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে বই পড়ে আরবরা এইসব বিষয়ে নিজেরাই গবেষণায় প্রবৃত্ত হলো। গণিতের নূতন পথ তারা পেলো সেদিন, যেদিন হিন্দু গণিতের সংখ্যাবাচক প্রতীকের সাথে 'শূন্য (Zero) যোগে সংখ্যার নূতন রূপ দেখতে পেলো। আর একদিন দশমিক (Decimal) তত্ত্ব ভারতীয় গণিত থেকে জানলো। ভারতীয় বিদুষী লীলাবতীর বীজগণিত তারা পেয়ে নূতন করে তার রূপ দিল। ৮২০ অব্দে অল্‌খোয়ারিজিমি 'অলজেবরওয়াল মুকাবেল নামে গ্রন্থ লিখলেন; তখন থেকে গণিতের এই বিদ্যার নাম হলো 'অলজেবরা!' হিন্দুদের জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা করতে হয়, পূজা-পার্বন-ক্রিয়াকাণ্ডের শুভমুহূর্ত নির্ধারণের জন্য। মুসলমানদের পক্ষেও চন্দ্রের অবস্থান ও গতি সম্বন্ধে নির্ভুল তথ্য জানা দরকার; কারণ রমজান প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠান পালন করতে হয় চন্দ্রকে দেখে। ভৌগোলিক গণিতের সাহায্যে পৃথিবীর কোন জায়গা থেকে মক্কাশরীফ কোন্ দিকে পড়বে তা জানাও একান্ত প্রয়োজন। এখন তো মক্কার সকল দিকেই ইসলামিক রাজ্য—সুতরাং গণিতের সাহায্যে দিকনির্ণয় করতেই হয়।

নামকরা বিজ্ঞানীরা হচ্ছেন—মুসা অল্-খোয়ারিজমি (মৃ ৮৫০?), অলকিন্দি (মৃ ৮৭৩), অল ফরঘানি (মৃ ৮৬১২) অল্‌বিত্তানি (৮৫০-৯২৯) প্রভৃতি। কত নাম করবো? অল্‌বিত্তানির ন্যায় জ্যোতির্বী ইসলামিক জগতে জুড়ি মেলা ভার। সিরীয়ার আন্তিয়োক মহানগরীর মানমন্দিরে একচল্লিশ বৎসর তিনি পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করেন; তাঁর রচিত গ্রন্থ লাতিনে তর্জমা হয়েছিল (১৫৩৭)। ত্রিকোণমিতির অনেক তত্ত্ব এঁর আবিষ্কার। ইবন্ ইউনিসের (মৃ, ১০০৯) হাকেমাইট' ফলক প্রায় দুই শ' বৎসর য়ুরোপের পণ্ডিতরা ব্যবহার করেছিলেন। ইবন অল্ হাইথাম (মৃ, ১০৩৯)—য়ুরোপে যিনি অলহাজেন নামে খ্যাত—আলোক-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা বহুকালের প্রাচীন ভ্রান্ত মতকে সংশোধিত করে।

অল্‌বিরুনী ও ওমরখায়েমের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। অল্‌-বিরুনীর ভারত সম্বন্ধে গ্রন্থটি নিছক ভ্রমণকাহিনী নয়—হিন্দু জ্যোতিষ, গণিত সম্বন্ধে বহু গবেষণা এর মধ্যে আছে; তাছাড়া আছে হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক তথ্য। ওমরখায়েমকে আমরা কবি বলে জানি। কিন্তু তিনি কত বড় গাণিতিক ছিলেন সে-খবরটাও জানা দরকার; মুসলমানী পঞ্জিকা সংস্কারে তাঁর স্থান অবিস্মরণীয়; তাঁর লেখা 'অল্‌তারিখ অল্‌জালালি' বা জালালি পঞ্জিকা নির্ভুল ও বিশুদ্ধ; রোমের পোপ (১৩শ) গ্রেগরী ১৫৮২ অব্দে বহু পণ্ডিত নিযুক্ত করে পঞ্জিকার যে সংস্কার করেন ওমর-খৈয়ামের পঞ্জিকা তার থেকে অনেক বিশুদ্ধ।

বোগদাদের আব্বাসী খলিফাদের রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক অধঃপতন ত্রয়োদশ শতকের পূর্ব থেকে সুরু হয়েছিল। তারপর ১২৫৮ সালে কীভাবে মংগোল সর্দার হুলাগু খান বোগদাদ ধ্বংস করে, সে কাহিনী পূর্বেই বলা হয়েছে। মংগোলদের সম্বন্ধে আমরা একপেশে মত পোষণ করি—তারা নরহত্যা, ও সভ্যতা ধ্বংসকারী ইত্যাদি। এ অভিযোগ সত্য হলেও হুলাগু খান পরম বিদ্যোৎসাহী ছিলেন; নাসীর অল্‌দিন আত্‌তুসি (১২০১-৭৪) নামে এক প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীকে তিনি আশ্রয় দেন; ও তারপর তাঁর গবেষণার সুবিধার জন্য মারাঘাতে এক বিরাট মানমন্দির নির্মাণ করে দেন। মারাঘা আবহাওয়া ও জলবায়ু পর্যবেক্ষণের অনুকূলস্থান বলে পাহাড়ের উপর বীক্ষণাগার স্থাপিত হয়েছিল। মধ্যএশিয়ার নানা নগর থেকে কুশলী কারুকর মারাঘাতে আনিয়ে বহুবিধ যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিয়ে মানমন্দির শোভিত করলেন। মোটকথা অ-মুসলমান হুলাগু প্রতিষ্ঠিত মারাঘার তুল্য বিদ্যাকেন্দ্র সে-অঞ্চলে আর দ্বিতীয়টি ছিল না। মারাঘার বীক্ষণাগার পর্যবেক্ষণের ফলে গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে যেসব তথ্য জানা গিয়েছিল, তার সূচী পারসি ভাষায় প্রথম লিখিত হয়। পরে আরবী সংস্করণ প্রস্তুত করে নেন পণ্ডিতরা। আরবীতে করবার কারণ পারস্য ও ভারতে পারসি ভাষার চল্‌ ছিল, তার বাইরে পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকায় আরবী ছিল লোকভাষা ও রাষ্ট্রভাষা।

কালে মংগোলদের পতনের সাথে সাথে মারাঘার খ্যাতিও ম্লান হয়ে যায়। তার স্থান অধিকার করে সমরখন্দ; সেখানে মধ্যএশিয়ার দ্বিতীয় মানমন্দির নির্মিত হয়। সেটি তৈরী হয় তৈমুরলঙের প্রপৌত্র উলুগ বেগের

উৎসাহে ও অর্থানুকূল্যে। এখানকার গবেষকরা পারসি ভাষায় সবকিছু লেখেন এবং পরে আরবী ভাষায় এবং তার থেকে লাতিন ও ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়। য়ুরোপীয় বিদ্যার্থীরা আরবী কিতাবের লাতিন অনুবাদ থেকে সে-যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের টুকরো কথা সংগ্রহ করতেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি আরবদের দৃষ্টি যায় দিগ্‌বিজয়ে বাহির হবার সময় হতেই। চিকিৎসা বা আয়ুর্বেদ চর্চা করতে হয় ব্যক্তিগত দৈহিক দুঃখভোগ নিবারণের জন্য। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি করতে হয়—সৈন্যবিভাগের যোদ্ধা-মানুষ, তার বাহন অশ্ব, হস্তী, উট, গর্দভ প্রভৃতিকে সুস্থ রাখবার ও পীড়িত বা আহত হলে সুস্থ করবার তাগিদে। ভেষজ বা গাছপালার গুণাগুণ, মৃত্তিকার রাসায়নিক তত্ত্ব ও প্রাণীর দেহতত্ত্ব—এই তিনটি বিষয়ে গবেষণা হলে চিকিৎসা সার্থক হয়। হিন্দুরা ভেষজ ও প্রাণীজ পদার্থের গুণাগুণ সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করে। আর আরবরা মৃত্তিকা বা খনিজ পদার্থের গুণাগুণ বিচার করে 'কিমিয়া' বিদ্যা বা রসায়ন বিজ্ঞানের উদ্‌ভাবক হয়। ভোজনবিলাসী বাদশাহ, আমীর ওমরাহদের জন্য মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুত ও তাহা পরিপাক করাবার জন্য নূতন নূতন দাওয়াই বা ঔষধ তৈয়ারীর কথা চিকিৎসক বা হেকিমদের ভাবতে হতো।

আয়ুর্বেদ বা চিকিৎসা-বিজ্ঞান আয়ত্ত করবার জন্য হিন্দুদের আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ পারসি ভাষায় ও সিরীয়াক ভাষায় অনূদিত ও পরে আরবী ভাষায় তর্জমা হয়। পারস্যের শাহন্‌শাহরা হিন্দু বৈদ্যদের খুবই পছন্দ করতেন। বোগদাদে একাধিক হিন্দু চিকিৎসক ছিলেন—একথা বলেছেন অল্‌বিরুনী। চরক, সুশ্রুতের আয়ুর্বেদীয় বই অনুদিত হয়েছিল বলেও জানা যায়।

ঔষধ প্রস্তুতের সঙ্গে কিমিয়া বা রসায়নবিদ্যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বিজ্ঞান-সম্মতভাবে চিকিৎসার প্রবর্তক আরবরা হলেও, তারা প্রেরণা পেয়েছিল গ্রীক ও হিন্দুদের কাছ থেকে। কিমিয়াবিদ্যাকে কেন্দ্র করে য়ুরোপে যাদুবিদ্যা, নিকৃষ্ট ধাতুকে সোনা করবার জন্য 'অল্‌কেমি' বিদ্যাচর্চা চলে; আরব বিজ্ঞানীদের মধ্যে এইসব ভেল্‌কি নিয়ে তেমন মাতামাতি করতে দেখা যায় না। মধ্যযুগের নামকরা বিজ্ঞানী অল্‌রাজি ইবন্‌সিনা (Avicena)। এদের কিমিয়াবিদ্যা বিষয়ক বই পড়লে মনে হয় যেন য়ুরোপের সপ্তদশ শতকের সত্যসন্ধানী রাসায়নিকের গ্রন্থ পড়ছি।

চিকিৎসাবিদ্যায় পারদের (mercury : রস) ব্যবহারে আরবরা পথিকৃৎ ভারতের আয়ুর্বেদীয় চরক, সুশ্রুত প্রভৃতির গ্রন্থ মধ্যে পারদ বা রসের ব্যবহারবিধি অজ্ঞাত ছিল; ১৬ শতকে 'ভাবপ্রকাশ' নামে আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে (পোর্তুগীজদের দ্বারা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ভারতে আনীত 'সিফিলিস' বা ফেরঙ্গব্যাধির চিকিৎসার জন্য) পারদ শোধিত ঔষধের কথা পাওয়া যায়। এই প্রয়োগবিধি য়ুনানী বা হেকিমি শাস্ত্র থেকে প্রাপ্ত বলে অনুমান হয়।

চিকিৎসাবিষয়ক বহু আরবী গ্রন্থ কালে লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়। অল্‌রাজি (৮৬৬-৯২৫) সে-যুগের যেন আরিস্তোতল—সর্বজ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার! চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থ লাতিন ভাষায় তর্জমা হয় ১২৭৯ অব্দে; ১৯ শতক পর্যন্ত সেই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছিল-য়ুরোপের চিকিৎসকরা পড়তেন নিশ্চয়ই। এই বিরাট গ্রন্থে প্রাচীন গ্রীক, ভারতীয় ও সিরীয়াক চিকিৎসা-প্রণালীর আলোচনা দেখা যায়; তবে গ্রীক বিজ্ঞানী হিপোক্রেটিস ও গ্যালেন প্রদর্শিত পদ্ধতির উপর বেশী জোরে পড়েছে। নিজের অভিজ্ঞতা ও গবেষণা থেকে অনেক তথ্য এই গ্রন্থে আছে।

চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধে ইবন্‌সিনা (Avicena ৯৮০-১০৩৭) ও ইবন্‌রসীদ (Averroes ১১২৬-১১৯৮)-এর নাম অমর হয়ে আছে য়ুরোপের বিজ্ঞান ইতিহাসে। ইবন্‌সিনার বিখ্যাত গ্রন্থ 'কানুন-ফিল্‌-টিব' অর্থাৎ 'ঔষধের নিয়মাবলী' চিকিৎসাশাস্ত্রের বিশ্বকোষ। প্রায় ছয় শ' বৎসর এই 'কানুন' মধ্যপ্রাচ্যে ও য়ুরোপে সুপরিচিত ছিল। এই গ্রন্থ লাতিন, হীব্রু ও য়ুরোপীয় কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল—যুগপৎ অগণিত টীকা ভাষ্য রচিত হয়ে চলেছিল।

স্পেনের মুসলমানদের মধ্যে ইবন্‌রসীদ—আভেরোস নামে যিনি য়ুরোপে খ্যাত, তাঁর মতো মনীষী, সর্বতোমুখী প্রতিভা য়ুরোপে দ্বাদশ শতকে আর কেউ ছিলেন না। ইবন্ রসীদ যৌবনে আইন-কানুন, য়ুনানী বা হেকিমি-বিদ্যা চর্চা করার পর মন দিলেন দর্শনশাস্ত্র আলোচনায় বিশেষ করে প্লাতোন ও আরেস্তোতলের গ্রন্থ অধ্যয়নে। এখানে প্রসঙ্গত একটা কথা বলা দরকার। গ্রীকরা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার ও বিশেষভাবে রোমান সম্রাটদের দ্বারা খৃষ্টধর্ম রাজধর্ম বলে স্বীকৃত হবার পর থেকে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি পাঠ ও চর্চা গ্রীকদের মধ্য থেকে প্রায় উঠেই গিয়েছিল; য়ুরোপ ভুলেই গেল তাদের কথা; যেটুকু প্রচারিত হতো খৃষ্টান পণ্ডিতদের দ্বারা তা অত্যন্ত বিকৃত। মুসলমান মওলানারা গ্রীক্ দার্শনিকদের মতবাদ বুঝবার চেষ্টা এবং

আরবী ভাষার মাধ্যমে বুঝাবার চেষ্টা করে আসছেন অনেক কাল থেকে। ইবন্ রসীদের সময়ে আরিস্তোতলের প্রায় সমস্ত দার্শনিক গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল; ইবন্‌রসীদ নানা টীকা ভাষ্য আলোচনা করে নূতন ভাবে গ্রীক মহাদার্শনিকের মত ব্যক্ত করেন। ইসলামের প্রতিক্রিয়াপন্থী মওলানা অল্ ঘজলীর দল ঘোষণা করলেন ইবন রসীদের মতামত কোরান বিরুদ্ধ। ইবন্‌রসীদ ছাড়বার পাত্র নন। তিনি উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিলেন। কিন্তু ইসলামে বুদ্ধিমুক্তির যুগের অবসান হয়ে আসছে—যুক্তি, তর্ক, বিচার প্রভৃতির স্থলে গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার নির্বুদ্ধি মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। তাই অল্ ঘজলির জয়জয়কার হলো। খলিফার আদেশে ইবন্ রসীদ নির্বাসিত হলেন ও তাঁর গ্রন্থরাজি প্রকাশ্যভাবে পোড়ানো হলো; ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞানী মনোভাবের পরাজয় ঘটলো—ইসলামের মধ্যযুগের ইতিহাসের উপর যবনিকার পর্দাও নেমে এলো, যেমন একদিন বিশুদ্ধ ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে মোতাজাল'দের দশা হয়েছিল!

ব্যবহারিক শিল্প বা বিজ্ঞানের যোজনায় যেসব কারুশিল্পের জন্ম হয়েছে আরব বা মুসলমানদের সেক্ষেত্রে দানের কথা সাধারণে প্রায় ভুলে গেছে। আমরা নেদারল্যানড বা ওলন্দজদের দেশে windmill বা পবনচক্রের প্রচলনের কথা জানি; কিন্তু এযন্ত্র আবিষ্কৃত হয় মধ্যএশিয়ায় এই তথ্যটি জানতে পারি ইতিহাস থেকে। মধ্যএশিয়া পারস্য আফগানিস্তানের কূপ থেকে জল তোলার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহৃত হতো—জল উঠতো ঘটিচক্র দিয়ে। আরবরা এই যন্ত্রনির্মাণ বিদ্যা স্পেন নিয়ে যায়—স্পেন থেকে বোধহয় হল্যাণ্ডের লোকে এই যন্ত্রবিদ্যা পেয়েছিল। ডন্‌কুইসোট নাইট বেশে ঘুরতে ঘুরতে পবনচক্রকে দৈত্য ভেবে লড়তে গিয়েছিলেন—সে কাহিনী সবার পড়া ও সে-ছবিও সবারই দেখা।

প্রাচীন কালে এমনকি মধ্যযুগেও য়ুরোপের লোকে না জানতো চিনি খেতে, না-জানতো সুতির কাপড় পরতে; বনের থেকে মৌমাছির চাক্ ভেঙে মধু আনতো। আর শনের সুতোয় বোনা কাপড়-চোপড় অথবা চামড়ার তৈরী জামা পরতো। এ দুটোই আরবরা প্রবর্তন করে য়ুরোপে। আখের চাষ, আখ থেকে রস বের করে চিনি করার পদ্ধতি সমস্তই আরবরা য়ুরোপীয়দের শেখায়। এ বিষয়ে মিশরের আরবরা ছিল অগ্রণী। মিশরীয়দের শর্করা বা চিনি তৈরীর পদ্ধতি য়ুরোপীয়রা পশ্চিম ইনডিজ দ্বীপপুঞ্জে চালু করে। তারপর অবশ্য য়ুরোপীয় বিজ্ঞানীরা উন্নততর পদ্ধতি আবিষ্কার করে—প্রাচ্যদেশের লোক প্রাচীনকালের যন্ত্রপাতি নিয়ে স্থির হয়ে বসে থাকলো; প্রতিযোগিতায় তাই হটতে হলো। শর্করা ভারত থেকে যায় য়ুরোপে আরবদের মাধ্যমে, তেমনি যায় কার্পাস বা সুতির কাপড়। ইংরেজিতে Cotton শব্দটা আরবী 'কর্তুন' থেকে এসেছে। 'কাগজ ও বারুদ' আরবরা পেয়েছিল

মধ্যএশিয়ার চীনাদের কাছ থেকে—'কাগজ' শব্দটার চীনা মূল রূপ।
মুসলমানরা কতভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সহায় হয়েছিল মধ্যযুগে সে ইতিহাস পৃথকভাবে পড়বার মতো বিষয়। মরুচর, অর্ধ-যাযাবর বিবদমান বহু উপজাতিতে বিভক্ত আরবরা এক মহাপুরুষের বাণী শুনে দেহে ও মনে কী শক্তি পেয়েছিল, যার বলে চারশত বৎসরের মধ্যে তাদের ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি ভারত থেকে স্পেনে অথবা ভারত মহাসাগর থেকে মধ্য ধরনী সাগরের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল!

সেই ইসলামী শক্তির অবসান হলো একদিন। একাদশ শতকের শেষাশেষি থেকে বিজ্ঞান গবেষণায় আরবদের উৎসাহ ক্ষীণ হয়ে আসতে আরম্ভ করে। যুক্তি, বিচার থেকে প্রাচীনপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল মওলানাদের নির্দেশে চলাই ইসলামের শ্রেষ্ঠ আদর্শ দাঁড়িয়ে গেল। ইবন্ খালদুন প্রভৃতির মতো দু চার জন চিন্তাশীল লোক জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তাদের কথা শোনবার মতো লোকের মতিগতি আর নেই—এখন অল্ ঘজালির মত-ই প্রবল হয়ে উঠেছে।

সাম্রাজ্যবাদ ও অনিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দেখা দিয়েছে সাম্রাজ্যের সর্বত্র; ধনী-নির্ধনের মধ্যে সেতু গিয়েছে ভেঙে। ধন বৃদ্ধিহেতু দৈহিক শ্রমবিমুখ হয়ে পড়েছে লোকে; সমস্ত কাজ করে তুর্কি মজুর, তুর্কি দাসের দল,—সৈনিকের কাজ করে তুর্কিরা (মংগোল সর্দার হুলাগু খান যখন বোগদাদ আক্রমণ করলো, তখন তাকে রুখবার শক্তি আব্বাসী খলিফাদের সৈন্যবাহিনীরও নেই, জনতারও নেই। কালে এই মংগোলদের প্রাধান্য দেখা দিল ইসলামীয় ইতিহাসে—মধ্যএশিয়া ও ভারতে তারা সাম্রাজ্য গড়লো। কিন্তু বিজ্ঞানচর্চার আয়োজন দেখা গেল না—কেবল স্থাপত্য-বিজ্ঞানের উন্নতি দেখা দিল—প্রাসাদ, মসজিদ, কবরস্থান নির্মাণে। বিলাস-ব্যসনের সামগ্রী প্রস্তুত করতে হলেও যে বিজ্ঞানীবুদ্ধির প্রয়োজন, তা বংশ-পরম্পরায় শিল্পীদের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় ছিল,—কার্য কারণের সম্বন্ধ না জেনে পরম্পরাগত অভ্যাসবশে চারু ও কারুশিল্প করে যেতো তারা। বুদ্ধির মুক্তি হয়নি মধ্যযুগের মানুষের, কারণ ধর্মের শাসন ছিল নির্মম, দার্শনিক দৃষ্টি ছিল আচ্ছন্ন। প্রাচীনকালের হিন্দুরা ও চীনারা এবং মধ্যযুগের আরব ও অন্য মুসলমানরা বিজ্ঞানের চর্চা করতে করতে একটা অবস্থায় এসে থেমে গিয়েছিল। পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করতে করতে জীর্ণ হয়ে গেল প্রাচীন সংস্কৃতি। অচিরকালের মধ্যে তাদের স্থান পূরণ করলো বর্তমান য়ুরোপ, যার কথা আমরা পরবর্তী খণ্ডে আলোচনা করবো।

শেষ

কালানুক্রমিক সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী

খৃষ্টপূর্ব ৪০০০ হইতে খৃষ্টপর ১০০০ অব্দ

খৃষ্টপূর্ব

৪০০০ মিশর; প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতা। তাম্রাস্ত্র যুগ। চিত্রলিপির আরম্ভ।

যুফ্রাতিস—তাইগ্রিসের মোহনায় সুমেরুয়দের বিচ্ছিন্ন উপনিবেশ; কৃষিকেন্দ্রিক নগরজীবন।

৩৫০০ মিশরের প্রবাদগত রাজবংশের আরম্ভ। মেসোপটেমিয়ায় সমুদ্রাগত মানুষদের ইতস্তত রাজ্য স্থাপন।

৩০০০—২৭৫০ মিশর, পিরামিড পর্ব। ফারায়ো খুফুর পিরামিড্। উত্তর দক্ষিণ মিশরীয়দের মিলন—গরুড় ও সর্প প্রতীক রাজচিহ্ন ধারণ। থীবস। 'মৃতপুস্তক'। কারুশিল্প।

সুমেরুয়দের উর প্রভৃতি সভ্য নগরী প্রতিষ্ঠা। ফিলিস্তানে কানানীদের বাস। ভারতে সিন্ধু-হরাপ্পার বহু বিস্তৃত সভ্যতার বিস্তার।

২৮৫০ বাবিলনিয়া আক্কাদীরা। শরকুন (সারাগণ) রাজা।

২৫০০ মধ্য-য়ুরোশিয়ায় অর্ধ যাযাবর 'আর্য' ভাষা-ভাষীদের বাস।

২৪৫০-১৭৮৮। মিশরে ৯—১৭ রাজবংশীয় ফারায়োদের শাসনকাল।

২২০০ ক্রীট দ্বীপের প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন মৃত্তিকা খনন করিয়া প্রাপ্ত।

২১৫০ বাবিলনে রাজা হামুরাবি। পৃথিবীর সর্বপ্রথম লিখিত আইন সংগ্রহ শিলাপটে খোদিত।

২০০০ মিশরে সামন্ত রাজচক্র। এশিয়া মাইনর (তুর্কী) হিটাইতদের উপনিবেশ। বলকানে আদিমতম আর্যদের আবির্ভাব।

১৮০০ ক্রীটান। ইজিয়ান তথা মিকিনির সভ্যতা।

১৭৮০—১৫৮০ মিশরে আর্য উপজাতি হিক্‌সসদের শাসন। অশ্বের ব্যবহার মিশরে প্রচলিত হইল।
যাযাবর হীব্রু ও আরামিনদের ফিলিস্তান ও সিরীয়ায় উপনিবেশ। হীব্রুদের রাখাল শাখার দুর্ভিক্ষের জন্য মিশরে আশ্রয়। ইহুদীরা হিক্‌সস্ রাজাদের প্রিয়।

১৬০০ মিশরে জাতীয় অভ্যুত্থান। হিক্‌সস্‌দের উচ্ছেদ। মিশরে নূতন সাম্রাজ্যবাদ ও এশিয়ার পশ্চিমাংশ অধিকার। পারস্যে আর্যদের উপনিবেশ।

১৫০০ ভারতে আর্যদের নানা উপজাতির প্রবেশ, বৈদিক যুগ। পঞ্চনদে বাস।

১৪০০-১২০০ হিটাইতদের পশ্চিমএশিয়ায় বিস্তার। মিশরীয়দের চিত্রলিপি ও বাবিলনীয় কীলকাক্ষরে উৎকীর্ণ হিটাইত শিলালেখ। কাশস্ত (কাসাইত) আর্য-উপজাতির বাবিলনিয়া দখল। মহাভারতীয় যুদ্ধ।

১৩৮০ মিশরের ফারায়ো আমনহোতেপের ইথনাতোন নাম গ্রহণ: আতোন বা সূর্য আত্মন-প্রশস্তি। ১৩৫৮ তুতেনখামোন।

১২৫০ অসুরীয়দের অভ্যুদয়। মিশর আক্রমণ।

১২০০ মিশর প্রবাসী ইহুদীদের মিশর ত্যাগ। মুসার (মোজেস) নেতৃত্বে পশ্চিম-এশিয়ায় পুনর্বাসন চেষ্টা।
হেলেনী আর্যদের নানা উপজাতির আনাতোলিয়ার (এশিয়া মাইনরে) উপকূলে উপনিবেশ।

১১৪০ ফিলিস্তানে হীব্রুদের বাস। জজ শাসকদের কাল। ট্রোজান যুদ্ধ।
১১০০ হোমারীয় বীরগাঁথা রচনার কাল।

১১০০ অসুরীয় রাজা টিগলথপিলেসর।

১০০০ ইসরেইলের রাজারা—দাউদ, সলোমন। ১০ শতক ফিনিকদের স্বরবর্ণহীন অক্ষরের ব্যবহার।

৯৩৫ হীব্রুদের রাজ্য বিভক্ত—ইসরেইল ও জুডা।

৮৫০ অসুরীয় রাজারা পশ্চিমএশিয়ায় প্রবল। এশিয়ামাইনরে লিডিয়া রাজ্য, মুদ্রা প্রথম প্রচলন সেখানে। গ্রীসের স্পার্টায় লাইকারগাস।

৮০০ আফ্রিকার উপকূলে ফিনিকদের উপনিবেশ 'নবনগর' বা কার্থাডা (কার্থেজ)। ভারতে উপনিষদ যুগ।

৭৭৬ গ্রীসে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রবর্তন।

৭৫৩ ইতালিতে রোমনগর পত্তন। ইউট্রাসকানদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি।

৭৫০ ভারতে বেদবিরোধী নানা মতের অন্যতম জৈন ধর্মমতের প্রবর্তক পার্শ্বনাথের আবির্ভাব।

৭৪০—৭২২ অসুরীয় রাজাদের প্রতাপ—ইসরেইলের রাজধানী সামারিয়া ধ্বংস।

৭৩০ গ্রীকদের মধ্যধরনী-সাগর তীরে উপনিবেশ—সিসিলিতে গ্রীক উপনিবেশ—কার্থেজীয় ব্যবসায়কেন্দ্র স্থাপন।

৭০৫ অসুরীয় রাজা সেনাকরিব—জুডা আক্রমণ—মহামারীর জন্য জেরুসালেম রক্ষা পায়।

৭০০ গ্রীসে লিখনকলার প্রসার। লিরিক কবিতার জন্ম।

৬৮০ অসুরীয় সম্রাট এশাহদ্দনের সময়ে অসুরিয়া-বাবিলনিয়া যুক্ত সাম্রাজ্য।

৬৪০ গ্রীক দার্শনিক থেলিস্। আথেন্সে ড্রাকো আইনকর্তার আবির্ভাব (৬২০)।

৬৪০—৪১৩ ভারতে শৈশুনাগ বংশ।

৬১০ মিশরের ফারায়ো নিকো-র সুয়েজ-খাল খননের পরিকল্পনা। তাঁহার নির্দেশে ফিনিক নৌবাহিনীর আফ্রিকা প্রদক্ষিণ।

৬০৫ বাবিলনিয়ার নূতন সম্রাট—নেবুকাডনেজর কর্তৃক মিশর আক্রমণ।

৬০০ চীনদেশে লাওৎসুর তাওধর্ম।

৫৯৯—৫২৭ জৈনধর্মের তীর্থঙ্কর মহাবীর।

৫৮২ মগধে বিম্বিসার রাজা। নবরাজগৃহ নির্মাণ।

৫৯৪ আথেন্সে সোলন আইনকর্তা—আর্কন।

৫৮৬ নেবুকাদনেজার কর্তৃক জেরুসালেম ধ্বংস ও ইহুদীদের বাবিলনে নির্বাসন।

৫৬৭—৪৮৬ বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকাল।

৫৫৮ পারস্ত-সাম্রাজ্য স্থাপন: কইরুশ।

৫৫৪ মগধের রাজা অজাতশত্রু।

৫৫১ কুঙফুৎসু (কনফুসিয়াস) চীনাসাধক। বহু পরিব্রাজকদের নানা মত প্রচার।

৫৪৬ লিডিয়া পারসিকদের দ্বারা অধিকৃত; ধনকুবের ক্রোসাস। আথেন্সে টাইরেণ্ট শাসন। গ্রীক মহাকাব্য ইলিয়াড, ওডেসীর সংকলন।

৫৩৭ কইরুস কর্তৃক বাবিলনে বন্দী ইহুদীদের মুক্তিদান ও জেরুসালেম পুনর্গঠন ব্যবস্থাপন।

৫২৯ কইরুসের মৃত্যু: কাম্বিসিস্ পারসিক সম্রাট।

৫২৭ মহাবীর, অজাতশত্রু, টাইরেণ্ট পিসাসট্রোটাসের মৃত্যু।

৫২৫ মিশর পারসিকদের অধিকৃত (৫২৫-৩৩২)।

৫২২—৪৮৬ অখামনীয় বংশের দরায়ুস পারস্তের সম্রাট। লোহিতসাগর হইতে নীলনদ পর্যন্ত খাল খনন।

৫10 আথেন্স হইতে টাইরেণ্টদের নির্বাসন, ডিমোক্রেসি প্রতিষ্ঠা। বিতাড়িত গ্রীক টাইরেণ্টদের পারসিক ক্ষত্রপের (গবর্ণর) সহায়তালাভের চেষ্টা।

৫০৯ রোম হইতে রাজা টারকুইন বিতাড়িত: 'রিপাবলিক' শাসন প্রবর্তন। পূর্বভারতে লিচ্ছবিদের মধ্যে জনমত সাপেক্ষ শাসনতন্ত্র।

৫০৮ দরায়ুস কর্তৃক পঞ্জাব অধিকার। স্বর্ণখনি-পূর্ণ দেশ তখন।

৫০৪ পূর্বভারতে বিদ্রোহী রাজপুত্র বিজয় সিংহ কর্তৃক লঙ্কাদ্বীপে উপনিবেশ: 'সিংহল' নামকরণ।

৪৯৯ এশিয়া মাইনরের গ্রীক বাসিন্দাদের মধ্যে আত্মকলহ—পারসিক শাসন

পক্ষের সহিত আথেনীয় 'ডিমোক্রেসি' মতবাদের সপক্ষীয়দের মধ্যে সংঘর্ষ।

৪৯৪ রোমে ট্রিবিউন পদ সৃষ্টি; সিনেটে প্লীবদের প্রথম অধিকার প্রাপ্তি।

৪৯০ দরায়ুস কর্তৃক গ্রীসে সৈন্য প্রেরণ। মারাথনের যুদ্ধে পারসিকদের পরাজয়।

৪৮৬ জারক্সেস পারসিক সম্রাট।

৪৮৬ বুদ্ধদেবের ৮০ বৎসর বয়সে মৃত্যু। রাজগৃহে ভিক্ষুদের প্রথম সংগীতি (?)

৪৮০ পারসিকরা গ্রীসে। আথেন্স বিধ্বস্ত। থার্মাপলির যুদ্ধ। সালামিসের নৌ-যুদ্ধে পারসিক নৌবাহিনীর পরাজয়। পারসিক সৈন্যের অপসারণ।

৪৭৮ ডেলিয়ান কনফেডারেসি। ডেলস দ্বীপে গ্রীক রাষ্ট্রনগরী সমূহের সংঘ গঠন। থেমিষ্টক্লিস কর্তৃক আথেন্স পুনর্গঠন। পাথরের প্রাচীর নির্মাণ— স্পার্টার ঈর্ষা। আথেনীয় নৌ-বাহিনী গঠন।

৪৭০ সোক্রাতিসের জন্ম। ৪৬৮ সোফোক্লিস। ৪৫৬ ইস্কাইলাসের মৃত্যু।

৪৫৭ পাটলিপুত্র নগরপত্তন। শিশুনাগ বংশীয় রাজারা।

৪৫০ রোমে লিখিত আইন-দ্বাদশ ফলকে খোদিত;

৪৪৮—৪৩০ আথেন্স পেরিক্লিস কর্তৃক পুনর্গঠিত। ফিদিয়াস স্থপতির পার্থিনন মন্দির নির্মাণ।

পেলোপনেশীয় সমর। আথেন্সে প্লেগ মহামারী।

৪২৯ পেরিক্লিসের মৃত্যু। প্লাতোনের জন্ম। আরিস্তোফেনিসের নাটক অভিনয়।

৪১৩—৩২২ মগধে নন্দ রাজবংশ।

৪১১ স্পার্টার সহিত পারসিকদের মিতালি।

৪০৪ আথেন্সের পরাজয় স্পার্টার নিকট।

৩৯৯ আথেন্সে জনতার শাসন। সোক্রাতিসের প্রাণদণ্ড। প্লাতোনের বয়স ৩০।

৩৯০ রোমনগরী গলদের দ্বারা আক্রান্ত পশ্চিমএশিয়ায় সার্দিসের পারসিক 'ক্ষত্রপ' রাজনীতি একছত্র নিয়ামক।

৩৭৬ বৈশালিতে ২য় বৌদ্ধ সংগীতি।

৩৭৬ রোমে পিতৃস্বান-প্লিবীয়ানদের বিবাদ; প্লিবীয়ানদের কন্সাল-নির্বাচনে অধিকার লাভ। শ্রেণীসংগ্রাম।

৩৫৯ মকিদানরাজ ২য় ফিলিপ। বিচ্ছিন্ন গ্রীক রাষ্ট্রনগরীগুলিকে একছত্রতলে আনিবার চেষ্টা। ডিমস্থেনীসের বিরোধিতা, বক্তৃতা ৩৫৪-৩৫১।

৩৫৬ আলেকজেন্দারের জন্ম।

৩৪৭ প্লাতোনের মৃত্যু। গ্রীক দর্শনের নূতন দিক্ উন্মোচন।

৩৩৬ ফিলিপ নিহত। আলেকজেন্দার ২০ বৎসর বয়সে মকিদানপতি।

৩৩৫ আলেকজেন্দার কর্তৃক গ্রীক রাষ্ট্রনগরীগুলি জয়। দিগ্বিজয় যাত্রা।

৩৩৪—৩৩২ গ্রানিকাসের যুদ্ধ, ইসাসের যুদ্ধে পারসিকদের পরাজয়। মিশর জয়।

৩৩১ ফিনিশিয়ার রাষ্ট্রনগরী ধ্বংস। সামুদ্রবাণিজ্যে একচেটিয়াত্বের অবসান।

৩৩০ আরবেলার যুদ্ধে পারসিক সম্রাট পরাভূত। পলায়নমান সম্রাট স্বজাতি হস্তে নিহত। আলেকজেন্দার পারস্য সাম্রাজ্যের অধীশ্বর।

৩২৭—২৫ আলেকজেন্দারের পশ্চিম ভারতের কিয়দংশ জয়। গঙ্গারাঢ়। নন্দবংশ।

গ্রীকদের প্রত্যাবর্তন। নিয়ার্কাস সিন্ধুনদ বাহিয়া অজ্ঞাত সমুদ্র পথে বাবিলনিয়ায় পৌছান। আলেকজেন্দার স্থল পথে।

৩২৫—২৩ গ্রীকরা সুসা ও বাবিলনে। আলেকজেন্দারের ইচ্ছা বাবিলকে সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন। মৃত্যু।

৩২৩-৩০ সেনাপতি প্‌টলেমির বংশধরগণ মিশরের অধীশ্বর।

৩২৩ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নন্দবংশ ধ্বংস। কৌটিল্যর রাজনীতি।

৩০৩ সেল্যুকাসের ভারত আক্রমণ। চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক পরাভূত। মেগাস্থেনীস পাটলিপুত্রে রাষ্ট্র দূত রূপে অবস্থান।

৩০১ গ্রীক সাম্রাজ্য বিভক্ত—সিরীয়া ও পশ্চিমএশিয়া সেল্যুকাস, মিশর প্‌টলেমি। মকিদান ও গ্রীস পৃথক রাজ্য।
মিশরে আলেকজেন্দ্রিয়ায় ম্যুজিয়াম। ইউক্লিড।

২৯৮ মগধে বিন্দুসার সম্রাট। দাইমোকোস গ্রীক রাষ্ট্রদূত।

২৮৫ মিশর গ্রীক সংস্কৃতি, শিল্প, শিক্ষার কেন্দ্র। হীবরু বাইবেলের গ্রীক তর্জমা—সেপ্তুয়াজেণ্ট।

২৮০—৭৫ এপিরাসের রাজা পিরাসের ইতালি আক্রমণে ব্যর্থতা। রোম সমগ্র ইতালির অধীশ্বর।, দক্ষিণ ইতালির গ্রীকবাসিন্দাদের স্পর্শে আসিবার পর রোমানদের সাংস্কৃতিক জীবনের রূপান্তর।

২৭২—২৩২ ভারতে প্রিয়দর্শী অশোক। দক্ষিণ ভারতে চের, চোল, পাণ্ড্য। শিলালিপি, স্তম্ভলিপি। পাটলিপুত্রে ৩য় বৌদ্ধ সংগীতি। সাঞ্চী স্তূপ নির্মাণ আরম্ভ (২৫১)।

২৬৯ রোমে রৌপ্যমুদ্রার প্রথম প্রচলন।

২৬৪—২৪১ প্রথম পিউনিক যুদ্ধ—রোমের সহিত কার্থেজের সংঘর্ষ।

২৫০ পারস্যে গ্রীকদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা। আর্সিকি বংশ।

২৩২ অশোকের মৃত্যু।

২১৮—২০২ দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ। ইতালিতে হানিবল।

২১৩ চীনের হুয়াংতি; কুঙফুৎসুর গ্রন্থাদি দগ্ধের আদেশ। উত্তর চীনে হুনদের আক্রমণ—চীনা প্রাচীর নির্মাণ।

২১২ সিসিলিতে বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের মৃত্যু।

২০৬ বক্‌ত্রিয়ার স্বাধীনতা। সেল্যুকীদ বংশীয় আন্তিয়োকসের ভারতসীমান্ত আক্রমণ—রাজা সুভাগসেন পরাজিত।
চীনে হান্‌ বংশের প্রতিষ্ঠা।

২০২ কার্থেজে জামার যুদ্ধে হানিবল পরাজিত।

২০১—১৯০ বাকত্রিয়ান রাজা দিমেত্রিয়োস কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম ভারতে হামলা। বহুবৎসর বাকত্রিয়ানরা ভারত জয়ের ব্যর্থ চেষ্টা করে।

১৮৫ পাটলিপুত্রে মৌর্যবংশের অবসান; সুঙ্গবংশীয় পুষ্যমিত্র কর্তৃক অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন। বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া।

১৭১ অন্ধ্র শাতকর্ণী। খারবেল: হাতিগুম্ফার শৈললেখ: জৈনদের রাজনৈতিক অভ্যুদয়।

১৭১—১৩৬ পারদরাজ মিত্রদত্ত: তক্ষশিলা ও সিন্ধু অববাহিকায় শাসন প্রতিষ্ঠা।

১৫৫ বাক্‌ত্রিয়ান গ্রীক মিনান্দারের ভারত আক্রমণ। 'মিলিন্দ পঞ্‌হো' পরবর্তীকালে রচিত।

১৫০ চীনে 'কাগজ' প্রস্তুত।

১৪৯ তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ: কার্থেজ ধ্বংস। রোমানদের দ্বারা কোরেন্থ অধিকার ও লুণ্ঠিত—আর্ট-ঐশ্বর্য দ্বারা রোম বিভূতি।

১৪০—১৩০ বকত্রিয়ান রাজ্য ধ্বংস।

১৩৩ স্পেন রোমানদের দ্বারা অধিকৃত।

১২৩ রোমে শ্রেণীসংঘাত। ট্রিবিউন টিবেরিয়াস গ্রাকাস দাঙ্গায় নিহত।

১২০ মধ্যএশিয়ায় ইউচি, শক, কুষাণ প্রভৃতি উপজাতিদের চলাফেরা।

১০৪ চীনের বিখ্যাত ঐতিহাসিক সু-মা চিয়েন। ১ম শতকে ভারতে মনুস্মৃতি সংগ্রহের চেষ্টা।

৯৫ কুষাণ উপজাতির প্রাধান্য লাভ।

৯১—৮৮ রোমে শ্রেণীসংঘাতও শ্রেণীসংগ্রাম। সেনাপতি মারিয়াস জনতা-পক্ষীয়-নেতা। ৮২—সিনেটের পক্ষে সুল্লা। মারিয়াসের পরাজয়; প্রতিক্রিয়া পন্থী ধনতন্ত্রবাদীদের জয়;

৮৮ সিংহলে বৌদ্ধ ত্রিপিটক এলু হইতে পালিতে সম্পাদন।

৭৩—২৮ মগধের সিংহাসনে কাণ্ব ব্রাহ্মণ রাজবংশ। ভারত বহু ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত।

৬০ রোমের রাজনীতি ত্রিমূর্তি জুলিয়াস সীজার, ক্রেসাস ও পম্পাই (ট্রায়ম্বিরেট) অন্যতম কন্সালরূপে সীজারের গালিয়া (ফ্রান্স) জয়। ব্রিটেনে রোমানরা।

৫৭ ভারতে 'বিক্রমসম্বৎ' আরম্ভ। শক-আক্রমণ হইতে উজ্জয়িনী যশোবর্মন কর্তৃক রক্ষা ; বিক্রমাদিত্য শকারি উপাধি গ্রহণ।

৫৩ রোমান সেনাপতি ক্রেসাস পারস্য জয় করিতে গিয়া পারদ সৈন্যদের দ্বারা নিহত। ক্রেসাসের ছিন্ন-মুণ্ড পারদরাজ সমীপে আনয়ন—তখন রাজা আরেণ্ডোফেনিসের 'বাকাই' নামে গ্রীক নাটকের অভিনয় দেখিতেছিলেন।

৪৮ গালিয়া হইতে সীজারের রোমে প্রত্যাবর্তন। পম্পাই-এর ইতালি হইতে পলায়ন। মিশরে পম্পাই নিহত। সীজার কর্তৃক মিশর জয়—ক্লিওপেট্রা প্‌টলেমি বংশের শেষ অধিশ্বরী।

৪৫ রোমে সীজার সর্বময় কর্তা। পঞ্জিকা সংস্কার—সৌরহিসাব প্রবর্তন।

৪৪ রিপাবলিকানদের হস্তে সীজারের মৃত্যু।

৪৩ –৩১ দ্বিতীয় ট্রায়ম্বিরেট—আনটনি, অকটেভিয়াস ও লেপিডাস। সীজার হত্যাকারীদের পরাভব ও মৃত্যু। আক্‌ৱামের যুদ্ধে আনটনির পরাজয়। অক্‌টেভিয়াস রোমান জগতের একেশ্বর।

২৭ অকটেভিয়াস 'অগষ্টাস্' ও ইমপিরেটর (এম্‌পারার) বা উপাধি ধারণ।

২৬-২০ দ. ভারতের পাণ্ড্যরাজ কর্তৃক রোমান অগষ্টাসের দরবারে দূত প্রেরণ।

৮ পাঞ্জিকা সংস্কার। ৭ম মাস 'জুলাই' ও ৮ম মাস 'অগষ্ট' হইল।

৪ ইসরেহলি বেথেলহাম গ্রামে দরিদ্র ছুতারের ঘরে যীশুর জন্ম।

খৃষ্টপর অব্দ

১৪ প্রথম রোমান সম্রাট অগস্টাসের মৃত্যু—টিবোরিয়াস সম্রাট (১৪-৩৭)

২৩ চীনে হান্‌বংশের অবসান।

২৯ যীশুখ্রীষ্টকে হত্যা (৩৩ বৎসর বয়স)।

৪৩—৪৪ উত্তরপশ্চিম ভারতে পহ্লব (পারদ, পার্থিয়ান) রাজ্য বিস্তার।

৪৮—৭৫ মধ্যএশিয়ায় ইউচিদের পাঁচ উপজাতিদের কদফিসেস কর্তৃক সংঘবদ্ধকরণ।

৪৭ ব্রিটেন রোমান সাম্রাজ্যভুক্ত (৪০০ বৎসর রোমানদের অধীন)।

৪৭—৬৫ সাধু পল, সাধু পিটর কর্তৃক রোমান সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টের ধর্ম প্রচার।

৪৮ ভারতে খৃষ্টীয় সাধু টমাসের আগমন সম্বন্ধে কিম্বদন্তী।

৬৪ চীনে বৌদ্ধভিক্ষু কাশ্যপ মাতঙ্গ। মধ্যএশিয়ার বৌদ্ধদের চীনে আগমন ; শ্বেতাশ্ববিহার প্রতিষ্ঠা।
রোমনগরী সম্রাট নিরো কর্তৃক অগ্নিসংযোগে ধ্বংসের কাহিনী। খৃষ্টানদের উপর উৎপীড়ন।

৭০ জেরুসালেম রোমানদের দ্বারা ধ্বংস। লোহিতসাগরের নাবিকের রোজনামচা পেরিপ্লাস।

৭৫ রোমের প্রেক্ষামঞ্চ কলেসিয়াম নির্মাণ।

৭৮ ভারতে শকাব্দ প্রবর্তন। কুষাণরা ভারত সীমান্তে।

৭৯ ইতালিতে ভিসুবিয়াস আগ্নেয়-উৎপাতে পম্পে ও হারকুলেনিয়াম ধ্বংস।

৮৯-১০৫ চীন সম্রাট হো-তি। কুচা, কারাশহর চীনাদের দ্বারা অধিকৃত।

১০০ রোমান সম্রাট ট্রেজান দরবারে ভারতীয় দূত।

১২০ কুষাণ উপজাতীয় সম্রাট কণিষ্ক। ভারতীয় শিল্পে গ্রীক তথা হেলেনেস্টিক আর্টের প্রভাব।

কাশ্মীরে বৌদ্ধ সংগীতি। মহাযান-হীনযান ভেদ সুস্পষ্ট। অশ্বঘোষ। অসঙ্গ, বসুবন্ধু। মধ্য এশিয়ায় প্রাকৃতভাষায়, খরোষ্টি লিপিতে ধম্মপদ (উদানবর্গ) লিখিত।

১৫০ দক্ষিণ ভারতে চের বংশের অভ্যুদয়। জৈনধর্মাচার্যগণ।

১৬০ মার্কাস অরেলিয়াস; 'আত্মচিন্তা'। খ্রীষ্টবিদ্বেষী।

২০০ পশ্চিমএশিয়ার পামিয়ারায় পারদ স্থাপত্য।

২২০—২৬৫ চীনে ওয়াই রাজবংশ। পারদ বৌদ্ধভিক্ষু—চীনে বৌদ্ধগ্রন্থ—অনুবাদক।

২২৬-৬৪১ পারস্যে সাসনীয় রাজবংশের অভ্যুদয় ও রাজত্ব।

২৪৮ রোম মহানগরীর ১০০০ বৎসর প্রতিষ্ঠা উৎসব।

২৬০ পারস্য সম্রাট সাপোরের নিকট রোমান সম্রাট ভালেরিয়াণের পরাজয়। আন্তিয়োক অধিকার।

২৬৫—৩১৬ চীনদেশে ৎসিন বংশীয় রাজাদের লোয়াঙে রাজধানী; বহু মধ্যএশিয়ান বৌদ্ধদের চীনে আগমন ও বৌদ্ধসংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ।

২৮৪—৩০৫ রোমান সম্রাট দাওক্লিশিয়ান; খৃষ্টানদের প্রতি অত্যাচার।

২৯৬ রোমান সাম্রাজ্য চারটি প্রদেশে বিভক্ত।

৩০৬ সম্রাটপদের বহুপ্রার্থী। কনস্টাণ্টাইন নির্বাচিত।

৩১৩ ধর্মবিষয়ে সহিষ্ণুতা ঘোষণা। ৩২৪ কনস্টাণ্টাইনের খৃষ্টধর্ম গ্রহণ। ৩২৫ নিশিয়ায় (এশিয়া মাইনরে) খৃষ্টান পাদরীদের সভা।

৩১৭—৪২০ চীনে ৎসিন (পূর্ব) রাজবংশ—নানকিন রাজধানী।

৩১৮-৩২০ ভারতে গুপ্তাব্দ। চন্দ্রগুপ্ত প্রথম সম্রাট। সংস্কৃত সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। কালিদাস। ভারত নাট্যশাস্ত্র।

৩৩০ কনস্টাণ্টিনোপল স্থাপন।

৩৩০—৩৭৫ সমুদ্রগুপ্ত। বৌদ্ধ আচার্য বসুবন্ধু।

৩৬৪ পূর্ব ও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য বিভক্ত।

৩৮০ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। দিল্লীর লৌহস্তম্ভের নির্মাতা বলিয়া অনুমান।

৩৯৪ গ্রীক অলিম্পিক ক্রীড়া উৎসব অখ্রীষ্টানী বলিয়া নিষিদ্ধ হইল।

৩৯৭ চীনে ধর্মঘোষ কৃত বহু বৌদ্ধগ্রন্থের অনুবাদ।

৩৯৯—৪১৪ ফা-হিয়েন ভারতে।

৪০০ বোর্ণিও দ্বীপে রাজা মূলবর্মন কর্তৃক বহু-সুবর্ণ যজ্ঞ সম্পাদন।

৪১৩ চীনদেশে কুমারজীবের মৃত্যু।

৪২০—৪৩৯ নানকিঙে গুণবর্মন, গুণভদ্র প্রভৃতি ভারতীয় বৌদ্ধদের দ্বারা ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ।

৪৩৯ ভান্ডেলরা কার্থেজে উপনিবেশ।

৪৪২ হুন সর্দার আটিলা রোমান সাম্রাজ্যে।

৪৪৯—৫৫ অ্যাংগলো স্যাক্সন, জুটদের ব্রিটেনে অবতরণ ও উপনিবেশ গঠন।

৪৫৮ হেংগিষ্ট ও হোর্সা।

৪৫২ ভেনিশ নগর প্রতিষ্ঠা।

৪৫৫—৬৭ হুনদের ভারত আক্রমণ। রোম ভানডেলদের দ্বারা লুণ্ঠিত।

৪৭০ বুদ্ধগুপ্ত, আর্যভট্ট। ফ্রান্সে ফ্রাংকরা

৪৮৪ পারস্য সম্রাট ফিরোজ হুনদের দ্বারা নিহত।

৪৯৫—৫০২ ভারতে হুনসর্দার তোরমন। ৫০২—৫৪২ মিহিরকুল।

৫৩০ হুনদের পরাজয়—মানবরাজ যশোবর্মন।

৫৩২ জাস্টিনিয়ান কৃত রোমান আইনগ্রন্থ সম্পাদন। কনস্টান্টিনোপলের সেণ্ট সোফিয়া গির্জা নির্মাণ আরম্ভ। ষষ্ঠ শতকে ভারতে এলিফেণ্টা গুহামন্দির উৎকীর্ণ।

৫৩২ দুইজন খৃষ্টান সন্ন্যাসী কর্তৃক চীন হইতে রেশমগুটি গোপনে বলকানে আনয়ন।

৫৪৬ বৌদ্ধ আচার্য পরমার্থ সমুদ্রপথে চীনে। বহু সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদক।

৫৭০—৬৩২ হজরত মহম্মদ।

৫৮১-৬১৮ চীনে সুই রাজবংশ। জিনগুপ্ত প্রমুখ ভারতীয় বৌদ্ধ আচার্যগণ চীনে।

৫৯০—৬০৪ রোমের পোপ গ্রেগরী কর্তৃক খৃষ্টধর্ম প্রচার।

৫৯৩—৬২১ জাপানে শোতোকু তাইশির বৌদ্ধধর্ম বিস্তার।

৫৯৭ সাধু অগষ্টাইনের ব্রিটেনে খৃষ্টধর্ম প্রচার।

৬০০ হুয়েনসাঙের জন্ম।

৬০৫ স্থানেশ্বর, প্রভাকর বর্ধনের মৃত্যু; রাজ্যবর্ধন রাজা। বঙ্গদেশে শশাঙ্ক স্বাধীন রাজা। ৬৩৮ শশাঙ্কের মৃত্যু।

৬০৬—৪১ হর্ষবর্ধন সম্রাট। সংস্কৃত নাটক রচয়িতা। বাণভট্ট কৃত হর্ষচরিত। কাদম্বরী।

তিব্বতের জাগরণ—স্রংসামগামপো রাজা। ব্রাহ্মীলিপি হইতে তিব্বতী লিপি রচনা।

৬১০ রোমান সম্রাট হেরাক্লিস। ৬১৪ পারস্য সম্রাট খসরু।

৬১৮—৯০৭ চীনে তাং রাজবংশ। ৬২৭—৩৯ প্রভাকর মিত্র: চীনাভাষায় বৌদ্ধতান্ত্রিক গ্রন্থের অনুবাদ। বারণী মন্ত্র প্রভৃতি। ৭—৯ শতকে মধ্যে ইলোরার পার্বত্য মন্দির খোদিত।

৬২২ হজরত মহম্মদের মক্কা হইতে মদিনায় আশ্রয় গ্রহণ (১৬ই জুলাই)।

৬২৭—৬৪৯ চীনের সম্রাট তাইৎ-সুঙ্ বিদ্যোৎসাহী।

৬৩০—৬৪৪ হুয়েনৎসাঙ ভারতে; হর্ষবর্ধনের সমকালীন নালন্দা বিহারে আচার্য শীলভদ্র।

৬৩২ হজরত মহম্মদের মৃত্যু; প্রথম খলিফা আবুবকর।

৬৩৪ দ্বিতীয় খলিফা ওমর। জেরুসালেম আরবদের দ্বারা অধিকৃত। চালুক্যরাজ পুলকেশী ২য় নিকট হর্ষবর্ধনের পরাভব।

৬৩৫ উৎপীড়িত নেসতোরীয় খ্রীষ্টানদের চীনদেশে আশ্রয়।

৬৪০—৪৫ আরবদের দ্বারা রোমানদের নিকট হইতে মিশর প্রদেশ জয়।

৬৪১ হর্ষবর্ধন কর্তৃক চীনে দূত প্রেরণ—শেষ সাসনীয় সম্রাট তৃতীয় য়েজদর্গ আরবদের দ্বারা পরাভূত;

৬৪২ পল্লবরাজ নরসিংহ বর্মন কর্তৃক পুলকেশীর পরাজয়। কাঞ্চী রাজধানী। মহাবলীপুরমে স্থাপত্য।

৬৪৩ হর্ষবর্ধন আহূত ধর্মমহাসম্মেলন প্রয়াগে। হুয়েনসাঙের ভারত ত্যাগের আয়োজন।

৬৪৪—৫৬ তৃতীয় খলিফা ওসমান। হিজরী হইতে মুসলমানী পঞ্জিকা পালন ব্যবস্থা।

৬৪৫ হুয়েনসাঙের চীনে প্রত্যাবর্তন—১৮টি অশ্বের উপর বৌদ্ধ পুঁথি, মূর্তি প্রভৃতি সঙ্গে। চীন সম্রাটের ব্যবস্থা; সংস্কৃত গ্রন্থাদির চীনাভাষায় অনুবাদের বিরাট ব্যবস্থাপন।

৬৪৭ হর্ষবর্ধনের মৃত্যু; অর্জুনাশ্বের বিদ্রোহ। চীনা সেনাপতি ওয়াঙ হুয়েনৎসের দ্বারা বিদ্রোহ দমন।

৬৭১—৬৯৫ ইৎসিঙ ভারতে। প্রত্যাবর্তন পথে যবদ্বীপ ও সুমাত্রায় বহু বৎসর যাপন; ভারতীয় বৌদ্ধপণ্ডিতদের সহায়তায় বৌদ্ধগ্রন্থের চীনা অনুবাদ।

৮ম শতকে ভারতে শঙ্করাচার্যের ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রচার। ভারতীয় বৌদ্ধদের দ্বারা দক্ষিণ ভারতীয় অক্ষর-শব্দ বা বর্ণবিন্যাস জাপানে আনয়ন; কাতা-কিনা লিখনবিধি জাপানী মন্ত্রী কিবি কর্তৃক উদ্ভাবন।

৭০৯ আরবরা উত্তর আফ্রিকায়। ৭১১ স্পেনে আরবরা।

৭১৫-৭৫৯ আরবরা ফ্রান্সের মধ্যে ছিল।

৭১৩ আরব সেনাপতির দ্বারা সিন্ধুদেশ জয়। দাহীর।

৭১৮ আরবদের জলেস্থলে পাতালে কনস্টান্টিনোপল অধিকার চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

৭৩১ যশোধর্মণ কর্তৃক চীনে দূত প্রেরণ। ভবভূতি কবি।

৭৩২ ফ্রান্সে তুরের যুদ্ধে আরব মুসলমানদের পরাভব। আর বিশ বৎসর পরে আরবরা ফ্রান্সে নির্মূল হয় (৭৫৯)।

৭৩৫ ব্রিটেনে আচার্য বীড্-এর মৃত্যু।

৭৪০—৫২ উত্তর ভারতে প্রতিহার; দক্ষিণে চালুক্য। আরবরা দক্ষিণ-ফ্রান্স, স্পেন, মধ্যধরণী দ্বীপে, আফ্রিকায়, পারস্যে সুপ্রতিষ্ঠ।

৭৪৪ তুর্কদের দ্বাদশ শাখার অন্যতম উইগুরদের অর্থান নদী মস্তকে প্রতিষ্ঠান। তিব্বতে খ্রীরাং ত্সান বৌদ্ধধর্মানুরাগী। ভারতীয় বৌদ্ধ আচার্য শান্তিরক্ষিত পদ্মসম্ভবের তিব্বতে গমন।

৭৫০ দামাস্কাসে উম্মীয় খলিফাদের অবসান। আব্বাসী খলিফা আবুল আব্বাস। ৭৫৬ স্পেনের কর্দোভার উম্মীয় বংশের আবদুর রহমান-কর্তৃক রাজ্যস্থাপন। আব্বাসী খলিফা বোগদাদে রাজধানী স্থানান্তরণ (৭৬০)।

৭৫১ মধ্যএশিয়ার চীনারা আরবদের দ্বারা পরাভূত, চীনাবন্দীদের দ্বারা সমরকন্দে 'কাগজ' তৈরীর শিল্প স্থাপন।

৭৫৪—৭৫ অল্ মনসুর খলিফ। ৭৮৬—৮০৯ হারুন অল রসীদ; ৮০৯—৮৩৩ অল্ মামুন। এই পর্বে আরবদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা।

৭৫০—৮৫০ দ্বীপময় ভারতে শৈলেন্দ্ররাজগণ যবদ্বীপে বরবুদুর মন্দির নির্মাণ; মহাযান বৌদ্ধ প্রভাব। বঙ্গে পাল রাজগণ।

৮00 রোমে শার্লমানকে পবিত্র সম্রাট্ বলিয়া পোপ কর্তৃক ঘোষণা।

৮00—১000 বৃহত্তর ভারতে কম্বোজ রাজ্য।

৮০২—৩৯ ইংলণ্ডে এগবার্ট রাজা।

৮১৬—৩৮ তিব্বতে রলপথেন। বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ।
৯ম শতক জাপানে বৌদ্ধ আচার্য কোবোদাইশি কর্তৃক জাপানী হিরাকনা লেখন পদ্ধতি প্রবর্তন। পূর্বে কাতা-কনা ছিল।

৮১৩—৩৩ বোগদাদের আব্বাসী খলিফা অল মামুন। মুতাজলি মত যুক্তিবাদ—কোরান গ্রন্থ বিশেষ—কিয়ামত দিনে দেহ ধারণ করা যায় না। মুতাজলিরা পাষণ্ড বলিয়া ঘোষিত—সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সাধন।

৮৪০—১২০০ দক্ষিণ ভারতে চোল রাজবংশ।

৮৫০ হইতে ইংলনডে ডেনদের আক্রমণ। আলফ্রেড।

১০১৬—১০৪২ কান্যুটএ ডেনদের প্রভুত্ব।

৮৫০—১০৬০ আব্বাসী খলিফাদের অশান্তির জীবন। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় কম্বোজের প্রভাব। অংকোর নগর ও মন্দিরাদি নির্মাণ।

৯০০ দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ায় কার্মেথীয়দের বিদ্রোহ—মক্কা আক্রমণ, কাবা অপহরণাদি দুষ্ক্রিয়া।
মিশরে ফতেমীয় বংশ। ৯০৮—১১৭১ ফতেমীয় খিলাফত। ১১৭১ সালাউদ্দিন কর্তৃক মিশর অধিকৃত।

৯৬০ চীনে সুঙবংশ; আননাম পৃথক রাষ্ট্র—চম্পার হিন্দুরাজ্য।

৯৯৮ গজনীর সবুক্তগীন। মামুদ।

৯৮৫—১০১৪ চোলরাজাদের প্রতাপ। তাঞ্জোর মন্দির নির্মাণ।

১০০০ যবদ্বীপে হিন্দু সভ্যতা।

১০০১—২৫ সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণ।

১০১৪—৪৪ রাজেন্দ্র চোল। শৈলেন্দ্র রাজাদের সমসাময়িক।

১০১৯ যবদ্বীপে ঐরলংগ রাজা।

১০২৫ পশ্চিম এশিয়ায় সেলজুক তুর্কদের অভ্যুদয়।

১০২৬ মামুদ কর্তৃক সোমনাথ মন্দির ধ্বংস।

১০৩৭ ইবন্ সিনার মৃত্যু।

১০৬৬ নরমানডির ডিউক কর্তৃক ইংলণ্ড জয়।

১০৭৪ চোল রাজবংশের অবসান। রামানুজাচার্যের ধর্মমত প্রচার।

১০৭৬—১১৪৭ গঙ্গবংশীয় চোড়া গঙ্গদের রাজত্বকাল।

১০৯৬—৯৯ প্রথম ক্রুজেদ।

১১৭৯ লক্ষ্মণসেন বঙ্গের রাজা। ১১৯০—১২০৬ তুর্কদের উত্তর ভারত জয়।

১২৫৮ হুলাগুখান কর্তৃক বোগদাদের খলিফত্বের অবসান। ১২৮০ চীনে মংগোল বংশ। কুবলাই-এর কোরিয়া জয়। জাপান আক্রমণ ১২৮১। যবদ্বীপ অধিকারের ব্যর্থ চেষ্টা। বর্মা অধিকার। পেগান রাজধানী ধ্বংস। মার্কো পোলো।

১৩ শতকে ভারতবর্ষ তুর্কীদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত। ১৩০০ সেলজুক তুর্কদের পতন: ওসমানলি (ওথমান) তুর্কীদের আবির্ভাব।

নির্দেশিকা

আ

ই

ই

ঈ

উ

ক

গ

জ

ট

ত

ত

থ

দ

প

প

ফ

ব

ব্রাহ্মীলিপি ১৫৪, ২২৪, ২৬৩

ব

ভ

ম

শ

স